হিন্দু সমাজের মুখপত্র

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।
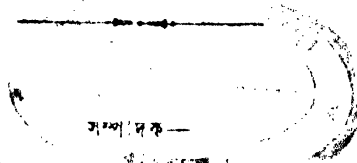
সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল্।

ত্রয়োবিংশ বর্ষ।

১৩২৬ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

আলোচনা-কার্য্যালয়,

১০৮নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য ২, টাকা।

হাওড়া, ৪নং তেলকল ঘাট রোড, কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাৎসরিক সূচী।

শ্রীশ্রীকালিকাদেবৈ নমঃ

আলোচনা

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

ত্রয়োবিংশ বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩২৬ সাল। { প্রথম সংখ্যা।

নববর্ষ।

বিশ্ব ব্যোম পতাকায় ভক্তপদ্ম বিকাশিনে
নষ্ট-মোহান্ধকারায় নমো বিশ্বসৃজে নমঃ।

গীত।

(১)

বিরাট কালের মহারঙ্গভূমে
বিশ্ব চরাচর নাচে গায়,
কত সুখ, দুখ, আশা বা নিরাশা
হৃদয় দলিয়া চ'লে যায়;
জীব কিম্বা জড় যে আছে যেখানে,
এই মহানাট্যে সবে একতানে,
করে অভিনয় অদৃষ্ট শাসনে,
(শেষে) মৃত্যু-যবনিকা পাশে সে লুকায়।

(২)

ঋতু মাস দিন গর্ভাঙ্ক লইয়ে,
বৎসরের অঙ্ক যায় ফুরাইয়ে,
কর্ম্মসূত্রে বাঁধা যবনিকা দোলে,
(হায়) সংসারের লীলা কবে বা ফুরায়।

(৩)

হাসিয়ে কাঁদিয়ে নাচিয়ে গাহিয়ে,
পুরাতন বর্ষ গিয়াছে চলিয়ে,
(এবে) একতায় ঐক্যতান বাজাইয়ে,
নববর্ষ-নাটে বাসনা জাগায়।

(৪)

এস ভাই সবে গাহি এক সুরে,
কর্ত্তব্যের পথ হেরিয়া অদূরে,—
নবীন উৎসাহে অভিনয় তরে,
প্রণমি জনক জননী পায়।

(৫)

এস নমি সবে বিশ্বেশ্বর পদে,
চাহি এই বর সম্পদে-বিপদে
যেন থাকে মতি ঐ রাঙা পদে
(মোরা) এর বেশী আর কিছু না চাই।

শ্রীতারাপদ কাব্যতীর্থ কবিভূষণ।

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ব্যতীত এ জগতে একটী কার্য্যও হইতে পারে না। এমন কি একটী ফুলের জীবন মরণ, একটী বালুকা-কণার স্থান পরিক্রমণ এবং স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্তও তাঁহার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন জাগতিক কোন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না, যে বলে আমি করি এবং ইহাতে সম্পূর্ণ আমার কর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান—সে মূর্খ বা বাতুল ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

যাহার জীবন জগতের সামান্য একটী ফুৎকার সহ্য করিতে পারে না, আয়ু-বায়ু ভরসা করিয়া একটী সামান্যমাত্র শারীরিক গ্লানী উপস্থিত হইলে যাহার জীবন-প্রদীপ নিবিয়া যায়-নিশ্বাস প্রশ্বাস মাত্র যাহার জীবনের পরিমাণ গণিতেছে, তাহার আবার এত অহংজ্ঞান,এত আত্মগরীতা কেন ? তাহার অহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা বলিয়া এরূপে অহংকারে ধরাকে এত হীন দেখিবার কারণ কি ?

বিশ্বেশ্বরীর এই বিশ্বরাজ্যে মানুষ তাঁহার ক্রীড়ার পুত্তলী, তিনি যেমনভাবে তাহাকে ফিরাইবেন, যেমনভাবে তাহাকে নড়াইবেন-চড়াইবেন, সে সেইরূপ ভাবেই নড়িবে-চড়িবে—যাইবে-আসিবে। অনেক লোকেই হয়ত এ কথার অনুমোদন করিবেন না ; কারণ এখন সকলেই বলিয়া থাকেন, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ভগবান রামচন্দ্রকে বশিষ্ঠদেবের শিক্ষাদানের মধ্যে সকলে অম্লানবদনে বলিয়া থাকেন—"দৈবেন দেয়ম্ ইতি কাপুরুষা বদন্তি" দৈবের উপর নির্ভর কর, দৈব সমস্ত বস্তু প্রদান করিবেন, ইহা কাপুরুষের উক্তি। পুরুষ হইয়া পুরুষকারের চালনা না করিয়া, নিজের মনুষ্যত্বের বলে সমস্ত লাভ না করিয়া কেবল দৈবের উপাসনা করিয়া কাঁদিলে কি হইবে ? দৈব আবার কি ? আমিই সব—আমারই কর্তৃত্ব এ জগতের সর্ব্বত্র বিরাজিত। কথাটা ঠিক—যদি বশিষ্ঠের মত গুরু লাভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মত মানুষ হইতে পারি—মানুষ হইয়া সর্ব্বপ্রকারে মনুষ্যত্ব আমাতে বর্ত্তমান রাখিতে পারি, তাহা হইলে আমাদেরও ঐ কথা বলা সাজে এবং পুরুষকারে একনিষ্ঠ হইলে দৈব ও পুরুষকার মিলিত হইয়া আমাদের সুফল প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু আমরা যে মানুষ—ঠিক সেইরূপ মনুষ্যত্ব সম্পন্ন—তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিব ?

এখানে জানা উচিত—দৈব ও পুরুষকার প্রকারান্তরে একই বস্তু,দৈব যেখানে পুরুষকারও সেইখানে, পুরুষকার যেখানে দৈবও সেইখানে সুফল প্রদানে মুক্তহস্ত, বরং নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—দৈবই মূলাধার। এ জগতে আত্মোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে না কে ? কিন্তু উন্নতি কয়জনের হয়, দৈব সানুকূল হইলে তোমার চেষ্টা বা পুরুষকার আপনি আসিয়া জুটিবে। পঙ্গু তুমি, জড়ভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছ, কোথা হইতে একটী অজানিত, প্রবল শক্তি আসিয়া তোমার অসার-অকর্ম্মণ্য, শক্তিহীন দেহকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিবে—তখন তুমি

সেই নবোদ্যমে যাহা করিবে—যাহা ধরিবে—তাহাতেই যে সফলকাম ও কৃতকার্য্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

তবে এই সৌভাগ্য লাভ করিতে হইলে তোমাকে মানুষ হইতে হইবে। দৈব সানুকূল নয় বলিয়া পুরুষকারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার জন্য ভগবান তোমাকে এতগুলি বাহ্য-ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন করিয়া সৃজন করেন নাই। কর্ম্ম তোমাকে করিতেই হইবে,—কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মময় জীবন লইয়া কর্ম্মে ক্লান্তিবোধ করিলে—তোমার ইহপরকাল নষ্ট হইবে। কর্ম্ম ছাড়িয়া কেহ থাকিতে পারে না—থাকা উচিতও নয়, কর্ম্মই ত ধর্ম্ম, কর্ম্মই ত স্বয়ং মা, কর্ম্ম ছাড়া কে কবে মায়ের কোলযোড়া হইয়া তাহার শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? অর্জ্জুন যখন কর্ম্মে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন—কর্ম্মে যখন তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া গাণ্ডীব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—তখন ভগবান বার বার তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া বলিয়াছিলেন—সখা! তুমি কর্ম্ম কর—কর্ম্ম কর, কর্ম্মরূপী যে আমি, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ কেন? অনন্তরকল ধনঞ্জয় তখন প্রবুদ্ধ হইয়া দেখিলেন—বাস্তবিকই ত, আমি এ কি করিতেছি—ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়া এমন বিষাদ ভাব কি সাজে, জগৎকর্ত্তা, সকল কর্ম্মের মর্ম্মবিধাতা ভগবান যখন বলিতেছেন, তখন কর্ম্মই আমার ধর্ম্ম—অতএব আর অবহেলা করিব না। পার্থ দারুণ বেগে আবার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন—"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি,—ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

এইখানে দৈবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা হইতেছে—এখানেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার উপর সাধক সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া আপন কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন—ইহা যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান।

নতুবা একটা মান-সম্ভ্রম লাভের কাজে বুক চাপড়াইয়া বলিব—আমি করিয়াছি—ইহার কর্ত্তা আমি, আর একটী দুষ্কর্ম্ম—যাহার দ্বারা লোক-সমাজে অখ্যাতি হইবে—তাহাতে বলিব—ভগবান যেমন করাইয়াছেন, তেমনি করিয়াছি। ইহাই কি মনুষ্যত্ব? ভালও তাঁর, মন্দও তাঁর, সৎও তাঁর, অসৎও তাঁর, আলোও তাঁর, অন্ধকারও তাঁর, সুখও তাঁর, দুঃখও তাঁর, এইরূপে যিনি তাহাতে সমস্ত সমর্পণ করিতে পারেন—তিনি যথার্থ সাধক। এ ধর্ম্মক্ষেত্র-রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার কর্ম্মই যথার্থ যশোলাভের হেতু।

কার্য্যে সুখ্যাতিও হয়, অখ্যাতি হওয়াও অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ সাধারণ কার্য্য করিতে গেলে কোথাও সুযশ-সুখ্যাতি, কোথাও বা অযশ-অখ্যাতি হইয়াই থাকে। কারণ, সকলের চিত্তবিনোদন করা সাধারণ কর্ম্মীর কর্ম্ম নয়। এই যে আমরা এত কাল "আলোচনা" চালাইতেছি,ইহা মায়ের ইচ্ছারই ফল—নতুবা আমাদের এমন কোন সামর্থ্য বা সঙ্গতি নাই, যাহাতে ইহা এতদিন

নিয়মিতরূপে চলিতে পারে। ১৩২৬ সালের বৈশাখে ইহা ত্রয়োবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল—সময়টা বড় অল্প নহে—ইহার ভিতর শক্তিশ্বরী মায়ের বিশিষ্ট শক্তি এবং তজ্জনিত গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গের বিশেষ অনুকম্পা বর্ত্তমান না থাকিলে কখন কি এত সুদীর্ঘ দিন কিছু থাকিতে পারে? আমাদের কার্য্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় নাই এবং তাহার দরুণ যে কোন কোন গ্রাহক সময়ে সময়ে আমাদের অখ্যাতি ঘোষণা করেন নাই—তাহা বলিতে পারি না, তবে সুদীর্ঘ কাল এত বড় একটা কার্য্য করিতে গেলে, সামান্য কর্ম্মীর ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু দায়ীত্ব হিসাবে দেখিতে গেলে এবং এই দুর্দ্দিনে—কাগজের দুর্ম্মূল্যতার দিকে দেখিতে গেলে এরূপ ত্রুটী মার্জ্জনীয়। সরলহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ পাঠক মহোদয়গণের নিকট আমরা সে দাবী করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

আমরা সকলেই মায়ের ছেলে, ছেলের আদর-আবদার মায়ের নিকট যত খাটে, তত আর কাহারও নিকট নহে। তাই আজ তাঁহার চরণে মতি রাখিয়া নূতন বর্ষে আবার "আলোচনার" গুরুভার মস্তকে লইয়া নবোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার উপর এত বড় জগৎ চলিতেছে—চন্দ্র-সূর্য্য এমন ভাবে ঠিক সময় মত উদিত হইতেছে—আর তাঁহার অনুপ্রেরণায় আমাদের ক্ষুদ্রশক্তির দ্বারা পরিচালিত "আলোচনা" ঠিক পরিচালিত না হইবে কেন? তাঁহারই কার্য্য তিনি করেন, করিতেছেন ও করিবেন—আমরা কেবল নিমিত্তমাত্র, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে যোড়হস্ত। মা! শক্তিসমন্বিতে! হৃদয়ে শক্তি দাও, আমরা ক্ষুদ্র "আলোচনাকে" যেন ক্রমোন্নতির পথে লইয়া ক্রমশঃ মুখপত্ররূপে সাধারণের মনস্তুষ্টি করিতে পারি।

নিবেদন—ভগবৎকৃপায় নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া "আলোচনা" ১৩২৬ সালের বৈশাখে ত্রয়োবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। দারুণ মহাসমরে কাগজের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে পত্রিকা পরিচালন করা মহাদায়! ৩৲ টাকা রীমের কাগজ ১২৲ টাকায় কিনিয়া পত্রিকা পরিচালন করা কতদূর কষ্টকর—তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। এই কয়বৎসর আমরা পত্রিকা প্রকাশে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও বিচলিত হই নাই, ঠিক সমভাবে গ্রাহকগণের সেবা করিয়া আসিয়াছি। এ বৎসর তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য এবং কিছু গ্রাহক বর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে এই দারুণ মহার্ঘ্যতার সময়ে আমরা বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে পাঁচখানি উপাদেয় পুস্তকও উপহার দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। পত্রিকা মূল্য ২৲ দুই টাকা ধার্য্য করা হইল বটে কিন্তু যাহারা এই বৈশাখ মাসের মধ্যে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে—হোমিওগীতি—১ম ও ২য় ভাগ, অশ্রুমালা—উপাদেয় পদ্য গ্রন্থ, জালনোট—উপন্যাস, ভক্তি-পরীক্ষা ও চক্র সংহিতা এই পাঁচখানি পুস্তক বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে প্রদান করিব, সকলে সত্বর হউন।

লেখকগণের প্রতি—নূতন লেখকের প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া উৎসাহ দান করাই

"আলোচনার" মুখ্য উদ্দেশ্য, এ উদ্দেশ্য লইয়া আজকাল কোন পত্রিকা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, "আলোচনা" সে বিষয়ে চিরকালই অগ্রণী. নূতন লেখক বৃদ্ধি করাই তাহার চরম লক্ষ্য, যাহারা আমাদের "আলোচনার" নূতন লেখক হইয়া প্রবন্ধ লিখিবেন, তাহাদের প্রবন্ধ আমরা সাধ্যমত সংশোধনান্তে প্রকাশ করিব। অতিরিক্ত পদ্য—যাহার ভাব, ভাষা, ছন্দ কিছুই নাই, সংশোধন করিলেও চলিতে পারে না—সেরূপ প্রবন্ধ কেহ পাঠাইবেন না, পাঠাইলে অগ্রাহ্য হইবে। লেখকগণ একটু পরিশ্রম করিয়া ভাল ভাল পুস্তকের সাহায্যে ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, সাধকজীবনী, ধর্ম্মমূলক ছোট গল্প প্রভৃতি গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধ ক্রমশঃ না হইয়া আমাদের পত্রিকার আন্দাজ ৪ পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করে, এইরূপ লিখিতে হইবে। রাজনীতি সংক্রান্ত কোন বিষয় "আলোচনায়" স্থান পায় না। যাহারা নূতন লেখক হইবেন, তাহাদিগকে এই দুর্দ্দিনে, কাগজের এই মহার্ঘতার দিনে "আলোচনার" জীবন রক্ষার্থে বাৎসরিক অন্ততঃ ৬৲ টাকা সাহায্য করিতে হইবে। তাহাদের উক্ত রূপ ছোট প্রবন্ধ বা ভাল ছোট পদ্য আমরা অন্ততঃ বৎসরে তিন চারিবার প্রকাশ করিব। ভাল হইলে আরও বেশী বার প্রকাশ হওয়াও সম্ভব। বৎসরের মধ্যে যাহাদের লেখার উন্নতি হইবে—তাহাদের বর্ষশেষে একটী বিশিষ্ট মূল্যের পারিতোষিক দেওয়া হইবে।　　　সম্পাদক।

মুগ্ধ।

যদি—বাসনা দিয়া গঠেছ এ হৃদয়
　　　কামনা-পূরিত প্রাণ,
তবে—আসিও হে সখা শারদ উষায়
　　　সুষমা করিতে দান।
যবে—আধ আধ ভাষা সজ্জিত হয়ে,
　　　পূরাবে হৃদয়খানি
তুমি—প্রদান' সুরস হেমন্তে হিম
　　　মন্থন করি আনি।
সদা—বিশ্ব মানিবে বেধার শাসন
　　　কম্পন সাথে করি
নাথ—শীত জড়তায় হেরিয়া তোমায়
　　　হৃদয় লইব ভরি।
প্রাণ—মলয় সমীর করিয়া স্পর্শ
　　　আবেগে উঠিবে পূরে,
আজি—পূর্ণ করিয়া বাসন্তী শোভা
　　　গাব মঙ্গল সুরে।
দেব—গ্রীষ্মে আসিও সহকার শাখে
　　　প্রাণ-রঞ্জন করি
মম—চিত্ত কালিমা নাশিয়া তোমায়
　　　আসন স্থাপিও হরি।
যবে—ভীম বরষা ভীষণ প্লাবনে
　　　ভাসাবে ধরণী রাণী
দিবে—মুগ্ধ, তোমার চরণ প্রান্তে
　　　হৃদয়-অর্ঘ্য আনি।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ

গৃহলক্ষ্মী

উষা গরীবের মেয়ে। এ সংসারে একমাত্র বৃদ্ধ পিতা-মাতা ভিন্ন উষার আর কিছু না থাকিলেও, তাহার বিধিদত্ত অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য ছিল। উষা শৈশব হইতে জননীর গৃহকার্য্যে সহায়তা করিত। ক্ষুদ্র রক্তোৎপল সদৃশ হস্ত দ্বারা ঘর-দোর লেপন, বাসনমাজা, আঙ্গিনা ঝাট দেওয়া প্রভৃতি কায করিত। ক্ষুদ্র মৃণ্ময় কলসী কক্ষে লইয়া সহচরীদিগের সহিত নদী হইতে জল আনিত। উষার সে স্বর্গীয় মাধুরীপূর্ণ লাবণ্যমাখা মুখখানি যে দেখিত, সেই ভালবাসিত, আদর স্নেহ করিত।

উষা এখন চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কিশোরী। জগতে প্রথম উষা-বিকাশের ন্যায় প্রথম যৌবন চিহ্ন উষার কমনীয় দেহে প্রকাশ পাইতেছে। উষার আকর্ণ বিস্তৃত নীলোৎপল নয়ন দুইটী সদা হাসিতেছে। ঘন কুঞ্চিত কেশদাম নিবিড় জলদজালের তুল্য বক্ষঃস্থল ও গণ্ডস্থল আবরণ করিতেছে, গণ্ডস্থল পদ্মপাপড়ীর মত ক্রমশঃ গোলাপী আভায় প্রকাশ পাইতেছে।

হায়! সমাজে এমন অনাবিল সৌন্দর্য্যের আদর নাই কেন? আজকাল রূপের সহিত রৌপ্যখণ্ড সংযোগ করিতে না পারিলে রূপের আদর কেহ করে না কেন? মেয়েকে বিবাহ-যোগ্যা দেখিয়া দারিদ্র্য-প্রপীড়িত উষার পিতা রামধন চক্রবর্ত্তী দিবানিশি চিন্তা করিতে লাগিলেন, দরিদ্রের এ রত্নরাজি কাহার হস্তে দিবেন? কে তাহার দুঃখকষ্ট বুঝিয়া তাহার মুখের পানে চাহিবে? উষার স্নেহময়ী জননী, হিতাহিত-ভাবিনী প্রতিবেশিনিদের তীব্র সমালোচনায় সময়ে সময়ে কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

নিদাঘ-সন্ধ্যা। সান্ধ্য-ফুল্ল-কুসুম-স্নাত সান্ধ্য-বায়ু নাচিয়া নাচিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া নিদাঘ-তপন-তপ্ত জীবকুলের কষ্ট অপনোদন করিতেছে। বিহগেরা মধুর তানে পল্লীভূমি মুখরিত করিয়া সান্ধ্য-সংগীত গাহিতেছে। চারিদিকে শান্তির সুধাধারা বহিতেছে।

এমন সময় রামধন চক্রবর্ত্তী কুটীর দ্বারে বসিয়া কত কি চিন্তা করিতেছিলেন। তাহার শারীরিক, আর্থিক ও কন্যাদায় সংক্রান্ত কত কথাই মনে উদয় হইতেছিল। এমন সময়ে পুণ্যবতী ধীর সঙ্কোচে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া বলিলেন—"আজ কিছু পেয়েছ?"

স্ত্রীর কথায় রামধনের চমক ভাঙ্গিল। পত্নীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"কি বলিলে?"

"হাঁগা! আজ তোমার মুখখানা অত ভারী ভারী কেন, কিসের এত ভাবনা?"

"ভাবনা অনেক,—বস, বলছি।"

"কেন, কি হয়েছে? উষার বিয়ের—"

"না না,—কালীবাবুর খাজনার টাকা কি করে পরিশোধ করি, তাই ভাবছি।"

"তাঁর কত টাকা খাজনা পাওনা হয়েছে?"

"অনেক, প্রায় তিন শ।"

"তিনি কি বলেন?"

"কি বলবেন, নালিশ করেছেন।"

"হা ভগবান! এখন উপায়?"

"নিরুপায়—সর্ব্বস্ব যাবে, বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত

থাকবে না।"

"তুমি তাঁর কাছে একবার গেলেই পার্তে, একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে—"

"তা কি আর বাকী রেখেছি? হাতে-পায়ে ধরে কত কাকুতি-মিনতি করেছি; কিন্তু পাষাণ প্রাণে দয়ার সঞ্চার হয় নাই। গরীবের রোদন কে শুনিবে? ভগবান! এ গরীব ব্রাহ্মণের দশা কি হবে?" রামধনের চোক দিয়া দর দর ধারে জল বহিতে লাগিল।

"ছি, তুমি কাঁদছ কেন? ভগবান আছেন, ভয় কি? তিনি মুখ তুলে চাইবেন।"

"ভগবান আছেন জানি, কিন্তু পুণ্য, এমন বিপদ কার কবে হয়? দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাতে পারিনে, ঘরে বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া কন্যা, অর্থাভাবে তার বিয়ে দিতে পারছিনে, তার উপর জমীদারের অন্যায় অত্যাচার।"

"এত টাকা কি করে হল?"

"ভগবান জানেন।"

"এক কায কর, উষার বে'র যে টাকা সংগ্রহ করেছ,—আর আমার যা দু'চার খানা গহনা আছে, তাই দিয়ে ওর টাকা শোধ করে দাও।"

"প্রাণ গেলেও উষার বে'র টাকার এক পয়সাও খরচ করবো না। কপালে যা থাকে, তাই হবে?"

"আমি মেয়েমানুষ, আমি আর তোমায় কি উপদেশ দিব। তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর।" দীননাথ কিছু বলিলেন না। শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

(২)

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অনবরত ভাবিতে ভাবিতে কিছুদিন পরে বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইল; বালিকা উষা পিতামাতার ব্যারামে বড়ই আকুল হইয়া পড়িল। তাহারা গরীব, কিরূপে পিতামাতার চিকিৎসা করাইবে?

একদিন উষার পিতামাতার অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িল; জনক-জননী উভয়েই শয্যায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন। উষা পিতামাতার শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছে, এবং যুক্তকরে ভগবানের কাছে পিতামাতার আরোগ্য প্রার্থনা করিতেছে।

এমন সময় একজন সুন্দর যুবক উষাদের বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি অশ্রুউচ্ছ্বসিতকণ্ঠের কাতর উক্তি শুনিয়া উষাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উষা অপরিচিত যুবককে দরজায় দণ্ডায়মান দেখিয়া লজ্জিতভাবে একখানি ছোট মোড়া আনিয়া বসিতে দিল।

যুবক আত্মহারার ন্যায় ক্ষণকাল পলকহীন নয়নে উষার রূপ-মাধুরী দেখিতে লাগিলেন। এমন অনিন্দ্যাসুন্দরী আর কখনও তাঁহার চোখে পড়ে নাই। স্বর্গীয়-লাবণ্যমাখা মুখখানিতে কি সরলতা, কি নম্রতা পরিব্যক্ত। আহা কি কমনীয় দেহলতা, কি সুন্দর নীলোৎপল নয়ন দুটী, কি সুন্দর সে স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নের চাহনি! যুবক আত্মহারা!—ক্ষণকাল পরে বলিলেন,—"অপরিচিত হইয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি; মার্জ্জনা করিও, জানিতে চাই তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

ঊষা সলজ্জভাবে বলিল,—"কালীবাবু আমাদের বাড়ী-ঘর, জমি-জমা সব ক্রোক করিয়াছেন, এইবার সব যাবে। সেই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বাবা ও মা'র উভয়ের বিষম জ্বর হইয়াছে। আজ ভোর হইতে উভয়ে অচৈতন্য, ডাকিলেও সাড়া পাওয়া যায় না। এখন কি করি? আমাদিগকে দেখে, সংসারে এমন আর কেহ নাই। না জানি কপালে কি আছে?"—বলিতে বলিতে ঊষা কাঁদিয়া ফেলিল, পর-দুঃখ-কাতর যুবকের নয়নেও দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

"ভয় নাই, ভগবানকে ডাক।" এই বলিয়া যুবক রোগী দুইজনকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া বাহিরে আসিলেন। পরে বলিলেন— "কোন ভয় করিও না—যত্নের সহিত শুশ্রূষা কর। আজই ডাক্তার আসিবেন।"

"ডাক্তার আসিবেন? আমরা গরীব কোথা হতে টাকা দিব?"

"আমি দিব।"

"আপনি কে, এত দয়ালু?" ঊষার ইচ্ছা হইতেছিল এই অপরিচিত যুবকের পদতলে লুটাইয়া পড়ে। ঊষা দুই হাতে যুবকের চরণ ধরিয়া বলিল—"আপনি কে এত দয়ালু?" আপনি মানুষ না দেবতা? আপনার পায়ে ধরে বলছি—আমার বাবা ও মাকে বাঁচাইয়া দিন।"

যুবক সস্নেহে ঊষাকে হাত ধরিয়া তুলিল। কিশোরীর স্নিগ্ধস্পর্শে যুবকের হৃদয় এক অপূর্ব্ব পুলকে শিহরিয়া উঠিল। যুবক সস্নেহে বলিলেন—"ভয় কিছুই নাই, ডাক্তার আসিয়া যে ঔষুধ দিবেন, নিয়মমত খাওয়াইও। আর নোটখানি তোমার বাবাকে দিও; বলিও— এতেই কালীবাবুর প্রাপ্য টাকা শোধ হবে। আজ যাই আর একদিন আসবো।" যুবক ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ঊষা কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে কোন কথা বাহির হইল না।

ডাক্তার আসিয়া রোগী দুইটী ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন। ঊষা সতর্কভাবে ঔষধ সেবন করাইতে লাগিল ও সেবা শুশ্রূষায় রত হইল। এইভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। ঊষার পিতামাতা ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিলেন।

পিতামাতা সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হইলে, ঊষা সেই অপরিচিত দয়ালু যুবকের অনুগ্রহের কথা পিতামাতার নিকট প্রকাশ করিল। অপরিচিতের দয়ার কথা শুনিয়া এবং অযাচিত দান লাভ করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী যারপরনাই আশ্চর্য্য ও বিস্মিত হইলেন। কে এমন দেবতা, কে দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুঃখ-কষ্ট বুঝিয়া অযাচিত ভাবে এত টাকা দান করিল? দীননাথ সদা-সর্ব্বদা এই কথা ভাবিতে লাগিলেন।

(৩)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। এই কয়দিন ঊষা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সেই যুবককে ভুলিতে পারে নাই। তাঁরে কি ভুলিবার? সে দেবমূর্ত্তি যে তার হৃদয় অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে—ভুলিবে কেমন করিয়া? ঊষা যুবকের আগমন আশায়

প্রতিদিন পথপানে চাহিয়া থাকিত। কৈ তিনি আসিলেন না? আসিবেন বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আসিলেন না ত? দিনের পর দিন গেল—সপ্তাহের পর সপ্তাহ গেল, তবু তিনি আসিলেন না কেন? তিনি যদি দয়া করিয়া ডাক্তার না পাঠাইতেন, তাহা হইলে কি হইত? উষা আর ভাবিতে পারিল না,—দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তার কোমল গণ্ডস্থল গড়াইয়া পড়িল।

একদিন এক বিধবা বর্ষীয়সী ঘটকী ঠাকুরাণী আসিয়া উষার মাতাকে বলিলেন—"জমীদার কালীবাবুর ছেলে তোমার মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চান, কি বল? বড় ভালছেলে গো, এমনটি আর হবে না। বয়সই বা কি, এরই মধ্যে তিন তিনটে পাশ দিয়েছে। স্বভাব চরিত্রও তেমনি কোমল। আর গায়ের রং—যেন কাঁচা সোনা। এক কথায় রূপে কার্ত্তিক, গুণে গণেশ।"

"আমরি উষার কি সে কপাল হবে মা?"

"হবে গো হবে, সত্যি বল্‌ছি হবে। সে সেদিন এসে নাকি কনে দেখে গেছে?"

"কোন্ দিন?"

"যে সময় তোমরা ব্যারামে ছিলে।"

"হ্যা—আমরা যে বড় গরীব মা?"

"তা হ'ক না, পণ এক পয়সাও লাগবে না। তোমার মেয়েটি নাকি যোগেশের বড় পছন্দ হয়েছে, তাই পিতার কথা অবহেলা করেও সে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়!"

এই যোগেশই যে সে দিন আসিয়া নানা-প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন—তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। যোগেশ উষাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, এ সংবাদে উষার পিতা-মাতা হাতে স্বর্গ পাইলেন। আর উষা? সে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় মধুময় কল্পনা করিয়া স্বপ্নের আলোকে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল! *

যোগেশ সৎস্বভাবসম্পন্ন বিদ্বান্ যুবক। তাহার মত সুশীল ও দয়ালু যুবক রাধানগরে আর কেহই নাই। পরের দুঃখ-কষ্ট দেখিলে তাঁহার চোখে জল আইসে! যোগেশ উষাকে দেখিয়া, উষার রূপে, গুণে ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি উষাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পিতা কালীবাবু বড়লোক, হীন অবস্থাপন্ন দীননাথ চক্রবর্ত্তীর মেয়েকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনা তাঁহার একবারেই মনঃপুত হইল না। বিশেষতঃ কোন ধনীর নন্দিনীর সঙ্গে তিনি পুত্রের বিবাহ ঠিক করিয়াছেন। এ বিবাহে তাঁহার যথেষ্ট লাভ আছে। নগদ ৫০০০৲টাকা,আর গহনা-পত্র ত আছেই! গরীবে কি ইহা দিতে পারিবে? কাজেই উষার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ মনঃপুত হইল না। কালীবাবু পুত্রকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তখনি তিনি ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন—"দূর হ হতভাগা, আজ হ'তে তুই আমার ত্যাজ্য-পুত্র!"

যোগেশ পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিলেন। ভবিতব্য খণ্ডন করিবে কে? যথাসময়ে যোগেশ-উষার বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময় উষা দেখিতে পাইল, সে তাহার বাঞ্ছিত দেবতার পদেই স্থান পাইয়াছে। যোগেশ ভাবিল—কি ছার পিতৃ-ধন? অসহায়গণের

উপকার করিতে গিয়া যদি দরিদ্রতাকে আশ্রয় করিতে হয়, তাহাও সুখের। আর আজ সে যে অমূল্য-ধনে ধনী হইয়াছে, নন্দনের পারিজাতমালা কণ্ঠে পরিয়াছে, অমরাবতীর আনন্দময় নন্দনে সুখে ভ্রমণ করিতেছে, ইহাতে তার মত সুখী কে?

(৪)

যোগেশের হাতে এক কপর্দ্দকও ছিল না। কোন বন্ধুপ্রদত্ত চারি সহস্র টাকার মূলধনে তিনি একটী কারবার খুলিয়া বসিলেন। তিন চারি বৎসরের মধ্যেই চঞ্চলা কমলা যোগেশের গৃহে আবদ্ধা হইলেন। যোগেশ প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়া নানা সদনুষ্ঠানে দেশের ও দশের সেবা করিতে লাগিলেন।

যোগেশের পিতা সকল কথাই শুনিলেন,—শুনিয়া তাঁহার আনন্দ কি নিরানন্দ হইল, তাহা বুঝা গেল না। কারণ এই সময় তিনি একটা ভয়ঙ্কর মকদ্দমায় বিজড়িত। নিজের বিপদে নিজেই আকুল। ক্রমে সব গেল, স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত বিক্রয় হইয়া গেল। তারপর, তারপর? এক দিন আদালত হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাস্তুভিটা হইতে বাহির করিয়া দিল। কালের কি কুটীল নিয়ম! বিধির কি বিচিত্র বিধান!

তারপর এক দিন কালীবাবু কনিষ্ঠ পুত্রের হাত ধরিয়া যোগেশের আশ্রয় প্রার্থনা করিল। যোগেশ বলিলেন—"আসুন বাবা! এ লক্ষ্মীর আশ্রয়—এখানে কোন দুঃখ-কষ্ট হবে না। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী—স্বয়ং লক্ষ্মী।"

এ লক্ষ্মী কে? পাঠক, চিনিতে পারিলেন কি?—আমাদের সেই দীন-দরিদ্রের কন্যা ঊষা—যোগেশের "গৃহলক্ষ্মী"।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

গায়ত্রী মাহাত্ম্য।

এমন একদিন ছিল, যে দিন ভারত ভগবদ্-ভক্তির পূত প্লাবনে প্লাবিত হইত,—যে দিন পবিত্রা কল্লোলিনীর প্রাণমনবিমোহন কল কল নিনাদে বিশ্ব-সংসার মুখরিত হইত। সদাচারী ধর্ম্মপ্রাণ বিপ্রবক্ত্র বিনিসৃত চিত্তোন্মাদিনী মধুর-গম্ভীরা সামগীতি ধীর মধুর পবন-হিল্লোলে সুদূর কুমারিকা হইতে হিমগিরির তুষার-ধবল তুঙ্গশৃঙ্গ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিত; কিন্তু আজ ভারতে দুর্ভাগ্যের ফলে অতীতের গৌরব—বর্ত্তমানের আনন্দ-স্মৃতির সুখ, সেই স্বপ্নময়ী দিবা, কালের করাল অন্ধকারে বিলীন!—ভক্তির সেই দিগন্তপ্লাবিনী পূতধারা বর্ত্তমান যুগের ভারত-মরুভূমে অতি ক্ষীণা স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ পূর্ব্বক নিঃশব্দে ধীর মন্থর গতিতে লোকনয়নান্তরালে প্রবাহিতা! সামগীতির পরিবর্ত্তে আজ স্বৈরিণী-সঙ্গীতে ভারত মুখরিত!—ভক্তের ভক্তোন্মাদের পরিবর্ত্তে অভক্তের তাণ্ডব-নর্ত্তনে আজ ভারতের ভাগ্য-চক্র নিয়ন্ত্রিত!

কোনও কোনও মনীষী ইহা সাময়িক পরিবর্ত্তন বলিয়া বর্ণনা করেন। কেহ কেহ বলেন যে, সুদীর্ঘকাল বৈদেশিকগণের সংসর্গের ফলে এই অঘটন সংঘটিত হইয়াছে।

এ যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন না হইলেও, ইহা আত্মাপরাধ ক্ষালনের একটী উপায় মাত্র। অধুনা আমাদিগের নব্য যুবকগণের মধ্যে অনেকেই দেবদেবীর মন্দির সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে লজ্জাবোধ করেন, ইহা পর্য্যবেক্ষণশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবলোকন করিয়া থাকিবেন। নব্য যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মভাব এতদূর হীনপ্রভ হইয়াছে যে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে স্বতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাহাদিগের আচার-ব্যবহারে কোনও প্রকার ধর্ম্মভাব প্রকটিত হইলে, তাহারা জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয়, সেই সম্প্রদায় মধ্যে—বিশেষতঃ সেই সম্প্রদায়ের যুবকবৃন্দের মধ্যে—এই ভাব অত্যধিক পরিস্ফুট। যে ব্রাহ্মণ হিন্দুধর্ম্মের কর্ণধার—হিন্দু-সমাজের মুকুটমণি—যে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যতেজে একদিন ষষ্ঠি সহস্র সগর-সন্তান ভস্মীভূত হইয়াছিল,—যে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যতেজের মর্য্যাদা রক্ষার্থে স্বয়ং ভগবান স্বীয় বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিয়াছিলেন, সেই দেবদুর্লভ ব্রাহ্মণ-বংশের বংশধরগণ আজ গায়ত্রী-ধ্যানে পর্য্যন্ত পরাঙ্মুখ। হিন্দুজাতির প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ বিপ্র-নন্দন! কি মনোভ্রমে আজ তুমি আত্মবিস্মৃত! একবার মাত্র [illegible] নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত করিয়া অবলোকন কর, দেখিতে পাইবে যে, তুমি তোমার বর্ত্তমান শিক্ষা-বশে, যাহাকে আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান কর, সেই ইংরাজও তাহার চিরন্তন প্রথা অনুসারে ভট্টারকবারে যথারীতি স্বকীয় ইষ্টদেবের অর্চ্চনার্থে যথাকালে দেবমন্দিরে উপনীত হইয়া স্বীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-কর্ত্তব্য-সাধনে ব্রতী হয়,—তাহাতে তাহাদের অন্তরে কোনও প্রকার সলজ্জ ভাবের উন্মেষ ক্ষণিকের নিমিত্তেও পরিলক্ষিত হয় না;—মুসলমান-সন্তানগণ দেবার্চ্চন কালে, প্রয়োজন হইলে বিপুল জন-সমাকীর্ণ রাজবর্ত্মের পার্শ্বে বিটপীমূলে, পাদপ-শূন্য প্রান্তরের মধ্যভাগে, অথবা অন্য যে কোনও স্থলে তাহাদিগের কর্ত্তব্য সাধনে নিরত হয়, তাহাতে তাহাদিগের মানসপটে লজ্জার ক্ষীণ ছায়া মাত্রও নিপতিত হয় না;—আর তুমি বেদাভ্যাস-নিরত, দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-বংশের বংশধর,—তুমি গায়ত্রীধ্যানে পরাঙ্মুখ! চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন ইহা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্যরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য! আমাদিগের বিশ্বাস, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষেই এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদিগের শিক্ষা বিশ্বাসমূলক এবং আর্য্যধর্ম্ম সহ অবিচ্ছিন্নসম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিল, আধুনিক শিক্ষা জ্ঞানমূলক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধ বিবর্জ্জিত হইয়াছে; পূর্ব্বে আমরা গুরুবাক্য সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে জানিতাম, পরে উপযুক্ত কালে শ্রীগুরুর কৃপায় দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব স্বীয় মার্জ্জিত-বুদ্ধির সাহায্যে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতাম, [illegible] শিক্ষাদোষে আমাদিগের এরূপ হীনাবস্থা হইয়াছে [illegible] আয়ত্ত ও বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যে উচ্চ জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা লাভ করিবার বহু

পূর্ব্বে আমরা আমাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা ঐ নিগূঢ় তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে সচেষ্ট হই ;—ফলে বিফল-মনোরথ হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা গঞ্জিকাসেবীর কল্পনাপ্রসূত স্থির করিয়া পরিত্যাগ করি। গায়ত্রী সম্বন্ধেও এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। উপনয়ন কালে অপরিণত বয়স্ক বালককে যখন গায়ত্রী শিক্ষা প্রদান করা হয়, তখন তাহার ওঁকার কিংবা গায়ত্রীর অর্থ অথবা মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযোগী ধীশক্তি থাকে না, সুতরাং তৎকালে এ সম্বন্ধে কোনও শিক্ষা আদৌ প্রদত্ত হয় না ;—পরে উপযুক্ত বয়সেও এ সম্বন্ধে কোনও শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না, ফলে সেই বালক যৌবনে স্বধর্ম্ম-সম্পর্ক-শূন্য বৈদেশিক শিক্ষা লাভ করিয়া গায়ত্রী সম্বন্ধে আস্থাহীন ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে।

"গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রীত্বং ততঃ স্মৃতা।"

গায়ককে ত্রাণ করে যে তাহার নাম গায়ত্রী, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে যে মন্ত্রসাধনা করিলে জীবের মুক্তি লাভ হয়—তাহার নাম গায়ত্রী।

"একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরন্তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে॥"

—মনু-সংহিতা।

একাক্ষর ওঁকার প্রণবই পরমব্রহ্ম স্বরূপ এবং প্রণব ও গায়ত্রী জপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। বস্তুতঃ গায়ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মন্ত্র নাই, এবং মৌনাবলম্বন অপেক্ষা সত্য বাক্যই শ্রেষ্ঠ।

প্রথমে 'ওম্' শব্দের অর্থ যথাসম্ভব হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। প্রাণায়াম কালে প্রণব ধ্যান করিতে হয় ; প্রণবই পরমব্রহ্মের বীজ স্বরূপ। ওঙ্কার উচ্চারণ কালে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু ঊর্দ্ধ-দেশে সংক্রমিত হয়, তন্নিমিত্তই ইহার নাম ওঙ্কার।

"যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব প্রাণান্ ঊর্দ্ধমুৎক্রাময়তি তস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ।"—অথর্ব্বশির উপনিষদ।

এতভিন্ন এই ওঙ্কার উচ্চারণে বেদ চতুষ্টয় প্রণত হইয়া থাকে, এবং বেদাধ্যয়ন নিরত ব্রাহ্মণগণ ওঙ্কার উচ্চারণ দ্বারা তাঁহাদিগের অধীত বেদ চতুষ্টয় আয়ত্ত করেন, এই হেতু ইহা প্রণব বলিয়া উক্ত হয়।

"যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাঙ্গিরসং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রণাময়তি নাময়তি চ তস্মাদুচ্যতে প্রণব।"—অথর্ব্বশির উপনিষৎ।

যদ্দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা যায়, তাহার নাম প্রণব। মহর্ষি পাতঞ্জল বলেন যে, প্রণবই পরমেশ্বরের বাচক, ওঙ্কার ও ঈশ্বর এতদুভয়ের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ নিত্য। প্রণব উচ্চারণে পরমেশ্বরের স্তব করা হয় ; এবং পরমেশ্বর বাচক প্রণব জপ করিতে করিতে ও তাহার অর্থ হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে একাত্ম হওয়া যায়।

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।
তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"—পাতঞ্জল-দর্শন।

প্রণবে তিনটী অক্ষর আছে। অ, উ, ম এই তিন যোগে ওঙ্কার প্রণব। অকারের পর উকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়, এই ব্যাকরণ সূত্রানুসারে অ, উ এবং ম সংযোগে "ওম্" শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মনু বলেন—

"আদ্যং যত্র্যাক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা।
সগুহ্যোঽন্যস্ত্রিবৃদ্বেদো যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥"

—মনু-সংহিতা।

অর্থাৎ অ, উ এবং ম এই তিন অক্ষর তিন বেদাত্মক প্রণবের রূপ, ইহা অতি গুহ্য এবং ইহা ত্রিবৃদ্বেদ বলিয়া উক্ত হয়; যে ব্যক্তি ইহার অর্থ ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন—তিনি বেদজ্ঞ।

অকারার্থে সত্ত্বগুণাত্মক পালন কর্তা বিষ্ণু, উকারার্থে তমোগুণাত্মক সংহার কর্তা মহেশ্বর এবং মকারার্থে রজোগুণাত্মক সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। অতএব ওঙ্কার প্রণব দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তা ত্রিগুণাশ্রয় ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়।

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ॥"

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

উল্লিখিত অকার, উকার এবং মকারের সংযোগকারিণী শক্তি—সেই শক্তিই নাদবিন্দু-রূপে ভগবতী। সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সগুণাত্মক, নির্গুণ ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপ। ফলতঃ সগুণ ব্রহ্ম ব্যতীত পূজা উপাসনাদি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং সগুণ ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মেরই রূপ। নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা প্রভৃতি অতীব দুষ্কর। তিনি বাক্যাদির অতীত, সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত, ইন্দ্রিয়াদির অগোচর এবং একমাত্র সৎ চিত্তের গোচরীভূত; অতএব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শক্তি প্রভৃতির ধ্যান প্রকৃত পক্ষে পরমব্রহ্মেরই উপাসনা। ফলতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামত্রয় এবং মূর্ত্তিত্রয় একমাত্র সগুণ ব্রহ্মেরই রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন মূর্ত্তি এক দেবতা,—এ সম্বন্ধে যাহার মনে বিবিধ সন্দেহের উদয় হয়, তাহার পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে।

"রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা সত্ত্বভাবস্থিতো হরিঃ।
ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়োদেবাস্ত্রয়োগুণাঃ॥
একমূর্ত্তিস্ত্রয়োদেবাঃ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্নজায়তে॥"

—জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র।

এতদ্ভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রের মতে ওঙ্কার হইতেই চতুর্দ্দশ বিদ্যা, মন্ত্র, পূজা, তপস্যা, ধ্যান, কর্ম্ম, অকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই উদ্ভূত হইয়াছে।

"ওঁকারাদক্ষরাৎ সর্ব্বাঃ প্রোক্তা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
মন্ত্রপূজা তপোধ্যানং কর্ম্মাকর্ম্ম তথৈব চ॥"

—জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

শিবগীতায়ও আমরা ওঙ্কারের এই মহীয়সী শক্তির পরিচয় পাই। শিবগীতায় কথিত আছে যে সমস্ত জাত ও জায়মান পদার্থ, এই শিব, পঞ্চভূত এবং বিচিত্র ভুবন প্রভৃতি সমস্তই ওঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত।

"সর্ব্বং জাতং জায়মানং তদোঙ্কারে প্রতিষ্ঠিতং।
বিশ্বং ভূতঞ্চ ভুবনং বিচিত্রং বহুধা তথা॥"

—শিব-গীতা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদেও ঐ বাক্যই গুরু-গম্ভীর স্বরে বিঘোষিত হইতেছে;—

"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিদং সর্ব্বম্।"

অর্থাৎ ওঙ্কারই ব্রহ্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্তই ওঙ্কার। অতএব আমাদিগের মানস-পটে ভ্রমেও যেন উদিত না হয় যে ওঙ্কার কতিপয় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সমাবেশ মাত্র। আমা-

দিগের সতত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ওঙ্কার পরম ব্রহ্মের বাচক,—ওঙ্কারই অসার সংসারে সারভূত পরমারাধ্য পরম ব্রহ্ম স্বরূপ।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম।"

—অমৃতবিন্দু-উপনিষদ্।

বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের—ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পন্থাসমূহের মধ্যে ওঙ্কার অবলম্বনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ওঙ্কার অবলম্বন উপায় দ্বারা নিত্যানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত অনায়াস-সাধ্য হইয়া থাকে। কায়মনোবাক্যে ওঙ্কার-মন্ত্রোচ্চারণ করিলে এবং ওঙ্কার-তত্ত্ব-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে, প্রকৃত ব্রহ্ম-ধ্যান করা হয়, এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে।

"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

—কঠোপনিষৎ।

শিব-গীতায় উক্ত আছে—

"প্রবিলীনাং তদোঙ্কারে পরংব্রহ্ম সনাতনং।
তস্মাদোঙ্কারজাপী যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়॥"

অর্থাৎ সনাতন পরমব্রহ্ম ঐ ওঙ্কারেই বিলীন রহিয়াছেন; সুতরাং যে ব্যক্তি ওঙ্কার জপ করিয়া থাকেন, তিনি যে মুক্তিলাভ করিবেন—তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

যদ্যপি কোনও ব্যক্তি মৃত্যুকালে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে ব্রহ্ম-বাচক 'ওঁ' এই অক্ষর উচ্চারণ পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ভাগ্যবান সর্ব্ব পাপ-বিমুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করে।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

—ভগবদ্-গীতা।

গায়ত্রী প্রকৃত পক্ষে প্রণবেরই অর্থজ্ঞাপক। প্রজাপতি ব্রহ্মা সাম, ঋক্, যজুঃ এই বেদত্রয় হইতে ওঙ্কার-প্রণবেরই অঙ্গ-স্বরূপ অকার, উকার ও মকার এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥"—

মনু-সংহিতা।

অতএব হিন্দু মাত্রেরই সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য যে, মোক্ষপদলাভ রূপ অব্যয় ফলের কারণ স্বরূপ ওঙ্কার, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় এবং ত্রিপদা গায়ত্রীই বেদের মুখ অর্থাৎ আদি স্বরূপ।

"ওঙ্কার পূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োহব্যয়াঃ
ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং॥"

মনু-সংহিতা।

গায়ত্রীর অন্বয়—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ তৎসবিতুঃ দেবস্য বরেণ্যং ভর্গঃ ধীমহি, ধিয়ঃ যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ।

ভূঃ পৃথিবী ভুবঃ অন্তরীক্ষং স্বঃ স্বর্গঃ তৎ-সবিতুঃ তেষাং প্রসবিতুঃ দেবস্য ক্রীড়াদিযুক্তস্য ব্রহ্মনঃ বরেণ্যং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং ভর্গঃ তেজঃ ধীমহি বয়ম্ চিন্তয়ামঃ, যঃ যো ভর্গ নঃ অস্মাকং ধিয়ঃ বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষেষু প্রেরয়তু নিয়োজয়তু ইত্যর্থঃ।

ত্রিলোক অর্থাৎ ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক যিনি প্রসব করিয়াছেন, এরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহার শ্রেষ্ঠ তেজ আমরা ধ্যান করি, যে ব্রহ্মণ্য

তেজে আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিগুলিকে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষের বিষয়ীভূত সৎপথে প্রেরণ করেন; অর্থাৎ যিনি প্রণব দ্বারা প্রতিপাদ্য, ব্যাহৃতি-ত্রয়ের বাচ্য, ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি সৃষ্টি-স্থিতিলয়রূপ কল্পনাতীত ঐশী লীলায় নিরন্তর নিরত, সেই ত্রিগুণাশ্রয় পরমব্রহ্মের পরমারাধ্য বরণীয় সত্যস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সনাতন মহা-জ্যোতিঃ আমরা কায়মনোবাক্যে ধ্যান করি এবং সেই সর্ব্বেশ্বর,সর্ব্বসাক্ষী জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্য স্বরূপ আমাদিগের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিচয়কে ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ সাধনে সতত বিনিযুক্ত করুন।

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকার গায়ত্রীর যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

"এ্যক্ষরাত্মকতারেণ পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে।
পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
অসৌ দেব ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্মবাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ॥
তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয়এব সঃ।
জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীব্যতো বিভোঃ॥
অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ।
ধ্যায়েম তৎপরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্॥
যো ভর্গঃ সর্ব্ব সাক্ষীশো মনবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিয়োজয়েৎ॥'
"অসৌ দেবস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি
অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্মবাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ॥'

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অস্যার্থঃ—সেই দেব ত্রিলোকের আত্মা; তিনি ত্রিগুণ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন; এই হেতু ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ব্যাহৃতি ত্রয় দ্বারা বিশ্বময় ব্রহ্ম অভিহিত হইয়া থাকে।

যে দেব প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা, তিনি অক্ষরাত্মক ওঙ্কার প্রণব দ্বারা সেই পরমেশ্বর প্রতিপাদিত। ঐ দেবতা ত্রিলোকের আত্মা, এবং তিনি গুণত্রয় ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, এই হেতু ভূঃ,ভু বঃ ও স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয়ের বাচ্য, তিনিই সাবিত্রীর দ্বারা জ্ঞেয়; তিনি বিশ্বের সবিতা অর্থাৎ স্রষ্টা এবং দীপ্ত্যাদি ক্রিয়াশ্রয় বিভু; তাঁহার অন্তর্গত যোগিগণের বরণীয় পরম সত্য স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সনাতন মহাজ্যোতিঃ আমরা ধ্যান করি, সেই জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর আমাদিগের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সমূহকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে বিশিষ্ট ভাবে নিয়োজিত করুন।

এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর "এক মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবাঃ—এক তিন, তিনে এক, এবং গায়ত্রী সেই ব্রহ্মশক্তির ধ্যান। কিন্তু ব্রহ্মের ধ্যানের পরিবর্ত্তে, ব্রহ্ম-শক্তি উপাসনার কারণ কি, এ চিন্তা আমা-দিগের মানসপটে স্বতঃই সমুদিত হইতে পারে।

এ গূঢ়তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমতঃ গায়ত্রীর নিগূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। গায়ত্রীর দ্বারা আমরা যে ব্রহ্ম শক্তির ধ্যান করি, তাহা প্রকৃত পক্ষে আদ্যা-শক্তির ধ্যান—গায়ত্রী মাত্র ভূর্লোক,ভুবর্লোক স্বর্লোক প্রসবিত্রীর ধ্যান নহে,—ইহা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রসবিনী আদ্যাশক্তির ধ্যান। ভূলোকার্থে অকার অর্থাৎ সত্ত্বগুণাশ্রয় বিষ্ণু ভুবর্লোকার্থে 'উকার' অর্থাৎ রজোগুণ বিশিষ্ট

ব্রহ্মা, এবং স্বর্লোকার্থে 'মকার' অর্থাৎ তমোগুণাশ্রয় মহেশ্বর।

অকারার্থং ভূর্লোক উকারশ্চোচ্যতে ভুবঃ।
সব্যঞ্জনা মকারশ্চ স্বর্লোকঃ পরিকল্পতে॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

অতএব গায়ত্রীর গূঢ় অর্থ এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রকে প্রসব করিয়াছেন এমন যে পরমব্রহ্ম, তাঁহার শ্রেষ্ঠ তেজ আমরা ধ্যান করি, যে তেজ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিগুলিকে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের বিষয়ীভূত সৎপথে প্রেরণ করেন।

এই পরমারাধ্যা আদ্যাশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতির বিকারেই তাঁহার বিকার,—শক্তির বিকাশেই তাঁহার বিকাশ; বস্তুতঃ এই আদ্যাশক্তিই পরমপুরুষে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ মহাকার্য্য সমাধান করেন। তিনি রজোগুণসংযুক্তা হইয়া যখন পরমপুরুষে আশ্রয়গ্রহণ করেন, তখন তিনি সৃষ্টিকর্ত্রী এবং আমাদিগের নিকট ব্রাহ্মণীরূপে সম্পূজিতা, আবার সত্ত্বগুণসংযুক্তা হইয়া যখন তিনি পরমপুরুষাশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি পালনকর্ত্রী এবং আমাদিগের নিকট বৈষ্ণবীরূপে প্রকাশিতা; পুনঃ যখন তিনি তমোগুণযুক্তা হইয়া পরমপুরুষে আশ্রয়গ্রহণ করেন, তখন তিনি সংহারকর্ত্রী, এবং আমাদিগের নিকট রুদ্রাণীরূপে সমারাধিতা হইয়া থাকেন। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ একমাত্র তাঁহার শক্তির সাহায্যেই সম্ভব, কারণ যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই শুদ্ধ নির্ব্বিকল্প, নিষ্ক্রিয়, চৈতন্যস্বরূপ পরমব্রহ্মের ধ্যানের অধিকারী।

বহুদর্শী নিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণসন্তান যথাবিধি গায়ত্রী প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সুস্থকায় ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। ইহার কারণ নির্দ্দেশার্থ তাঁহারা বলেন যে, মনে ধর্ম্মভাব জাগরূক থাকিলে স্বতঃই শারীরিক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। মনু বলেন যে, ঋষিগণ সুদীর্ঘকাল সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠানের ফলে দীর্ঘজীবন, প্রকৃষ্টজ্ঞান, বিমল যশোরাশি এবং বেদাধ্যয়নজনিত বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চসমেব চ॥"

(মনুসংহিতা)

কিন্তু আধুনিক যুবকবৃন্দ কেবলমাত্র আপ্তবাক্য শ্রবণ করতঃ সম্পূর্ণরূপে সন্তোষলাভ করিতে অসমর্থ; ইদানীং পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে তাহাদিগের কীদৃশ ভয়ঙ্কর বিশ্বাস, তাহা কাহারও অপরিজ্ঞাত নাই; যে কোনও বিষয় হউক না কেন,—এমন কি হিন্দুধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বাদি পর্য্যন্ত জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে সমর্থিত না হইলে, তাহারা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপনে সমর্থ হয় না। তন্নিমিত্ত গায়ত্রী ধ্যানের উপকারিতা যে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসম্মত, তৎসম্বন্ধে আমরা এ স্থলে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদিগের এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, ক্রমপ্যাথি নামক একটী অভিনব চিকিৎসা-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে; বঙ্গভাষায় ইহাকে বর্ণ-চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলা

যাইতে পারে। ক্রমপ্যাথি-চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ চাক্ষুষ দৃষ্টান্তের দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, রক্তবর্ণ শারীরিক অবসাদ নিবারক এবং দৈহিক যন্ত্র সমুদয়ের কার্য্যকরী শক্তির প্রবর্দ্ধক, তদ্ভিন্ন ইহা অগ্নিমান্দ্য নিবারক ও বাতরোগ নাশক। সম্ভবতঃ এই হেতুই আমাদিগের আর্য্য ঋষিগণ অরুণোদয়ে শয্যাত্যাগ করত পূতদেহে ও শুদ্ধচিত্তে রক্তবর্ণা ব্রাহ্মণীর ধ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্রমপ্যাথি ইহাও সপ্রমাণ করিয়াছে যে, নীলবর্ণ স্নিগ্ধ ও সত্ত্বগুণযুক্ত এবং শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তাপের আধিক্য হেতু যে সকল ব্যাধির উৎপত্তি হয়—তাহার প্রশমক। বোধ হয় এই নিমিত্তই দিবসের উত্তপ্ত সময়ে নীলবর্ণা বৈষ্ণবীর ধ্যান প্রশস্ত। ফলতঃ এই সময়ে নীলবর্ণের ধ্যান করিলে পিত্তাধিক্যের হ্রাস এবং দৈহিক স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়। উল্লিখিত বর্ণবিজ্ঞান ইহাও প্রমাণ করিয়াছে যে, শ্বেতবর্ণ কফনাশক ও কফজনিত রোগের প্রশমক এবং শান্তিবিধায়ক। সম্ভবতঃ এই কারণেই সায়াহ্নকালে শ্বেতবর্ণা রুদ্রাণীর ধ্যানের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা সকলেই অবগত আছি যে আয়ুর্ব্বেদ মতে বায়ু, পিত্ত ও কফ হইতেই সর্ব্ববিধ ব্যাধির উৎপত্তি। ক্রমপ্যাথি সাহায্যে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, রক্ত, নীল ও শ্বেতবর্ণ যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফ হইতে উৎপন্ন ব্যাধি সমূহের প্রতিকারক। ফলতঃ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের সর্ব্বতত্ত্বদর্শী, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ আর্য্যঋষিগণ তাঁহাদিগের অসীম জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ফলস্বরূপ যে যুগপৎ স্বাস্থ্যরক্ষার ও সাধন সম্পাদনের কল্পনাতীত বিধি নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেও আমাদিগের চিত্ত যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়; আর আজ সেই আর্য্যবংশধরগণ—দুঃখদৈন্যক্লিষ্ট হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ জীবনস্বরূপ বিপ্রসন্তানগণ যদি সেই ঐহিক ও পারত্রিক সুখের অব্যর্থ উপায় অবলম্বনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজ, হিন্দুজাতি—হিন্দুর হিন্দুত্ব অতল জলধিজলে নিমজ্জিত হইবে;—অতএব বলি—

"সর্ব্ববেদময়ী বিদ্যা গায়ত্রী পর দেবতা।
পরস্য ব্রহ্মণোমাতা সর্ব্ববেদময়ী সদা॥"

গায়ত্রী-তন্ত্র।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর বি-এস্‌-সি।

কবি-কুঞ্জ।

অমৃত ও গরল।

বিবাহটা বড় মিষ্টি জিনিষ;
যেমন গরম-ভাতে ঘি,
যাবৎ গরম তাবৎ ভাল;
জুড়ায়ে গেলে ছি।

—

মনে রেখো।

অদৃষ্টে থাকিলে ক্লেশ অবশ্যই ফলে,
জলধি হইয়ে জলে তুষার অনলে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী কবিকুসুম।

একা।

(১)

বিশ্বহাটে ঘুমিয়ে ছিনু
আশ্রম-তরুর তলে,
সবাই জানা সবাই চেনা
সবাই আপন বলে।
সবাই তারা চলে গেল
হাটের কাজটি সেরে,
সাঁঝের বেলা চেয়ে দেখি
একা আমি পড়ে।

(২)

নীল সাগরের ঢেউ গণিনু
সারা দিনটি বসে,
যে উর্ম্মিটী চলে যায়
কেউ না ফিরে আসে।
অনন্ত এ কাল-সাগরের
অতল জলে যারা
বিলীন হ'য়ে যায় একবার
আর ত না দেয় সাড়া!

(৩)

শাখী-শাখে পাখীর ডাকে
বিশ্ব জেগে ছিল,
সন্ধ্যাবেলা সবাই তারা
বাসায় ফিরে গেল।
মুগ্ধ হ'য়ে যে পাখিটি
বৃক্ষে থেকে যায়,
যাবার বেলা তাহার পানে
কেউ না ফিরে চায়!

(৪)

সারা দিনটি খেলে শিশু
সবুজ ঘাসের 'পরে,
ভুলি তারা মায়ের মুখ
খেলা-ধূলা করে।
সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলে
সবাই তারা হায়,
খেলা ছেড়ে উধাও হ'য়ে
মায়ের কোলে ধায়।

(৫)

আমরা যত মায়ের ছেলে
খেলায় আত্মহারা,
মাকে ভুলি হাসি-খেলি
কেউ ত না দেয় সাড়া।
জীবন-সন্ধ্যাকালে যবে
বিশ্ব আঁধার হবে,
সংসার-খেলা ছেড়ে যাব
মায়ের কোলে সবে।

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

দর্শনের এক পৃষ্ঠা।

ব্যক্তিত্ব। (Individuality).

আমি আমার ছাত্রজীবনে কোন এক খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মযাজকের নিকট "বাইবেল" ধর্ম্ম-গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করিতাম। কথা-প্রসঙ্গে আমার সেই মাননীয় "বাইবেল"-শিক্ষক মহাশয় একদিন বলিলেন যে, "হিন্দু-ধর্ম্মের চরম সীমা ব্যক্তিত্বের নাশ, আর খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ শিক্ষা দেয়। হিন্দু-ধর্ম্মের মুক্তি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নির্ব্বাণের ন্যায় ব্যক্তিত্বের নাশ বুঝায়। খ্রীষ্টীয় salvation ভগবানের সহিত

অনন্ত জীবন সম্ভোগ বুঝায়। হিন্দু-ধর্ম্মে মৃত্যু আর খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মে জীবন অনন্ত জীবন সম্ভোগ শিক্ষা দেয়। তাই আমরা আজ দেখিতে পাইতেছি যে, অনন্ত জীবন অভিলাষী মানব যতই সভ্যতালোক পাইতেছে, ততই তাহারা মানবের অনন্ত জীবন-কীর্ত্তনকারী এই ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্ত উদ্‌গ্রীব হইতেছে। অন্যের কি কথা, স্বধর্ম্ম গর্ব্বিত অনেক হিন্দুও আজ এই মহান্ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছে এবং অনন্ত জীবন লাভের সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছে।

মদীয় শিক্ষা-গুরুর এই উপদেশ-বাণী প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্ত আমি তৎকর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলাম। তৎপরে অনেক খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মযাজকের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছে, দেখিলাম যে, তাঁহাদের অনেকেই এই মতের পোষকতা করেন। এমন কি পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী অনেক তথা-কথিত হিন্দুও নিজেদের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিবার প্রয়াসী হইয়া ব্যক্তিত্ব বিনাশ শিক্ষা প্রদান করে। ভয়াবহ হিন্দু-ধর্ম্মের শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির সম্পূর্ণ সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া মানব জীবনের অনন্ত-কল্যাণকরী মহান খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। তাঁহারা বলেন যে "হিন্দু-সমাজ জীবনের অনন্ত মাহাত্ম্য না বুঝিয়া ধ্বংসের নিম্নতমস্তরে নমিত হইয়াছে। এখনও যদি হিন্দু-সমাজ এই মহান্ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে ধ্বংসের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। অন্যথা এই সমাজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি।

হিন্দু-ধর্ম্ম বা খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। লেখক নিজে হিন্দু এবং সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সুগভীর সত্য নিহিত আছে—ইহা তাহার বিশ্বাস ; তবে ইহাও তাহার বিশ্বাস যে, অনেকেই ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ প্রণিধান করিতে অসমর্থ হইয়া স্বকপোলকল্পিত এক একটা ব্যাখ্যা করিয়া বসেন ; তদ্বারা নিজেদের স্বার্থ হয়ত ক্ষণ-কালের জন্ত পুষ্টিলাভ করিতে পারে, কিন্তু তদ্বারা মানব-প্রকৃতির যে কতদূর অকল্যাণ সাধিত হয়, তাহা তাহারা ভাবিয়া দেখেন না বা ভাবিবার সময় পান না। যা'ক সে সব অবান্তর কথা। ব্যক্তিত্ব বস্তটী কি এবং তাহার কোন প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি না তৎপ্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমরা প্রথমে দেখিতে চেষ্টা করিব যে আমরা যাহাকে ব্যক্তিত্ব বলি, সেই বস্তুটির আভাষ আমরা আমাদের পার্থিব-জীবনে পাই কি না এবং তৎপরে পার্থিব-জীবন বিনষ্ট হইলেও ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব থাকিবে কি না, এই প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিব।

১ম। পার্থিব-জীবনে ব্যক্তিত্বের আভাষ সম্ভব কি না? আজকাল অনেকের মুখেই ব্যক্তিত্ব বলিয়া একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের নিকট হইতে ব্যক্তিত্ব বস্তটী কি তাহার কোন সন্তোষজনক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা হউক, সংজ্ঞা দিতে না পারিলেও—আর সকল বস্তুর সংজ্ঞাও অসম্ভব

—তাহারা ব্যক্তিত্ব দ্বারা কি বুঝেন, আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ভাবুক! তুমি স্মৃতির সাহায্যে যতদূর সম্ভব তোমার অতীত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, দেখিবে তোমার জীবনের উপর দিয়া অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তোমার শরীরের পরিবর্ত্তন ত হইয়াছেই; তোমার মনোরাজ্যের উপর দিয়াও পরিবর্ত্তনের অনেক প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে। তুমি হয়ত এখন অশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছ; হয়ত সমাজে একজন গণ্য-মান্য লোক হইয়াছ, তুমি যাহা ছিলে—তাহা আর নাই। তোমার শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ পরিবর্ত্তনই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটু বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখ, দেখিবে তুমি যাহা ছিলে তাহাই আছ। বাল্যকালের সেই তুমি এবং এই প্রাপ্ত বয়সের তুমি একই আছ, শুধু কতকগুলি অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। যেমন বায়ুর সঞ্চালনে বারিধি-বক্ষে অনন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ। তুমি বারিধি, অনন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ তোমার অবস্থা। তরঙ্গের পরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু তুমি যাহা তাহাই আছ—স্থির, অচঞ্চল, নিরবচ্ছিন্ন তোমার বাল্যকাল হইতে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যতগুলি অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তোমার যা তুমিত্ব, তাহা নিরবচ্ছিন্ন এবং অবিকৃত রহিয়া গিয়াছে। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, জ্ঞানের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই যে একটানা একত্বের আভাষ, যাহা শত সহস্র অবস্থার পরিবর্ত্তনের মাঝ দিয়াও অবিকৃত রহিয়াছে, তাহাই তোমার তুমিত্ব, তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার Individuality, তুমি যে রাম, সেই রামই আছ, কেবল বাল্য, যৌবন, কৈশোর প্রভৃতি নানাবিধ শত সহস্র অবস্থা তোমার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অবস্থাগুলি তুমি নও, অবস্থাগুলি তোমার। এই পরিবর্ত্তনের অন্তরালে যাহা কিছু অপরিবর্ত্তনীয়, অচঞ্চল এবং অবিকৃত তাহাই তোমার তুমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব, তাহাই তুমি। ইহাই মানবজীবনে ব্যক্তিত্বের আভাষ। এই সূত্র ছিন্ন হইলে মানব-জীবন যাপন অসম্ভব হইয়া পড়ে, নৈতিক শাসনের কোন অর্থ থাকে না। এই মুহূর্ত্তে তুমি যে কাজ করিলে, পরবর্ত্তী সময়ে যদি সেই তুমির অপায় ঘটে, তাহা হইলে নৈতিক শাসন কাহার উপর প্রযুক্ত হইবে? তাই মানব জীবনে এই ব্যক্তিত্ব আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। এই ব্যক্তিত্ব বস্তুটী অবিনাশী কি না, তাহা আমাদের বর্ত্তমানে বিচার্য্য নহে। এখন আমাদের প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ব্যক্তিত্বের আভাষ—ইহা সত্য সম্ভূত না মিথ্যা সম্ভূত, ইহা বাস্তব না মানসিক কল্পনামাত্র? এই প্রশ্ন সমাধানের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিত্বের বিনাশাবিনাশত্ব প্রমাণীকৃত হইবে। ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে, কর্ম্মময় জীবনে আমরা এই ব্যক্তিত্বের আভাষ পাই, এবং ইহাও সত্য যে, আমাদের বাস্তব জীবনে এই ব্যক্তিত্বের আভাষ একান্ত প্রয়োজনীয়। আমি যে এখন এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী রচনা করিতেছি, ব্যক্তিত্ব বলিয়া কোন একটী বস্তুর আভাষ না থাকিলে, ইহাও অসম্ভব হইয়া পড়িত। ব্যক্তিত্ব বলিয়া একটা কিছু আছে এবং তাহা স্বীকার করি

বলিয়াই আমাদের কর্ম্মময় জীবন অসংখ্য বাধা বিঘ্নের মাঝ দিয়াও কোন এক মহান্ উদ্দেশ্য এবং আদর্শের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই আমাদের জীবনের সকল অবস্থায়ই কি এই ব্যক্তিত্ব বস্তুটী অবিকৃত থাকে এবং আমরা ইহার সত্ত্বা অনুভব করিয়া থাকি?

ভাবুক, তুমি একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ। তুমি যখন সুষুপ্তির অবস্থায় থাক (sound sleep) তখন তুমি তোমার তুমিত্বের বা ব্যক্তিত্বের আভাষ পাও কি? তোমার ব্যক্তিত্ব তখন কোথায় চলিয়া যায়? যে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তোমার কর্ম্মময় জীবন-স্রোত অবাধ গতিতে (তুমি মনে কর) প্রবাহিত হইতেছিল, সুষুপ্তির গাঢ় আলিঙ্গনে তোমার সেই ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব কোথায় রহিল? এই সুষুপ্তির অবস্থায় তুমি তোমার তুমিত্ব খুঁজিয়া পাও না অথবা পাইবার চেষ্টাও নাই, সাধ্যও নাই। সেই সময়ের জন্য অন্ততঃ তোমার ব্যক্তিত্ব সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তুমি তোমার অনুসন্ধান পাইতেছ না। ইহা সত্য যে,সুষুপ্তির অবসানে তোমার ব্যক্তিত্ব ফিরিয়া আসে, তুমি আবার তোমার তুমিত্বের আভাষ পাও। আর আমরাও ইহা অস্বীকার করিতেছি না, তবে গাঢ় নিদ্রার মাঝে এই যে ব্যক্তিত্বের নিরাভাষ, ইহা কি মহানিদ্রায় ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপের ইঙ্গিত করিতেছে না? ইংরেজ কবি ইহা বলিয়া না দিলেও, এই সত্য সকলেই উপলব্ধি করেন যে, মহানিদ্রা এবং নিদ্রা "যমজ ভাই বোন"; —নিদ্রা মহানিদ্রারই উপক্রমণিকা prologue মাত্র। নিদ্রায় যে ব্যক্তিত্ব সূত্র ক্ষণকালের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়, মহানিদ্রায় যে সেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিলোপ সাধিত হয়, ইহা স্বীকার করিবার ন্যায়তঃ কোন প্রতিবন্ধক নাই।

শুধু সুষুপ্তির গাঢ় আলিঙ্গনেই কি ব্যক্তিত্বের অপায় ঘটিয়া থাকে? সম্ভবতঃ তাহা নহে। তুমি যখন গভীর মনোনিবেশ সহকারে কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে থাক, যখন বিশ্ব-রাজ্যের রহস্য-দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ব সমূহের আবিষ্কার করিতে থাক, যখন তুমি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার আকাঙ্ক্ষায় কাব্য-জগতে অবাধ গতিতে বিচরণ করিতে থাক, তখন তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায় থাকে? অসংখ্য ভাব-প্রবাহের মধ্যে তোমার ব্যক্তিত্ব ডুবিয়া যায় না কি? তুমি তখন ব্যক্তি (active) নহ, তুমি তখন সম্পূর্ণরূপে কর্ম্ম (passive)। তোমার ব্যক্তিত্ব ততক্ষণ পর্য্যন্ত, যতক্ষণ তুমি ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আয়োজন করিতে থাক, ভাব জগতে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। ভাবরূপ ঊর্ম্মিরাশি তোমার হৃদয়রূপ বারিধি-বক্ষে উঠিতেছে, নৃত্য করিতেছে এবং ডুবিয়া যাইতেছে কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্বের কোন সন্ধান বলিয়া দিতেছে না। কেবল যখন তুমি ভাব-জগৎ হইতে ক্রমে ক্রমে বাস্তব জীবনের দিকে পশ্চাদ্পদ হইতে থাক, তখনই আবার ব্যক্তিত্বের ছিন্ন সূত্র গ্রথিত হইতে থাকে। তখনই তুমি

তোমার তুমিত্বের আভাষ পাও। জীবনী-শক্তির উন্মেষ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে একটানা একত্বের বা সমত্বের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মাঝে যে শত সহস্র বিরাম (break) রহিয়া গেল। জীবনটাও একটানা একত্ব নহে—কতকগুলি একটানা একত্বের সমষ্টি মাত্র দেখিতে পাই। শত সহস্র রূপে এই একটানা একত্ব প্রতিহত হইয়া যাইতেছে। একটানা একত্ব কোথায়? তুমি হয়ত তবু যুক্তি দেখাইবে যে, একত্বের বিপর্য্যয় ঘটিলেও বাল্যকালের সেই তুমি এবং এই মুহূর্ত্তের এই তুমি একই আছ; এবং এই সমত্বের ভাব না থাকিলে তোমার ব্যবহারিক জীবন অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমরাও ইহা অস্বীকার করিতেছি না যে তোমার বাল্য ও বার্দ্ধক্যে সমত্বের ভাব রহিয়াছে। কিন্তু এই যে এক টানা একত্বের অভাব প্রদর্শিত হইল, ইহার কোন সুমীমাংসা দেখাইতে পারিবে কি?

উপরে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, তাহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায়শঃই ঘটিয়া থাকে এবং আপাতঃদৃষ্টিতে সেই সকল অবস্থায় আমাদের তথাকথিত ব্যক্তিত্ব অবিকৃত থাকে; কিন্তু এমন অনেক দৃষ্টান্ত আজকাল দৃষ্ট হয়, যাহাতে আমাদের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। নিম্নে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

মার্কিন পণ্ডিত ডাঃ মর্টন প্রিন্সের "ব্যক্তিত্বের বিপর্য্যয়" (Dissociation of personality) নামক গ্রন্থে মিস্ বোসাম্ নাম্নী এক যুবতীর পর্য্যায়ক্রমে চারিবার চারিটী ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠানের বিষয় উল্লিখিত আছে। মিস্ বোস্যামের প্রথম জীবনে যে ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান হয়, তাহার পরবর্ত্তী জীবনে আর একটী নূতন ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি তখন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যান। প্রথম জীবনের "বোস্যাম" তাহার দ্বিতীয় জীবনের "বোস্যাম" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেমন একজন বাঙ্গালী হইতে একজন ইংরাজ। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে চারিটী ব্যক্তি মিস্ বোস্যামের দেহ আশ্রয় করে।

বাঙ্গালী পাঠক হয়ত মনে করিবেন যে, মিসকে এ সব ক্ষেত্রে ভূতে পাইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে তাহারা এক শরীরেই আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের সমত্ব বা একটানা রাজত্ব কোথায়? এরূপ দৃষ্টান্ত আজকালকার দিনে বিরল নহে। আমাদের নিজেদের জীবনেও দেখিতে পাই যে, কোন ভয়ানক মানসিক দুর্ঘটনায় মনোরাজ্যের অভাবনীয় আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে এবং আমরা যেন অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া নূতনরূপে জীবনযাপন করিতে প্রারব্ধ হই; এবং এই সত্যও আমরা উপলব্ধি করি যে, উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাহাদের উন্মত্ত অবস্থায় যে সকল কার্য্য করে, অথবা চিন্তার প্রবাহে থাকে, তাহাদের সজ্ঞান ও প্রকৃত অবস্থায় সেই সকল কর্ম্ম ও চিন্তা-প্রবাহের কোন স্মৃতি বা সত্ত্বা মনে উদিত হয় না। সম্মোহিত ব্যক্তিও নিজের ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া যায়। তুমি হয়ত দেখিবে, এই সব

ক্ষেত্রে ভৌতিক দেহের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, পরোক্ষে সমস্ত রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু যে রাজ্যের রাজসিংহাসনে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলে, সেই মনোরাজ্যের যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তোমার সমস্ত— এমন কি, সমস্তের আভাষ বা ভাব কোথায়? সমস্ত-সূত্র কি সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই?

আরও ভাবিবার বিষয় আছে। তোমার জীবনে হয়ত এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, যাহার স্মৃতি তুমি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছ। সেই বিশেষ ঘটনার তুমি এবং বর্ত্তমানের তুমি—এতদুভয়ের মধ্যে তুমি কোন সমস্ত স্থাপিত করিতে পার কি? তুমি শত চেষ্টা করিয়াও তোমার শৈশবকালের বিস্মৃত ঘটনাবলীর কোন সন্ধান পাও কি? তুমি যে একসময়ে শিশু ছিলে, তাহার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখন দিতে পার কি? তবে আনুমানিক সিদ্ধান্ত দ্বারা এই বিশ্বাসে উপনীত হওয়া যায় যে, অন্য শিশু যেরূপভাবে আছে, তুমিও সেই ভাবে ছিলে। আমাদের পিতা-মাতার নিকট হইতে আমরা আমাদের বাল্যজীবনের বহুবিধ ঘটনার কথা শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের স্বকীয় স্মৃতির ন্যায় তাহাদিগকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি? আমাদের কোন কোন অতি অস্পষ্টভাবে স্মৃত ভূয়োদর্শন সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না যে, তাহারা আমাদের স্বকীয় জীবনের ভূয়োদর্শনের ফল, না লোকমুখে শ্রুত, না গ্রন্থ অধ্যয়নে অবগত। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, যদিও আমরা ব্যক্তিত্বের সমস্ত সম্বন্ধে একটা মনোভাব পোষণ করিতে পারি, তবুও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মনোভাব মিথ্যাসম্ভূত হইতে পারে; অন্ততঃ তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় (metaphysical) সমস্ত বা একত্ব প্রতিপন্ন করে না।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে এই কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ব্যক্তিত্ববাদ মতাবলম্বীরা এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, যদিও আমরা শৈশব এবং বাল্যকালে আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই না, তবুও আমরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিত্বের বিস্তার (expansion of self) দেখিতে পাই এবং সদ্‌ভাবে জীবন যাপন দ্বারা (অবশ্য খৃষ্টীয় আদেশে) আমাদের ভৌতিক দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের রাজ্যে এই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাই খৃষ্টীয় মতে salvation বা ভগবানের সহিত অনন্ত জীবন। এই যুক্তি মানিয়া নিতে হইলে ব্যক্তিত্বের পর্য্যায় স্বীকার করিতে হয় এবং ইহাও প্রমাণীকৃত হয় যে, আমাদের ব্যক্তিত্ব কেবল পূর্ণত্বের দিকে, বিস্তৃতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এই সত্য কি আমরা মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ করি না যে, ধর্ম্মজগতের অনেক বড় বড় বীরপুরুষের ব্যক্তিত্ব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; অনেক নীতিবিদ্ পণ্ডিতও মাঝে মাঝে অন্যায়ের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। আর উপরে যে সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা

অস্বীকার করিবার ন্যায়তঃ কোন অধিকার নাই। সৎ-জীবনই যাপন কর, আর অসৎ-জীবনই অতিবাহিত কর, তোমার ব্যক্তিত্বের সঙ্কোচ এবং বিকাশ, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই ঘটিয়া উঠা সম্ভব এবং হইতেছেও তাই। অতএব এই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠাবাদ যতই মনোরম এবং উচ্চ আদর্শ হউক না কেন, ইহা কল্পনা মাত্র। বাস্তব জীবনে ইহার কোন সঠিক নিদর্শন নাই। তত্ত্ববিদ্যায় ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।

এ পর্য্যন্ত ব্যক্তিত্ব দ্বারা আমরা এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্বাকেই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই স্থলে কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, ব্যক্তিত্ব এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্বার সমত্বে বা একত্বে নহে। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এই ত্রিবিধ মানসিক অবস্থার সংমিশ্রণজনিত সমত্বে তোমার মনোরাজ্যে যে সকল অবস্থার উদ্রেক হয়, তাহাদের সমষ্টির সমত্বের উপরই তোমার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহা দ্বারা আমাদের প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইল কি? ব্যক্তিত্বারা আমরা এক সসীম জীবকেই বুঝি এবং এই সসীম জীব একমাত্র, সাদৃশ্যরহিত, একমাত্র অদ্বিতীয় সত্বাকেই বুঝায়। আর যদি ব্যক্তিত্ব দ্বারা জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি এই ত্রিবিধ মানসিক অবস্থার সংমিশ্রণজনিত সমত্ব বা একত্বই বুঝায়, তাহা হইলে আমাদের জীবনের দুই বিভিন্ন সময়ে যদি একই মানসিক উপাদানের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে আমাদের মানসিক উপাদানের অথবা ব্যক্তিত্বের সমত্ব কোথায় থাকে? পরন্তু আমরা কি একই জীবনে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি না? জীবনের সকল অবস্থায়ই সমত্ব রক্ষিত হইয়াছে এমন ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব কোথায় আমরা একটু পরিষ্কাররূপে এই বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করিয়া দেখিব, তোমার জীবনের কোন নির্দ্দিষ্ট কালের চৈতন্যাবস্থায় আধেয় বস্তুর আংশিক পরিমাণ চিন্তা করিয়া দেখ এবং তাহাদের সমত্ব স্থাপিত কর। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কোন সূত্র দ্বারা তুমি এই ভগ্নাংশ প্রাপ্ত হও এবং এইরূপ ভগ্নাংশের প্রাপ্তি সম্ভব কি না? আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব যে, যদি কোনও ব্যক্তির জীবন আমরা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করি তাহা হইলে ইহা কখনই দৃষ্ট হইবে না যে, তাহার ব্যক্তিত্ব নির্দ্দিষ্ট, তাহার মানসিক উপাদানের সমষ্টি (physical elements) স্থিরীভূত। তোমার জীবনের কোন কালবিশেষের মানসিক আধেয় বস্তু যেমন "ক খ গ", তৎপরবর্ত্তীকালে সম্ভবতঃ "কখঘ" বস্তুর সমন্বয় পরিলক্ষিত হইবে এবং উভয় ক্ষেত্রেই "কখ"এর উপস্থিতি দ্বারা তোমার ব্যক্তিত্বের সমত্ব রক্ষিত হইয়াছে স্বীকার করা যায়, কিন্তু অন্য এক সময়ে হয়ত 'খ' চলিয়া যাইবে এবং প্রথম কালের 'ক' শুধু বর্ত্তমান থাকিবে। তখন তোমার মানসিক উপাদান বোধ হয় "কঘপ" এর সমষ্টি। চতুর্থকালে হয়ত 'ক'ও চলিয়া যাইবে এবং "ঘপক" দ্বারা তোমার মানসিক অবস্থার সমত্ব সাধিত হইবে। 'ঘ'এর ক্রমাগত পুনঃপরিচালনা দ্বারা এই সকল ক্ষেত্রে তোমার ব্যক্তিত্বের সমত্ব রক্ষিত হইয়াছে। যদিও

তোমার প্রথম কালে 'খ'এর কোন অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় নাই। পরিবর্ত্তন যখন ধীর পর্য্যায়ে আবদ্ধ হয়, তখন এই ধারাবাহিকতা এবং সমন্বয়ের উপলব্ধি পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু "কখগ" যদি "কখঘ" এবং "কখক" অবস্থা-দ্বয়ের মধ্য দিয়া না গিয়া অকস্মাৎ "খগক" অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ধারা-বাহিকতা বা অব্যাহত সংযোগের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ এবং সমন্বয়ের বিচ্যুতি সংঘটিত হইবে। এই সত্য আমাদের কোন ভয়ানক মানসিক দুর্ঘটনায় আমরা উপলব্ধি করি। অতএব এ ক্ষেত্রেও আমাদের অস্তিত্বের পর্য্যায় স্বীকার করিতে হয়। "বাল্যকাল এবং বৃদ্ধকাল, ব্যাধি এবং উন্মত্ততা (আমাদের মানসিক জীবনে) নূতন নূতন অবস্থার সংঘটন করে, অন্য সকল অবস্থার সমষ্টয় আমরা কোনরূপে রক্ষা করিয়া থাকি। বস্তুতঃ আমাদের ব্যক্তি-ত্বের পরিবর্ত্তনের কোন সীমা নির্দ্দেশ করা কষ্টকর; অতএব "ব্রাড্‌লের" (Bradley) সহিত আমাদেরও একমত হইয়া বলিতে হয় "আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত নহে।" ইহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী এবং জীবনের প্রায় প্রতি অবস্থায়ই ঘটিয়া উঠি-তেছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের বাংলা দেশের সেই তামাকু-খোরের কথাটী মনে পড়িয়া গেল। তামাক-খোর মহাশয় যথাক্রমে তাঁর হুঁকার 'খোল' এবং 'নলিচাটী' পরিবর্ত্তন করি-য়াও মনকে প্রবোধ দিতেন যে,তাহার পুরাতন বস্তুটী যা তাই আছে। আমাদের ব্যক্তিত্ব কি এই মিথ্যা প্রবোধ নহে? এই মিথ্যা মায়ায় সত্যতার আরোপ করিয়াই কি আমা-দের কর্ম্মময় জীবন অনন্ত বাধা বিঘ্নের মাঝ দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে না? ইতিপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যদি মানসিক পরিবর্ত্তনগুলি ধীর পর্য্যায়ে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে একত্বের বা সমত্বের ভাব রক্ষিত হয়। আমাদের কর্ম্ম জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক এবং ইহার প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ। তাই বলিয়া সসীম জীবের (ব্যক্তিত্ব দ্বারা আমরা তাই বুঝি) অপরিবর্ত্তনীয়, চিরস্থায়ী অস্তিত্ব ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

উপরি উক্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আমরা দেখিতে পাইলাম যে, আমরা যাহাকে ব্যক্তিত্ব বলি—তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। তবু হয়ত কেহ কেহ বলিবেন যে "প্রেতাত্মার ভৌতিক আবির্ভাব কি আমরা দেখিতে পাই না এবং তদ্বারা কি ব্যক্তিত্বের চিরস্থায়ীত্ব প্রমাণীকৃত হয় নাই?" প্রেতাত্মার ভৌতিক আবির্ভাব সত্য হইতে পারে, আর আমরা তাহা অস্বী-কার করিতেছি না। তবে তদ্বারা ব্যক্তিত্বের অবিনশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, ব্যক্তিত্বের সম-ত্ব বা সমত্ব বা ব্যক্তিত্ব বলিয়া কোন বস্তুর সত্বা নাই; এবং প্রসঙ্গক্রমে ইহাও আমরা বলিয়াছি যে, মহানিদ্রার এই তথাকথিত ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলয়ে বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত প্রতিবন্ধক নাই। এ স্থলে পুনর্ব্বার প্রমাণের আবশ্যক না থাকি-লেও যখন "প্রেততত্ত্ব" (spiritualism)

বৈজ্ঞানিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তখন আমাদের মতের পূর্ণ সংস্থাপনের জন্য এই সম্বন্ধে যথাযোগ্য যুক্তি প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

প্রেততত্ব (spiritualism) এখন পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে পরিগৃহীত হয় নাই এবং বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে এখন পর্য্যন্ত ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হয় নাই। অপিচ ভৌতিক দৃশ্য বা প্রেতাত্মার পুনরাবির্ভাব আমাদের প্রত্যক্ষানুভূতির ন্যায় জীবন্ত কল্পনার পরিণামও হইতে পারে। সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুরও ইন্দ্রিয়োপলব্ধি হয়, এই সত্য বর্ত্তমান সময়ে অস্বীকার করিবার অধিকার বোধ হয় কাহারও নাই। আর এ কথাও সত্য যে, অতিশয় মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না—তাহারা নিজ দ্বারা সম্মোহিত হইতে পারেন। আমাদের যে সকল চিন্তা অতিশয় উজ্জ্বল এবং জীবন্ত অর্থাৎ আমাদের যে সকল চিন্তায় চিন্তনীয় বস্তু সকল আমাদের মানস নয়নে জীবন্ত রূপে প্রতিভাত হয়, সেই সকল চিন্তিত বস্তুমাত্রই যদি প্রকৃত এবং সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে "প্রেততত্বের" কোন মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু চিন্তনীয় বস্তু মাত্রকেই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা জীবন্তই হউক আর যাই হউক। আর প্রেতাত্মারা যে শরীর লইয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েন, তাহা তাহাদের পূর্ব্ব জন্মেরই ভৌতিক দেহের এবং ব্যক্তিত্বের অনুরূপ প্রতিকৃতি বলিয়া আমরা শুনিতে পাই। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে নৈতিক ক্রমোন্নতির কোন অর্থ থাকিবে কি? সে যাহা হউক ব্রাড্‌লের (Bradley) সহিত আমাদের বলিতে হয় যে, দেহ বিচ্ছিন্ন শরীরের অস্তিত্ব এবং কার্য্যশীলতার বর্ত্তমানত্ব সম্ভব; কিন্তু ইহাকে প্রকৃতপক্ষে সত্তাবান (real) বলিয়া গ্রহণ করিবার অসম্ভবত্ব পূর্ব্বের ন্যায়ই বর্ত্তমান।

অতএব ব্যক্তিত্বের চিরস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে "প্রেততত্ব" কোন প্রমাণ দিতেছে না। অন্য পক্ষে আমাদের ইহলোকের ব্যক্তিত্ব পরলোকেও অবিকৃতভাবে এইরূপে চলিতে থাকিবে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বহুবিধ অতিক্রমনীয় বাধা বিঘ্ন আছে। আমাদের পার্থিব জীবনের ব্যক্তিত্ব যদি তাহার সকল অভিজ্ঞতা লইয়া পরলোকেও বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ আমাদের চিন্তাভাব এবং ইচ্ছার সমষ্টি এবং তৎসঙ্গে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলও যদি আমাদের পারলৌকিক ব্যক্তিত্বে চিন্তনীয় বিষয় হয়, তাহা হইলে আমাদের এমন এক জগতের কল্পনা করিতে হইবে, যেখানে ভৌতিক জগতের সকলই বর্ত্তমান, শুধু 'ভূতের' অভাব। কিন্তু পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি পারিবারিক সম্বন্ধগুলি যদি আমাদের পরকালেও বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ভগবানের রাজ্য যে আমাদের এই রাজ্যের ন্যায়ই কল্পিত হয়। আমাদের পার্থিব বন্ধুবান্ধব সকল চিরস্থায়ী, এই উক্তির দ্বারা আমাদের যুক্তির অসঙ্গত এবং উশৃঙ্খল ভাবেরই প্রকাশ

পায়। অথচ ব্যক্তিত্বের চিরস্থায়ীত্ব দ্বারা আমরা ইহাই বুঝিতে বাধ্য হই। কারণ মৃত্যুর পরেও যদি আমাদের বর্ত্তমান চিন্তা, ভাব এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা, ভাব এবং আকাঙ্ক্ষার বিষয়গুলি অর্থাৎ আমাদের পার্থিব সম্বন্ধের বস্তুগুলিও বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা বলিবার ন্যায়তঃ কোন প্রতিবন্ধক নাই। ইহা নৈয়ায়িক (তর্ক-শাস্ত্রীয়) সিদ্ধান্ত, কিন্তু এই স্থলে যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে, আমাদের চিন্তা, ভাব এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি বর্ত্তমান থাকিবে সত্য, কিন্তু সেগুলি এই জীবনের নহে। এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইলে আমাদের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হয় না কি? পরলোকে আমাদের আমিত্বের বা ব্যক্তিত্বের অভাবের ইহাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নহে?

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ব্যক্তিত্ব দ্বারা আমরা এক সসীম, সাদৃশ্যরহিত, একমাত্র অদ্বিতীয় সত্তাকেই বুঝি, অথবা জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি (knowing, willing, feeliug) এই ত্রিবিধ মানসিক অবস্থার সংমিশ্রণজনিত সমষ্টিই বুঝি, তত্ত্ব-বিদ্যায় (metaphysics) ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। তবে যে ইহার একটা কাল্পনিক অস্তিত্ব স্বীকার করি, তাহা শুধু আমাদের কর্ম্মময় জীবনের সমন্বয় রক্ষা করিবার জন্য। বস্তুতঃ আমরা যাহাকে বাস্তব জীবন বলি, তাহা কাল্পনিক জীবন মাত্র।

তবে কি ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই? আমাদের কি কোন অস্তিত্ব নাই—এখানে এই পরিদৃশ্যমান জগতেও নাই, মৃত্যুর পররাজ্যেও নাই? তবে কি বৈদান্তিক মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমাদেরও বলিতে হইবে "জগন্মিথ্যা" "সব মিথ্যা", শুধু "মায়াবাদেরই" বিজয় ডঙ্কা নিনাদিত করিতে হইবে? আমরা ততদূর বলিতেছি না এবং বৈদান্তিক মায়াবাদের সমর্থন করিতেছি না।

হিন্দু দর্শনে ব্যক্তিত্বের কোন স্থান আছে কি না, তৎপ্রদর্শন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা "ব্যক্তিত্বের" দ্বারা কি বুঝেন, আমরা তাহা বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং সেই ব্যক্তিত্বের তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় কোন অস্তিত্ব আছে কি না, তাহা প্রদর্শিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তবে উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, আমরাও একরূপ ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী। আমরাও মানবের অনন্তত্বের অভিলাষী। ব্যক্তিত্ব যখন অনন্তের সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থাপিত করে, জীবাত্মা যখন তাহার পরমাত্মিক প্রকৃতির সন্ধান পায়, সসীম জীব যখন অসীম এবং অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের মাঝে ডুবিয়া যায়, তখনই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। ইহা খ্রীষ্টীয় salvation বা ভগবানের সহিত অনন্ত-জীবন নহে। ইহা সসীমের মাঝ দিয়া অসীমের স্বরূপ সন্ধান—ইহাই হিন্দু দর্শনের মুক্তি। অসীম যখন তাহার অসীমত্বের সন্ধান পায়, তখনই ব্যক্তিত্বের মিথ্যা সম্ভূত সসীমত্ব টুটিয়া যায়। বদ্ধ আত্মা মুক্ত আত্মা হইয়া যায়। আমরা ব্যক্তিত্ব দ্বারা এই মুক্ত আত্মা বা পরমাত্মাকেই বুঝি—ইহাই বৈদান্তিকের "ব্রহ্ম"

(Highly individualised being) যাহা হউক, বারান্তরে আমরা এই বিষয়টী বিশদরূপে এবং পরিষ্কাররূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষাল বি, এ।

শ্রাদ্ধকৃত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পিতৃগণের আবাহনে মন্ত্র পাঠ করা হয় "এত পিতরঃ সোম্যাসো...ইত্যাদি" হে সোম দৈবত পিতৃগণ, পূর্ব্বপুরুষগণের গমনাগমনের যে দেবমার্গ, তাহা অবলম্বন করিয়া এই কুশার নিকটে আসুন, আমাদের ক্রমাগত পৈতৃকধনে কল্যাণ সম্পাদন করুন এবং যে পৈতৃক ক্রমাগত ধনে আমরা বঞ্চিত, সেই সর্ব্ব বীরপুরুষ লভ্য ধনও আমাদিগকে প্রদান করুন। "উশন্তস্ত্বা ..ইত্যাদি" হে অগ্নি, আমরা তোমার আরাধনা করিব বলিয়া প্রজ্বলিত করিতেছি, তুমি প্রজ্বলিত হইয়া পিতৃগণকে অস্মদত্ত অন্নাদি ভোজনের নিমিত্ত আনয়ন কর।* "আয়ান্ত নঃ পিতর ..ইত্যাদি" সোমদৈবত পিতৃগণ, দেবগণ যে পথ দিয়া গমনাগমন করেন, সেই পথ অবলম্বন করিয়া আসুন; এই শ্রাদ্ধরূপ যজ্ঞে অন্ন গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হউন, আমাদিগের শ্লাঘা বর্দ্ধন করুন; এবং আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

আবাহনের পর অর্ঘ্য দান। অর্ঘ্য দানে পবিত্র অর্থাৎ প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র কুশ, দৈব পক্ষে যব এবং পিতৃপক্ষে তিল এবং তুলসী, ফুল দূর্ব্বা প্রভৃতি প্রয়োজন হয়। শ্রাদ্ধের অর্ঘ্যদান একটী অতি আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্য। ইহাতে অনেকগুলি মন্ত্র আছে। মন্ত্রগুলি জল, যব, তিল প্রভৃতির উপাসনা পূর্ণ। এই মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য পর্য্যালোচনা করিলে শ্রাদ্ধকৃত্য যে কেবল বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পিতৃপুরুষগণের পূজার অনুষ্ঠান করা হয় না, তাহা অতি সহজেই প্রতীয়মান হইবে। অর্ঘ্যদানের মন্ত্রগুলি এইরূপ "শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে...ইত্যাদি" হে জল, আমাদের কল্যাণ প্রদান করুন; অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত, পানের নিমিত্ত, কল্যাণ সংযোগের নিমিত্ত আমাদের সম্মুখবর্ত্তী হউন। "যবোঽসি যবয়াস্মদ্দেষো...ইত্যাদি" তুমি যব অর্থাৎ 'পৃথক'। সুতরাং আমাদের দ্বেষকারীদিগকে, আমাদের শত্রুবর্গকে পৃথক কর। আমরা স্বর্গ গমনের নিমিত্ত, অন্তরীক্ষ গমনের নিমিত্ত, পৃথিবী লাভের নিমিত্ত তোমার উপাসনা করিতেছি। পিতৃভবন প্রাপ্ত লোকগণ (শত্রুক্ষয়াদি দ্বারা) শুদ্ধি লাভ করুক। তুমি পিতৃদিগের আশ্রয় প্রদান কর। তিলোঽসি সোম দেবত্যো......ইত্যাদি" তুমি জগতে তিল বলিয়া খ্যাত, তুমি জল দ্বারা মিশ্রিত এবং বিষ্ণুদেহোদ্ভব, সোম তোমার অধিপতি, সম্প্রদানকারীর পাপ তুমি ধ্বংস করিয়া থাক। আমাদের পিতৃগণকে স্বধা মন্ত্র দ্বারা প্রীতি প্রদান কর। "যা দিব্যা আপঃ পয়সা... ইত্যাদি" স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীসম্ভূত হিরণ্যবর্ণ এবং যজ্ঞীয় যে জল ক্ষীরের সহিত সঙ্গত

---

* এই মন্ত্রটী বৈদিক সময়ে—যে সময়ে অগ্নি স্থাপন করিয়া শ্রাদ্ধ করা হইত, সেই সময়ের উপযোগী। এখনও কেন যে এই মন্ত্রটী পাঠ করা হয় তাহা বুঝিতেছি না।

হইয়াছে, তাহা আমাদের কল্যাণপ্রদ, আনন্দপ্রদ এবং ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পিত হইয়া সুখযুক্ত হউক।

অর্ঘ্য দানের পর পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, যজ্ঞোপবীত সূত্র, বস্ত্র প্রভৃতি দান করা হইয়া থাকে। অতঃপর অন্ন দান করা হয়। অন্ন দান শ্রাদ্ধের মূল ক্রিয়া। এই অন্ন দান করিবার উদ্দেশ্যেই এত আড়ম্বরের সহিত পিতৃগণকে আসন-দান, আবাহন, অর্ঘ্য-দান প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করা হয়। অন্ন দানের প্রক্রিয়াও অর্ঘ্যদানের ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ। ইহার সকল প্রক্রিয়ার উল্লেখ না করিয়া মাত্র মূল মন্ত্রগুলি উল্লেখ করিলে প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আংশিক প্রকাশ করা হইবে।

অন্নের উপর হস্তদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া বলা হয় "পৃথিবীতে পাত্রং...ইত্যাদি" হে অন্ন, পৃথিবী তোমার পাত্র, আকাশ তোমার আচ্ছাদন, তুমি অমৃত, এই হেতু অমৃতস্বরূপ ব্রাহ্মণের মুখে তোমায় হোম করিতেছি।

অন্নের উপর অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া বলা হয় "ইদং বিষ্ণুঃ...ইত্যাদি" এই অন্নকে আক্রমণ করিয়াছেন (তিনি বলিরাজাকে ছলিবার জন্য নিজেকে উর্দ্ধ, মধ্য ও অধোভাগে ত্রিবিক্রমরূপে ব্যাপ্ত করায়) তিনি তিন প্রকারে এই অন্নে পদার্পণ করিয়াছেন। পৃথিবী পাংশুযুক্ত, সুতরাং সহজেই ইহাতে বিষ্ণু চরণ নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অনন্ত বিষ্ণুপদ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে।

অন্নের উপর তিল দিয়া মন্ত্র পাঠ করা হয় "অপহতা সুরা... ইত্যাদি" হে বেদিস্থ অসুরগণ ও রাক্ষসগণ, এই শ্রাদ্ধের অন্নের নিকট হইতে দূর হও।

অন্নে মধু দিয়া যে মন্ত্রটী পাঠ করা হয়, উহা শ্রাদ্ধকৃত্যে বহু বার পাঠ্য। মন্ত্রটীর ভাব এত উচ্চ আদর্শের, এত গভীর কবিত্বপূর্ণ যে, বোধ হয়, আর্য্যঋষিগণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তন্ময় হইয়া প্রাণের ভিতর হইতে এই মন্ত্রটী রচনা করিয়াছিলেন। মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে বাহ্য-জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তন্ময় হইয়া যাইতে হয় বলিয়াই বোধ হয় শ্রাদ্ধের অন্নদান ও পিণ্ডদান করিবার সময় বার বার উহা পাঠ করিয়া সমষ্টির উপর ব্যষ্টির আবরণ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মন্ত্রটী এই,—"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব ইত্যাদি" সমস্ত ঋতুর বায়ুগণ মধুময় হউক, নদীগণ মধুক্ষরণ করুক, ওষধি সকল মধুময় ফল প্রদান করুক, রজনী ও প্রাতঃকাল মধুযুক্ত হউক, পৃথিবীর ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত মধুময় হউক, আকাশ মধুময় হউক, পিতৃগণ মধুযুক্ত হউন, আমাদের বনস্পতিগণ মধুযুক্ত হউক, সূর্য্যদেব মধুময় হউন, আমাদের গোগণও মধুময় দুগ্ধ প্রদান করুক, অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি সাধন করুক, আমরা সন্তুষ্টচিত্ত হই।

অন্নদান করা হইলেই মূল শ্রাদ্ধের কার্য্য শেষ হইল। অন্নদান করার পর যদি কিছু অন্ন উদ্বৃত্ত থাকে, তবেই পিণ্ডদান করিবার ব্যবস্থা। অধুনা আমরা শ্রাদ্ধের অন্ন পরিবেশন করিবার সময়েই পিণ্ডদানের জন্য কিঞ্চিৎ অন্ন রাখিয়া দিই; আবার কেহ কেহ বা শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে অন্ন পরিবেশন করিবার সময়েই পিণ্ডাদি

রাখিয়া রাখেন। ইহা বিধিসঙ্গত নহে।

অন্নদান পর্য্যন্ত মূল শ্রাদ্ধ কার্য্য হইলেও আমরা অবশ্য পিণ্ডদান পর্য্যন্ত না করিয়া কখনই ক্ষান্ত হই না। এমনও একটি ঘটনা দেখিয়াছি যে, অন্নদানের পর শেষ অন্ন কোনও কারণে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পুরোহিত পুনরায় অন্ন পাক করাইয়া পিণ্ডদান করাইয়াছেন। এ সকল অবশ্য আমাদের অবনতির ফল। হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ক্রিয়া-কলাপাদির মধ্যে শ্রাদ্ধকৃত্য সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। ইহা অজ্ঞ পুরোহিতের দ্বারা নিষ্পন্ন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সার সত্য।

যৌবন কাল হইতেই স্রষ্টাকে স্মরণ করা যুবকগণের একান্ত কর্ত্তব্য। যে যৌবনবস্থায় হৃদয় অন্যান্য অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মপ্রবণ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ থাকে সেই সময় হইতে সেই মহান্ ও পরমপুরুষকে শ্রদ্ধা-ভক্তি, পূজা, তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও তৎপ্রতি প্রীতি করিতে হয়, তাঁহার আদেশ নতশিরে বহন করিতে হয়, কারণ, তিনি আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ করিয়া তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা তোমাদের কল্যাণ চেষ্টা করিতেছেন। যৌবনেই যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু সুন্দর, তাহাতে আনন্দ ও বিস্ময় অনুভব করিবে এবং উদারতা ও অকপটতার অন্বেষণে ও আবিষ্কারে বিচলিত হৃদয় হইবে। বিশ্বপিতা ও সর্ব্বসুখবিধাতার অপার স্নেহ-মমতা বিশ্বের সর্ব্বত্র জাগরুক থাকিয়া অশেষবিধ সুখদানে আমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছে।

সর্ব্বত্রই তাঁহার অবদান সমূহ ষড়ৈশ্বর্য্য ও মহিমার ঘোষণা ও দ্যোতনা করিতেছে। তাঁহার করুণাময় শ্রীহস্ত হইতে অমূল্য ও দেব দুর্ল্লভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে। তিনি তোমার বাল্যের পরিচালক বা পালক, যৌবনের অভিভাবক এবং বার্দ্ধক্যের আশাস্বরূপ।

ভগবানকে তুমি যেমন ভক্তি করিবে, সেই-রূপ মাতা-পিতাকে সম্মান করিবে এবং তোমার অপেক্ষা বিজ্ঞতর ও অধিকতর পদ-গৌরবে গৌরবান্বিত ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। বিশ্বাস ও আজ্ঞানু-বর্ত্তিতা যৌবন কালের বিশেষ সামগ্রী এবং বিনয় ইহার একটি প্রধান আভরণ। অতএব তোমার অপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা পরি-চালিত হইতে আপনাকে নিয়োজিত কর এবং তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের বিজ্ঞতার দ্বারা আপনাকে জ্ঞানী করিয়া তোল। কবিও বলিয়াছেন ;—

"মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয়।"

সত্যবাদিতা সকল গুণের ভিত্তিস্বরূপ। যৌবনের ভণ্ডামি বার্দ্ধক্যের বিশ্বাসঘাতকতার অগ্রদূতরূপে পরিগণিত হয়। এই কপটতা যাবতীয় গুণের দীপ্তিকে মলিন করিয়া দেয়, এবং তোমাকে এইরূপে জগদীশ্বর ও তাঁহার

সৃষ্ট মনুষ্যের নিকট ঘৃণিত করিয়া তুলিবে।

অতএব তুমি যেমন ঈশ্বরের রসজ্ঞতা ও পার্থিব সম্মানকে মূল্যবান দ্রব্য বলিয়া মনে কর, সেইরূপ সত্যানুরাগের অনুশীলন কর, অকপট কথা ও কার্য্যে সঙ্গতিশীল হও। সরলতা ও অকপটতাতে প্রবল মোহিনী শক্তি আছে। এই দুইটী গুণ সর্ব্ব লোকের প্রসাদ প্রাপ্ত হয় এবং প্রায় সকল দোষের ক্ষালন করে।

সত্যের পথই সমতল ও নিরাপদ। মিথ্যার পথ কষ্টপ্রদ ও ঘূর্ণায়মান। সাধুতা (honesty) হইতে একবার ভ্রষ্ট হইলে আর উহার গতিরোধ করিতে পারা যায় না। একটি প্রতারণা, অপর প্রতারণা-কার্য্যের পথ প্রদর্শন করিতে থাকিবে, অবশেষে তুমি স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিবে।

যৌবনকালই জনহিতকর ও সদয় কার্য্যের অনুশীলন ও অনুষ্ঠানের উপযুক্ত সময়। অপরের সঙ্গে তুমি যে সম্বন্ধে সম্বন্ধ হও, তাহারই উপর তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বহুলাংশ নির্ভর করিতেছে। উপযুক্ত সময়ে তুমি যে স্বভাব ও আচার-ব্যবহারের আশ্রয় লইয়া থাক, তাহাই ঐ সম্বন্ধকে সুখপ্রদ করে। একটা বিচারশক্তি তোমার সমুদায় গুণাবলীর ভিত্তি হউক। তোমার বাল্যজীবনে, এমন কি তোমার যৌবনের আমোদ-প্রমোদে যেন কোনরূপ অসাধুতা না থাকে। তোমার মানস-পটে এই কথাটি অঙ্কিত করিয়া রাখ "তুমি অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তুমি অন্যের সহিত তদ্রূপ আচরণ করিবে।"

অপরের দুঃখে দুঃখানুভূতি একটা মহদ্ভাব, উহা হইতে লজ্জার কোন কারণ নাই। যৌবন কালের সৌন্দর্য্য আনন্দ-বাষ্পতুল্য এবং যে হৃদয় দুঃখ কাহিনীতে বিগলিত হয়, উহা তদ্রূপ। অতএব, মাঝে মাঝে রোদন মুখরিত গৃহে গমন করিবে, কখনও বা "দীয়তাং ভুজ্যতাং"-মুখরিত ভবনে যাইবে। মানব-জীবনের দুঃখরাশি, জনহীন কুটীরের মুমূর্ষু জনক-জননীর এবং ক্রন্দনশীল পিতৃ-মাতৃহীন বালকের দুঃখের কথা চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইবে। কোন আমোদ-উৎসব দুঃখের সহিত উপভোগ করিবে না। অতি নিকৃষ্ট পতঙ্গটীকেও নির্দ্দয়ভাবে পদদলিত করিও না; কারণ, উহার একটীও তুমি স্বয়ং সৃষ্টি করিতে পার না।

পরিশ্রম ও সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার, এই দুইটীই যুবকগণের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। যৌবনে পরিশ্রমের অভ্যাস অতি সহজে আয়ত্ত হয়। এই সময়ে উচ্চাকাঙ্খা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, প্রতিযোগিতা এবং আশার উন্মেষ সাধন হইয়া থাকে। শ্রম শুধু উন্নতির যন্ত্র স্বরূপ নহে, ইহাকে আমোদ-আহ্লাদের উৎস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অলস ব্যক্তির দুর্ব্বলচিত্ত অপেক্ষা মানবজীবনে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ উপভোগের পরিপন্থী আর কিছু নাই। যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ, সে ধনবান হইতে পারে কিন্তু সে মনোপভোগের নির্ম্মল ও পবিত্র আনন্দ লাভ করিতে পারে না। কেবল পরিশ্রমই আনন্দ-উপভোগ-প্রবৃত্তি প্রদান করে।

মনে করিও না, ধন, পদগৌরব, প্রভৃতি পরিশ্রম ও মনোনিবেশ হইতে তোমাকে মুক্তি প্রদান করিবে। পরিশ্রম মনুষ্য জীবনের নিয়ম, ইহা প্রকৃতি, বিবেক ও জগদীশ্বরের আদেশ। সর্ব্বদা মনে রাখিবে, যে সমুদায় বৎসর এক্ষণে অনন্ত কালসাগরে যাইয়া মিশিতেছে, সেই সমস্ত বৎসর তাহাদের পশ্চাতে স্থায়ী স্মৃতি চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে। উহারা তোমার জীবনের প্রধান অংশ অধিকার করিবে। যদিও তোমার চিন্তাশূন্য মন হইতে তাহারা পলায়ন করে, তথাপি তাহারা জগদীশ্বরের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে। *

শ্রীরাধাচরণ দাস।

দুর্ভিক্ষ

বঙ্গের ঘরে ঘরে আজ যে দৈন্যের করাল ছায়া পতিত হইয়াছে, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমির মঙ্গলময় শ্রী আজ যে মলিন হইয়া গিয়াছে, তাহা কে না অনুভব করিতেছেন? দুর্ভিক্ষ যেন ভীষণ মুখব্যাদান করিয়া নর-নারীকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। এই বিষম দুর্দ্দিনে আমাদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? আমরা কি কেবল আমাদের দিন গুলি গণিয়া গণিয়া ক্রমে ক্রমে বিলয়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকিব? কোন চেষ্টাই কি আমরা করিতে পারি না?

এই কালান্তক যম সদৃশ দুর্ভিক্ষের বহু কারণ বিদ্যমান থাকিলেও অবাধ বাণিজ্য ইহার একটী প্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কোটী কোটী টাকার খাদ্য শস্য বৎসর বৎসর দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, দৈবক্রমে যাহা থাকিয়া যাইতেছে, তাহাই আজ আমরা ৮৲ টাকা মণ দরে ক্রয় করিয়া নিজেদের জীবন রক্ষা করিতেছি। পাঠক, একবার দেশের অবস্থা ভাবিয়াছেন কি? কয়জন লোক আজকাল দুই বেলা খাইতে পাইতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কি? আর এই যে ভীষণ অজন্মা, এই অজন্মাতেও কত কোটী টাকার খাদ্য শস্য ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার একটা মোটামুটী হিসাব লউন। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯১৭—১৮ সালে ৫৪ কোটী টাকা মূল্যের খাদ্য শস্য বিদেশে গিয়াছে; যুদ্ধের পূর্ব্বে গড়ে বৎসরে ৪৬ কোটী টাকা মূল্যের খাদ্য শস্য রপ্তানি হইত। এই অবাধ বাণিজ্য স্রোত রোধ করা সহজসাধ্য নহে। দেশের ব্যবসায়ীগণের এখনও এমন দেশাত্মবোধ জন্মে নাই যে, তাঁহারা সকলে এই স্রোতের মুখে বাধা প্রদান করিতে পারেন।

এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমাদিগকে বিলাসিতা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। পেটে ভাত নাই, অথচ বাবুয়ানা করিবার প্রবল ইচ্ছা, এক বিষম ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকারে অনেক সময় আমরা নিজেদের দুঃখ নিজেরা ডাকিয়া আনি। যে দেশের লোকের দুই বেলা আহার জোটে না, সে দেশের লোকের এক কপর্দ্দকও বিলাসিতার জন্য ব্যয় করা সাজে না।

আর দেশের ধনীবৃন্দ, এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় আপনারা কি নিশ্চিন্ত থাকিবেন? শত শত লোকের কাতর ক্রন্দন কি আপনাদের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিতেছে না? কত অর্থ কত রকমে ব্যয় হইয়া থাকে, দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য যদি কিছু অর্থও ব্যয় করেন, তাহা হইলে অনেক অনাথের তপ্তাশ্রু মোচন করিতে পারেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি পর-দুঃখকাতর অনেক সমাজ এই কার্য্যের জন্য ব্রতী আছেন। তাঁহাদের সাহায্য করিয়া দুর্ভিক্ষ দমনে প্রবৃত্ত হউন।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সোম বি, এল্।

---

* কোন একটা ইংরাজী প্রবন্ধের ভাবাবলম্বনে রচিত।
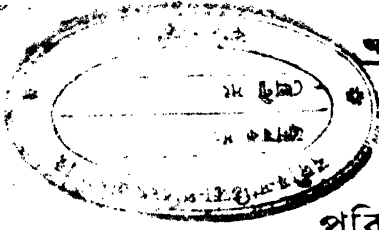
আলোচনা, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল।

পরিবর্ত্তনের প্রভাব।

যুগের পরিবর্ত্তনই জগতে যাবতীয় পরিবর্ত্তনের প্রভাব সূচিত করিয়া থাকে। সত্যযুগে যাহা যাহা ছিল, ত্রেতায় তাহার কতক কতক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল; ত্রেতায় যাহা ছিল—দ্বাপরে তাহার কতক কতক বৈষম্য ঘটিয়াছিল, আবার দ্বাপরে যাহা ছিল, এই কলিযুগে তাহার বৈষম্য অনেক; কলির এই বাল্যাবস্থাতেই এত পরিবর্ত্তন, না জানি আরও বেশী দিন গত হইলে জগতের কি ভীষণ পরিণামই হইবে।

দেখিতে গেলে সকল যুগেই—যুগের প্রভাব একটু না একটু প্রভাবিত থাকেই। সত্য যুগেও ত্রেতা, দ্বাপর, কলির প্রকোপ ছিল। ত্রেতা যুগেও সত্য, দ্বাপর, কলির প্রভাব ছিল, দ্বাপর যুগেও সত্য, ত্রেতা ও কলির মাহাত্ম্য বর্ত্তমান ছিল এবং কলিতেও যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের প্রভাব বর্ত্তমান থাকিবে—ইহা আমরা শাস্ত্রপাঠ দ্বারা বুঝিয়া লইতে পারি।

অনেকেই বলেন—দেশ-কাল-পাত্র খারাপ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের এত অধঃপতন হইয়াছে এবং দেশ-কাল-পাত্র যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আমাদের সেইরূপ ভাবে কার্য্য না করিলে আর পরিত্রাণের উপায় নাই। এখন দেখিতে হইবে—পরিবর্ত্তনটা কোথায় হয়—ইহার মূল কোথায়। দেশ ত ঠিক সেই প্রকার আছে—এখনও সেই গগন-পবন ভারতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে—এখনও অন্যান্য যুগের ন্যায় চন্দ্র-সূর্য্য সমুদিত হইয়া দেশের আঁধার নাশ করিতেছে, এখনও

নিবেদন।—আলোচনার উপহারের পুস্তক ছয়খানির মধ্যে "জালনোট" নামক পুস্তকখানি বোধ হয় আর পাওয়া যাইবে না। তাহার পরিবর্ত্তে অন্য একখানি ভাল উপন্যাস গ্রাহকগণকে দেওয়া হইবে। সত্বর পত্র লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত না হইলে বিলম্বে হতাশ হইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—আলোচনার পুরাতন গ্রাহকদের নামে আমরা ক্রমশঃ ভিঃ পিঃ [illegible] কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অবিলম্বে জানাইবেন। ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া আমাদিগকে [illegible] না করেন, ইহাই প্রার্থনা।

"কর্ম্মকর্ত্তা আলোচনা"

নীলাম্বু অম্বুরাশি ঘোররবে দেশকে মুখরিত করিয়া সমানভাবেই বহিয়া যাইতেছে। কাল ঠিক সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের মত অনন্তের ক্রোড় হইতে নামিয়া অন্যান্য যুগের মত একই প্রবাহে অনন্তের পানে ছুটিয়াছে—ইহাদের মধ্যে ত পরিবর্ত্তনের কোনও প্রভাব অনুভব হয় না—কোন ভাব বিপর্য্যয় ত ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই কেবল পাত্রের ভিতর, আমাদের মধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া আমরা আপনাদের মত দেশের ও কালের মধ্যে পরিবর্ত্তন হইল—ভাবিয়া লই। সত্য যুগে আমরা যাহা ছিলাম—ত্রেতায় যেরূপ ভাবে আমরা বিচরণ করিয়াছিলাম, দ্বাপরে আমরা যেভাবে ভাবিত হইয়া আপনাকে ভাবময় করিয়াছিলাম, কলিতে আমাদের সে ভাবের অভাব হইয়াছে। আমরা সে পন্থা পরিহার করিয়াছি বলিয়াই আমরা জগতকে পরিবর্ত্তনময় দেখিতেছি। যকৃতরোগী হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যেমন স্বভাবে, স্বচক্ষে জগতের সমস্ত বস্তু হরিদ্রা বর্ণ নিরীক্ষণ করে, আমরা পাপ-যকৃৎ-রোগগ্রস্ত হইয়া—বিকারগ্রস্ত রোগীর মত, আত্মবৎ অবস্থার মত, জগৎটাকেও পরিবর্ত্তনময় দেখিতেছি। তাহা হইলে বেশ বুঝা যাইতেছে—দেশের ও কালের পরিবর্ত্তন হয় নাই, —আমাদের পরিবর্ত্তনেই আমরা সমস্ত পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। গোড়ায় গলদ আমাদেরই—তাই জগতে এত পরিবর্ত্তন, এত অধঃপতন।

আত্মা অবিনাশী, অতএব এই আমরা চিরকালই আছি, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে ছিলাম, কলিতে আছি এবং থাকিবও। সত্য যুগে পুণ্য আমাদের পূর্ণ মাত্রায় ছিল, চতুষ্পাদ ধর্ম্ম—তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্যরূপে আমরা প্রতিপালন করিতাম—তাই আমাদের লক্ষ বর্ষ পরমায়ু ছিল, দীর্ঘাকার একবিংশতি হস্ত পরিমিত বলিষ্ঠ দেহ ধারণ করিতাম; প্রাণ মজ্জাগত এবং মৃত্যু আমাদের আয়ত্বাধীন ছিল। তারপর ত্রেতায় ইহার একটু পরিবর্ত্তন হইল—পুণ্যের প্রভাব আমাদের এক পাদ কমিয়া গেল—পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর হইল, দেহের পরিমাণ চৌদ্দ হস্ত হইল—প্রাণ অস্থিগত হইল। এইরূপে দ্বাপরে দুই পাদ ধর্ম্ম সমন্বিত হইয়া—হাজার বৎসর পরমায়ু লইয়া, রুধিরগত প্রাণের সহিত সাত হাত পরিমিত মানব দেহ ধারণ করিলাম—তারপর এই কলিতে কি বিষম পরিবর্ত্তন, সেই আমরা—সেই সনাতন আর্য্যজাতির বংশধর আমরা অতি ক্ষীণ অন্নগত প্রাণ লইয়া সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত অতি অপ্রতুল দেহে অবস্থান করিতেছি। তাহাও কতদিন অবস্থান করিব—লক্ষ বর্ষ, দশ হাজার বা হাজার বৎসর নয়—এক শত কুড়ি বৎসর মাত্র অতি কষ্টে অবস্থান করিয়া এ দেহ পরিবর্ত্তন করিব—জগতের এ মানবী লীলার অবসান করিব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পাত্রাপাত্র জ্ঞান ছিল, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে আকাশ পাতাল প্রভেদ ছিল, আহার-বিহারে আচারাদি অনুষ্ঠান ছিল; আর এখন সব খিচুড়ী হইতে বসিয়াছে। তাহা হইলে পরিবর্ত্তনটা কোথায় হইয়াছে এবং কিসের জন্য হইয়াছে, ইহাতে

সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে —দেশের নয়, কালের নয়—পরিবর্ত্তন আমাদের নিজেদের এবং ধর্ম্ম ভাবের অভাব হওয়াই এই পরিবর্ত্তনের মূল কারণ। যখন পূর্ণ মাত্রায় ধর্ম্ম ছিল—যখন পূর্ণ মাত্রায় ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতিমান হইয়া আমরা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম, তখন এত অভাব অভিযোগ, এত দারিদ্র্য, এত দুঃখ আমাদিগকে এমন ভাবে প্রপীড়িত করিতে পারে নাই—মৃত্যুর লেলীহান চর্ব্বণে আমাদিগকে এরূপভাবে চর্ব্বিত করিয়া জন সমাজ লোক শূন্য করিতে পারে নাই; অহরহঃ খাদ্য-শস্যের অভাবে দারুণ দুর্ভিক্ষ-দাবানলে দেশকে এমন ভীষণ ভাবে দগ্ধ করিতে পারে নাই। এখন ত অন্ন-বস্ত্রের অভাবে দেশ দারুণ প্রপীড়িত—চারিদিকে হাহাকার, মৃত্যু যন্ত্রণায় এমন স্থান নাই যাহা অস্থির হইয়া ত্রাহি মধুসূদন না করিতেছে! ধর্ম্মহীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘোর অধঃপতন কি ইহার একমাত্র কারণ নয়?

তখন দেশে অজন্মা, অশান্তি, মড়ক হইত—কিন্তু সে কয়দিন; দেশে লোক ছিল, ধার্ম্মিক লোক দেশের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বিচরণ করিত, ত্যাগী ব্রাহ্মণগণ দেশ ও দেশবাসীর রক্ষায় যোগ-তপস্যা করিত, শান্তি স্বস্ত্যয়নে রত থাকিত, তাই এ সকল বিভীষিকা তখন মাথা তুলিয়া দেশের ও দশের অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইত না। বর্ষণ অভাবে ক্ষেত্রে অজন্মা হইয়াছে, তপনিরত বিপ্রকুল বদ্ধ পরিকর হইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, প্রাণময় কোষে প্রাণের দেবতাকে অধিষ্ঠিত করিয়া যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলেন—তৎক্ষণাৎ বারি বর্ষণ হইল, বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হইয়া লোকের অভাব পূর্ণ করিল। মরণাধিক্য দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে—ধর্ম্মপরায়ণ জনগণ মরণ-বারণ মাতৃপাদপদ্ম পূজন ও হরিনাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে তাহা হইতে দেশকে রক্ষা করিলেন। চারিদিকে আবার শান্তি বিরাজিত হইল। এখন যেরূপ অন্নবস্ত্রের অভাব, যেরূপ মরণের প্রাদুর্ভাব, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কি এরূপ ছিল, না দেশ এত হাহাকারে পূর্ণিত হইয়া উঠিয়াছিল। তবেই দেখিতে হইবে—দেশ কালের কিছুই হয় নাই—আমাদের মধ্যে সেরূপ লোকের, সেরূপ ভাবের অভাব হইয়াছে—আমরা অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া পরিবর্ত্তন স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছি, তাই এত অধঃপতন। পরিবর্ত্তনের প্রভাব তাই আমাদের উপর বিষম রূপে আধিপত্য করিয়া ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট করিতেছে। ঘরে অন্ন নাই, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন পেট পুরিয়া খাইতে পায় না। বিলাসিতায় আমরা আকণ্ঠ ডুবিয়া রহিয়াছি—বাবুয়ানাটি না হইলে আমাদের চলে না! ত্যাগী ব্রাহ্মণ আজ বিলাসী বাবু। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাহারা এ সকলের চূড়ান্ত করিয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতি অবলম্বনে ত্যাগের উর্দ্ধ সোপানে উঠিয়াছিল। জানি না কোন্ পাপে, বিধাতার কোন্ অভিশাপে সামান্য অর্থের জন্য পরমার্থ নষ্ট করিতেছে; তুচ্ছ বণিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সঞ্চয়ের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। সঞ্চয়ের পিপাসা আবার কবে তপঃপরায়ণ জাতিকে বিচক্ষণ করিয়াছিল?

সহানুভূতি কথাটা দেশ হইতে একবারে উঠিয়া গিয়াছে, আজকাল একটু আধটু যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল নাম কাওয়াস্তে, কেবল বাহাদুরী পাইবার জন্য। তোমার বাটীর পাশে একজন না খাইয়া মারা যাইতেছে, তাহাকে তুমি দেখিবে না, বরং তাহার বাস্তটী আত্মসাৎ করিবার লোভ তোমার অস্থিমজ্জায় জড়িত। অপরদিকে দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে টাকা দিয়া লোকের নিকট নাম কিনিতে, দাতা বলিয়া জাহির হইতে তোমার ইচ্ছা অতিশয় প্রবল। অতুল ধনের অধীশ্বর জমীদার সুরম্য হর্ম্ম্যে, বৈদ্যুতিক আলোক-বীজনী-তলে সুখে অবস্থিত, দশ টাকা মণ চাউলে চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় আহারে দেহ স্ফীত হইতেছে; পিপাসা নিবারণের সরবৎ বরফের ছড়াছড়ি, কিন্তু তোমার এ বাবুয়ানা কোথা হইতে প্রভু! অভুক্ত প্রজাবর্গের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নয় কি? কিন্তু ভাবিয়া দেখিও, তাহাদের ন্যায় অতি দরিদ্রকেও তোমা অপেক্ষা জগতের কাজে অনেক বেশী দরকার। সে না থাকিলে তুমি থাকিতে না, তোমার অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাইত। সে ছোট আছে বলিয়াই তোমার বড় বলিয়া এত আদর। অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোর আদর হয় না, সে না থাকিলে কে তোমায় বড় করিত। বড়কে বড় করিবার হেতুই যে ছোট।

আরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে ধর্ম্মে। ধর্ম্মের বড় বড় কথা আজ কাল সকলেই কয় কিন্তু কার্য্যে কিছুই দেখিতে পাই না। ভাগবত, গীতার প্রচলন আজ কাল সর্ব্বত্র, গীতার শ্লোক আওড়ায় না এমন লোকইত দেখিতে পাই না। এই ধর্ম্ম সেবার ভাণে দেশের ঘোর সর্ব্বনাশ হইতেছে। ধর্ম্মের দেশে ধর্ম্মের ভাণে লোক মজান অতি সহজ, তাই আজ প্রবৃত্তির দাস, ঘোর আসক্তি পরায়ণ ব্যক্তি বিনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য গেরুয়া ধারী হইয়া সমাজে ঘুরিতেছে। দুই একটা বুজরুকী দেখাইয়া লোক মুগ্ধ করিয়া শেষে তাহার কাণে মন্ত্র প্রদান করিতেছে, অর্ব্বাচীন ব্যক্তিগণ তাহার মায়া-মুগ্ধ হইয়া পরম পূজনীয় কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়া তাহার মন্ত্র শিষ্য হইতেছে, ইহাতে যে শাস্ত্র-সঙ্গত কিরূপ মহাপাপ তাহা একবার ভুলেও ভাবে না। প্রশ্রয় পাইয়া এই সকল লোকের দ্বারা প্রত্যহ কত কুকর্ম্ম সাধিত হইতেছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এই সে দিন শ্রীরামপুর এবং হাওড়ায় আদালতে দুই জন সন্ন্যাসী সংক্রান্ত ঘোর কলঙ্কের বিচার শেষ হইল—যাহা লিপিবদ্ধ করিতে লেখনী অবশ হইয়া পড়ে। এরূপ আরও যে কত পরিবর্ত্তন, কত অধঃপতন আছে যাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারা যায় না।

তাই বলিতে হয় পরিবর্ত্তন কোথায়? দেশ ও কালে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে? আমাদের মধ্যে, আমাদেরই যে বিবর্ত্তন বিকারে ঘোর বিকৃত, তাই বিকারী রোগীর মত যাহা দেখি, তাই পরিবর্ত্তিত বলিয়া মনে হয়। এ অধঃ-পতন, এ পরিবর্ত্তন, এ অশান্তি দেশে যাহা ঢুকিয়াছে—ইহা শিক্ষার পরিবর্ত্তন প্রভাবে, এবং সনাতন বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে। যদি দেশ-কাল ঠিক করিতে চাও, তাহা হইলে অগ্রে

নিজব্যাধির হস্ত হইতে নিজেকে পরিত্রাণ করিতে চেষ্টা কর। ধর্ম্ম-কর্ম্মে আবার মতিমান হও, তোমার আপনার ভাই-ভগ্নীকে চিনিয়া লও; প্রাণের টানে তাহাদের অভাব মোচন কর। তুমি বড় হইয়াছ বলিয়া দরিদ্র তাহাদের ছুড়িয়া ফেলিয়া দিও না। ইহাতে মহা অধর্ম্ম। ধর্ম্মহীনতার পরিবর্ত্তনই বিষম পরিবর্ত্তন। অন্য সকলের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা সহজ কিন্তু ধর্ম্ম-কর্ম্মহীন হইলে যে অনিষ্ট হইবে, তাহা হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই। ধর্ম্মের অভাবে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া যে অধঃপতন সৃষ্টি করিবে, তাহা হইতে উদ্ধারলাভ শত জন্মেও হইবে না।

সম্পাদক।

মূর্ত্তি পূজা

যেমন বর্ণমালা সকল বিবিধ আকারে গ্রথিত হইয়া শব্দরূপে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশ করে, তদ্রূপ এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন গুণ-ধর্ম্ম বা মহিমাকে বিশেষ বিশেষ ভাবে বিভক্ত করিয়া আমরা অনন্তধর্ম্মী অসীম মহিমাময়ী জগন্মাতার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বা মহিমা উপভোগ করি। সেই সকল বিশেষ বিশেষ চিন্ময়-স্ফূর্ত্তিকে যখন অনন্যবুদ্ধি হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হই, যখন আপনার প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয় দিয়া তাহাকে প্রাণময়ী, মনোময়ী, ইন্দ্রিয়ময়ী করি, তখন বস্তুতই জগন্মাতার সেই বিশেষ বিশেষ ভাবের ভাবময়ীমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা আমাদিগের মনুষ্যজন্ম সার্থক করিয়া থাকি এবং এইরূপ সাধনালব্ধ সার্থকতা, আমাদিগের বাহ্য চক্ষের তৃপ্তির জন্য বা অপরকে সেইরূপ সিদ্ধিলাভ করাইবার জন্য আমরা মায়ের সেই মূর্ত্তি ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, শিলাময়ী করিয়া জনসমাজের মঙ্গলার্থে গ্রামে-নগরে প্রতিষ্ঠা করি। কত-কাল—কতকাল ধরিয়া এইরূপে মনুষ্য, মাকে চৈৎক্ষেত্রে লাভ করিয়া কাঠ, পাথর, মাটি দিয়া গড়িয়া আসিতেছে, তাহার নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া অনেক মনস্বী হাস্যাস্পদ হইয়াছেন মাত্র।

আত্মদানের, আত্মলাভের, আত্মসাধনার সম্যক নিদর্শন এই সকল মূর্ত্তি। বিশ্বেশ্বরীর সহিত বিশ্বের পরমাণু ক্ষুদ্র মনুষ্য আপনার প্রাণের সম্বন্ধ বা আত্মীয়তা ফুটাইয়া তুলিতে যতদূর সমর্থ-বল্পনায় তাহার দুইটী বাহ্য নিদর্শন আমাদিগের চক্ষে প্রতিভাত হয়। একটী আপনি জড় হইয়া যাওয়া, অন্যটি মাকে জড়ে পরিণত করা। বাহ্য চক্ষে এই দুইটীই যথার্থ আত্মবিনিময়ের শেষ সীমা। পূজ্য আর্য্যদিগের পবিত্র আশ্রম এই ভারতবর্ষে এই দুই দৃষ্টান্ত এখন পর্য্যন্তও অপ্রতুল হয় নাই, এবং মনুষ্যজগৎ বহির্ম্মুখে যতই ভাসিয়া যাউক, এ অপ্রতুলতা কখনও আসিবে না—ইহা স্থির নিশ্চয়। যেখানে পরমাত্মরূপিণী মা একবার অচ্যুত, অব্যয়, নিত্য, সত্য বলিয়া প্রপূজিতা হন, সেখানে যুগ-যুগান্তরেও আত্মদানের এ নিদর্শন এককালীন বিলুপ্ত হয় না। মনুষ্য মাকে ভাবিতে ভাবিতে জড় হইয়া গিয়াছে, মৃত্তিকা হইয়া গিয়াছে—মৃত্তিকার দেহ ইহ জন্মের মত মৃত্তিকায় মিলাইয়া দিয়া মাতৃজকে মিশাইয়া

গিয়াছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল না হইলেও আমরা ঘুরিতে ফিরিতে চক্ষের উপর বড় একটা দেখিতে পাই না। কিন্তু দ্বিতীয়টী গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে দেখিতে পাইয়া "আমরা মায়ের অঞ্চলের নিধি" এই পুণ্য স্মৃতিটি প্রাণে ক্ষণেকের তরেও ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হই। প্রথম দৃষ্টান্তটি উচ্চঃশ্রেণীর সাধক-বৃন্দের ব্যক্তিগত আবির্ভাবের সমসাময়িক, তাঁহাদিগের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে উহা বাহ্য চক্ষু হইতে লয় পায়। কিন্তু দ্বিতীয়টী বহুকাল ধরিয়া বংশানুক্রমে আমাদিগের প্রাণকে পুণ্যময় করে। প্রথমটী শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা সাধকেরই মহিমা জ্ঞাপন করে, কিন্তু দ্বিতীয়টী সাধনার রহস্য-উপায় প্রভৃতি ও জনসাধারণের হৃদয়ে অনেকাংশে ফুটাইয়া দেয়। জনসাধারণের জন্য মাতৃ ভালবাসায় এই অপূর্ব্ব ঘনীভূতি—প্রতিমাদি প্রতিষ্ঠারূপ হিন্দুর এই ভক্তির জড় বিকাশ, প্রীতি-কল্পনার শেষ সীমা, ইহা কেহ কখনও অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না।

সত্যই জীব যে মায়ের পুত্র—একথা সত্য-প্রাণে, সত্যজ্ঞানে সত্যবুদ্ধিতে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া জগন্মাতাকে কতদূর ঘরের মায়ের মত করিয়া লইয়াছিল—তাহার সজীব পরিচয় এই মাতৃ অভিব্যক্তি। পূর্ব্বে অনেকে হিন্দুর এ প্রতিমা পূজা পৌত্তলিকতা বলিয়া উপহাস করিলেও এখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ভগবৎ প্রীতির এ পূর্ণতম অভিব্যক্তিকে সম্ভ্রমে শিরে তুলিয়া লইতেছেন। হিন্দুর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কত অচলপ্রতিষ্ঠা রূপে ভক্তি অধিকার করিয়া আছে—মায়ের জন্য হিন্দুর হৃদয় কত ব্যাকুল—প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য দেবতা সকল তাহার জলন্ত সাক্ষী দিয়া বিদেশীয়দিগকে মুগ্ধ করিবার সূচনা করিয়াছে।

কিন্তু আজ কি দেখিতেছি! প্রবাসে বহুকাল বসবাসের পর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ভক্তিমান পুত্র যদি দেখে যে—গৃহে তাহার পিতামাতার যে তৈলচিত্র বা প্রতিচিত্র গুলি সে নিত্য দেখিত, নিত্য প্রণাম করিত, নিত্য সে গুলিকে জীবন্ত পিতামাতা বলিয়া উদ্দেশে ভক্তি-অশ্রু দিয়া পূজা করিত—সে চিত্রগুলি কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে, অথবা দেওয়াল-গাত্র হইতে ভূমিতে স্খলিত হইয়াছে—তবে তাহার হৃদয়ে যে মর্ম্মান্তিক হাহাকার জাগিয়া উঠে—আজ গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিলে ভগবৎ ভক্তিপরায়ণ পুরুষের প্রাণে কি সেই হাহাকার জাগিয়া ওঠে না? কত যত্নে, কত আদরে, কত ভক্তিভরে প্রতিষ্ঠিত, সম্পূজিত বিগ্রহ সকল আজ অবজ্ঞায়, অশ্রদ্ধায়, অবহেলায় গ্রামপ্রান্তে অনাথের মত পড়িয়া রহিয়াছে। কোথাও চূর্ণিত—কোথাও বিকলাঙ্গ—কোথাও পূজা-প্রীতি বর্জ্জিত—কোথাও অজ্ঞ ভক্তিহীন তণ্ডুল-লুব্ধ মূর্খের জীবিকার্জ্জনের উপায় মাত্র হইয়া অবস্থান করিতেছে। যে মায়ের স্নেহ স্মরণে তাহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—না জানি আজ সে মায়ের চক্ষে কত অশ্রু—না জানি আজ সে মায়ের বক্ষে কত তপ্তশ্বাস—বুঝি সেই মাতৃ-ক্রন্দন আজ অভিশাপের মত হিন্দুগৃহে দুর্দ্দশার বন্যা আনিয়াছে, বুঝি সেই তপ্তশ্বাস আজ হিন্দুর সমস্ত আশার প্রাসাদ সমূলে বিচূর্ণ করিয়া

দিতেছে।

অনেকে শব্দগত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তন্ত্রাদি হইতে দুটা শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিয়া থাকেন—"ও সকল মাটি কাট পাতর পূজা মূর্খের জন্য, নিম্নাধিকারীর জন্য—কেহ বা বিজ্ঞের মত চক্ষু উর্দ্ধে স্থাপিত করিয়া বলেন—এই বিশাল বিশ্বই তাঁহার প্রতিমা—আবার নূতন করিয়া প্রতিমার আবশ্যক কি—জল-স্থল-আকাশ সবই তাঁর মূর্ত্তি—ও সব গড়িয়া আর কি হইবে! মানুষ হাত তালি দিয়া বাহবা দেয়—ব্রহ্মজ্ঞানের বিপুল বৈভব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখের অমৃত পান করে ও অপরকে তাহাই উদ্‌গীরণ করিয়া পান করায়। দেশটি-যেন যথার্থই ব্রহ্ম দর্শনে পরিপূর্ণ হইয়াছে—এইরূপ একটা বিকট উশৃঙ্খল শব্দ-রোল আমাদের গৃহে তিষ্টিতে দেয় না, আমরা কাঁদি—আর মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকি। হায়—কেহ বোঝে না—কেহ বুঝিতে চায় না—ও-সকল পাশ্চাত্য নরনারীর Love letter এর মত—ভিত্তিহীন—স্বার্থানুগামী, শুক পক্ষীর শ্রুতি মধুর বাক্যালাপ!—ভালবাসার ধর্ম্মই এই যে, সে তাহার প্রিয় বস্তুকে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের চারিধার হইতে গুটাইয়া আনিয়া তাহার নিজের হৃদয়ের পরিমাণে তাহাকে আকৃতিময় করিয়া হৃদয়ের ভিতর পূরিয়া ফেলে। একথা—আত্মজ্ঞ বা আত্মচিন্তনশীল পুরুষের ত কথাই নাই—আত্মীয়তা মোহ মগ্ন সাধারণ মনুষ্যও অতি সহজে বুঝিতে পারে। যাহারা তাঁহাকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহারা ত প্রতিমা গড়িবেই—যাহারা তাঁহাকে আত্মীয় বলিয়াও ঈষৎ ধারণা করিতেছে, তাহারাও তাঁহাকে কাষ্ঠে মৃত্তিকায় না গড়িয়া থাকিতে পারে না। রামচন্দ্র স্বর্ণময়ী সীতা না গড়িয়া থাকিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তৎবাক্তিত সাধনা রহস্য ও উপকারীতার কথা বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়।

মোট কথা না বুঝুক তাহাতে তত ক্ষতি নাই কিন্তু সব যে যায়! ভিখারীর মুষ্টিমের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের একটা কণা পড়িয়া গেলেও যেমন সাগ্রহে সেটি ভূমিতল হইতে উঠাইয়া লয়—তেমনি যখন দেখিব—গ্রাম্য দেবতা, কুলদেবতা এ সকলের আদর আচার দেশে জাগিতেছে—শুধু তখনই বুঝিব—ভগবৎ আত্মীয়তার কণামাত্র আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। নতুবা সহস্র ধর্ম্মপ্রবন্ধ, সহস্র বক্তা, সহস্র ব্রহ্মজ্ঞানী, সহস্র পরমহংস, সহস্র আনন্দস্বামী দেশের গলিতে গলিতে শোভা পাইলেও বুঝিব—হিন্দুর প্রাণে এখনও ধর্ম্মভাব বিন্দুমাত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গ্রাম্য-দেবতার পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা অন্য কিছুই নহে—শ্লোক নহে, গীত নহে, কীর্ত্তন নহে, প্রার্থনা নহে, হোম নহে, যাগ নহে, যোগ নহে, ধ্যান নহে, অবতারের সৃজন নহে, গেরুয়া বসন, জটা অথবা মুণ্ডিত শির নহে, সভা ও বক্তৃতা নহে, মুদিত চক্ষু নহে; শুধু—বিগ্রহ সকলের পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাই—হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণ পুনঃ প্রতিষ্ঠার সর্ব্ব প্রথম জীবন্ত নিদর্শন। সত্য ভগবৎ হৃদয়তার পুনঃ সূর্য্যোদয়। অন্য যাহা কিছু—নক্ষত্রালোক মাত্র, দিবালোক নহে। যাহ চিত্তে যাহাদের প্রাণে শ্রদ্ধা জাগে না—

আচারের শত বাহুল্য, শত হা হুতাশ, শত শত পরায়ণতার বাহ্য ব্যবহার, কখনও অকৃত্রিম নহে। একথা যেন আমরা আর ভুলিয়া না থাকিয়া ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি।

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

বেলা ব'য়ে যায়।

বেলা বয়ে যায় ভানু অস্তগত প্রায়
ক্ষীণ ম্লান রশ্মি জাল নীরব ভাষায়
যামিনীর আগমন জগতে জানায়
ধীরে ধীরে পলে পলে বেলা ব'য়ে যায়।

২

গোপাল গোপাল ল'য়ে ফিরে গোশালায়
পাঁচনি আঘাতে দ্রুত গোকুল তাড়ায়
কভু নাচে নানা রঙ্গে বাঁশরী বাজায়
উচ্চৈঃস্বরে গায় কভু অন্য ভাষায়।

৩

আর একটুকু হ'লে শেষ হ'য়ে যায়
আজিকার কার্য্য তা'র—প্রাতে পুনরায়
আরম্ভিবে নব কর্ম্ম—এই যে আশায়
শ্রান্ত ক্লান্ত এক কার্য্য সারিছে ত্বরায়।

৪

অই যে অদূরে পল্লী গৃহ দেখা যায়
উল্লাসিত পথ তারা নবীন আশায়
ক্ষিপ্র পদে ত্রস্ত ভাবে পল্লী লক্ষ্য ধায়
লভিতে বিশ্রাম তথা আগত নিশায়।

৫

ব্যস্ততা ত্রস্ততা শুধু হেরি বিশ্বময়
যে যাহার নিজ নিজ কাজ সারি লয়
এক দিন এইরূপে ক্রমে গত হয়।

৬

দিনে দিনে এইরূপে আয়ু বেলা হায়
বহিয়া যেতেছে বৃথা—ক্রমে ডুবে যায়
জীবন মার্ত্তণ্ড অস্ত-কালের গুহায়
ভয়ঙ্করী মৃত্যু-নিশা ভীম বেগে ধায়।

৭

উন্মুক্ত সম্মুখে সদা মৃত্যুর গহ্বর
গভীর অতলস্পর্শ মহা ভয়ঙ্কর
পদে পদে পলে পলে পতনের ভয়
কখন কাহার ঘটে নাহিক নিশ্চয়।

৮

দেখিছে কজন তাহা বুঝিছে কজন ?
জীবনের মহা ব্রত করিছে সাধন
কেবা ? পথের সম্বল বাঁধিছে ক'জন
মৃত্যু-পথে লবে যবে করাল শমন।

৯

মোহান্ধ মানব ভুলি আশার ছলনে
কি ধন আজ্জলে হায় অসার জীবনে
অনিত্য লইয়া মত্ত ত্যজি নিত্য ধনে
কেটে যায় বেলাটুকু দেখনা নয়নে।

১০

এই বেলা জীবনের এক বেলা হায়
অনন্ত কালের স্রোতে ক্রমে মিশে যায়,
গত হলে নাহি পাবে ফিরে পুনরায়
হেলায় অমূল্য বেলা বৃথা বয়ে যায়।

শ্রীশিতিকণ্ঠ রায়

বেলা ব'য়ে যায় সন্ধ্যা হয় হয় হয়

দাসীর আত্মকাহিনী।

আমার দুঃখ কি কেহ শুনিবে? বড় বড় লোকের দুঃখের কাহিনী শুনিবার ও শুনাইবার লোক অনেক মেলে, কিন্তু গরীবের দুঃখ শুনিবার ও শুনাইবার লোক কোথায়? বড় বড় রাজ্যের শোচনীয় কাহিনী, রাজা রাজড়াদের দশা বিপর্য্যয়ের ইতিবৃত্ত লইয়া পৃথিবীতে কত ইতিহাস, কাব্য ও জীবনী রচিত হইয়াছে; কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর কথায় দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ-কথায় কে কবে মাথা ঘামাইয়াছে? ঘনান্ধকার-ছায়ার তলে জন্মেছি বলিয়া আমার মত দীন দরিদ্রের জীবন লইয়া কি একটী ক্ষুদ্র গল্পও রচিত হইতে পারে না? যে বিশ্বে সূর্য্য চন্দ্র আলো দেয়, সেখানে জোনাকীও ত জ্বলে যে সাগরে হাঙ্গর কুম্ভীর বাস করে, সে স্থানে ক্ষুদ্র মণ্ডূকও ত থাকে, যে বনে সিংহ ব্যাঘ্র গর্জ্জন করে, সে বনে ঝিল্লীও ত তান ধরে।

তবে আমারও ভরসা আছে। গোলাপ, মল্লিকা, যূথি, যাতি আদি সুগন্ধি ফুলের মাঝে কুন্দও থাকে, দয়াল কবিগণ বড় বড় সাগরের বড় বড় পর্ব্বতের বর্ণনাই করিয়া থাকেন, আবার ক্ষুদ্র সরসীর হিল্লোল, বন মৃগিকার নর্ত্তন, সেফালিকার ভূমিতলে পতনের বর্ণনা তাঁহাদিগকেই ত করিতে দেখা যায়।

আমি ক্ষুদ্র পল্লীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কন্যা। জাঁক করিয়া গর্ব্ব করিয়া বর্ণনা করিবার মত আমার কিছুই নাই। আমার গর্ব্ব করিবার মধ্যে ছিল, আমার পিতার কুল, বেশমালা, আমার পিতা মহাদেবের মত, আমার মাতা ভগবতীর তুল্য।

আমরা তিন ভগ্নী। জ্যেষ্ঠা মায়ের মত সত্যযুগের মানুষ, মধ্যমা আজকালের মত চালাক চতুর ও বুদ্ধিমতী। আর আমি—আমার দুর্ভাগ্যের কথাই ত শুনাইতে বসিয়াছি।

বাল্যকালেই আমার বিবাহ হয়। যাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইল—তাঁহাকে এক বার মাত্র শুভদৃষ্টিতে দেখিয়া লইলাম। সেই একটুকু দৃষ্টিপাতেই বুঝিলাম, স্বামী আমার মনের মতন হইয়াছে; কি দেখিলাম! কাম দেবের মত সুন্দর, সুপুরুষ, কার্ত্তিকের মত কি তাঁহার কষিতকনক কান্তি! দেখিয়া আমার আশা মিটিল না। সেই বালিকা বয়সেই আমার নারীহৃদয় সেই দেবতার পদে উৎসর্গীকৃত হইল। আমি কাল, এক প্রকার কুৎসিতা বলিলেই হয়। আমার ভাগ্যে এমন সুন্দর স্বামী!

আমি বালিকা বয়সে শিব-পূজা করিতাম। ঠাকুরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করিতাম, "হে ঠাকুর, আমার রাঙা বর দাও।" বাসর ঘরে ঘোমটার মধ্যে ভাল করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইলাম। এমন সুন্দর যে, তার প্রশংসা শুনিতে শুনিতে আমার কাণ ঝালাপালা হইল। মেয়েদের মুখে বার বার সে প্রশংসা বাস্তবিকই আমাকে একটু ঈর্ষান্বিত করিল। অত অল্প বয়সে এমন কেন হইল—তার উত্তর আমি কি দিব?

আমার ভয় ছিল, আমাকে তাঁর মনে

থাকিবে না। কিন্তু কি তাঁর সুন্দর চক্ষু—কি চক্ষুতেই তিনি আমাকে দেখিলেন, তাহা বলিতে পারি না। আমার রূপের আকর্ষণ ত কিছুই ছিল না, তবু তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার ভালবাসা আমি খুব বেশীই পাইলাম। তখন সুন্দর স্বামী পাইয়া গর্ব্বে গৌরবে আমার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। হৃদয় কুসুম এক অজানা আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া দুলিতে থাকিল।

আমার শ্বশুর-শাশুড়ী নাই। স্নেহ-যত্ন করিতে এক আমার স্বামী। কাজেই শ্বশুর-ঘর আর আমার করা হইল না। আমার বড় সাধ ছিল শ্বশুর-ঘর করি—বিধাতা সে সাধ অপূর্ণই রাখিলেন। আমি বাপের বাড়ীতে থাকিয়া গেলাম। আমার পিতা কলিকাতার এক ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিত করিতেন, এবং দুই একটী ছাত্রের গৃহ শিক্ষকতাও করিতেন। তাহাতেই এক প্রকার সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। আর আমার স্বামী কলিকাতার কোন অফিসের কেরাণী। শনিবার শনিবার আমাকে দেখা দিতে আসিতেন। আমার মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যে, আমাকে তিনি দেখিতে আসিবেন।

স্বামী আমার মত কাল কুৎসিতাকে তাঁর চরণতলে স্থান দিলেন। আমি কৃতার্থা হইলাম। আদরে যত্নে সোহাগে ভালবাসায় আমার দিনগুলি বড়ই সুখে কাটিতে লাগিল। কখন তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া, কখন তাঁহার কাঁধে মুখ লুকাইয়া, কখন বা তাঁহার সেই সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া আমার কিশোর বয়স কাটিয়া গেল।

বলিয়াছি আমার স্বামী কলিকাতায় চাকুরী করিতেন। আমার বাপ-মা এইখানে থাকিয়া অফিস করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারও বাপ-মা নাই। বাড়ীতে আদর যত্ন করিবার কেহ নাই বলিলেই হয়। তিনি আমার বাপ মার অনুরোধে আর আমার উপর আকর্ষণে তাহাই স্বীকার করিলেন।

তিনি রহিয়া গেলেন। লোকের চক্ষুতে তিনি ঘর-জামাই বলিয়া প্রথম প্রথম একটু মনমরা থাকিতেন। কিন্তু আমিই শেষে বুঝাইলাম যে, তুমি ত অক্ষম নও, তুমি ত চাকুরী কর। তোমার নিজের রোজগারে আমাদের দুটো পেট স্বচ্ছন্দেই চলিয়া যাইবে। মেঘ কাটিয়া গেল। আমার ভালবাসায়, সেবায়, মায়ের আদরে যত্নে তাঁহার মনের ভাব কাটিয়া গেল। সুন্দর মুখে হাসির জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল।

আমার মা—আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতেছি না, তিনি রূপে গুণে ভগবতীর মত ছিলেন। আমার একটি মাত্র ভাই, আমা অপেক্ষা ৫।৬ বৎসরের ছোট। আমার স্বামী তাঁর বড় ছেলের মত ছিলেন। আমার চেয়ে, আমার ভাইয়ের চেয়ে তাঁহাকেই অধিক আদর যত্ন করিতেন। আমার ভাই মাতার যেন ছোট ছেলে। লোকে এই রকম ভাবিত।

আমার স্বামী বড়ই খরচে ছিলেন। যাহা রোজগার করিতেন, তাহার অনেকাংশই বাজে খরচ করিয়া ফেলিতেন। খাওয়া পরা বাবু-

য়ানির দিকে তাঁর দৃষ্টি বড় বেশী ছিল। প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্ বাজার হইতে ভাল ভাল মাছ কিনিয়া আনিতেন, ভাল ভাল ফল আনিয়া হাজির করিতেন। পয়সা না থাকিলেও ধার করিয়াও ভাল ভাল খাবার কিনিয়া বাড়ীতে আসিতেন। মদ বেশ্যা—এ সকল দোষ তাঁহার অতি বড় শত্রুতেও কেহ দিতে পারে না। প্রত্যহ চায়ের দোকানে ৩।৪ বাটী চা ও কেক্ বিস্কুট না হইলে তাঁহার আদৌ চলিত না। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের ছেলের ধাতে ও সব সহিবে কেন ?

তাঁর কি কুবুদ্ধি জন্মিল, তিনি ঘোড়দৌড় খেলিতে গেলেন, গরীবের ঘোড়া রোগে কখন সুফল ফলে না। ভিতরে ভিতরে তাঁর অনেক টাকা ঋণ হইয়া গেল। কাবুলওয়ালার নিকট ঋণ; ছয় মাস যাইতে না যাইতে সুদে আসলে টাকা দ্বিগুণ বাড়িল। এক কাবুলে যখন পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন অন্য কাবুলের নিকট টাকা ধার করিয়া পূর্ব্বোক্ত কাবুলির টাকা শোধ করা হইতে লাগিল। এইরূপে চারিদিকে ধার করিয়া স্বামী আমার বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। মুখ ম্লান, দৃষ্টি উদাস, মন গাঢ় চিন্তাভারে আচ্ছন্ন। তাহার সে সময়কার অবস্থা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি গায়ের গহনা খুলিয়া দিয়া দেনা শোধ করিয়া দিলাম।

এখন মনে হয় আমি যদি গোড়া হইতে একটু বেশী সাবধান হইতাম, বেশী চাপা চাপি করিয়া ফিরাইতে চেষ্টা করিতাম, বাবা মাকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিতাম, তাহা হইলে হয়ত আমার ভাগ্যে এমনটী ঘটিত না। ভাগ্যে যাহা আছে কে খণ্ডাইবে, নিয়তির মুখ কে রোধ করিবে ?

স্বামীকে অনুযোগ করিব কি তিরস্কার করিব—সে শক্তি আমার ছিল না। আমি তাঁহার মুখের আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া অবুঝের মত হইলাম। তাঁহার নিষেধ-বাণী প্রাণান্তে প্রকাশ করিলাম না।

স্বামী-সেবার ফলরূপে আমি একটি পুত্র সন্তান লাভ করিলাম, ছেলেটি যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি তাঁহারই মত সুন্দর হইয়াছিল, আমি আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম, সেই সোনার পুত্তলি লইয়া নূতন খেলা আরম্ভ করিলাম, সেই সুখের খেলার মাঝখানে আবার শুনিলাম স্বামী দেনার দায়ে ডুবিয়া আছেন, রক্তবীজের ঝাড়ের মত সে দেনা বৃদ্ধিই পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সময়েও যদি তিনি সমস্ত দেনার কথা বলিতেন,তবেও বোধ করি সুরাহা হইত, আমার মা লুকাইয়া লুকাইয়া দেনা শোধ করিতে লাগিলেন। এক এক করিয়া দেনাও ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

এক দিন দেখি, বাড়ীর সম্মুখে কাবুলিরা ওত পাতিয়া বসিয়া আছে। আমার স্বামীও পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। অনেক রাত্রে আফিস হইতে বাড়ী আসিতে লাগিলেন, প্রত্যুষেই তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে আফিসে রওনা হইতেন। উদ্দেশ্য কাবুলীর নিকট আত্মরক্ষা।

আমার জ্যাঠা মহাশয়ের দুই পুত্রও মধ্যে

মধ্যে কাবুলীর নিকট ধার করিতেন, তার সময়ে-সময়ে জ্যাঠা মহাশয়কে সেই দেনাও শোধ করিতে হইত। কিন্তু আমার ভাগ্যের দোষে ঐ ঋণ কাল-সর্প হইয়া এমন দংশন করিল যে, তাহার দংশন জ্বালায় আজও আমি জ্বলিতেছি। বিনা বন্ধকে শুধু হাতে অধিক হারে সুদ দিয়া আমাদের গাঁয়ের লোকরাই কাবুলীর নিকট টাকা ধার করে; কিন্তু কলিকাতার ভদ্রলোকেও এইরূপে টাকা ধার করিতে লজ্জা বোধ করে না। কাবুলিরা গরীবের পাড়াগাঁয়ে বাড়ীতে আসিয়া মেয়ে লোকদের অপমান করে, দেনদারকে দুই চারি ঘা লাটীর বাড়ী দেয়, বাড়ীর সম্মুখে দিন রাত্রি পাহারা স্বরূপ দাঁড়াইয়া থাকে।

আমার স্বামীর উপর আমার মায়ের প্রাণ ঢালাই ছিল, তিনি ঋণ শোধের জন্য মায়ের গহণা দিতে লাগিলেন, একদিন চুপি চুপি হাতের চুড়ী পর্য্যন্ত জামাইকে কাটিয়া লইতে বলিলেন। এইরূপে মা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, আপনাদিগকে ঋণে ডুবাইয়া আমার স্বামীকে রক্ষা করিলেন। আমার পিতাকে সমস্ত ব্যাপারই লুকান হইত। তিনি এ সব ব্যাপারের কিছু কিছু জানিতে পারিয়া মাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মা আমার জীবনে কখন বকুনি খান নাই, আজ বকুনি খাইয়া মরমে মরিয়া গেলেন। পাড়ার লোকে আত্মীয় স্বজন সকলেই এজন্য মাকে গঞ্জনা দিতে লাগিলেন।

মা কাঁদিতেন, আর বলিতেন, "জামাই আমার মুখে বেল্লায় দেনা করে নাই। তাহার মা নাই, আমিই এখন তাহার মা, আমি শোধ না করিলে সে কি জেলে যাইবে? আমি থাকিতে তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে কোন্ মুখে ছাড়িয়া দিব।" সকলে বাবাকে পরামর্শ দিলেন "মেয়ে জামাইকে তফাত করিয়া দাও।"

মা শুনিতেন আর কাঁদিতেন, "আমি এতটুকু বয়স হইতে মানুষ করিয়া মেয়ে জামাইকে কাহার হাতে দিব? আমি না তাকাইলে কে তাদের মুখের পানে তাকাইবে, আজ আমার ছেলে হইলে আমি কি করিতাম? এই বলিয়া মা আমাদের কাছ ছাড়া করিতে দিলেন না।

লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে তিরস্কারে মা মন-মরা হইয়া রহিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া মার গৌর অঙ্গ আধখানা ও বিবর্ণ হইয়া গেল, চক্ষে কালী পড়িল। মা জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করিলেন—"আমাকে কোলে তুলিয়া লও, আর যে আমি সহিতে পারি না। জগদম্বা সকলক্ষী মায়ের প্রার্থনা শুনিলেন।

একদিন অকস্মাৎ কাল আসিয়া মাকে ধরিল। ওলাওঠা আসিয়া মাকে আক্রমণ করিল। কালে ধরিয়াছে, চিকিৎসার কি করিবে? সাধামত চিকিৎসায় কোন ফলই ফলিল না। মা মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া! উঃ, সে কি দিন! আমি মার পায়ের তলায় পড়িয়া আছি। আমার স্বামী মায়ের মুখের উপর পড়িয়া শতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, মা আমার তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র রাখিয়া সজ্ঞানে প্রাণ বিসর্জ্জন করতঃ স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সতীলক্ষ্মী হিরন্ময় রথে চড়িয়া

সত্যকুঞ্জ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

মায়ের দাহ শেষ হইতে না হইতে বাবা আমার ভাইটিকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ভাইয়ের ভেদ বমী আরম্ভ হইয়াছে। প্রতাপ মজুমদার আসিয়া চিকিৎসার ভার লইলেন। যমের সহিত দিন রাত যুদ্ধ. এমন সময়ে আমার স্বামীকেও সেই কাল রোগে ধরিল। চিকিৎসায় আমার স্বামী ক্রমে আরোগ্যের পথে উঠিলেন। ভায়েরও বাঁচিবার আশা দেখা দিয়াছে।

অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাইবে? আমার স্বামী অসুখ হইতে উঠিয়া পেটের দোষের জন্য কাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অল্প পরিমাণে অহিফেন কিনিয়া খাইলেন। চায়ের দোকানে গিয়া ৩।৪ বাটি চা ও বিস্কুট প্রভৃতি খাইয়া আসিলেন। পেট চুঁইয়া গিয়াছিল—তাহার উপর অহিফেন ও চা বিষের কার্য্য করিল। রোগ ফিরিয়া দাঁড়াইল। আহত শত্রুর মত সে মাথা তুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেই অত্যাচারপ্রাপ্ত রোগ পদাহত সর্পের মত তীব্র-দংশনে আমার স্বামীর জীবন লীলা শেষ করিয়া ছিল।

আমার সব ফুরাইল। জীবনের সাধ-আহ্লাদ সুখ-শান্তি দুঃখ-শোক তাঁর সঙ্গে সবই গেল। আমি এক্ষণে অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠের মত। হায়, আমি মরিলাম না কেন? দেহের বন্ধন লগ্ন হইয়া রহিতেছে, মন হুহু করিতেছে, সে কি দুঃখ, কি জ্বালা, আমার অন্তরাত্মা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রাত্রিদিন মগ্ন হইয়াই আছে।

আমার সুখের ঘর আগুনে পুড়িয়া গেল। আমার সাধের সপ্তচূড় মন্দির ধূলিসাৎ হইয়া গেল। আমার সব গেল! আমার সেই সোনার ঠাকুর, ভক্তমাংসময় হৃদয় সমন্বিত নারীজীবনের দেবতা আমার স্বামী আজ কোথায়? এত অল্প বয়সে অসহায়া আমার পানে না চাহিয়া স্নেহের পুত্তলির পানে না দেখিয়া তিনি কোন্ দেশে গেলেন?

তার পর আমি এখনও আছি। একমাত্র ভাইয়ের অভিভাবিকা, বৃদ্ধ পিতার আশ্রয়স্থলী হইয়া আমি এখনও আছি। পিতা ও ভ্রাতা দুইই অসহায়। একজন বৃদ্ধ, অপর জন বালক।

আধপোড়া দেহ, আধমরা মন, আধখানা প্রাণ লইয়া আমি সংসার চালাইতেছি। স্বামী দেবতার বংশের দুলাল, স্নেহপুত্তলি ছেলেটিকে মানুষ করিতেছি। স্বামিন্, প্রভু, দেবতা, যতদিন ইহাদের আমাকে আবশ্যক ততদিন তোমার চরণে মতি রাখিয়া ব্রহ্ম-চারিণীর মত যেন সংসার-ধর্ম্ম পালন করিয়া যাইতে পারি। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন ধর্ম্মে মতি থাকে, ভগবানে বিশ্বাস থাকে, জীবনে আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ হয়। আমার এই কার্য্য শেষ হইলে দেখিবেন, যেন আমাকে আপনার কাছে টানিয়া লইতে ভুলিবেন না, যেন শ্রীচরণের দাসীকে পরলোকেও দাসী করিয়া লইতে না ভুলেন্।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

অক্ষর ও ভাষার মৌলিকতা।

এক বা ততোধিক বর্ণ বা অক্ষর-সমষ্টির

ধ্বনির নাম ভাষা। অক্ষর সকল বাগিন্দ্রিয় হইতে উচ্চারিত হয়, সুতরাং উক্ত বাগিন্দ্রিয়— ভাষার জন্মভূমি। জীব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই জীবের অশেষ মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময় স্রষ্টার ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি। যে দিন জীব, সেইদিনই বর্ণ ও তজ্জাত ভাষার জন্ম। প্রভূত করুণা-নিদান বিশ্বক্রীড়াকুশল পরমেশ্বরের জীব সৃষ্টির ইচ্ছামুহূর্ত্তে,—যখন বিশ্বের অস্তিত্ব ও তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে একটি কালময়ী যবনিকার আবরণ ছিল, যখন। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের বিকাশ ছিল না, মায়া প্রপঞ্চের প্রসারতা ছিল না, তখন যে ভাষাও ছিল না ইহা স্বতঃপরতঃ অনুমান করা যাইতে পারে। একদিকে যেমন জীব মৌলিক, কৃত্রিম নয়, তেমনি অন্য-দিকে বর্ণ ও তজ্জাত ভাষাও মৌলিক—কৃত্রিম নয়। ক্রীড়নক জীবগ্রামকে লইয়াই জীব-স্রষ্টার ক্রীড়া! একটিকে লইয়া ক্রীড়া অপেক্ষা একাধিক বস্তু ক্রীড়া-সামগ্রী হইলে ক্রীড়ার পূর্ণতা ও তজ্জনিত আনন্দ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়। এই জন্যই জীবের প্রথম ও প্রধান আবশ্যক বর্ণ ও ভাষার সৃষ্টি। জীব নানা, ভাষাও নানা। জীবের সহিত, এক দেহ ব্যতীত, ভাষার সম্বন্ধ যত নিকট গৌণ-ভাবে অন্যের সহিত সে সম্বন্ধ থাকিলেও, মুখ্যভাবে বুঝি তত আর কাহারও সহিত নয়।

জীবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণ ও ভাষার সৃষ্টি। জীবের কথা কহা ত চাই নতুবা ক্রীড়া অপূর্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু কি করিবে? এই খানেই অক্ষর সমষ্টির দ্বারা ভাষার সজ্জা! সেই সজ্জাই ভাষার মধ্যে নিহিত আছে। সেই গুলি লইয়া ভাষা, সেগুলি ছাড়া ভাষা হইতে পারে না, আবার ভাষাকে ছাড়িয়াও সেগুলির অস্তিত্ব থাকে না। বহু জীবের বহু ভাষার মধ্যে মানবিক ভাষাই শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন জীবশ্রেষ্ঠ মানবের প্রধানতম সামগ্রী। স্রষ্টার মঙ্গলময় উদ্দেশ্য যে কি—তাহা বুঝা যায় না, তবে তিনি তাঁহার সৃষ্টিরূপ ক্রীড়ামণ্ডপে মানবকেই সকল প্রকারে শ্রেষ্ঠ করিয়াই তিনি ক্রীড়াপর। এই মানবই কার্য্যগুণে দেবতা, অসুর, নর, নাগ প্রভৃতি রূপে তাঁহার অদ্ভুত সৃষ্টিচাতুর্য্য ও অনন্ত ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করিতেছে। তিনি সতত অদৃশ্য থাকিয়া মঙ্গলময় ইচ্ছা ও করুণা মাখান হস্তে এক সূত্রে সকলকে বাঁধিয়া চালা-ইয়া বসাইয়া শোয়াইয়া নাচাইয়া ইত্যাদি কার্য্য পরম্পরায় আপনার মহদুদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন।

তাঁহার প্রদত্ত মানবের এই প্রাধান্যের সহিত ভাষারও প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মানবের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ইহা কতক-গুলি বর্ণ সমষ্টি। সে বর্ণগুলির ওতপ্রোত সাজাই ভাষা। সেগুলি ব্যতীত ভাষা আর কোন বর্ণকে কখন আশ্রয় করিতে পারে নাই আর পারিবেও না, কেন না মানবের মুখ-গহ্বরের যন্ত্র বিশেষ হইতে সেরূপ অন্য কোন অক্ষরের সৃষ্টি নাই। ইহাই মানবিক অক্ষর বা ভাষার মৌলিকতা! এই মৌলিকতার নিদর্শনই সংস্কৃত ভাষা। ইহাই ভাষার আদিম সুতরাং মৌলিক।

ভাষাতে যতগুলি বর্ণ বা অক্ষর আছে অর্থাৎ

বাগিন্দ্রিয় হইতে যে অক্ষর গুলি বহির্গত হয় সেই গুলিই পৃথক রূপে সংস্কৃত ভাষায় বর্ণরূপে বর্ত্তমান। সেই সংস্কৃত ভাষা ভাঙ্গিয়াই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃত ভাষার প্রথম বর্ণ অ—তাহার পর আ—প্রভৃতিস্বর, এগুলি নিরপেক্ষ—তাহার পর ইহাদের এক একটির সাহায্যে 'ক' প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণের উৎপত্তি; প্রথম 'অ' প্রভৃতি বর্ণ গুলি কণ্ঠস্বর-বহির্গত বলিয়াই বোধ হয় তাহারা স্বর (১) এবং সেই গুলির মিশ্রণে 'ক' প্রভৃতি অক্ষরবর্ণ গুলির উৎপত্তি বলিয়াই বোধ হয় তাহারা ব্যঞ্জন বা মিশ্র।

পৃথিবীতে দেশ বা প্রদেশ ভেদে মানবের নানা জাতি। সুতরাং তাহারা আপনাপন কণ্ঠস্বরকে নানা ভাবে বহির্গত করিয়া থাকে, কাজেই তাহা ভাষারূপ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাগিন্দ্রিয় দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াই মানুষে ক্ষান্ত বা সন্তুষ্ট না হওয়ায় দেখা যায় ক্রমে লিখনের সৃষ্টি। কথা কহার সঙ্গে লিখনের নিকট সম্বন্ধ! এই লিখন নিজের অভিমত ভাষাকে অপরের বোধগম্য করাইবার দর্পণস্বরূপ। সুতরাং এই লিখন-সৃষ্টিকে ভাষার সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলা যায়। 'এরূপ' 'সেরূপ' 'ওরূপ' করিয়া বর্ণ, শব্দ, বাক্যবিন্যাস করিলেই 'ইহা' 'তাহা' 'উহা' বুঝা যাইবে, ইহাই লিখনের উদ্দেশ্য। লিখনের ভঙ্গী, কৌশলবিন্যাস প্রভৃতি দেখিলে ইহা ভিন্ন আর কিছু বুঝা যায় না। মানব-বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সহিত যে এরূপ লিখনের সৃষ্টি, তাহা দ্বারাই উপলব্ধি হয়। পৃথিবীর অনেক স্থানে এখনও এমন অনেক মানব আছে যাহারা কথা কহিতে পারে কিন্তু দূরস্থ কোন লোককে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে তাহাদিগকে তাহার নিকট যাইতে হয়। এই অভাব দূরীকরণই লিখন। কিন্তু সেই সমস্ত মানব এখনও এরূপ বর্ণ বা শব্দ বিন্যাসের উপযুক্ততা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই লিখনের সাঙ্কেতিক চিহ্ন লইয়াই ভাষার মৌলিকতা প্রকাশিত হয়। এই চিহ্ন নানা মানবের হস্তে তাহাদের ইচ্ছায় বা বুদ্ধি চাতুর্য্যে ছাঁদে গঠিত। কিন্তু দেখা যায়, এক সংস্কৃত বর্ণ ভিন্ন সকল জাতির সকল বর্ণই যেন মানবের ইচ্ছায় তাহার ক্রমশিক্ষার ফল। ইহাতে তাহার নিজের বা সৃষ্টির মৌলিকতার সঙ্গে সে বর্ণাবলীর কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সংস্কৃতের 'অ' 'আ' প্রভৃতি স্বর ও 'ক' 'খ' প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণ গুলির ঐ মৌলিকতা একচেটিয়া।

প্রথমতঃ সদ্যঃপ্রসূত শিশুর কণ্ঠস্বর প্রথম 'অ' ভিন্ন কিছুই নয়। লক্ষ্য করিলে বুঝা যাব যে, তাহার পরই 'আ' 'হ' প্রভৃতি বর্ণ গুলি তাহার বাগিন্দ্রিয় উচ্চারণ করে। ক্রমে এই গুলির আয়ত্ত হইলে তবে উক্ত 'অ'এর সাহায্যে 'ক' প্রভৃতি বর্ণের প্রকাশ। ইহাতেই বুঝা যায় যে, উচ্চারিত সমস্ত বর্ণই প্রথম 'অ' এর পর আ প্রভৃতি অক্ষ স্বরের বিকার। মানব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যেমন তাহার বাগিন্দ্রিয় গুলির সৃষ্টি, উক্ত যন্ত্র হইতে প্রথম 'অ' 'আ' প্রভৃতিস্বর ও

(১) উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ কণ্ঠধ্বনির নাম স্বর। (প্রকৃতিবাদ অভিধান)

পরে 'ক' 'খ' প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণগুলির বিকাশ পায়,—বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত ভাষার সৃষ্টি ও উন্নতি ঘটিল, অমনি ঐশীশক্তির আনুকূল্যে ঐ বাগিন্দ্রিয় নিঃসৃত বর্ণগুলির আদিম হইতে পর পর গুলি ধরিয়া ধরিয়া তবে 'অ' 'আ' প্রভৃতির আদিম গুলি এবং 'ক' 'খ' প্রভৃতির আদ্যম গুলিকে পর পর সাজাইয়া লিখনের সৃষ্টি হইল, এ সৃষ্টির মূলে ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের ইচ্ছা বা কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই। ইহা মৌলিক, পৃথিবীর যত জাতি আছে, বোধ হয়, 'অ' 'আ' ও 'ক' 'খ' প্রভৃতি আদিম ও অন্তিম বর্ণগুলি ছাড়া কেহই অন্য কোন বর্ণ লইয়া কথা কহিতে পারে না।—অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রতি কথার মূলে এ গুলির একটি বা একাধিক বর্ণ আছেই আছে। ভাষা বিশেষের মধ্যে একটি বর্ণ বা শব্দ উচ্চারণ করিলে অর্থাৎ কথা কহিলে কণ্ঠ তালু দন্ত ওষ্ঠ প্রভৃতি মুখগহ্বরের যন্ত্রগুলি একটি বা একাধিকটি স্পর্শ করিয়া সংস্কৃতের কোন একটি বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণ হইবেই। কিন্তু এক সংস্কৃত ভিন্ন সকল ভাষার আদিম হইতে আন্তম পর্য্যন্ত ক্রমিক অক্ষর গুলি বাগিন্দ্রিয় উচ্চারিত বর্ণগ্রামের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া সৃষ্ট নয়।

সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষাভাষী যাহারা লেখাপড়া জানেন, তাঁহাদের কথার উপাদান ও লেখার উপাদান যেমন এক—যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না, অক্ষরের সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারাও যখন কথা কয় তখন 'অ' 'আ' প্রভৃতি স্বর ও 'ক' 'খ' প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণাবলীর দ্বারা গঠিত শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাহা হইলেই কখনও লিখনের উপাদান এক হইল। অন্য ভাষাভাষী যাঁহারা লেখাপড়া জানেন তাঁহাদের কথনের উপাদান 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' কিন্তু লিখনের উপাদান A B. প্রভৃতি ভাষা বিশেষে সাঙ্কেতিক চিহ্ন—কথনের উপাদানের সহিত ইহাদের কোন সামঞ্জস্য নাই। আবার যাহারা লেখাপড়া জানে না তাহাদের কথনের উপাদান 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' প্রভৃতি লিখনের উপাদানের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল মুখে সেই ভাষায় কথা কয় মাত্র—তাহাতে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি গৌণ ভাবে বহির্গত হয়—মূল অর্থাৎ মুখ্যভাবে তাহারা বাগিন্দ্রিয় হইতে 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' প্রভৃতিকে উচ্চারণ করে। একজন ইংরেজ Tall বলিল—সে সংস্কৃতের 'ট'এর উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা স্পর্শ করিয়া 'ট' উচ্চারণ করিবেই। এ স্থানে মুখ-গহ্বরের মধ্যে ইংরাজী বর্ণ Tএর উচ্চারণ স্থান নাই বলিয়াই এইরূপ হয়—অন্যান্য ভাষা ও অক্ষর সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়া থাকে। অতএব সকল ভাষারই সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা অক্ষরাবলীর যোগেই সেই ভাষাভাষী লোক লিখিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করে। সেই বর্ণগুলির সহিত বাগিন্দ্রিয় বিনির্গত বর্ণ বা শব্দ বিশেষের কাহারও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার মৌলিকতার বিচার পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এখন এগুলির সহিত মানবের বাগিন্দ্রিয় যন্ত্রের কত দূর নিকট সম্বন্ধ তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

কথা কহিবার সময় যে সমস্ত বর্ণ বাগিন্দ্রিয়

হইতে উচ্চারিত হয়, সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলির প্রত্যেকটিই সেইগুলির কোন না কোনটী সেই মুখ-গহ্বরের অন্তর্গত কণ্ঠ-জিহ্বা প্রভৃতি কোন না কোন যন্ত্র দ্বারা উচ্চারিত হইবেই। কণ্ঠের সাহায্য না লইয়া কি সংস্কৃতজ্ঞ, কি অন্য কোন ভাষাভাষী কেহই 'অ' 'আ' 'ই' বর্ণের উচ্চারণ করিতে পারিবে না। জিহ্বাগ্র দন্তে, ওষ্ঠে অধর স্পর্শ না করিলে কখনই 'ত'বর্গ বা 'প'বর্গ উচ্চারিত হইবে না। এইরূপে প্রত্যেক বর্ণেরই যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা এক সংস্কৃত বর্ণাবলীরই আছে। পরন্তু সমস্ত মানবজাতি এ সম্বন্ধে বদ্ধ।

ইংরাজী ভাষায় 'এ' 'বি' প্রভৃতি ছাব্বিশটী অক্ষর। ইহার একটীর উচ্চারণও মুখ-গহ্বরের কোন যন্ত্রসাপেক্ষ নহে। অথচ ঐ ভাষাভাষী প্রত্যেকেরই ঐ যন্ত্রগুলির সাহায্য ভিন্ন কথা কহিবার শক্তি নাই। নিজের মনোভাব অপরকে জানাইবার জন্য লিখন একটা নিয়ম বা শৃঙ্খলা। 'এই বলিলে, এই হয়' এই মাত্র। সংস্কৃত ভাষার বর্ণ সমূহের ন্যায় এরূপ মুখগহ্বরের মধ্যস্থ যন্ত্রভেদে বর্ণের উচ্চারণ ও তদনুসারে বর্ণ-বিন্যাসের সহিত লিখনের সামঞ্জস্য এবং মানবের জন্মের পর হইতেই ঐ সমস্ত বর্ণের অর্থাৎ প্রথম 'অ' বর্ণ হইবে, 'অ' এর উচ্চারণ আর কোন ভাষায় বর্ণ বা অক্ষরে দেখা যায় না। অতএব সংস্কৃত ভাষাই মৌলিক, সংস্কৃতের ভাঙ্গা ভাষা বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষাও এই মৌলিকতা লাভ করিয়াছে।

ইংরাজী ভাষার প্রথম অক্ষর 'এ' আর সংস্কৃতের স্বর বর্ণ 'এ' একস্থান হইতে উচ্চারিত হয় ইত্যাদি। সকল ভাষাভাষী লোকের মুখ হইতে 'এ' বর্ণ বহির্গত হইবার সময় এই একই যন্ত্র হইতে উচ্চারিত হইবে। কিন্তু সদ্যঃপ্রসূত ইংরাজ-শিশুর উচ্চারিত ভাষা, কখন 'এ' হইবে না, সংস্কৃত বর্ণের 'অ' হইবে। কিন্তু সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষাভাষী সদ্যঃপ্রসূত শিশুর মুখ হইতে যেমন 'অ' বর্ণ বাহির হয়, তেমনি তাহার ভাষার আদিম অক্ষর 'অ';—এইরূপ উচ্চারিত বর্ণ বা অক্ষরাবলীর সামঞ্জস্য থাকায় সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষা ও তাহার লিখন-প্রণালী মৌলিক।

সংস্কৃত ভাষা দেব-ভাষা, ভারতীয় পূজ্য মনীষিগণের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত সত্য ও প্রত্যক্ষ ফলনিচয় এই দেব-ভাষায় প্রকটিত। তাঁহাদের বেদ এই দেব-ভাষায় অভিব্যক্ত। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই বেদ ও তাহার ভাষা যে মৌলিক—

ওঁকার চার্থ শব্দশ্চ দ্বাবেত ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতং তেন মাঙ্গলিকা বুভৌ॥*

ভাগবত।

এই বাসুদেবের মুখামৃত নিত্য সত্য শ্লোক তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। তাহা হইলেই ঈশ্বররূপী ওঁকার প্রথম—তখন আর কিছুই নাই। তারপর 'অথ' শব্দের 'অ' প্রথম জীবসৃষ্টির সহিতই তাহার মুখ-গহ্বরের যন্ত্র সমূহের আদি ও শ্রেষ্ঠ যন্ত্র কণ্ঠ হইতে সৃষ্ট।

এই বেদোক্ত ভাষাতেই ভগবানের পূজার বৈদিক মন্ত্র স্তোত্র ইত্যাদি পরিপূর্ণ। সংস্কৃত

* সৃষ্টির প্রথম ওঁকার ও 'অথ' শব্দ ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়; এই নিমিত্ত এই দুই শব্দ মাঙ্গলিক।

ভাষাভাষী ভারতীয় মানব হিন্দু নামে অভিহিত—আর হিন্দুর ভাষা সংস্কৃত নামে প্রখ্যাত এ মৌলিকতা নিবন্ধন হিন্দুর ভাষা এত মিষ্ট—এত আদৃত। এই জনাই বর্ণ বা শব্দ উচ্চারণ সময়ে যাহার জিহ্বাগ্র 'ত' বর্ণ উচ্চারণের স্থান দন্তমূল স্পর্শ করিতে না পারিয়া মূর্দ্ধা স্পর্শ করে—সে 'ত' স্থানে 'ট' এর উচ্চারণ করিয়া ফেলে। সংস্কৃত বর্ণ সকল যে বাগীন্দ্রিয় উচ্চারিত বর্ণ সমূহের অনুরূপ, ইহাতেই তাহাদের মৌলিকতা প্রমাণিত হইতেছে। এই জন্য এই ভাষার দ্বারা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্য্য সকল চিরকাল পরিসমাপ্ত হইয়া আসিতেছে। এই জনাই বিজাতীয় সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ও অতিশয় যত্ন ও আগ্রহের সহিত এ ভাষাকে শিক্ষা করিয়া অতল সিন্ধু হইতে রত্নাবলী উদ্ধার করিয়া যশস্বী হইতেছেন। সৃষ্টির সহিত, স্বভাবের সহিত, মানবের বাক্-শক্তির সহিত তাঁহারা এ ভাষার মৌলিকতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন।

সৃষ্টির আদি হইতে মানব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় সকল যেমন সৃষ্ট হইয়াছে সেই, মুহূর্ত্তে করুণানিদান পরমেশ্বর তাহাকে কথা কহাইবার জন্য তাহার মুখ-বিবরে এরূপ কতকগুলি স্থানের সৃষ্টি করিয়াছেন, মনের আবশ্যক মত সেইগুলি স্ব স্ব কার্য্য সাধনক্ষম হইতে পারিবে অর্থাৎ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবে—ইহাই সৃষ্টির আদি রহস্য। সৃষ্টির আদিতে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর একা। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা একবারেই। তাঁহার সেই অদ্বিতীয় কার্য্যাবলী তাঁহার অনন্ত অসীম শক্তিবলে আবহমান কাল সমভাবে চলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সার্ব্বজনীন ও বিশ্বপালন শক্তির পরিচয় দিতেছে। ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত সৃষ্ট বস্তু ও প্রাণীর রক্ষা ও পালন-কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি একা বা তাঁহার উক্ত শক্তি সমর্থ; আবার সমস্ত বস্তুও যখন তাঁহার সৃষ্ট, তখন সেই সামর্থ্য প্রত্যেকেই বর্ত্তমান। এই বর্ত্তমানতার অংশ বিশেষই মানবের বাগীন্দ্রিয় বিনির্গত কথা কহিবার শক্তি। তাঁহার সৃষ্টির সঙ্গেই এই শক্তির উন্মেষ! মানব জন্মিবে, পালিত ও বর্দ্ধিত হইবে, তাহার এ ইচ্ছাও যেমন,সে বর্ণ-বিন্যাসের দ্বারা কথা কহিবে—এ ইচ্ছাও তেমনি—অর্থাৎ কথা কহিতে মানুষের যে যে জিনিষের আবশ্যক, তাহা তিনি সৃষ্টির সঙ্গেই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর অক্ষরযোগে তাঁহার লিখনের চিন্তা—মানুষকে লিখিয়া মনের ভাব অপরকে জানান আবশ্যক, সে কার্য্যের জন্য সে কোথায় যাইবে? কাহার আবার সাহায্য লইবে? তিনি ও তাঁহার শক্তি নিরপেক্ষ। তাঁহার সৃষ্ট জীবও তাঁহার শক্তিতে কাজ করিতে পারে—জীবের খাদ্য পানীয় আবশ্যক—সে, সে ইচ্ছা না করিলেও ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাহাকে সেই সেই কার্য্যে নিয়োগ করেই। দেহের বর্দ্ধন ও পুষ্টি, বৃক্ষ-লতার রসাকর্ষণ ইত্যাদি প্রত্যেক প্রাকৃতিক কার্য্য তাঁহার সেই শক্তিতে শক্তিমান। সুতরাং সেই শক্তিতে কথা কহার উপাদান হইতেই বর্ণ সমষ্টির উৎপত্তি। এই কথা ও বর্ণ হইতেই বেদের সৃষ্টি,

ইহা ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথম উৎপন্ন হয়। তদনুসারে মানবের মুখ-গহ্বরের যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া তাহার কথা ও তাহার উপাদানগুলিকে 'অ' 'আ'—'ক' 'খ' প্রভৃতি অক্ষররূপে সাজাইয়া রাখিয়া—এ কার্য্যের জন্য যাহাতে মানবকে পরমুখাপেক্ষী হইতে না হয়, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই 'ক' হইতে সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণ শক্তি-প্রকৃতি অর্থাৎ জড় শক্তিতে 'অ' হইতে সমস্ত স্বরবর্ণ শক্তিগুলি পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্যরূপে তিনি অধ্যাসীন। অতএব ব্যঞ্জন বর্ণগুলি বাচক ও স্বরবর্ণগুলি বাচ্য রূপে—এই প্রকৃতি-পুরুষ সম্মিলনই জীব-সৃষ্টি অর্থাৎ জড় জগতের উপর চৈতন্যের আবেশ।

জীব-দেহ কতকগুলি জড় পদার্থের সমষ্টি; এই সকলকে এক করিয়া চৈতন্যরূপী তাহাতে অধিষ্ঠিত, তাই জীব চৈতন্যবিশিষ্ট। এই শক্তির অংশই ক্রিয়াবিশিষ্ট জীবের মধ্যে কার্যাকর, ইহাই বর্ণ বা অক্ষরাবলীর উৎপত্তি-শক্তি বা তাহাদের সমষ্টি ভাষা-শক্তি। অতএব মানব-সৃষ্টির আদি হইতে মানবের বাক্যযন্ত্রে সংস্কৃত অক্ষর বা বর্ণ-শক্তি থাকায় তাহা মৌলিক সুতরাং তজ্জাত ভাষাও মৌলিক এবং ইহা হিন্দুর চিরন্তন একচেটিয়া সম্পত্তি। পৃথিবীর কোন জাতির কোন ভাষায় এরূপ বাগিন্দ্রিয় বিনির্গত ভাষার উপাদানগুলির সহিত লিখনের অক্ষরাবলীর কোন সম্বন্ধ না থাকায়, সেই অক্ষর-সমূহ ও তাহাদের বিন্যাসে উৎপন্ন যে শব্দ, বাক্য বা ভাষা, তাহাতে মৌলিকতা পরিদৃষ্ট হয় না। সে গুলি লিখনোপযোগী সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র —কৃত্রিম সম্পত্তি।

মানবরূপ বৃক্ষে ভাষাকোরক, বর্ণ বা অক্ষরের সৃষ্টি স্ফুটন, লিখন ও তাহাতে ব্যাকরণ সংযোগে 'সাহিত্য' নামই সেই প্রস্ফুটিত প্রসূনালীর সজ্জীকৃত স্তবক। সংস্কৃত অক্ষর সকল মূল;—তজ্জাত ভাষা মৌলিক,—সাহিত্য সেই ভাষার পরিণতি অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সেই ভাষার সজ্জা! কেন না মানবের মুখ-বিনির্গত ভাষা বিশৃঙ্খল, তাহা কোন নিয়মের অধীন থাকিয়া প্রথমে মানবের মুখ হইতে বহির্গত হয় না। শিশু হইতে বালক, বালক হইতে যুবার ভাষা ক্রমশঃ উন্নত। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত সম্প্রদায় বা অসভ্য বর্ব্বর ভীল সাঁওতালদিগের কথোপকথনে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। শিক্ষা-প্রসঙ্গে এই বিশৃঙ্খল ভাষার সহিত ব্যাকরণের সংযোগ অর্থাৎ ভাষার নিয়ম সংস্থাপিত হইলে সেই নিয়মিত ভাষাই "সাহিত্য" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যখন ভাষা সাহিত্যরূপে সুশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—তখন সময়ে সময়ে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জন সমূহে তাহার অর্থের সঙ্গতি করিতেও অসমর্থ হইয়া থাকে; তখন সেই সাহিত্যে পুষ্পের সজ্জীভূত স্তবকের ন্যায়—সমাজের উপকার হইয়া থাকে। তখন পরার্থপর বাগ্মীর বাগজাল সমুদ্ভূত সজ্জিত সাহিত্যরূপিণী ভাষায় কত লোক আত্মহারা হইয়া আপনাপন মতকে তাঁহার মতে পরিপুষ্ট করিয়া ফেলে। ইহারাই সমাজের আদর্শ বীর। অতএব যে সমাজে যত সাহিত্যিক, সে সমাজ তত উন্নত।

সাহিত্যে জ্ঞান হইলেই গণিত-বিজ্ঞান প্রভৃতি এমন কি নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ডেও অধিকতর আস্থা জন্মে—ভক্তির উদয় হয়। বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্রে ও বিধি-ব্যবস্থায় এবং ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাবলীতেও নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। সুতরাং সমাজের উন্নতিকর বিধি-ব্যবস্থাও সুসংস্কৃত হইয়া থাকে; কুসংস্কার দূরীভূত হয়, স্বার্থের ভাণ চলিয়া গিয়া নিত্য সত্য পদার্থে মতি জন্মে। এ ভাব মৌলিক অক্ষর বা ভাষারই মুখ্য কার্য্য।

অক্ষর ভাষার মূল,—ভাষা সাহিত্যের মূল সাহিত্য মানবের বা সমাজের মূল সুতরাং উন্নতিকর উপাদান। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সাহিত্যে জ্ঞান জন্মিলেই গণিতাদি অন্য ভাষাও শীঘ্র আয়ত্ত হয়। এ সম্বন্ধে বঙ্গের সুসন্তান মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাধ্যায়ীদ্বয়ের একটি গল্প আছে। বাল্যকাল হইতেই মধুসূদনের ভাষার প্রতি আশক্তি ছিল, তিনি ভাষার ভাবে উন্মত্ত হইতেন। ভাষাসিন্ধুজাত সুধার আস্বাদে তিনি নীরস গণিতাব্ধির প্রতি লক্ষ্য করিতেন না। এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার সহপাঠী ভূদেববাবু তাঁহাকে গণিত শিখিতে বলেন। গণিত শিখিলে ভাষা শিক্ষা সহজ, কিন্তু ভাষাবিৎ কেহ সহজে গণিত শিখিতে পারে না, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নিউটন সেক্সপিয়র হইতে পারে কিন্তু সেক্সপিয়র নিউটন হইতে পারে না। মধু শুনিলেন,কথাটা ভাল লাগিল না, ভাষায় নিন্দা তাঁহার অন্তঃস্থলে আঘাত করিল। তিনি অতিশয় অধ্যবসায়ী ছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই, ভূদেবকে কোন কথা না বলিয়া স্থির করিলেন যে, সেক্সপিয়ার কিরূপে নিউটন হইতে পারে, তাহা ভূদেবকে দেখাইতে হইবে। মহাপুরুষের সবই অলৌকিক, সেই দিন হইতেই মধু গণিত শিখিতে আরম্ভ করিলেন।

ভ্রমণ প্রসঙ্গে কত কথা হয়, ভূদেব সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন। কয়েক মাস পরে এক দিন ক্লাসে শিক্ষক একটি অঙ্ক দিয়াছেন। গণিতে ভাল ছেলেদের মধ্যে ভূদেব একজন ছিলেন, তিনি ও অন্যান্য সকলেই অঙ্কটি কসিতে অপারগতা দেখাইলেন। শিক্ষক অঙ্কটি কসিতে বোর্ডের নিকট যাইতেছেন,এমন সময় প্রতিভাবান মধুসূদন বলিলেন, 'আমি একবার চেষ্টা করিতে পারি কি?' মধু কখন ক্লাসে কোন অঙ্ক কসিতেন না। অঙ্কের সময় তিনি ভাষার আলোচনায় মধুময়ী কবিতার সৃষ্টি করিতেন, তাঁহার কথা শুনিয়া ছাত্রগণ হাসিয়া উঠিল। শিক্ষক হাসিতে হাসিতে মধুকে কসিতে আদেশ দিলেন। মধু ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে অঙ্কটি বোর্ডে কসিয়া দিয়া নিজের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেন এবং ভূদেবের নিকটে আসিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, 'সেক্সপিয়ার কিরূপে নিউটন হইতে পারে, দেখিলে।' ভূদেব চমকিয়া উঠিল, মধুর অনন্যসাধারণ কবিত্বশক্তির সহিত গণিতের জটিল মীমাংসার—বিজলীর হাসিরাশির সহিত বজ্রের অবস্থান দেখিয়া ছাত্রমণ্ডলীও অবাক্ হইয়া গেল। সমস্ত রহস্য অর্থাৎ ভূদেবের ভাষার অপমানকর কথার বিষয় প্রকাশ করিয়া মধু বলিলেন যে, ভাষাবিৎ ইচ্ছা করিলে যে কঠিন দুর্ব্বোধ্য

গণিত-শাস্ত্রেরও অধিকারী হইতে পারে,তাহাই আজ ভূদেবকে দেখাইলাম।

তাহা হইলেই ভাষার যে কত শক্তি ও রূপ তাহা বলা যায় না। সূক্ষ্ম ও গভীর গবেষণা দ্বারা অসীম শক্তিসম্পন্ন ও বহুরূপিণী ভাষার আলোচনায় মানুষ অমরতা লাভ করে। আবার সেই অমরতা মৌলিকতাসাপেক্ষ হইলেই কর্ম্ম-ধর্ম্ম ও ঐশীশক্তিতে ভূষিতা ও বলীয়সী হয়। তখন তাহার দ্বারা কোন কার্য্য অসম্পন্ন থাকে না। অক্ষর ও ভাষার সহিত মানব-সৃষ্টির এ মৌলিকতা আছে বলিয়াই সংস্কৃত ভাষা 'দেবভাষা'—ও আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্না

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।

ডায়েরী

(গল্প)

ভাই জীবু, শৈলেনের নিরুদ্দেশের পর তার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা যে রকম ঘোঁট পাকিয়ে ছিলুম, তার কথা নিয়ে যে রকম সন্ধ্যে বেলা আমারা একটা বৈঠক ক'রে বসতুম, আমার বুকে সেই সব কথা গুলো এখনও পাষাণের মত চেপে রয়েছে। তাকে ঠেলে ফেল্‌তে ত কিছুতেই পাচ্ছিনে, ভাই! আজ তোর কাছে এসেছি, যদি মনের ভার কিছু লাঘব ক'ত্তে পারি।

এদিকে শৈলেনের পরিত্যক্ত জিনিষগুলি গোছ গাছ ক'রতে গিয়ে একখানা খাতা পেলাম। সে খানা আর কিছুই নয়, কেবল তার দুঃখপূর্ণ জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত ডায়েরী মাত্র। সেখানার নকল আজ তোকে পাঠাচ্ছি পড়লেই বুঝবি যে, বিচারকের আসনে না বুঝে সুজে ব'সে পড়লে, বিচার-বিভ্রাট কি রকম ভয়ানক ভাবে প্রাণান্তকর হ'য়ে ওঠে। এখন মনে হ'চ্ছে, মানুষ মানুষকে এ রকম জোরে বিচার করবার কে! তার যদি এরকম সম্পূর্ণ ডায়েরী না থাকিত, তা'হলে হয়ত সে জগতের কাছে আজ একটা অপদার্থ জীবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াত। আজ আমরা তার সত্যের সন্ধান পেলুম, কিন্তু সে কত পরে।

"দুদিনের সুখ-দুঃখ নিয়ে পৃথিবীর মধ্যে যে দিন আমি প্রথম পা দিলাম, সে দিন বাড়ীতে কোথায় হাঁসির রোল উঠবে, না উঠল কান্নার। স্বপনের মত মনে পড়ে, ছেলে বেলায় কে একজন আমায় তার জল-ভরা চোক শুকমুখ দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল। স্নেহময় পিতা আমায় আদর করতেন, আর একজন বৃদ্ধা আমায় দেখত।

বুকভরা অভিমান নিয়েই আমি জন্মেছিলাম। কেউ একটু ধমকে ব'লে, কেউ আমার হাতের কোন জিনিষ কেড়ে নিলে, সেদিন আর আমার খাওয়া হ'ত না। সেই বৃদ্ধা আমাকে বুকে করে নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াত, কিন্তু একছিটে জল কেউ খাওয়াতে পারত না। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন একদিন সকালে উঠে দেখ্‌লাম, ঘর বারান্দা সব ঝাড়া হ'চ্ছে, বাড়ীর সামনে নহবৎ বাজছে, একটা আনন্দ যেন সমস্ত বাড়ীটা ছেয়ে ফেলেছে। সন্ধ্যার সময় বাবা

আমাকে চুম খেয়ে হাতে একটা খেলনা দিয়ে চ'লে গেলেন. আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না রাত্রিতে আমার খাটে গিয়ে শুয়ে প'ড়লাম, পাশে আমার বুড়া। আমি তাঁকে দিদিমা ব'লতাম, তিনিও আমাকে চুমুতে তার জবাব দিতেন। কিন্তু এ সুখ বেশী দিন গেল না, দুঃখের দিন আরম্ভ হোল।

একদিন বাবা এসে আমার সঙ্গে একটী যুবতীর আলাপ করিয়ে দিলেন ; বল্লেন, একে তুমি আজ থেকে মা-বলে ডেক'। আমি অবাক হ'য়ে তাঁর দিকে চেয়ে রহিলাম। ছবির মতন কি যেন চোকের সামনে ঝাপ্সা ঝাপ্সা ভেসে উঠল। আমার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। বাবা আমাকে পুঁতুলের মতন মার কোলে তুলে দিলেন কিন্তু মা আমাকে জোর ক'রে বুকের ভেতর চেপে ধরতে পারেন না। তাঁর মনের ভেতর তখন বোধ হয় কিসের একটা যুদ্ধ চলছিল। আমি আর তাঁর কোলে বসতে পাল্লাম না। দিদিমার কাছে যাবার জন্যে মন কেমন ক'রে উঠল। মারও হাতটা আস্তে আস্তে যেন আল্‌গা হ'য়ে গেল, আমিও কোল থেকে নেমে এক দৌড়ে দিদিমার কাছে গিয়ে কোলের ভেতর মুখ লুকালাম।

সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের আরও দশ বছর কেটে গেল। এর ভেতর বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নি। কেবল খেলার সাথী ছোট একটী ভাই পেয়েছি! স্কুল থেকে এসে রোজ তার সঙ্গে খেলা করি। সেও তার ছোট ছোট হাতগুলি দিয়ে, কচি মুখে দাদা বলে ডেকে, আমাকে জড়িয়ে ধরত, আর আমিও তাকে চুমু খেয়ে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুলতাম, কিন্তু মার আমার এ আদর ভাল লাগত না। তিনি আড়ালে আমার সঙ্গে খেলা কত্তে তাকে কত মানা কত্তেন, কখন মারতেন আর মনে হতো,সেই মারগুলো যেন আমারই পিঠে পড়ছে। সেই থেকে আমি আর বেশী বাড়ীর ভেতর যেতুম না। বৈঠকখানায় বসে নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতুম আর কেঁদে কেঁদে এই কাগজ সব ভিজিয়ে ফেল্‌তুম। দিদিমা অনেকদিন হল কাশীতে চলে গেছেন,— স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে। বাবা আর আমার সঙ্গে ভাল কোরে কথা কহিতেন না ; আমি অভিমানে যেচে কথা কহিতে যেতাম না। অভিমানই ঈশ্বরের অভিশাপের মত আমার বুকের ভিতর এসে জায়গা নিয়ে বসেছিল ; তা না হ'লে বোধ হয়, আবার আমি বাবার স্নেহ ফিরে পেতাম।

ভাত-কাপড় ছাড়া বাড়ী থেকে আমার আর বেশী কিছু পাবার আশা ছিল না। তাই আমি একটী ভদ্রলোকের বাড়ী ছেলে-পড়ার ভার নিয়েছিলাম। বাবাও তাতে কোনরূপ বাধা দেন নাই।

ছাত্রটির বয়স প্রায় ছয় বৎসর ; বেশ শান্ত। আমি তাকে খুব যত্নের সহিত পড়াতাম, সেও আমাকে মাষ্টার মহাশয় ব'লে খুব ভক্তি ক'রত। কিন্তু তার চেয়েও আর এক জনের কাছে বেশী ভক্তি ও যত্ন পেতাম। সে একটী ফুটফুটে বালিকার। আমি যখন সুরেনকে পড়াতাম তখন কমল একদৃষ্টে আমার দিকে

চেয়ে থাকত। তার অপলক চাহনিতে যেন একটা স্নেহ-ভালবাসা মাখান ছিল। আমি কত দিন নিজের মনে এর কারণ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন মীমাংসাই ক'রে উঠতে পারি নি। রোজই পড়াতে যেতাম, আর একটু একটু ক'রে সেই অচঞ্চল চাহনিতে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়তাম। যখন আমি আমার শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত ক'রে ভয়ে ভয়ে তার দিকে চাইতাম, অমনি তার দুটি চক্ষু লজ্জায় অবনত হ'য়ে পড়ত। নিজের ছোট বৈঠকখানাটিতে বসে যতই তার বিষয় ভেবেছি, তার দিকে আকৃষ্ট হবার জন্য নিজের মনকে তিরস্কার করেছি, ততই তার দিকে ঝুঁকে পড়েছি।

* * * *

এক দিন খুব বৃষ্টি প'ড়ছে, কাল আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে খেলে যাচ্ছে। সারা বিশ্ব যেন একটা প্রলয়ের ভাবী আশঙ্কায় অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রছে। এমন সময় আমি আস্তে আস্তে পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সুরেন তার বইখানি নিয়ে ব'সে ছিল। আমি যেতেই তাড়াতাড়ি উঠে বল্‌লে মাষ্টার মশায়, দিদির আজ সকাল থেকেই ভারি অসুখ কোরেছে। কথাটা শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আমি আর তার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে বল্লাম, তুমি আজ শীগ্‌গির শীগ্‌গির পড়া কোরে নেও, আমি এখুনি যাব। আমার শরীরটা আজ খারাপ আছে।

পড়া শীগ্‌গির হ'ল বটে, কিন্তু কি যে পড়া লাম তা আমিই জানি না। "অসুখ" শব্দটি কেবল ঘুরে ঘুরে আমার হৃদয়ের এক কোণে এক গোপন তারে আঘাত কচ্ছিল।

বাড়ী গিয়েই বৈঠকখানায় শুয়ে পড়লাম। কেবলই সেই সরল লাবণ্যজড়িত মুখখানি নিঃস্বার্থ ভক্তের করুণ চাহনিটি আমাকে তার কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সব ছেড়ে এক বার তার যন্ত্রণাকাতর মুখখানি দেখতে ইচ্ছে কর্‌ছিল। কিন্তু তার আর আমার মাঝে কত ব্যবধান! দিনের পর দিন চ'লে গেল, সপ্তাহ অতীত হ'ল, আর তার কোন সংবাদই পেলাম না। আর আমার কাউকে জিজ্ঞাসা করবারও সাহস পর্য্যন্ত হ'ল না। একদিন শুনলাম যে, সে বাড়ীখানি অন্ধকার ক'রে ডেরাডুনে হাওয়া বদ্‌লাতে গেছে। শুনে যেন আমার বুক থেকে একটা পাথরের বোঝা নেমে গেল।

* * * *

সামনে আমার পরীক্ষা। নির্ম্মল বাবু দু' মাস আমাকে পড়ান হ'তে ছুটি দিলেন। আমিও তাই খুঁজছিলাম। যে দিন থেকে কমলা অসুখে পড়ে'ছিল, সেইদিন থেকে আমারও জীবনের পরিবর্ত্তন হয়েছিল। যেন কি একটা শূন্যতা রাত-দিনই হৃদয়ে অনুভব ক'রতাম।

* * * *

পরীক্ষা হ'য়ে গেল। তারপর শুনলাম কমলের বিবাহ ঠিক হ'য়েছে। সংবাদটা শুনিবামাত্র যেন বোধ হ'ল, পৃথিবীটা একটা বিপুল ধাক্কা দিয়ে স'রে গেল। সমস্ত প্রাণ ভ'রে বিরাট একটা হাহাকার উঠতে লাগ্‌ল। সমস্ত রাত আমার ঘুম হ'ল না। কেন এ অসহনীয়

বেদনা,—কেন এ ভীষণ মর্ম্ম প্রদাহ! আমি ত একদিনের জন্যেও তাকে পাবার আশা করি নি, বরঞ্চ তার কাছ থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা ক'রেছি। তবে আজ একি হ'ল! কোথা থেকে এ দারুণ বেদনা এল! তবে কি আমি কমলকে ভালবেসে ফেলেছিলাম? ফেলেছিলাম বই কি! কিন্তু কবে কোন মুহূর্ত্তে? কবে আমার হৃদয়ের কোন্ গোপন তারে তার জন্যে এ প্রেমের রাগিনী প্রথম বেজে উঠেছিল? আর ভাবতে পারলাম না। হৃৎপিণ্ডটা সজোরে কে যেন চেপে ধরছিল। দু'হাতে বুক চেপে উপুড় হ'য়ে আমার সেই বিছানাটীতে পড়ে রইলাম।

* * * * *

আর এখন আমি সুরেনকে পড়াতে যাই না। গঙ্গার ধারে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকি! একদিন বাবা এসে আমার বিয়ের বার্ত্তা জানিয়ে গেলেন। মুখে কিছু তাঁকে ব'লতে পারলাম না বটে, কিন্তু বুকের ভেতর আমার জলে যাচ্ছিল। আমার এই দুঃখময় জীবনের স্পর্শে একটি ফুটনোন্মুখ সরল জীবনকে ধ্বংস করা কেন। আমার এ হৃদয় পূর্ণ, কমলময়।

* * * * *

আষাঢ়ের সন্ধ্যা। ভোরে খুব এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। সমস্ত দিনটা কেমন যেন মেঘলা মেঘলা। সন্ধ্যার পরই অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। দূরে নিশ্চল বাবুর বাড়ী হ'তে সানায়ের করুণ সুর বাতাসের উপর ভর ক'রে, চারদিকে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল আর আমার মনের ভিতর তখন একটা তুমুল সংগ্রাম চলছিল।

আজ কমলের বিবাহ। কে সে এমন ভাগ্যধর, যার অঙ্কে এমন সোণার কমল স্থান পাবে? কত চিন্তাই মনের মধ্যে আনাগোনা কর্‌ছিল, আর তার মধ্যে মনে পড়ছিল, সেই ভালবাসা-ভরা চক্ষু দুটীর স্থিরদৃষ্টি।

মন্দিরের ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজল, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা কে যেন নিষ্পেষিত করে দিলে। বাড়ীতে আজ কেউ নেই। মা বাবা সকলেই বিবাহ বাড়ীতে চলে গেছেন। ঘরে একা কেবল আমি।

দশ মিনিট পরেই যে লগ্ন। আর বস্‌তে পারলাম না। কপালের শিরাগুলা টন্ টন্ কর্‌তে লাগল। আমার মাথাটা যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তিবলে কড় কড় করে বেঁধে দিলে। টল্‌তে টল্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাহিরে ঘন অন্ধকার, স্থানে স্থানে জমাট বেঁধে রয়েছে। বৃষ্টির বিরাম নাই। সবাই যেন আজ আমার বিরুদ্ধে। একবার কালো আঁধারের বুক চিরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, সামনের পথ সেই আলোকে যেন আমাকে কোন্ অজানা দেশে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করলে, আমিও কক্ষচ্যুত উল্কার মত ঘন জমাট অন্ধকারের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

* * *

জানিনা ভাই, শৈলেনের এই সংক্ষিপ্ত জীবনের দুঃখময় ইতিহাস পড়ে তোমার কিরূপ লাগবে। তবে আমার আজ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে কচ্ছে। কিন্তু আজ সে কোথায়? হাত—তোদের জিত্!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার রায়।
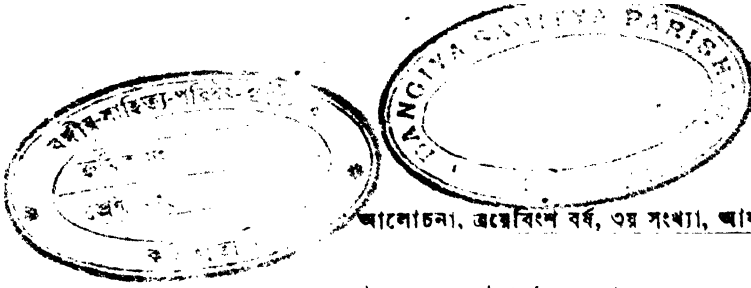
আলোচনা, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৬ সাল।

সংস্কারের আবশ্যকতা

পুরাতনকে নির্ম্মল করিয়া নূতনত্ব সম্পাদনের নাম সংস্কার। সংস্কারে দ্রব্যের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি, গুণ বৃদ্ধি হইয়া পুরাতনত্ব ঘুচিয়া যায় বলিয়া সকল দ্রব্যেরই সংস্কারের আবশ্যক, সংস্কার না হইলে জিনিস খাঁটি হয় না; কৃত্রিমতা নষ্ট করিয়া স্বরূপত্ব জাগাইতে হইলে সংস্কার প্রধান অবলম্বন। এই জন্য স্বর্ণের কৃত্রিমতা-বিষ বিমুক্ত করিতে হইলে তাহাকে সংস্কৃত করিতে হয়, বার বার দগ্ধ করিয়া অকৃত্রিম করিতে না পারিলে স্বর্ণের বহুমূল্যত্ব থাকে না। সকল দ্রব্যেরই সংস্কার করা উচিত, ইহাতে তাহার গুণ-গরিমা বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হয় না।

মানবের পাঞ্চভৌতিক দেহের সংস্কার অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া আর্য্যঋষিগণ হিন্দু-শাস্ত্রে দশবিধ সংস্কার রূপে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দেহটী কান্তিপুষ্ট, সুস্থ-বলিষ্ঠ করিতে হইলে, নিরোগ-নির্ব্যাধী করিয়া বেশীদিন ভোগ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, আমাদের ঐ সকল নিয়ম অবশ্য প্রতিপালন ও তদনুসারে কার্য্য করা একান্ত আবশ্যক। ভগ্নদেহে জরা মৃত্যুর কিঙ্কর হইয়া অতি সামান্য দিন যে আমরা ইহাতে কায়-ক্লেশ বসতি করিয়া দুর্ব্বিসহ কষ্ট অনুভব করিতেছি; এক দিনের জন্য সুস্থদেহে, সুস্থমনে, পরমানন্দে কাল যাপন করিতে পারি না—আর্য্যকুল ধুরন্ধর ঋষিবাক্য অন্যথা করাই তাহার প্রধান কারণ। আমরা দেশের সংস্কার; জাতির সংস্কার, সমাজের সংস্কার করিতে অগ্রসর কিন্তু নিজের সংস্কারের প্রতি ফিরিয়াও চাহি না। নিজে যে অসংস্কৃত, নিজে যে অর্ব্বাচী, কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ, তাহার প্রতি নজর দিবার সময় হয় না, হায়! আমাদের গোড়ায় গলদ, উপরের চাকচিক্য দেখিলে কি হইবে! বুনিয়াদ অপরিপক্ক, ভিত্তি কাঁচা, গৃহ পাকা-পোক্ত, দীর্ঘস্থায়ী হইবে কিসে?

পূর্ব্বে যে আমরা এত বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী হইতাম; জরামৃত্যু যে আমাদের সহজে আক্রমণ করিয়া কালকবলিত করিতে পারিত না; ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া জনন ক্রিয়া সম্পাদিত হওয়াই তাহার মুখ্য কারণ। আজকাল দ্বিজজাতির দশবিধ সংস্কার আর নাই, নব্য শিক্ষিত বাবুগণ এখন উহাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দেন, বা অত অধিক ধর্ম্ম-কর্ম্মের কোনও আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এককালে দ্বিজজাতি যে এত মেধাবী, এত তপপ্রভাব সম্পন্ন, শৌর্য্যবীর্য্যশালী ছিলেন, তাহার প্রধান কারণ এই দশবিধ সংস্কার, দ্বিজজাতিই এই সকল সংস্কারের অধীকারী ছিলেন এবং এই সংস্কার মানিয়া চলিতেন বলিয়া তাঁহাদের সন্তানগণ স্বাস্থ্যহীন ছিল না, অকাল মৃত্যুও তাহাদের দিক দিয়াও যাইতে পারিত না; পরন্তু তাঁহারা এক এক জন মহাবীর; মহাবিদ্বান, মহা তপস্যাপরায়ণ হইয়া জগতীতলে ধন্য ও বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন। আর আমরা তাঁহাদের বংশধর হইয়া দেহে ত বল নাই-ই, প্রকৃত বিদ্যাভ্যাস বা যোগ-তপস্যার পরিশ্রমও আমরা আদৌ সহ্য করিতে পারি না। এইত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

শাস্ত্র বাক্য মানিয়া না চলিলে, অহংজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা-তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমরা যে ক্রমশঃ আরও অধঃপতনের অতলে তলাইয়া যাইব, উদ্ধারের আর কোনও উপায়

থাকিবে না,সে পক্ষে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশকে আবার নূতন করিয়া গঠন করিতে হয়, যদি তাহাদিগকে নিরোগ-নির্ব্যাধী করিয়া নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বের পন্থা অনুসরণ করিয়া আবার ঋষিদিগের সেই পরম পবিত্র দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া তাহাদের জীবন গঠন করা উচিত; নতুবা সে তেজ, সে বীর্য্য,সে যোগপরায়ণতা আর কিছুতেই ফিরিয়া আসিবে না, তোমরা যতই বাহ্য সংস্কার কর, যতই বাহ্যাড়ম্বরে মত্ত হও, ভিতরের সে সাত্ত্বিক ভাব আর জাগিবে না।

পুত্র কন্যার সকল দোষগুণই পিতা-মাতার উপর নির্ভর করে। জনন ক্রিয়াই তাহাদের উন্নতি ও অবনতির মূল কারণ। কন্যা-পুত্রের উৎপত্তি সময়ে পিতা-মাতার মনের ভাব, তাহাদের স্বাস্থ্য যেরূপ থাকে, ঠিক দর্পণে প্রতিবিম্ব পতিত হইবার মত পুত্র-কন্যারও সেই ভাব, সেই গুণ সংক্রামিত হইয়া থাকে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। এ সময় পিতা-মাতা খুব ধর্ম্মপরায়ণ, প্রফুল্লচিত্ত, স্বাস্থ্য-সমন্বিত হওয়া, এবংতিথিনক্ষত্র বিচার করিয়া কার্য্য করিলে আর সন্তানে কোন দোষ সংক্রামিত হইতেপারে না, অজানিত কোনও দোষ হইয়া পড়িলে আর্য্য-শাস্ত্র তাই এই দশবিধ সংস্কারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইলে পুত্র-কন্যার আর কোন প্রকার মলিনত্ব থাকিবে না; সুসংস্কৃত হইয়া কষিত কাঞ্চনের ন্যায় দীপ্তিশালী হইবে।

"জন্ম না জায়তে শূদ্র সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে" এই শাস্ত্র বাক্য হইতে জানা যায় যে, দ্বিজপুত্র জন্ম অবধি শূদ্রবৎ থাকে কিন্তু শাস্ত্রবিধি অনুসারে সংস্কৃত হইলেই সে ব্রাহ্মণত্ব বা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। এখন আমরা সংস্কার অর্থে দুই সংস্কার—উপনয়ন ও বিবাহ বলিয়াই বুঝি, দশটী সংস্কারের কাছ দিয়াও যাইতে পারি না অথবা তাহাকে আধুনিক শিক্ষিতগণ বুজ-রুকী বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাই অজ্ঞানে, অন-মনে দিন কাল, বার তিথি না মানিয়া পুত্র কন্যাগণের উৎপাদন জন্য ভাল ভাল বংশ আজ কাল কিরূপ অধঃপাতে যাইতেছে, তাহা দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—বার, তিথি, কালাকাল মানিয়া, এবং মনের অবস্থা ও স্বাস্থ্য বুঝিয়া পত্নীর ঋতুকালে উপগত হওয়াই শাস্ত্রের বিধি, এ সকল করিয়াও যদি অজানিত কোন দোষ সংঘটিত হওয়া সম্ভব হয়,তাহা হইলে এই দশ-বিধ সংস্কারে তাহার খণ্ডন হইয়া আর কোন অনিষ্ট পুত্রকন্যায় সংক্রামিত হইতে পারে না। এইজন্য এ গুলি বিধিপূর্ব্বক প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, লোকনিন্দা বা লজ্জাপ্রযুক্ত এ সকল না করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ যে কত অন্ধকারময় হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা পঞ্জিকাতে "দশবিধ সংস্কার" নাম মাত্র পাঠ করি কিন্তু তাহা কখন করিতে হয় এবং করিলে কি ফল হয়, তাহা অবগত নহি। দশবিধ সংস্কার যথা—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন ও বিবাহ। ইহার মধ্যে আবার চারিটী শ্রেণী-বিভাগ আছে। ভ্রূণ দশমাস গর্ভমধ্যে অব-স্থানকালে—গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার করিতে হয়, ইহাকে গার্ভসংস্কার কহে। জাতকর্ম্ম, নামকরণ ও অন্নপ্রাশনকে শৈশব-সংস্কার কহে। চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমা-বর্ত্তনকে কৈশোর এবং বিবাহকে যৌবনসংস্কার কহে। এখন আমরা কৈশোর ও যৌবনের উপনয়ন ও বিবাহ-সংস্কার ব্যতীত সমস্ত পরি-ত্যাগ করিয়াছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—"গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎপুরা। ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম। অহন্যেকাদশে নাম, চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ। ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলং। এবমেনঃ শমং যাতি বীজ-গর্ভ সমুদ্ভবং॥"

দশবিধ সংস্কারের প্রথম সংস্কার গর্ভাধান,

এই সময়ে জনক-জননীর দেহে যে সকল দোষ থাকে, তাহাই পুত্রকন্যায় সংক্রামিত হয় বলিয়া এই সংস্কার করিতে হয়। ইহাতে মন পশুভাবাপন্ন না হইয়া সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হয়। যাহাতে মন উচ্চাভিলাষপূর্ণ এবং ধর্ম্মময় হয়, শাস্ত্র এই সংস্কারে তাহারই উপদেশ দিয়াছেন।

পুংসবন—গর্ভধারণের তৃতীয় মাসের দশম দিনে ইহা করিতে হয়। এই সংস্কারের ক্রিয়া দ্বারা গর্ভ রক্ষা হয় এবং গর্ভিনী কষ্ট পায় না।

সীমন্তোন্নয়ন—ইহা ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে করিতে হয়; সীমন্ত বা সিঁতি তুলিয়া দেওয়া, এই সময় হইতে গর্ভিনীকে বেশ ভূষা ও পতি-গমন পরিত্যাগ করিতে হয়; এবং নারীগণ মিলিয়া গর্ভিনীকে নানাবিধ উৎসাহবাক্য প্রদান করিতে হয়।

জাতকর্ম্ম—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ইহা করিতে হয়। এই সংস্কারের দ্বারা জাতকের আয়ু, বল ও মেধা বৃদ্ধি হয়।

নামকরণ—ইহা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর করিতে হয়। এক্ষণে ইহা অন্নপ্রাশনের সময় হইয়া থাকে।

অন্নপ্রাশন—পুত্রের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে ও কন্যার পঞ্চম বা সপ্তম মাসে ইহা করিতে হয়।

চূড়াকরণ—গর্ভাবস্থায় সন্তানের মস্তকে যে সকল কেশ থাকে, তাহা নিঃশেষ করা এই সংস্কারের কার্য্য।

উপনয়ন—ব্রাহ্মণ বালকের অষ্টম হইতে ষোড়শ, ক্ষত্রিয়ের একাদশ হইতে দ্বাবিংশ এবং বৈশ্যের দ্বাদশ হইতে চতুর্ব্বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

সমাবর্ত্তন—উপনয়নের পর গুরুগৃহে গিয়া পাঠ সমাপনান্তে তাঁহার আদেশে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের বিধি শাস্ত্রসঙ্গত।

বিবাহ—এই সংস্কার সকল জাতির আছে।

মানুষকে যথার্থ মানুষ করিতে হইলে, ব্রাহ্মণকে যথার্থ ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন দ্বিজত্বে উন্নীত করিতে হইলে হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের আশ্রয় লওয়া উচিত। নতুবা ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন করা যায় না। কোনপ্রকার দোষযুক্ত বীজ স্ত্রীরক্ষেত্রে পতিত হইলে গর্ভসংস্কারের দ্বারা সে দোষ নষ্ট হয়। জন্মের পর জাত-সংস্কারে অন্য দোষ নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণকুলে জন্মাইলে ব্রাহ্মণ হয় বটে কিন্তু সংস্কার না হইলে দ্বিজ বলিয়া গণ্য হয় না; আর বেদাধ্যয়ন না করিলে সে ব্রাহ্মণ বিপ্রপদবাচ্য হইতে পারে না।

উপনয়ন সংস্কার ব্রাহ্মণের প্রধান সংস্কার কিন্তু তাহাতে আজকাল অতিশয় সঙ্কোচ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই সংস্কার গুরুগৃহে সমাপিত হইত। কিন্তু আজকাল উহা গৃহে বসিয়াই সম্পন্ন হইয়া থাকে, আবার কাহাকেও ব্যয়বাহুল্য ভয়ে ও সংযমের মাত্রা হ্রাস করিবার জন্য কালীঘাটে উপনয়ন দিয়া সেই দিনেই সমস্ত কাজ শেষ করিতে দেখা যায়—ইহা এক প্রকার নূতন পদ্ধতি।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণবালক গুরুগৃহে উপবীত হইয়া বেদাধ্যয়ন জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিত, তারপর গায়ত্রী উপদেশ ও ব্রহ্মচারীর বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ক্রিয়া শিক্ষা করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করতঃ গৃহে প্রত্যাগত হইত, কেহ বা দণ্ডী হইয়া আর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া দণ্ড কমণ্ডলুধারী তাপস হইয়া যাইত। ব্রহ্মচারী গৃহে আসিলে নৈষ্ঠিক; তারপর যতদিন বিবাহ না হয়, ততদিন স্নাতক ব্রতধারী হইয়া থাকিতে হয়—এই সময় শৌচ, আচার ও উপাসনা প্রভৃতিতে ব্রতী থাকা কর্ত্তব্য, বিবাহ করিয়া গৃহী হইলেও এ সকল অবশ্য প্রতিপাল্য—ইহারই নাম গৃহস্থ ধর্ম্ম।

অন্যান্য জাতির বিবাহ সংস্কারই প্রধান। এই সংস্কার যত সুশৃঙ্খলায় এবং ধর্ম্মভাবে সুসম্পন্ন হইবে, গৃহীর জীবনে তত সুখ-সাচ্ছন্দ্য লাভ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য ইহা এত দায়ীত্ব পূর্ণ; খুব দেখিয়া শুনিয়া, খুব বিচার-বিবেচনা করিয়া তবে এই মিলন সংঘটন করা উচিত। কেবল অর্থের লোভে, অথবা রূপজ মোহে মুগ্ধ হইয়া এ কার্য্য করা বিধেয় নহে। যেখানে

আজীবনের সমস্ত সুখ-সৌভাগ্য নির্ভর করিতেছে; যেখানে বংশের উন্নতি অবনতির মূল সূত্র গ্রথিত, তাহা যে কিরূপ গুরুভার পূর্ণ—তাহা সহজেই বিবেচ্য।

গৃহস্থাশ্রম বড় কঠিন—মানুষ আবাল্য ব্রহ্মচর্য্যের পর; সংযমের হাল ধরিয়া সংসার তরণীতে আরোহণ করে, সদ্বংশজাতা প্রণয়িণীর সচ্চরিত্র রূপ পবন যদি ইহার প্রতি অনুকুল হয়,তাহা হইলে আর ডুবিবার কোনও সম্ভাবনা থাকেনা; সংসার সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া আর তাহাকে হাবুডুবু খাইতে হয় না, সে অনুকুল পবনে ধর্ম্মের পাল তুলিয়া ক্রমশঃ বাণপ্রস্থে উপনীত হইতে পারিবে; বাণপ্রস্থ একটী মিশ্র আশ্রম—ইহার কতকটা গৃহস্থ কতকটা সন্ন্যাস, ব্রাহ্মণের ত্যাগ শিক্ষা এইখান হইতে আরম্ভ; ক্রমে অগ্রসর হও, জীবন-স্রোত সুবাতাসভরে ঈপ্সিত পথে চলিয়াছে, দেখিতে পাইবে।

বাণপ্রস্থ পাকিয়া উঠিলেই সন্ন্যাস; ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণের জীবনস্রোত এবার কোন গতি অবলম্বন করিয়াছে দেখুন—সং কি না সম্যকরূপে ন্যাস, অর্থাৎ পরের হস্তে কর্ম্ম অর্পণ। এখানে পর মানে আর কেহ নহে—পরাৎপর ঈশ্বর স্বয়ং; সন্ন্যাস অর্থে আর কিছুই নহে—সকল বিহিত কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা অর্থাৎ কর্ম্মের ফল কামনা রহিত হইয়া কর্ম্ম করা, ইহাই গীতার কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম, ইহা কত উচ্চ, কত মহান। এই কর্ম্ম সন্ন্যাস শেষ হইলে আর কিছু থাকে না, তখনই জীব মুক্ত হইয়া যায়। যাবতীয় সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া, চারিটী আশ্রমে বেশ পাকা-পোক্ত হইয়া এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে ব্রাহ্মণের আর কোন কর্ম্মফলের আকাঙ্খা থাকে না, অতএব মুক্তি তাহাদের অনিবার্য্য। নতুবা কেবল গৈরিক ধারণ; দণ্ড ব্রীক আলোড়ন, বিদ্যার ভাণ প্রদর্শন করিলে মানুষ হয় না, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়া আদরণীয় হইতে পারে না।

আশার বাতি হৃদয়ে অহরহঃ জ্বালিয়া, প্রবৃত্তির ঝুড়ি মাথায় করিয়া কেবল ধর্ম্ম উপদেশ দিলে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারা যায় না; এইরূপে প্রত্যেক আশ্রমের মধ্য দিয়া আপনার চিত্ত সুদৃঢ় করিয়া; যাহাতে তোমাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাওয়া-আসা করাইবে, সেই কর্ম্মফলের আশা নিবৃত্তি করিয়া হে ব্রাহ্মণ! তুমি মুক্তি পথের পথিক হও। আবার ভারতের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠুক, আবার ব্রাহ্মণ দশবিধ সংস্কারে জীবন পুণ্যময় করিয়া, দশকর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইয়া ব্রহ্মময় জীবন গঠন করুন—আমাদের এ বাসনা পূর্ণ কর, পূর্ণ কর—হে ভগবান! সম্পাদক।

ব্রহ্মচর্য্য।

৩

পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য শরীর তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে শুক্রই মানব শরীরের প্রধানতম সার পদার্থ। দেহের বহু মূল্যবান সার পদার্থ দ্বারা এই মহামূল্য বীর্য্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার অপচয়ে যে ক্ষতি ও অনর্থ সংসাধিত হয়, মানব বহু আয়াসেও আর তাহার সম্পূর্ণ পরিপূরণে সমর্থ হয় না। "ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।" বীর্য্য নিরোধে সমর্থ হইলে শরীর ইন্দ্রিয় ও মন অতিশয় শক্তিশালী হয়। বীর্য্য-ধারণই যোগ-সিদ্ধি ও সচ্চিদানন্দ লাভের প্রধান উপায়। এইজন্য যোগীপুরুষগণ চির ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। হীনবীর্য্য পুরুষের মন বড় চঞ্চল; শুক্রধারণ বা ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত মানুষের মন স্থির হয় না। দুর্ব্বল দেহ, চঞ্চলচিত্ত [illegible] ধ্যান-ধারণার অযোগ্য। অনেক [illegible] বালক, কিশোর ও তরুণ যুবক নির্বুদ্ধিতা বশতঃ সঙ্গদোষে ক্ষণস্থায়ী কুৎসিত আমোদে মত্ত হইয়া দেহের এই মহামূল্য সার পদার্থ হেলায় বিনাশ করত আপনি আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। এরূপ অনৈসর্গিক শুক্রপাত বা শারীরিক ব্যভিচারকে আত্ম বিকৃতি বা নৈতিক আত্মহত্যা সংজ্ঞায়

অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা হইতে মানুষের উন্নত প্রবৃত্তি গুলি নিস্তেজ, সর্ব্বকর্ম্মে নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম ও স্ফুর্ত্তিহীণতা, দৃঢ় অনুরাগের অভাব, কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা, চিররুগ্নতা, ক্ষীণতা, অবসাদ, বীরত্বের ও সাহসের হ্রাস, মনুষ্যত্ব লোপ, দেহ অপটু, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস এবং শ্বাস, কাস, বাত, মেহ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানাবিধ কঠিন পীড়া হইয়া থাকে। দম্পতীর সুদীর্ঘকাব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য "মৃতবৎসা"—পীড়ার অমোঘ মহৌষধ তুল্য।

বাল্যকালে শুক্র অতি তরল, অসম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গব্যাপিয়া অবস্থিত থাকে। ১২ বৎসর বয়সের পর হইতে উহা ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে আরম্ভ হয়। অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে উহার পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় না। সুতরাং ২৫ বৎসর বয়সের অগ্রে বীর্য্যক্ষয় করা যার পরনাই অন্যায়। চিররুগ্নতা অকাল বীর্য্যপাতের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফল। কিন্তু অনৈসর্গিক বা বারস্ত্রী সহবাসের পরিণাম আরও ভীষণতম, স্বপ্নদোষ, উপদংশ ও সংক্রামক মেহ (গণোরিয়া) রোগের ইহাই নিদান। ইহা হইতে না জন্মিতে পারে এমন কঠোর পীড়া নাই। ইহাতে মানুষকে পশুতে পরিণত করিয়া থাকে।—পুরুষ ক্লীব ভাবাপন্ন হয়।

সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ডাক্তার জি, এম্, বিয়ার্ড লুইস, নিকলস্ ও ক্যালরেট প্রমুখ অভিজ্ঞব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত অভিমত এই যে,—

"রক্তের চরম সারভাগই শুক্রে পরিণত হয় এবং ইহাই জনয়িত্রী শক্তির মূল। উহা হইতে মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও মাংস পেশী প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুক্রই মানুষের জীবনীশক্তি. ঐ শক্তি প্রভাবেই মানবের সাহস, বল, উদ্যমশীলতা ও মনুষ্যত্ব জন্মিয়া থাকে, আর ইহার অভাবেই মানুষ দুর্ব্বল, হীনবীর্য্য ও উৎক্ষমতি হয়। ইহার অপব্যয়েই মানবের শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য, ইন্দ্রিয় বিকৃতি মাংসপেশীর ক্রিয়া বিশৃঙ্খলতা, শরীর যন্ত্রসমূহের ক্রিয়া বৈষম্য, স্নায়বিকদুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছা, উন্মাদ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তির ও স্মৃতির দুর্ব্বলতা দ্বারাই ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির বিকৃতবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার বন্ধ রাখিলে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বর্দ্ধিত হয়। মস্তিষ্ক, পাকস্থলী ও জননেন্দ্রিয় পরস্পর অতি ঘনিষ্ট সম্পর্কে বদ্ধ; একমাত্র জননেন্দ্রিয় পীড়িত হইলেই মস্তিষ্ক এবং পাকস্থলী উভয়ই পীড়াগ্রস্ত হয়। সুতরাং জননেন্দ্রিয়ের ব্যাধিতে সর্ব্বশরীরই পীড়িত হইয়া পড়ে। একমাত্র জননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহারই ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, উদরের পীড়া ও মস্তিষ্ক রোগের নিদান।"*

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ফ্লুরোর মতে যে জন্তুর শারীরিক বৃদ্ধিকাল যত বৎসর, তাহার জীবিতকাল সেই বৃদ্ধিকালের পাঁচগুণ। মানুষ বিশ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; সুতরাং মানব পরমায়ু ২০ × ৫ = ১০০ একশত বর্ষকাল, কত শত সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে প্রাচীন মুনি ঋষিগণ মতভেদে কেহ ১২০ এবং ১২৫ বৎসর কাল কলির মানব পরমায়ুর চরমকাল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন! সুতরাং পাশ্চাত্যের সহিত প্রতীচ্যের অধিক মতভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে না। স্থূলহিসাবে মানব-পরমায়ু শতবর্ষ ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত মীমাংসা বলিয়া বোধ হয় না। গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক লোক সমাজে এরূপ দীর্ঘজীবী লোকের সংখ্যা বড় কম। আপাত বিলাসিতা, দরিদ্রতা, উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাব, অতিশ্রম, শ্রমহীনতা, আত্মবিকৃতি, অতি ভোজন, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা এবং অনশন বা অর্দ্ধাশন প্রভৃতিই অকালিক পরমায়ু ধ্বংসের প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ধন, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যাহা কিছু সুখ-শান্তিপ্রদ ও বাঞ্ছনীয় সকলই পরমায়ু

* প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে উক্ত মহাত্মাদের অভিমতের বিশদ অনুবাদ বা মূল অভিমত পত্র উদ্ধৃত হইল না।

মুখাপেক্ষী; দীর্ঘকাল জীবিত না থাকিলে এ সকল সুখসম্ভোগ বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। অল্লায়ু লোকের দ্বারা জগতের অল্প কার্য্যই সংসাধিত হয় এবং তাঁহারা নিজে ও অভিলষিত বহুবিধ সুখে বঞ্চিত থাকিয়াই ভবলীলা শেষ করেন। স্বাস্থ্য-রক্ষা বিধির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া প্রচুর সুখসম্ভোগ, উন্নতি বা দীর্ঘ জীবন লাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

বীর্য্যরক্ষাই স্বাস্থ্যময় সুদীর্ঘজীবন লাভের প্রধানতম কারণ। সন্ন্যাসীরা উর্দ্ধরেতা; তাই তাঁহারা সবল দেহ ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। বিশ্ববরেণ্য মহাত্মা স্বামীপাদ বিবেকানন্দকে আপনারা সকলেই জানেন। এই ব্রহ্মচর্য্যের বলেই তিনি আমেরিকায় এক শ্রেণীর বারস্ত্রী-গণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পরীক্ষিত ও পবিত্রতা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ ব্রহ্মচর্য্যই মানব জীবনের উন্নতির মূল। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, সে যুগের গুরুগৃহের ন্যায় এখন আর বিদ্যালয়ে সেরূপ ধর্ম্ম, নীতি ও ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষার বিধান নাই। তাই আজ আমাদের মধ্যে ভ্রষ্টাচারী ও কদাহারীর এত আধিক্য। তাই আজ আমরা মাতা পিতাকে মানি না, গুরুজনকে গ্রাহ্য করি না, আহারে-বিহারে সংযমের ধার ধারি না! তাই আজ আমাদের দেশে অকাল বৃদ্ধের এত হুড়াহুড়ি—অকাল মৃত্যুর এত বাড়াবাড়ি! উপযুক্ত উপদেশ ও শিক্ষার অভাবই আমাদের এ অধঃপতনের কারণ।

অধুনা বঙ্গে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। ভীরু-দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে বীর-সমাজে বরনীয় হইবার নিমিত্ত—রণ ক্ষেত্রে শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন জন্য মহামান্য সম্রাটের সস্নেহ সাদর আহ্বান আসিয়াছে। কবি কাব্যে-কবিতায়, লেখক প্রবন্ধে-পুস্তিকায় এবং বাগ্মী সভা-সমিতির বক্তৃতায় দেশ জাগাইতে প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু সুপ্ত বাঙ্গালী 'উঠি-উঠি' করিয়াও উঠিতে সমর্থ হইতেছে না! প্রবন্ধ-বক্তৃতায় মন উত্তেজিত হইতেছে বটে, কিন্তু সে ক্ষণিক উত্তেজনায় তাঁহাদের চির অবসন্ন স্নায়ু বলহীন-রুগ্ন, শরীর উত্থান-শক্তি লাভ করিতেছে না! ক্ষণস্থায়ী সাময়িক উত্তেজনার ফলে দেহ-মন উভয়ই অধিকতর অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, উৎসাহ-উদ্যম মুহূর্ত্তে বিলয় পাইতেছে।

বাঙ্গালী বীরের জাতি; বাঙ্গালী মহা-কর্ম্মীর বংশধর। যে বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্য, উৎসাহ-উদ্যম ও উদ্ভাবনীশক্তি একদিন জগৎ-বিখ্যাত ছিল, যাঁহারা ধর্ম্মে-কর্ম্মে ও শক্তি সাধনায় একদিন বিশ্ববরণীয় হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভীরু, দুর্ব্বল, কর্ম্মশক্তিহীন বাক্সর্ব্বস্ব! আজ তাঁহারা সেবা-বৃত্তিপরায়ণ, কৃষি ও কুশীদজীবী, সাধারণ ব্যবসায়ী! তাঁহাদের এ অধঃপতনের কারণ কি? বাঙ্গালীর অবনতির বহু কারণ থাকিতে পারে কিন্তু স্নায়বিক দুর্ব্বলতাই যে তাঁহাদের এ অধোগতির প্রধানতম কারণ—তাহাতে সন্দেহ নাই। মানবের শৌর্য্য-বীর্য্য, অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতা বহুল পরিমাণে স্নায়ুবলসাপেক্ষ। আধুনিক বাঙ্গালী ব্রহ্মচর্য্যহীন স্নায়ুদুর্ব্বল জাতি; স্নায়বিক বল-বৃদ্ধি ব্যতীত এ জাতির পুনরুত্থান অসম্ভব। বাঙ্গালীকে উঠাইতে হইলে—তাঁহাদের

ভীরুতা, দুর্ব্বলতা ও অকর্ম্মন্যতার অপবাদ দূর করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ-উদ্যমশীল, উদ্ভাবনশক্তি সম্পন্ন মহাকর্ম্মী, মহাবীরের জাতিতে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের স্নায়ুবলবৃদ্ধি একান্ত কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য অনুকরণে শুধু প্রবন্ধ-বক্তৃতায় বা মদ্য-মাংসাদি উত্তেজক খাদ্য-পানীয় গ্রহণের ব্যবস্থায় বাঙ্গালীর এ পীড়া দূরীকৃত হইবে না। শীত প্রধান দেশের শক্তি বর্দ্ধক তীক্ষ্ণবীর্য্য খাদ্য-পানীয়, উষ্ণপ্রধান দেশের উপযোগী নহে, উহাতে দৈহিক বলের চেয়ে ইন্দ্রিয়বিশেষের উত্তেজনাই অধিক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঘৃত দুগ্ধাদি সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণ, ব্যায়াম, শুক্র রক্ষা এবং রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধাদি সেবন বাঙ্গালীর স্নায়ুশক্তি বর্দ্ধণের বা ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী নহে; উহা এ জাতির ধাতু- প্রকৃতির বিশেষ উপযোগী।

প্রাচীন কালের নৃপতিগণ,—বিশেষতঃ সে যুগের নবাব-বাদসাহ ও আমীর ওমরাহগণ মধ্যে অনেকেই বহু বিবাহ দোষ কলুষিত হইলে ও তাঁহারা শৌর্য্য-বীর্য্যে হীন ছিলেন না। এখন ও কাশী, কাঞ্চি, রাজপুতনা, পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রীয় বহু ব্যক্তি অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াও যুবকের ন্যায় কর্ম্ম-শক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। আর বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকেই অতিরিক্ত কর্ম্মশক্তি, চিন্তাশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক শ্রমে অকাল বৃদ্ধ ও অবসন্ন হইয়া পড়েন! আধুনিক বাঙ্গালীর কোনরূপ শারীরিক কি মানসিক কার্য্যেই তেমন উৎসাহ-উদ্যম নাই; তাঁহারা জীবন-সংগ্রামে অনিচ্ছায় যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইয়া অকালজরা ও অকাল মৃত্যুর গ্রাসে ঢলিয়া পড়েন! ইহার কারণ, প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ শক্তি বর্দ্ধক খাদ্য এবং রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধাদি সেবন স্বাস্থ্য ও দৈহিক বল বর্দ্ধনে সতত যত্নবান্, আর বাঙ্গালী পুষ্টিকর খাদ্য এবং রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ আদি সেবনে যত্নহীন ও অসক্ত। বাঙ্গালী শ্রাদ্ধে ঋণ করিবে, স্ত্রী কন্যাকে রত্নালঙ্কারে সাজাইতে ঋণ করিবে, বিবাহে সহস্র মুদ্রা খরচ করিবে, বিলাসে সর্ব্বস্ব উড়াইবে, মামলা-মোকদ্দমায় পৈত্রিক সম্পদ হারাইবে, কিন্তু জীবীতের মুখে ঘৃত-দুগ্ধাদি পুষ্টিকর সাত্ত্বিক খাদ্য দানে ও পীড়িতের সুচিকিৎসা বিধানে—ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহের শক্তি বর্দ্ধনে দৈন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে! শ্রমে-অত্যাচারে শরীর ক্ষয় করিবে, কিন্তু দৈহিক বল ও জীবনীশক্তি বর্দ্ধনে চিরউদাসীন সাজিবে! তাই বাঙ্গালী আজ ধ্বংসোন্মুখ জাতি।

চির ব্রহ্মচর্য্য সৃষ্টিরক্ষার অন্তরায়; সুতরাং সংসারীর পক্ষে তাহা অকর্ত্তব্য। হিত-মিত আহার-বিহারই গৃহীর ধর্ম্ম। অস্বাভাবিক বা অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় পরম অধর্ম্ম জনক। দশবার স্বাভাবিক ক্রিয়ায় যে শারীরিক ক্ষতি হয়, একবার অস্বাভাবিক রেতঃপাতে তদনুরূপ শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে। আত্মবিকৃতি আত্মহত্যা তুল্য। গভীর দুঃখের বিষয় আধুনিক নরনারী—বিশেষতঃ কুমার-কুমারীদের মধ্যে অনেকেই এরূপ নৈতিক আত্মহত্যা পাপে কলুষিত।

বংশরক্ষার্থ দৈহিক ক্ষতি পূরণ এবং স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত খণ্ড ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন, ঘৃত দুগ্ধাদি বলকর সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণ এবং রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধাদি সেবন গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাতে শুক্র, তেজ, কর্ম্মশক্তি, ধর্ম্ম, প্রীতি, অর্থ এবং শারীরিক ও স্নায়বিক বল পরিবর্দ্ধিত হয়। ক্ষীণবীর্য্য ব্যক্তির শুক্রবর্দ্ধনে এবং অকাল জরা ও অকাল মৃত্যু দূরীকরণে ইহা অদ্বিতীয় সহায়। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন,—

"বাজীকরণমন্বিচ্ছেৎ পুরুষেণ নিত্যমাত্মবান।
তদায়ত্তৌ হি ধর্ম্মার্থৌ প্রীতিশ্চ যশ এবচ॥"

(চরকসংহিতা, চিকিৎসিতস্থানম্, ২য় অঃ ২য় শ্লোক।)

এক্ষণে যাঁহারা বয়সে বালক, কিশোর কি যুবক তাঁহারা কেহ এরূপ ভাবিবেন না যে, আপনাদের চির দিন এমনি সুখ-স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে, এই সবেমাত্র জীবন-প্রভাত। জীবন-মধ্যাহ্নের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের নিমিত্ত এখন হইতেই সকলকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এখন হইতে প্রস্তুত না হইলে—শিক্ষিত না হইলে—সাবধান ও সংযত না হইলে, আর উপায় নাই। বাল্যের এ সুখ-শান্তিময় জীবন যাহাতে চির শান্তিময়—চির সুখময় হইতে পারে, এখন হইতেই সে জন্য প্রাণপণ যত্ন করুন। এখন সাবধান না হইলে—একবার কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিলে আর উপায় নাই। অশিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনে পদে পদে বিপদ। এ সংসারে মানুষের মত টিকিয়া থাকিতে হইলে—জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে, প্রাণপণ যত্নে শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্র প্রভাবে নিজকে ভাল করিতে, দেবতা বানাইয়া তুলিতে হইবে। এ বিশ্বসংসার শুধুই সুখের ফুলশয্যা নহে। বাল্যের সুখ-সমৃদ্ধি দেখিয়া কেহ ভাবিবেন না যে, এ সংসার-সমুদ্রে আজীবন কেবলই "মধুরে বহিবে বায় ভেসে যাব রঙ্গে।" যদি সংসারে টিকিয়া থাকিতে চাহেন, জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হইতে চাহেন, তবে প্রাণপণ যত্নে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করুন। বিদ্যালয়ে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ও স্বগৃহে বা নীতি-ধর্ম্ম শিক্ষপ্রদ আশ্রমাদি, কি সাধু সঙ্গে ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া প্রকৃত শিক্ষা লাভে—পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রতিপালনে ধন্য হউন।

বর্ত্তমান কালে ব্রহ্মচর্য্যের উপরই আমাদের ভাবী বংশধরগণের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম ও জীবন ধারণ-শক্তি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যই আমাদের সকলের একমাত্র অবলম্বনীয়। ধর্ম্ম-জীবনের মধ্য দিয়া কর্ম্ম-জীবন গঠিত করিতে পারিলে মানব জীবন বড় সুখ-শান্তিপ্রদ—বড় মধুময় হয়। আমরা আমাদের ভাবী আশার স্থল নব্য সম্প্রদায়কে সেই সুখ-সৌভাগ্য ও স্বাস্থ্য-পূর্ণ মধুময় জীবন পথ চিনিয়া লইবার জন্যই এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম—এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাদর আহ্বান করিতেছি। চিরমঙ্গলময় জগদীশ্বর আমাদের সহায় হউন। বাঙ্গালীর প্রাণ-কথা হউক।

"ওঁ তেজোঽসি তেজোময়ি ধেহি।
ওঁ বলমসি বলংময়ি ধেহি।
ওঁ বীর্য্যমসি বীর্য্যংময়ি ধেহি।
ওঁ ওজোঽসি তেজোময়ি ধেহি।

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

বিবাহে বিপত্তি।

[ক্ষুদ্র-গল্প]

[১]

সুরূপা হৃষীকেশ বাবুর বড় আদরের কন্যা। আর কোন সন্তান-সন্ততি না থাকায় শেষবয়সে এই কন্যারত্ন লাভ করিয়া সপত্নি হৃষীকেশ বাবু অপার আনন্দ লাভ করিলেন। কন্যা সুন্দরী হওয়ায় আদর করিয়া নাম রাখিলেন—সুরূপা।

ক্রমে সুরূপা বড় হইল। সুরূপার পিতা গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন; সপরিবারে বাড়ীতেই থাকিতেন। প্রতিদিন সকালে-বৈকালে তিনি কন্যাকে পড়াইতেন; সুরূপাও বেশ আগ্রহের সহিত শিখিতেছিল। সুরূপার জননী বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী। তিনি বুঝিলেন—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরের মেয়েকে শুধু লেখাপড়া শিখাইলে চলিবে না;—ঘরে সংসারের কাজ-কর্ম্মও শিখান চাই। তাই তিনি সর্ব্বদা মেয়েকে কাছে রাখিয়া গৃহ-কর্ম্মও শিখাইতে লাগিলেন। সুরূপা বেশ লক্ষ্মী মেয়ে—সে পূর্ণানন্দে জননীর গৃহকার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিল।—এইরূপে পিতামাতার শুভকর শিক্ষা, পুণ্যময় আদর্শ সুরূপার জীবনকে গড়িয়া তুলিতে লাগিল।

ক্রমে সুরূপা শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। জীর্ণ মলিন বস্ত্রের মধ্য হইতে তাহার অসামান্য রূপ-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল।—নবযৌবন সমাগমে সুরূপার সর্ব্বাঙ্গ সুপুষ্ট হইয়া দেহের কমনীয়তা আরও বাড়িয়া উঠিল।

লোক-লজ্জায় হাত এড়াইতে হইলে সুরূপাকে আর ঘরে রাখা যায় না!

একদিন গৃহিনী হৃষীকেশ বাবুর সহিত মেয়ের বিবাহের কথা তুলিলেন;—"হ্যাগা, তুমি সুরূপার বে-থা' দিবে না?—সুরূপার সঙ্গিনীদের একে একে সকলের বে' হ'য়ে শ্বশুর-ঘর কর্ত্তে গেল; কারো-কারো ছেলে-পুলেও হ'ল। আর এখনও তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছ?

গৃহিনীর কথায় হৃষীকেশ বাবুর চমক ভাঙ্গিল। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরূপার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি পাত্রান্বেষণে বহির্গত হইলেন।—পাত্রের বাজার দর হঠাৎ যে এমন আগুন হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি ইতিপূর্ব্বে জানেন নাই। এতদিনে তাঁহার চক্ষু ফুটিল। তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন—এরূপ রূপবতী, গুণবতী কন্যার বিবাহে, তাঁহার অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। যে কেহ সুরূপার রূপ দেখিবে,—গুণের কথা শুনিবে,—সেই আদর করিয়া তাহাকে বধূরূপে ঘরে তুলিয়া লইবে। সরলস্বভাব হৃষীকেশ বাবু একবারও মনে করেন নাই যে, এই পুত্র-বিক্রয় বাজারে রূপ-গুণের আদর নাই—আদর কেবল—অর্থের! হায়! হিন্দু-সমাজ! তোমার কি অধঃপতন!

[২]

"কেন অমন ক'রে নিশ্বাস ফেলছ—কি ভাবছ অত?"

গভীর রাত্রি—হৃষীকেশ বাবু বিছানায় পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছেন; আর ঘন-

ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। পাশে পতিপরায়ণা সুনীতি দেবী বসিয়া একখানা পাখা হাতে করিয়া স্বামীকে বাতাস করিতেছেন। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া সুনীতির মনে হইল—না-জানি কি দুঃসহ দারুণ দুশ্চিন্তায় স্বামী এইরূপ ছট্‌ফট্ করিতেছেন। কতক্ষণ বসিয়া তিনি স্বামীর মাথায় বাতাস করিলেন; কিন্তু হৃষীকেশ বাবুর নিদ্রা হইল না,—তেমনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। আহা, না-জানি কি গভীর বেদনা স্বামীর প্রাণটা এমন মথিত করিতেছে। সুনীতির প্রাণটা বড় করুণ বেদনায় কাঁদিয়া উঠিল। স্বামীর দুঃখ-কষ্টে কোন্ নারীর প্রাণ না কাঁদে? স্বামীর বিষাদক্লিষ্ট মুখের কাছে মুখ লইয়া সুনীতি স্নেহ-করুণ ব্যথিত স্বরে বলিলেন— "কেন অমন ক'রে নিশ্বাস ফেল্‌ছ—কি ভাবছ অত?"

পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া বিষন্ন মুখে হৃষীকেশ বলিলেন—"ভাবিব কি? হায়! দরিদ্রের ঘরে মেয়ে জন্মে কেন?"

"দেখ, তুমি অত ভেবো না—দেখে-শুনে একস্থানে ঠিক ক'রে ফেল। যা' কপালে আছে—হ'বেই।"

"নীতি! সুরূপা আমাদের বড় আদরের মেয়ে,—জেনে শুনে একটা গণ্ডমূর্খের হাতে ওকে স'পে দিতে পারিব না।"

"সে ইচ্ছা কি আমারও হয়? আমি বলি কি—বিলাসপুরের জমিদার বাড়ীতেই মেয়ের বে দাও—মেয়েটা থাকবে সুখে। তাঁরা আড়াই হাজার চেয়েছে ত?—তা-এক কাজ কর—আমার গায়ের যা-কিছু গহনা আছে, বিক্রী কর—বাকী টাকা বসত বাড়ীখানা বন্ধক দিয়া সংগ্রহ কর।

"তারপর কি হ'বে?

"কি হ'বে? আমাদের ঐ এক-বই আর দুই নাই। পরে কপালে যা' থাকে, তা'ই হবে! তুমি কাল যাও—সম্বন্ধ ঠিক ক'রে এস।"

পত্নীর প্রস্তাবে হৃষীকেশ সম্মত হইলেন। কন্যা জমিদারের পুত্র-বধূ হইবে চিন্তা করিয়া তিনি নিজের কথা ভুলিয়া গেলেন। কন্যাকে সুখিনী করাই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা। এমন ইচ্ছা কোন পিতার না হয়? হায়! পিতৃ-স্নেহ!

বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। আড়াই হাজার টাকা এই নারীমেধ যজ্ঞের দক্ষিণারূপে ধার্য্য হইল। হৃষীকেশ বাবু যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ব্যাধিগ্রস্ত জীব নীলামের উচ্চ দরে ক্রয় করিলেন।

(৩)

"না, আমি মেয়ের বিবাহ দিব না"

পুলক-মুখরিত আলোক-ঝলসিত পুষ্প-সুরভিত সমোজ্জ্বল বিবাহ-সভা,—উচ্চাসনে মহার্হ পরিচ্ছদ-ভূষিত কন্দর্পকান্তি বর উপবিষ্ট—সহসা সম্প্রদানে উদ্যত কন্যা-কর্ত্তা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"না, আমি মেয়ের বিবাহ দিব না।"

বর-কর্ত্তা আসিয়া অবধি বড় গোল করিতেছেন। নগদ ২৫০০৲ টাকার নোট গণিয়া পকেটে রাখিয়াছিলেন। তারপর দান-সামগ্রীর

দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এসব দরিদ্রের ঘরে শোভা পায় বটে, কিন্তু জমিদার-ঘরে নহে। তাঁহার ভৃত্যেরাও বুঝি এসব ব্যবহার করে না। ছি ছি! দরিদ্রের মেয়ের সহিত ছেলের বিবাহ দিতে আসিয়া মান-সম্ভ্রম সব গেল।" যাহা হউক, তিনি এখন অলঙ্কারগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন। তাহাতে বৈবাহিক মহাশয় কতদূর ঠকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,—বিবাহের পূর্ব্বে তাহা জানা আবশ্যক।

অলঙ্কারগুলি বিবাহ-সভায় আনীত হইল। বরকর্ত্তা ওজন করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল—"এ-সকলের মূল্য খুব বেশী করিয়া ধরিলেও পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না। অলঙ্কার দিবার কথা ছিল,—হাজার টাকার। অতএব ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আরও পাঁচশত নগদ দিন; নইলে আমি ছেলের বিবাহ দিব না।"

বরকর্ত্তার কথা শুনিয়া কন্যাপক্ষীয় লোকেরা ভ্রূকুটি করিল।—হৃষীকেশ বাবু কন্যা-কর্ত্তার আসনেই বসিয়াছিলেন, বরও বরের আসনে উপবিষ্ট—বিবাহের মন্ত্র পুরোহিতের রসনাগ্রে। —সকলে উদ্বিগ্ন-উৎসুক দৃষ্টিতে হৃষীকেশ বাবুর মুখের প্রতি চাহিলেন। হৃষীকেশ বাবু দৃঢ় স্বরে বলিলেন—"কথামত সব দিয়েছি—যাচাই করিয়া অলঙ্কারের মূল্য হাজার টাকার কম হইলে পূর্ণ করিয়া দিব; কিন্তু বেশী এক-পয়সাও দিব না।"

বরকর্ত্তা বলিলেন—"ভাল, তবে আমি পুত্রের বিবাহ দিব না।"

হৃষীকেশ বাবু আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন—"আমিও তবে মেয়ের বিবাহ দিব না।"

হৃষিকেশের এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে সভাস্থ সকলে বিস্ময়ে হা করিয়া রহিল।

হৃষীকেশ বাবু আবার দৃঢ় স্বরে বলিলেন—"না, আমি মেয়ের বিবাহ দিব না।"

বরকর্ত্তার মুখ ছাইয়ের মত পাংশুবর্ণ হইল। হায়! শেষে কি এমন অপমানিত হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইবে? হৃষীকেশের কি সমাজ-ভয় নাই?

(৪)

বড় গোলমাল পড়িয়া গেল। কেহ হৃষীকেশকে বুঝাইতে লাগিলেন, কেহ বরকর্ত্তাকে গিয়া ধরিলেন,—তাঁহাকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া সুবিবেচনার জন্য অনুনয়-বিনয় করিলেন। নহিলে ব্রাহ্মণের জাতি যায় যে, ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণের জাতি নাশ করা কি উচিত? অনেক তর্ক-বিতর্কের পর বরকর্ত্তা বলিলেন—"ভাল ২৫০৲ ছেড়ে দিলাম, আর ২৫০৲ দিবেন;—তাও নগদ চাই না,—হ্যাণ্ডনোট লিখে দেন।"

হৃষীকেশ বাবু বলিলেন—"আপনার ঘরে আমি মেয়ের বিবাহ দিব না। যদি আপনার সম্পূর্ণ দাবী ছাড়িয়াও দেন, তবু আপনার ঘরে আমি মেয়ের বিবাহ দিব না। কন্যার সুখের জন্য কন্যার বিবাহ দিব—আপনার ঘরে কন্যা সুখে থাকবে না।—আমি বিবাহ দিব না।"

গ্রামের নিতাই মুখুয্যে বলিলেন—"হৃষি! পাগল হয়েছ—আজ বিবাহ না দিলে, আর যে মেয়ের বিবাহ হইবে না! মেয়েটার গতি কি হবে?"

"কি হবে? হিন্দুর ঘরের বাল-বিধবার

যে গতি, মেয়েরও সেই গতি হ'বে।"

"তাও কি হয়? ব্রাহ্মণের মেয়ে,—কুমারী হ'য়ে থাক্‌বে? তা'তে তোর জাতি যাবে যে —সমাজ-চ্যুত হয়ে থাক্‌তে হ'বে যে।"

হৃষীকেশ পূর্ব্ববৎ দৃঢ় স্বরে কহিল—"জাতি যাবে—সমাজ-চ্যুত হ'য়ে থাক্‌তে হবে? হ'ক —যদি আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হই, ধর্ম্মে আমার মতি থাকে,—সমাজ ত্যাগ করুন; ধর্ম্ম আমায় ত্যাগ করবেন না—"

"সাধু! হৃষীকেশ বাবু, তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তুমিই প্রকৃত ধার্ম্মিক—ধর্ম্মই তোমায় রক্ষা করবেন। অরুণ! এ দিকে এস!"

এই কথাগুলি বলিয়া বিরাজ বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি পুত্রকে বলিয়া দিলেন— "বাড়ীর ভিতর সকলকে শান্ত হ'তে বলগে। আর তুমিও ভিতরে অপেক্ষা করো, আমি না গেলে স্থানান্তরে যেও না।" বিরাজ বাবুর বিংশতি বর্ষীয় পুত্র ভিতরে চলিয়া গেলেন।— বলা বাহুল্য—বিরাজ বাবু হৃষীকেশ বাবুর একজন হিতৈষী বন্ধু ও ডেপুটী। তিনি বন্ধু-কন্যার বিবাহে সপরিবারে বন্ধুর বাটীতে আসিয়াছেন।

বিরাজ বাবু ধীরে ধীরে বর-কর্ত্তার সম্মুখে গিয়া বলিলেন—"আপনি না জমিদার? আপনার এইরূপ নীচ অন্তর প্রকৃতি!"

বর-কর্ত্তা—"কি করব বলুন,—আর ২০০৲ দিন, ছেলের বিবাহ দিচ্ছি।"

বিরাজ—"আপনি অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর বটে, কিন্তু আপনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। এমন অধম চণ্ডালের ঘরে হৃষীকেশ বাবুর লক্ষ্মীরূপা মেয়ের বিবাহ দিলে মেয়েকে নদীজলে বিসর্জ্জন দেওয়া হবে।" ডেপুটী বাবু মিষ্টভাষায় বরকর্ত্তাকে দু'কথা শুনাইয়া দিলেন।

বর-কর্ত্তা—"ছেলের বিবাহ দিতে এসে, খুব শুন্‌লাম, এখন শুধু মারতে বাকী—"

বিরাজ—"এস্থান হ'তে শপথ করে যান,— অর্থমোহে অন্ধ হয়ে ভদ্রলোকের মান, সম্ভ্রম, জাতীয় গৌরব, মনুষ্যত্ব নষ্ট করবেন না। ছেলের বিবাহে পণ নিবেন না।"

বরকর্ত্তার মনে হইল, শ্মশান-ভূমে তাঁহাকে ঘিরিয়া অসংখ্য প্রেত তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। তিনি সপুত্র প্রস্থানোদ্যত হইলেন। বিরাজ বাবু কহিলেন—"নোটগুলি রেখে যান—ও গুলিতে আপনার কি অধিকার আছে?"

বিরাজ বাবু নোটগুলি লইয়া বন্ধুর হাতে দিয়া বলিলেন—"ভাই! আমি অরুণকে দিচ্ছি—যদি তোমার মনোমত হয়—কন্যা সম্প্রদান কর।" হৃষীকেশ ডেপুটি বাবুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"ভাই! তুমি নরাকারে দেবতা!" ডেপুটি বাবুর বন্ধুত্ব ও মহত্ব দেখিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল।

অরুণ বরের আসনে উপবিষ্ট হইলেন: মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। গৃহ ভরিয়া কুল-কামিনীগণ হুলু ও শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল। সুরূপা ভক্তিভরে স্বামী-দেবতার পদে প্রণাম করিল।—জমিদারের বরযাত্রীগণ নিমন্ত্রণ পাইল। আর সপুত্র জমিদার বাবু মলিনবদনে ঘোর কলঙ্কের মালা গলদেশে ধারণ করিয়া বাটী ফিরিলেন। শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন।

(ময়মনসিংহ)

গত বৎসর ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের জন্য প্রবন্ধ লেখাই আমার সার হইল—সম্মিলন হইল না। এ বৎসর আর যাইব না স্থির করিয়া ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া খুলনা অঞ্চলে শিশুরবাড়ী যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে রাণাঘাট ষ্টেসনে আমার পূজাপাদ অধ্যাপক বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় পুত্র ও ছাত্রাদি সমভিব্যাহারে সম্মিলনে যাইতেছিলেন। আমাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা অনুমান করিলেন যে, আমিও ব্রাহ্মণ সম্মিলনেই যাইতেছি; আমি ব্রাহ্মণ-সমাজ-পত্রিকার একজন সেবক, কাজেই তাঁহাদের পক্ষে ইহা ভাবা আশ্চর্য্যজনক নহে। কিন্তু আমি তথায় যাইতেছি না শুনিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। তর্করত্ন মহাশয় আজ্ঞা করিলেন যে, আমাকে সম্মিলনে যাইতেই হইবে। কি করি, গুরু-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। উপরন্তু শ্রীজীব ভায়া প্রভৃতির অনুরোধও অনুপেক্ষনীয়; কাজেই আমি স্বীকৃত হইলাম। শ্রীজীব ভায়া প্রভৃতি আমাকে একপ্রকার বুকে করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন।

আমার নিকট ভাড়া ছিল না। সকলে নিজের নিজের টাকা দিয়া আমাদের দুইখানি টিকিট ক্রয় করিলেন। বাস্তবিক তখন আমার বড়ই আনন্দ হইল। এত আদর আমার, ইহা ভাবিয়া হৃদয় নাচিতে লাগিল।

আমি ও শ্রীজীব ভায়া এবং শ্রীনবদাস ন্যায়তীর্থ—এই তিন জনে একটী কক্ষে আশ্রয় লইলাম। নবদাস দাদা ও শ্রীজীব ভায়া দুই জনে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মেল ট্রেণ যেমন ছুটে, তাঁহাদের আলোচনার ফোয়ারাও তেমনি ছুটিতে লাগিল। নবদাস দাদা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় জ্যোতিষের পণ্ডিত, কাজেই আলোচনা জমিল ভাল। সে গুরুপাক অবশ্য আমার হজম হইল না, তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিতে বিরত হইলাম না।

আমার নিজের সম্বন্ধে গণনার কথা পাড়িলাম। আমি কোন্ সালে জন্মিয়াছি, দিনে কি রাত্রে, তাহা আমার জানা নাই এবং কোন্ লগ্নে জন্মিয়াছি, তাহারও কোন ঠিকুজী নাই। তথাপি আমার বিষয় গণনা করা চাই। অতঃপর আমার গণনা চলিতে লাগিল। নবদাস দাদার দিব্য হাতযশ আর কল্পনাশক্তিও বেশ প্রখর। তখন সেই সচল যানের মধ্যে আমাদের অচল আলাপও সচল হইয়া উঠিল। প্রাণের দুয়ার খুলিয়া গেল। নবদাদা কচিৎ চুট্‌কী কবিতা আবৃত্তি করিয়া, কখনও রসের রসাত্মক গান গাহিয়া, কখনও বা হরবোলা রকমের অভিনয় করিয়া অবশিষ্ট রাতটুকু কাটাইয়া দিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ সার্থক হইল। "অবিদিতগতযামা" রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রাতঃকালে অপরাপর দলবলের সন্ধান করিয়া তাঁহাদের নিকট আমাদের শুভ রাত্রির সংবাদ দিলাম। সে গাড়ীতে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, বিজোহর পত্রিকার সম্পাদকযুগল শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যা-

রত্ন ও শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম্‌-এ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমরনাথ স্মৃতিরত্ন ও শ্রীযুক্ত কানাইলাল তর্কতীর্থ প্রভৃতি মহোদয়গণ অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা সমস্ত রাত্রি আমাদের এমন রসের আস্বাদন করিতে না পারিয়া বড়ই অসুখী হইলেন।

তিস্তামুখঘাটে গাড়ী থামিলে আমরা ষ্টীমারে পার হইয়া বাহাদুরাবাদে নামিলাম। ট্রেণ ছাড়িতে বিলম্ব আছে জানিয়া আমি তথায় স্নানাহ্নিক সমাপন করিলাম। ময়মনসিংহে পৌঁছিয়া বেলা দ্বিপ্রহরে স্নানাহ্নিক সারিয়া জলযোগ করার ব্যবস্থা অপেক্ষা আমার এই ব্যবস্থা বেশ ভাল হইয়াছিল, তাহা সহযাত্রিগণ সকলেই স্বীকার করিলেন।

ময়মনসিংহ ষ্টেসনে পৌঁছিবামাত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদিগকে অতি সমাদরের সহিত অশ্বযানে আরোহণ করাইয়া বাসায় লইয়া গেলেন। বাসায় ভদ্রমহোদয়গণ আমাদিগকে প্রাণের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের সে খোলা প্রাণের রসালাপ, সেই অক্লান্ত অকৃত্রিম সেবা কখনই ভুলিবার নহে। আহারের আয়োজন ও ব্যবস্থার কথা আর কি বলিব! আমাদের মুখের কথা তাঁহারা যেন দেবাদেশের মত মাথা পাতিয়া লইলেন। আমরা আনন্দিত, কৃতার্থ এবং একটু লজ্জিতও হইয়াছিলাম। স্বেচ্ছাসেবক ভাইগণ, আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা গ্রহণ কর। ধন্য তোমরা! ময়মনসিংহবাসী ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের আদর ও অভ্যর্থনার জন্য এই সামান্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। ময়মনসিংহ জেলার সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রাণের যোগ আছে, সে পরিচয় আমার আনন্দ ও গর্ব্ব। দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন একবার ময়মনসিংহ গিয়াছিলাম, তখনই জানিয়াছিলাম—আতিথেয়তার জন্য ময়মনসিংহবাসী চিরপ্রসিদ্ধ।

তৎপরে বাসায় আমাতে ও শ্রীজীব ভায়াতে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলাম। সে কি আনন্দ! আত্মীয়-স্বজনদিগকে রাঁধিয়া পরিবেশন করিয়া খাওয়াইব—সে কত সুখ! শ্রীজীব ভায়ার ত সকল দিকে সকল রকমেই সমান বাহাদুরী; তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্র—একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলিলেই হয়। নবদাস দাদা ভাটপাড়ার দলে নাম লিখাইলেন, আমরাও তাঁহাকে লইলাম; নচেৎ আমাদের রস যে জমে না। ভবভূতি ও ভববিভূতি ভায়াদের গাম্ভীর্য্য-বর্ম্ম ভেদ করিতে আমাদের বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। তর্করত্ন মহাশয় পৃথক্ বাড়ীতে একাকী থাকিবেন, তাহার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহিলেন না।

বাসায় আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল। সুসঙ্গের মহারাজ, ব্রজেন্দ্র বাবু, মনোমোহন বাবু প্রভৃতি নিয়তই আসা-যাওয়া করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত নবীন তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত তারানাথ সপ্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীর পদার্পণে বাসা নিয়তই শব্দিত হইতেছিল। পণ্ডিত যামিনীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ময়মনসিংহবাসী, কাজেই তিনি আমাদিগকে যে কিরূপ প্রাণের সহিত আদর অভ্যর্থনা করিতেছিলেন, তাহা লেখনীতে প্রকাশ

করা অসম্ভব। এমন নৈয়ায়িক হইয়া অমন নিরভিমান পুরুষ বড়ই দুর্লভ।

খাওয়ানো-দাওয়ার প্রচুর আয়োজনে ও আদর অভ্যর্থনার বাহুল্যতার আমাদিগকে বাস্তবিকই মোহিত করিয়াছিল। দলে দলে লোক আসিয়া আমাদিগের সংবাদ লইতে লাগিলেন, আর আমরাও অসংকোচে তাঁহাদের সহিত আলাপাদি করিতে লাগিলাম।

আহারাদির পরে গাড়ীতে উঠিয়া সভাগৃহে উপস্থিত হইলাম। জগজ্জননী দুর্গামূর্তির সম্মুখে বিশাল মণ্ডপ। সভাপতি মিথিলাধিপ স্যার রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই। কত রাজা, মহারাজা, কত জমিদার, কত শিক্ষিতবর্গ, কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কত বিষয়ী ও কত ছাত্রমণ্ডলী সেই সভা আলো করিয়া বসিয়াছেন। দর্শক ও নিমন্ত্রিতের সংখ্যা আশাতীত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সুসঙ্গের নবীন মহারাজ ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুর আমাদেরই মত একজন হইয়া সভায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজের ধীর প্রশান্ত আকৃতির অনুরূপ কণ্ঠস্বরের সামঞ্জস্যে অভিভাষণ পাঠ বেশ মিষ্টি লাগিল। হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাসটীকে তিনি মূর্তি দিয়াছেন। প্রাণের কথাটীকে বেশ সরল ও সরস করিয়া ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। মহারাজ কুমুদ-চন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হইয়া সনাতন ধর্মের রক্ষক হউন। দেশবিশ্রুত পণ্ডিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়ের প্রস্তাবে মাস্টবর তাহেরপুরের রাজ-কুমার শিবশেখর রায় মহাশয়ের সমর্থনে স্যার মহারাজ দ্বারবঙ্গেশ্বর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তর্করত্ন মহাশয় মিথিলা ও বাঙ্গলার প্রাণের যোগের কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝাইলেন। গঙ্গোপাধ্যায় ও বাসুদেব, পক্ষধর মিশ্র ও রঘু-নাথ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা পাড়িলেন, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে ও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছেন—তাহার ছবিটি আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, মহারাজ বড় খুসী হইলেন। এক্ষণে বিচ্ছিন্ন মিথিলা ও বাঙ্গালার মধ্যে কি আবার প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন হইবে না? শিবশেখরেশ্বর সুরসিক; অল্প সময়ের মধ্যে সকলকে হাসাইয়া তিনি বাহাদুরী লইলেন। সভা বিবাহের কন্যা, বর মহারাজ স্বয়ং। বর ও কন্যার কথা পাড়িয়া বেশ একটু সরস অথচ সূক্ষ্ম রসিকতা করিলেন।

মহারাজ দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শ্লোকবহুল অভিভাষণ পাঠ করিলেন। কথাগুলি বড় সারবান; তবে মহারাজের গম্ভীর আকৃতির অনুরূপ কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইলে অভিভাষণ পাঠটি মানাইত ভাল, সভাবিজয়ী কণ্ঠ মহারাজের নাই। তবুও শ্লোক পাঠ মৃদুভাবে হইলেও উহা মিষ্ট এবং বিশুদ্ধ হইয়াছিল।

সভাপতির সংস্কৃত অভিভাষণটির একটি ভাবানুবাদ পঠিত হইল। পাঠক পণ্ডিত, শ্রীরামনারায়ণ তর্কতীর্থ, পড়াটি অতি সুন্দর লাগিল। নবীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহস, বাগ্মিতা বেশ আছে। বাঙ্গালার মত করিয়া একটি ছোট সংস্কৃত বক্তৃতা উক্ত পণ্ডিত মহাশয়

দিলেন। তাহা সভার মধ্যে বেশ প্রশংসা লাভ করিল। সভা জাগিয়া গেল। নাচিয়া নাচিয়া সে সংস্কৃত ভাষার নৃত্যে আমারও হৃদয় তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। আমার শরীরে রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠিল। রামনারায়ণের সহিত আমার আলাপের বড় ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে সৌভাগ্য-যোগ আমার ভাগ্যে ঘটিল না।

আচার্য্য তর্করত্ন মহাশয় স্বলিখিত একটী মুদ্রিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সম্মিলনে উক্ত প্রবন্ধটীই ভাবে, নূতনত্বে ও যুক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্।

সন্ধ্যার পর আবার সভা বসিল। পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদের ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। তাঁহার বাগ্মিতাশক্তি দেশে কাহারও অবিদিত নাই। তিনি যে কি ঐন্দ্রজালিক শক্তি বক্তৃতার মধ্য দিয়া সঞ্চারিত করেন, যাহাতে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া যায়। অনলময়ী ভাষা হইতে উন্মাদনার স্রোত যেন ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। সেই জনতার উপযুক্ত বাগ্মী কুলদাপ্রসাদ দীর্ঘজীবী হউন। তাঁহার ভেরীধ্বনির পর রামদয়াল বাবুর বীণাধ্বনিবৎ মধুর বক্তৃতা হইবার কথা ছিল। উন্মাদনার পর অনুপ্রেরণা বড় মিষ্ট লাগিত, কিন্তু তাহা হইল না। তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ পণ্ডিত কেদার নাথ সাংখ্যতীর্থ উপস্থিত ছিলেন পর দিন তাঁহার বক্তৃতা হইবার কথা। সভায় বক্তৃতার শক্তি তাঁহারও অতি সুন্দর।

পরদিন দার্জ্জিলিং হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় উপস্থিত হইলেন। তিনি পনের মিনিট মাত্র বর্ক্তৃতা করিবার সময় পান। তাঁহার বর্ক্তৃতায় সভায় মহোৎসাহের ভাব লক্ষিত হওয়ায় তাঁহার আরও বর্ক্তৃতা করার জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি মুখ বন্ধ করার পর আর মুখ খুলিলেন না। শ্রবণ লালসা অতৃপ্ত রাখিয়া পণ্ডিতবর উপবেশন করিলেন। তর্করত্ন মহাশয় ও তর্কভূষণ মহাশয় শাখা ভগ্নীপতি সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট। তাঁহারা দুইজনে দুইটি স্তম্ভস্বরূপ হইয়া দেশের পতনোন্মুখ ধর্ম্ম-প্রসাদ রক্ষা করুণ।

বহরমপুরে ব্রাহ্মণ সম্মিলনের পর দিন খাগড়ার বাজারে ৭ শত কোশাকুশী বিক্রয় হয়, এ সংবাদ টুকু মাস্টার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর আমাদিগকে দিলেন। দানবীর পুণ্য শ্লোক জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের দানের কথা গুলি তারস্বরে উদ্বোধনা করিলেন। ব্রাহ্মণ সভার বাড়ীর জন্য কলিকাতায় জমী ক্রয় করা হইয়াছে এবং হিন্দুত্বের রক্ষায় উপযোগী আদর্শ ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

সন্ধ্যার পর দ্বারবঙ্গেশ্বর যতক্ষণ না আসিয়াছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন, সভায় সাধারণতঃ সকলে পাঁচ মিনিট মাত্র পাঠের সময় পান। পাঁচ মিনিট সময় উত্তীর্ণ হইবা মাত্র ঘণ্টা ধ্বনির পরিবর্ত্তে শঙ্খ ধ্বনির ব্যবস্থা ছিল। সমীচীন ব্যবস্থা—এই শঙ্খ-ধ্বনি কাহাদিগকে উন্মাদিত, কাহাদিগকে

ভীতিবিহ্বল এবং তাহাদিগকে ম্রিয়মান করিতেছিল।

শ্রীজীব ভায়া বিদ্যালয়ে হিন্দু ধর্ম্মের উপযোগী পুস্তক প্রচারের বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন, তিনি কয়েকটি নূতন কথা বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতা বীণাধ্বনির মত বড়ই মধুর লাগিল। পনের মিনিট কাল তিনি বক্তৃতা দেন। ভবভূতি ও ভববিভূতি ভায়ার প্রবন্ধ ছিল কিন্তু ভববিভূতি প্রবন্ধ পাঠ না করিয়া ছোটখাট একটি বক্তৃতা দিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন। কানাই ভায়া নূতন ব্রতী—সে হিসাবে মন্দ হয় নাই। আর বাহবা দিই—নবদাস দাদায়। তিনি পাঁচ মিনিট মাত্র সময় মধ্যে বক্তৃতায় বাহবা পাইলেন। মহেন্দ্র নাথ সাঙ্খ্যতীর্থ, তারা নাথ সপ্ততীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের একে একে বক্তৃতা হইল। সাঙ্খ্যতীর্থ সুলেখক, দেখিলাম বক্তাও বটেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শন-তীর্থ, ত্রিপুরারাজ সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ তর্কভূষণ জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে কি বলিলেন, কি পাঠ করিলেন, গোলমালের মধ্যে তাহা কিছুই শোনাও গেল না, বোঝাও গেল না। উভয়ের উদ্যম ব্যর্থই হইল। আরও অনেক পণ্ডিতবর্গ একে একে পাঁচ মিনিট বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের পরিচয় বলিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। সকলকে চিনি না, আমার এ ত্রুটি মার্জ্জনার অযোগ্য হইবে না আশা করি। ইন্দ্রনাথ বাবুর পুত্র শ্রীসতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাটোর ছোট তরফের রাজা বীরেন্দ্রনাথ রায়, জমিদার শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমি সকলের কথা উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

এ অধম সম্মিলনে আহার ও বক্তৃতা শ্রবণ ব্যতীত আর কিছু বড় করিবার সুযোগ পায় নাই। এক্ষেত্রে আমি সমালোচক, সমালোচ্য নহি। অনুরুদ্ধ হইয়াও যে আমি এত বড় সভায় কোনরূপ বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করিবার লোভ সংবরণ করিলাম, তজ্জন্য যদি বন্ধুগণ বাহবা দেন, তবে তাহা লইতে আমার আপত্তি নাই।

নাটোরের ছোট তরফের রাজা আগামী বৎসর নাটোরে ব্রাহ্মণ সম্মিলনের আমন্ত্রণ করেন। ভাগ্যে থাকে, তবে রাজা বাহাদুরের, রাণীভবানীর বংশধর বীরেন্দ্র বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইব।

তার পর বিদায়ের পালা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের পাথেয় দিবার ব্যবস্থা বেশ ভালই। আর ব্রজেন্দ্রবাবু দুই টাকা করিয়া নিজ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিদায় দিলেন। দ্বারভঙ্গের মহারাজা দুই টাকা বিদায় করিলেন।

তার পর প্রস্থানের বন্দোবস্ত, হরেকরকম আহারের ফ্যাসাদ এবং আদর অভ্যর্থনার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সেইদিনই গৃহে ফেরাই সাব্যস্ত করিলাম। আরও দুই চারিদিন থাকিলে মন্দ হইত না কিন্তু ময়মনসিংহবাসীদের প্রাণান্ত পরিশ্রম হইত।

সভায় কি হইল, এপ্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারি না, ইহাতে কাজ হইতেছে কি না, তাহা শ্রীভগবানই বলিতে পারেন। বর্ষা-

শ্রমধর্ম্ম,জাতিভেদ ও সদাচার রক্ষা যাহাতে হয়, তজ্জন্য প্রাণের আকুল আবেদন ত করা গেল, সন্ধ্যা-আহ্নিকের ইতিকর্ত্তব্যতা, পণ-প্রথার অপকারিতা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রক্ষার উপযোগিতা দেখান হইল,—ফল কি হইল, তাহা মানব আমরা কি বলিতে পারি; গোচারণ ভূমির অভাব, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রভৃতি ব্যাপারেরও অনেক আলোচনা হইল। বিলাত ফেরত সম্বন্ধে এবার কোনরূপ প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা ছিল না। ইহা ভালই বলিতে হইবে, রামমূর্ত্তি মাঝে হইতে—অখাদ্য ভোজন, অসবর্ণ বিবাহ, জাতিভেদ, এবং সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন দাখিল করিলেন। তাঁহার প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইল না; তবে তর্করত্ন মহাশয় প্রভৃতির বক্তৃতায় ঐ সকল ব্যাপার মিমাংসিত হইয়া যায়। রামমূর্ত্তি মহাবীর, তাই তিনি ব্রাহ্মণ সম্মিলনে ঐ সকল প্রশ্ন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহ টাউন হলে সম্মিলনের শেষ প্রাতঃকালে হিতসাধন সমিতি নামে একটি সভা আহুত হয়। ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের শেষ দিনে মান্যবর শিবশেখরেশ্বর বাবু হিতসাধন সমিতির হইয়া সভ্যদিগকে উক্ত সভায় নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। উহা হিন্দু সভা। উহারও সভাপতি স্যার বঙ্গেশ্বর স্যার রামেশ্বর সিংহ কে, সি, আই, ই। হিতসাধন-সমিতির কর্তৃপক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ ও পণ্ডিত নবদাস ন্যায়-তীর্থকে উক্ত সভায় গাড়ী করিয়া লইয়া যান। প্রতিস্বয় সেখানেও বক্তৃতা দেন। নবদাস দাদার বক্তৃতায় আপত্তির কিছু ছিল—শুনিলাম তজ্জন্য একটু আলোচনা হইল না।

আচার্য্য তর্করত্ন মহাশয় আমাকে সিলেক্ট কমিটিতে লইয়া গেলেন। সেখানে ব্রজেন্দ্র বাবু, পদ্মনাথ বাবু প্রভৃতির মহাজনগণের সঙ্গে আলাপ হইল। ব্রজেন্দ্র বাবুর বিনয় নম্র ব্যবহারে হৃদয় আকৃষ্ট হইল। জন্মভূমির যোগ্য সন্তান আদর্শ ভূম্যাধিকারী ব্রজেন্দ্র বাবু আমাদের মত দরিদ্রের হৃদয়ের শ্রদ্ধা-মিশ্র ভালবাসা গ্রহণ করুন।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

কবিকুঞ্জ।

স্বপন।

(পদাবলী অনুসরণে)

সখি, কেমনে রাখিব প্রাণ!
নিশিতে-স্বপনে হেরিনু শ্যামের-
মোহন মূরতি খান!
যমুনা পুলিনে কদম্বের তলে
যে রূপ নেহারি' গিয়াছিনু ভু'লে,
আজিকে নেহারি সেরূপ-হিয়ায়
উঠিছে প্রেমের বান।
নারিনু সজনি রাখিতে আবরি
লাজ-ভয়-কুল-মান।

সখি, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে—
সুপ্তি মাঝারে হেরিয়াছি আজ
হৃদয়-দয়িত শ্যামে।
নীল কলেবরে সে মোহন সাজ,
তেমতি বাঁশরী ধরি রসরাজ,

হাসি হাসি যেন দাঁড়ালো আসিয়া
চূড়াটি হেলায়ে বামে!
নিরখি' সেরূপ অভাগিনী আজ
ডুবিনু কালার প্রেমে।
সখি, আর কি বলিব হায়।
ভুবন ভুলানো শ্যামের চাহনি
ভুলাইলো রাধিকায়।
মদনের বানে আছে বটে ত্রাণ
সে নয়ন-বাণে নাহি পরিত্রাণ
পরাণ বিঁধিয়া আনেলো টানিয়া
কুল রাখা বড় দায়।
সে আঁখির পানে তোমরা চেওনা
অভাগী ডুবিয়া যায়!
সখী, আর কেন ভয় লাজ?
শ্যাম চাঁদে স্মরি কলঙ্ক সাগরে
ভাসিতে চলিনু আজ!
ননদিনী ভয় নাহি করি আর,
বলুক গোকুলে কলঙ্ক আমার,
যাঁহারে দেখিনু স্বপনে,—তাঁহারে
করিব হৃদয় রাজ।
তাঁহার সোহাগে ভুলিব গঞ্জনা
বিপুল বিশ্বমাঝ!
শ্রীবঙ্কচন্দ্র নাথ কাব্যবিনোদ।

"পাপিয়া"

পাপিয়ারে! পিউ পিউ গাও
অতৃপ্ত প্রাণের তলে নিরাশ অনল জ্বলে
শান্তির অমিয়া ধারে সে জ্বালা নিবাও।
গাইলে না ও পাপিয়া
গাইলে না গাও, গাও, গাও
উত্তপ্ত হৃদয় মূলে প্রেমের তরঙ্গ তুলে
এ মুগ্ধ পাগল পরাণ আবার নাচাও
পাপিয়ারে পিউ পিউ গাও।

২

পিউ পিউ গাও
নিবিড় কানন তলে মেঘময় নভস্থলে
কেন রে উন্মাদ বেশে উড়িয়া বেড়াও।
পঞ্চমে তুলিয়া তান গাওরে ললিত গান
প্রেমের মোহন ভাবে জীবন জুড়াও।
তোর এ করুণ স্বরে প্রাণ যে কেমন করে
পাপিয়ারে; সেই স্বর আবার শুনাও।
আবার সেই পিউ তানে মদিরা ঢালিয়া প্রাণে
উন্মত্ত গ্রন্থিছিন্ন এ হৃদয় মাতাও
পাপিয়ারে! পিউ পিউ গাও।

৩

পিউ পিউ গাও
কেরে তুমি প্রিয় পাখি গগনে লুকায়ে থাকি
এ মধুর পিউ রবে ভুবন ভুলাও।
দেব কি গন্ধর্ব্ব নর কোন জাতি, কোথা ঘর
পাখী সেজে বুঝি তুমি উড়িয়া বেড়াও।
তাই তব পিউ স্বরে পরাণ পাগল করে
যে হও সে হও তুমি পিউ পিউ গাও।

৪

পিউ পিউ গাও
যারে স্মরি দিবানিশি আকুল সাগরে ভাসি
কাতর করুণ স্বরে পিউ পিউ গাও
সে বুঝি তোমার পানে ফিরিয়া চায় না মানে
তারি তরে বুঝি তুমি কাঁদিয়া বেড়াও—

প্রণয় পীযূষ দিয়া সে বুঝি তোষেনা হিয়া
তাই সদা কেঁদে কেঁদে জগত কাঁদাও
শুনে তোর সুধা স্বর ভুলিনু আপনা পর
পাগল পরাণ মোর হইল উধাও
পাপিয়ারে ! পিউ পিউ গাও ॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

প্রণিপাত।

১

মাতার মাতা রূপে, সতত স্নেহ চোখে
অধম সন্তানে রাখি পাল তুমি দয়াময় !
সন্তান বিপদ যত নিবারিছ অবিরত
স্নেহকর সঞ্চালনে হে অনন্ত স্নেহময়।

২

ভ্রান্ত গর্ব্বিত চিতে পাপপথে যাই ছুটে
তোমার মধুবাণী হৃদয়ে জাগিয়া উঠে
এমনি করিয়া শুনি,পাপীগণে বক্ষে টানি
রক্ষা কর সদা তুমি ক্ষমাময় ক্ষেমঙ্কর !

৩

লইতে মঙ্গলময় তোমার স্নেহের দান
বিপদ ভাবিয়া হয় কাতর দুর্ব্বল প্রাণ,
শুভাশীষ বারে বারে ঢালিয়া সন্তান শিরে
সন্তানে নির্ভীক কর দেখায়ে মঙ্গলকর।

৪

লভিয়া তোমার দান আমার নির্ভীক প্রাণ
আজিকে গাহিতে চাহে তোমার মহিমা গান।
জয় জয় প্রেমময় প্রাণময়, দয়াময়
অধম তারণ জয় এ দাসের লহ প্রণাম।

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী।

সেবাধর্ম্ম।

বসন্তকাল। "হুহু" করিয়া বসন্তের বায়ু বহিয়া যাইতেছে, দিন রাত মাথায় সেবার ভার নিয়া বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, বিশ্বপ্রাণে শান্তির উৎস প্রবাহিত করিয়া দিতেছে. কুল কুল করিয়া শৈলচ্যুত কল্লোলিনী সৃষ্টির প্রভাত কাল হইতে অক্লান্ত গতিতে ছুটিয়া যাইতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ; বৎসরের পর বৎসর যুগ যুগান্তর ধরিয়া, জগতের হিতের জন্য, অনন্ত ব্যোমে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই বিশ্ব প্রকৃতির যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই সেবা-ধর্ম্মের মহান প্রচার দেখিতে পাই। সমস্ত জড় প্রকৃতির মধ্যেই যেন সেবা ধর্ম্মের বিস্তৃত বিকাশ।

এইত গেল জড়ের দিক। এখন চেতনের মাঝে এই ভাবের কিরূপ বিকাশ, তাই দেখা যাক্। আমি মানবের কথাই বলিতেছি। মানবের মধ্যে "সেবা-ধর্ম্ম" কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, আমরা তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব।

যখন আর্য্য জ্ঞানালোক স্বীয় তেজে ভারতের সৌভাগ্য-গগনে উদ্ভাসিত হইতেছিল, যখন হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে বেদ-গীতি-গাথা বিশ্ব-প্রেমের ঝঙ্কার দিতেছিল. যখন ভারতের প্রতি কাননাভ্যন্তর হইতে হোমাগ্নির সৌরভময় ধূমরাশি বিনির্গত হইয়া বিশ্বের মঙ্গল-বার্ত্তা ঘোষনা করিতেছিল, সেই সময় হইতেই আমরা "সেবা-ধর্ম্মের" মহান প্রভাব দেখিতে পাই

—সেই সময়ই মানবের মাঝে "সেবা-ধর্ম্মের" প্রথম বিকাশ।

আর্য্যদের মধ্যে যাহারা জীবের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য ভারতের দুয়ারে দুয়ারে "সেবা-ধর্ম্মের" ভার লইয়া প্রথমে ফিরিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইতিহাসে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের স্মৃতিও আজ আমাদের নিকট মধুময়; কারণ তাঁহারাই জগতে "সেবা ধর্ম্মের" মধুময় ফল ভোগ করাইয়াছিলেন। নিঃস্বার্থভাবে জীবের সেবা করিতে তাঁহারাই প্রথমে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ব্রহ্মণ্য তেজ সময়ের গূঢ় আবরণ ভেদ করিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে তার ক্ষীণ রশ্মি প্রতিভাত করিতেছে, যে ব্রাহ্মণত্বের পুণ্যময়ী স্মৃতি লইয়া আজও আমরা জগৎ সমক্ষে গর্ব্ব করি, সেই ব্রহ্মণ্যতেজঃ, সেই ব্রাহ্মণত্বের ভিত্তি-ভূমি "সেবা-ধর্ম্ম"। তাঁহাদের সেবায় মানবের কি কথা, বন্য জন্তু পর্য্যন্তও হিংসা, দ্বেষ ভুলিয়া গিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু হায়, কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ সে মহান ভাব ভুলিয়া গেলেন, এবং তখনই তাঁহাদের অবনতির সূত্রপাত হইল। ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে স্বার্থ আসিয়া পড়িল; আর তাহাদের স্থানে "সেবা-ধর্ম্মের" মহান্ ভাব হৃদয়ে করিয়া বাহির হইলেন—ভারতের ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ, যাঁহাদের কীর্ত্তি-গাথা ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। ব্রহ্মণ্য তেজের এইখানেই শেষ, ক্ষাত্র তেজের এইখানেই আরম্ভ। যে জাতিই যত পরিমাণে "সেবা-ধর্ম্মের" আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে প্রেমের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা প্রচার করিয়াছে, সেই জাতিই তত পরিমাণে শক্তিশালী হইয়াছে এবং সর্ব্বকালে সকলের পূজা পাইয়াছে। মায়ের কি বিচিত্র লীলা, ক্রমে সেই ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও স্বার্থ আসিয়া পড়িল, তাহার ফলে আজ ব্রাহ্মণদের যে দশা দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাদেরও সেই দশা। এবং যে জাতিই "সেবা-ধর্ম্মের" মহানভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেই জাতিই সেরূপ তেজে ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ভারতেতিহাসের প্রথম কয়েক অধ্যায়ে আমরা যে সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই, সে শুধু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের সেই মহান ভাব বিকাশের কাল। তার পরে—যদিও মাঝে মাঝে দুই একটি সমুজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই, সেগুলিও "সেবা-ধর্ম্ম" প্রকাশের এক একটি প্রয়াস মাত্র—ভারতেতিহাস এক গূঢ় প্রহেলিকা সমাচ্ছন্ন, সেখানে আছে শুধু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে, রাজা প্রজার মধ্যে স্বার্থ লইয়া সংঘর্ষ, এবং সেই সংঘর্ষের ফলে ভারতেতিহাস যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাই আছে।

ভারতে বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয় কোনওকালে হয় নাই। পাশ্চাত্য জগতে এই কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বৈশ্য শক্তির প্রবল সমুত্থান। এই শক্তির প্রথম অভ্যুদয়ের শুভ্র তরঙ্গশীর্ষে আমরা "সেবা-ধর্ম্মের" স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, আজ তাঁহারাও সেই মহান ভাব ভুলিয়া যাইতেছেন। ঐ শোন, ভারতের অদ্বিতীয় মনিষী জ্ঞানী-গুরু স্বামী বিবেকানন্দ জলদগম্ভীর-স্বরে কি বলিতেছেন,—"সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের

দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃ সম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্ব্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা, যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল, বল, কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃ-সম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরহিত্য শক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল ; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে, অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে ; এই স্থানে এই শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।”
—(বর্ত্তমান ভারত, ৪৯—৫০ পৃঃ।)

আজ ভারতের প্রতি গ্রাম হইতে ক্ষুধিতের “হাহাকার” ধ্বনি বহির্গত হইয়া ভারত-গগন সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। হে ভারতবাসি ! তোমরা কি দেশের দুর্দ্দশা দেখিতেছ না ? যদি না দেখিয়া থাক, এস, ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে গিয়া শোন, আজ ভারত ব্যাপিয়া কি “হাহাকার” ধ্বনি। প্রতি গ্রাম হইতেই আর্ত্তের মর্ম্মভেদী চীৎকার ধ্বনি বহির্গত হইতেছে। এ সব দেখ, তার পর যদি শক্তি থাকে, “সেবা-ধর্ম্মের” ভার মাথায় করিয়া ভারতের দ্বারে দ্বারে যাও ও আর্ত্তদের সেবা কর। হে আর্য্য, তোমরা তোমাদের জাতীয় ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছ। তাই তোমরা ধ্বংসের নিম্নতম স্তরে নমিত হইয়াছ। এখনও সময় আছে ; যতদূর পার, দীন দরিদ্রদের দুঃখ মোচন কর ; দেখিবে আবার সেই পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে। সেবা, সেবা—যতদূর পার সেবা কর। সেবাই তোমাদের ধর্ম্ম। হে ভারতের ধনিবৃন্দ ! তোমাদের ধন কি শুধু সঞ্চয়ের জন্য ? সঞ্চয় অনেক করিয়াছ, এখন বিতরণ কর। দেখ না ভারতের দুর্দ্দশা ? অর্থ সমাজের এক প্রধান শক্তি, কিন্তু এই শক্তি সমাজ-শরীরের সর্ব্বত্র প্রবাহের জন্য। যে সমাজে এই শক্তির যথার্থ ব্যবহার না হয়, সে সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। স্বামিজী বলিয়াছেন, “শক্তি সঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকীরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃদপিণ্ডে রুধির সঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কাল বিশেষে বা জাতি বিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এক কালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্ব্বত্র সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পারে, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।” (বর্ত্তমান ভারত, ৩১—৩২ পৃঃ :)
পরমহংস দেবেরও সেই কথা :—

"মায়ের ভাণ্ডারী মাত্র তুমি একজন।
তাঁর আজ্ঞা, কর তুমি ধন বিতরণ।"
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, ১৩১ পৃঃ।)

আজকাল একদল "বাবু" বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা পরোপকার করিতে হইলে বলেন, "অমুক দয়ার পাত্র নয়, ওকে দান করায় পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়" ইত্যাদি। বলি, অত অভিমান কেন? এই অভিমানেই ত সোণার ভারত ছারখার হইয়া যাইতেছে। ভক্তকবি তুলসীদাস কহিয়াছেন, "দয়া ধরম কি মূল হৈ, পাপ মূল অভিমান।" কিন্তু তখন কবি জানিতেন না যে তাঁহারই স্বজাতীয়গণ পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া "দয়া" শব্দেরও বিকৃত অর্থ করিবে। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যের দয়ার অভিমান ছিল না—ছিল শুধু আচণ্ডাল বিস্তৃত সুমধুর প্রেম-প্রবাহ। স্বামীজি বলিয়াছেন, "আমরা দয়া করি না, আমরা সেবা করি।" "সেবা" শব্দের এখন পর্য্যন্তও কোন বিকৃত ভাব জন্মে নাই।

হে সন্ন্যাসী, তোমার এই গৈরিক বসন খুলিয়া ফেল। তোমার ও বসনে "সংসারের স্বার্থ ছায়ার, কুটিলতার দাগ" লাগিয়াছে। আর তোমার ঐ পুতিগন্ধময় বসন নাড়া দিয়া ভারত-গগনে আরও দুর্গন্ধ ছড়াইওনা। তুমিই একবার ভারতকে "সেবা-ধর্ম্মের" মধুময় ব্রতে দীক্ষিত করাইয়াছিলে; এখন আবার তুমি হে সন্ন্যাসী; আবার সেই ভাবের মহান আদর্শ নিয়া ভারতের দ্বারে দ্বারে যাও। আজ যে ভারত বড়ই আর্ত্ত! তুমি না আর্ত্তের ত্রাতা? বৌদ্ধযুগেও তুমিই বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে প্রেমের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলে? আর সাত্ত্বিকতার ভাণ করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিও না। তাই বলি গৈরিক বসন খোল। আজ ভারত spiritual help চাহেনা। দেশ শুদ্ধ লোক অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। Spirituality কি করিবে? আজ ভারতে material help-এর আবশ্যকতা অত্যধিক। যদি শক্তি থাকে, যাও, ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে, গ্রামে গিয়া দরিদ্র "নর নারায়ণের" সেবা কর। ঐ শোন ত্যাগি-শিরোমণি স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয় হইতে গভীর বেদনার উচ্ছ্বাস স্বরূপ কি বাহির হইতেছে, "যাহার যেরূপ সাধ্য এক, দুই, ছয় বা দ্বাদশটি ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্বেষণ করিয়া তাহাদিগকে সাদরে গৃহে আনিয়া, খাওয়ান, পরান এবং ভগবৎ প্রতিমাদির যে ভাবে সেবা করা যায়, ইহাদেরও সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে সেই ভাবে সর্ব্ব প্রকারে সভক্তি সেবা করাই—বর্ত্তমান কালে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।" (ভারতে বিবেকানন্দ)

আবার দেশের দুরবস্থা দেখিয়া স্বামীজির কোমল প্রাণ যখন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি কবির ভাবে বলিয়াছিলেন, "শোক-সন্তপ্ত বিধবার অশ্রুবিন্দু মোচনে এবং পিতৃ মাতৃহীন নিঃসহায় অনাথার মুখে এক মুষ্টি অন্ন প্রদান করিতে যে ভগবান বা যে ধর্ম্ম অক্ষম, সে ধর্ম্মে বা সেরূপ ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না • • • •। ইহকালে যে ভগবান্ আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, পরকালে তিনি আমাকে অনন্ত

সুখে সুখী করিতে সমর্থ—একথা আমি বিশ্বাস করি না"। (পত্রাবলী)

তাই বলি, হে সন্ন্যাসী, ঘণ্টাকাঁশি কিছু কাল ফেলিয়া রাখিয়া ভারতের দারিদ্রদিগের সেবা কর, দেখিবে, আবার ভারতের সৌভাগ্য-গগনে জ্ঞান বিজ্ঞানের অনন্ত ভাস্কর ভাসিয়া উঠিবে। আর দেখিবে, তোমাদের, পথ লক্ষ্য করিয়া সহস্র সহস্র গৃহী "সেবা-ধর্মের" বিশ্ব-বিজয়িনী পতাকা নিয়া দীন দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে।

হে সন্ন্যাসী, হে গৃহী, তুমি না পরম ব্রহ্মের উপাসক ? তুমি না জান, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জড়াজড়ের মধ্যে এক ব্রহ্ম শক্তিরই পরিব্যাপ্তি? তবে তুমি ভগবানকে কোথায় খুঁজিতেছ ?

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্ব্বভূতে
সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পন, কর সখে
এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি
কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন
সেবিছে ঈশ্বর।
(বীর-বাণী)

তোমরা আর্য্য, তোমরা হিন্দু, মুক্ত না তোমাদের জীবনের আদর্শ? ত্যাগ না তোমাদের ধর্ম ? তবে "দাও, দাও, ফিরে নাহি চাও"। নিষ্কামভাবে যত পার দান কর,—অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্ম্মদান, এই "নর-নারায়ণের" পূজা হইতেই বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি জন্মিবে ; তখন তুমি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে, তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে। আর যদি তুমি সকাম ভাবেও মহাজন নিসেবিত পথ অনুসরণ করিয়া সেবা করিতে থাক, তুমি নিষ্কাম হইতে পারিবে এ সত্য আমরা ধর্ম্ম-রাজ্যে সর্ব্বদা দেখিতে পাই। রাজ-সিংহাসন লাভ হেতু ধ্রুবও পরে নিষ্কাম ভক্ত হইয়াছিলেন।

হে ভারতের গৃহলক্ষ্মীগণ, একটি ক্ষুদ্র দরিদ্র সেবক আপনাদের দৃষ্টি ভারতের ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রের উপর পাতিত করিবার জন্য সানুনয় অনুরোধ করিতেছে। আপনারাত মায়ের জাতি ? আপনারা কি সহস্র সহস্র দরিদ্র পুত্র কন্যার ক্রন্দনে নীরব থাকিবেন ? আমরাত পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র আলোকে ও গভীর কোলাহলে চক্ষু কর্ণ হারাইয়াছি, দরিদ্রের দুর্দ্দশা, আর্ত্তের ক্রন্দন আমরা কর্ণে শুনি না, চোখে দেখি না। আমরা বিলাস স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ধ্বংসের পথে ছুটিয়া যাইতেছি। আপনারাও এ স্রোতে গা ঢালিয়া দিবেন না। আপনারা ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে ধ্বংসের মুখ থেকে উদ্ধার করিতে পারেন, এ ক্ষুদ্র দরিদ্র সেবকের এই বিশ্বাস। আপনারা বিলাসিতা ত্যাগ করুন, আর দাঁড়ান আমাদের পিছনে—শক্তিরূপে। সহস্র বৎসরের দাসত্বের বোঝা মাথায় করিয়া আমরা আমাদের "সেবা-ব্রতের" শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। আপনারা ত দয়াশীলা ? আজ সহস্র কণ্ঠে যে "অন্ন, অন্ন" করিয়া চীৎকার উঠিতেছে তাহা কি শুনিতেছেন না ? তাই বলি, দিউন আপনাদের স্নেহধারা প্রবাহিত করিয়া, আর শুনিবেন, কোটি কোটি কণ্ঠে আপনাদের বন্দনাগীতি, কোটি কোটি প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বাস—আর দেখিবেন, কোটি কোটি ভারতবাসী মন্দিরে, মন্দিরে আপনাদেরই পূজা করিতেছে। শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষাল বি-এ।

আলোচনা, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল।

কর্ম্মই যোগ।

কর্ম্মপরিগ্রহণ এবং কর্ম্মত্যাগ লইয়া আমাদের দেশে একটা মহাগণ্ডগোল উঠিয়াছে। এই গণ্ডগোলে সমাজে যে বিশেষ অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে, অসংখ্য গেরুয়াধারী তথাকথিত পরমুখাপেক্ষী সন্ন্যাসী, স্বামী, আনন্দগিরি প্রভৃতি নামধারিদিগের দলই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিষয়টা গুরুতর হইলেও ভগবৎ-বাক্যের সাহায্যে ইহার একটু আলোচনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মেব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥

গীতা—৫ম অঃ ১ম শ্লোক।

ভগবান বলিয়াছেন—কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাসযোগ এ উভয়ের বাস্তবিক কোনও বিশিষ্টতা নাই। কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাসযোগ বস্তুতঃ উভয়ই এক। জগতে কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকিলে যে ফল লাভ হয়, কর্ম্মত্যাগ করিয়া তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকিলেও তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মগ্রহণ ও কর্ম্মত্যাগ ইহার কোনও বিশিষ্টতা নাই। বিশিষ্টতা যোগাংশের। কর্ম্ম সাহায্যে বা কর্ম্ম ত্যাগের সাহায্যে, যে উপায়েই হউক না কেন ভগবানে যে যে পরিমাণে যুক্ত হইয়া থাকিতে সমর্থ হয়, সে সেই পরিমাণেই মাত্র ফল লাভ করে। এবং সেইরূপ যুক্ত হইয়া থাকার নামই যথার্থ সন্ন্যাসযোগ। নতুবা গৃহস্থাশ্রমে কর্ম্মের ও সন্ন্যাসাশ্রমে কর্ম্মত্যাগের কোন মূল্যই নাই।

এই যে প্রকৃত আত্মিক সন্ন্যাস, ইহা লাভ করিতে হইলে কর্ম্মযোগের ভিতর দিয়া লাভ করাই ভগবানের অভিপ্রায়। কর্ম্ম ত্যাগের ভিতর দিয়া এ সন্ন্যাস লাভ করা দুরূহ। ভগবান ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যে কর্ম্মী তাঁহাতে সংযুক্ত হইয়া জগতে কর্ম্ম করে, কর্ম্মফল সকল তাহাতে লিপ্ত হয় না। কর্ম্ম সাহায্যে তাঁহাতে যুক্ত হওয়াই স্বল্পায়াসসাধ্য। কর্ম্মময় এ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মতরঙ্গ-চাঞ্চল্যের দ্বারাই আমরা তাঁহার সত্বা উপলব্ধি ও তাঁহার মহিমা দর্শন করিতে সমর্থ হই। এবং সেইরূপ দর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহাতে আমরা আকৃষ্ট হইতে থাকি। কর্ম্ম দেখিতে দেখিতেই স্বতঃ আমাদিগের চিত্ত এ কর্ম্মাবর্ত্তনের কর্ত্তাকে অন্বেষণ করে। কর্ম্ম দেখিলেই কর্ত্তা মনে পড়ে এবং কর্ম্মের বৈচিত্র্য তাঁহার মহিমা দৃঢ়রূপে আমাদিগের চিত্তে অঙ্কিত করিয়া দেয়। তাঁহার চরণে আমরা আত্মসমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারি না। এইরূপে কর্ম্মের সাহায্যে আমরা তন্ময়তা লাভ করিতে পারি। যতদিন না এ তন্ময়তা আসে, ততদিন কর্ম্ম করাই

অবস্থান করিতে হইবে। কর্ম্মত্যাগ করিয়া তাঁহাতে যুক্ত হইব, কর্ম্ম বা জ্ঞানে যুক্ত হইতে পারিতেছি না, এই ভাবিয়া যাহারা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তাহারা কস্মিনকালে তাঁহাতে যুক্ত হইতে পারে না। তাহারা কার্য্যতঃ অযোগী হইয়া দুঃখই ভোগ করে।

ভগবান সেই জন্য যথার্থ সন্ন্যাস লাভের একমাত্র উপায়—কর্ম্ম সাহায্যে তাঁহাতে যুক্ত হওয়া, এই কথা বলিয়াছেন। কর্ম্মের সাহায্যে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে জীব তাঁহাতে আস্থাবান হয়। যথার্থভাবে তাঁহার সত্তায় বিশ্বাসবান হয়। তিনি প্রত্যক্ষভাবে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন, এই ধ্রুব সত্য তাহার হৃদয়ে অনন্তভাবে আধিপত্য বিস্তার করে। এ সত্যজ্ঞান হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইলে বিষয় লাভের জন্য বিষয়ীর চিত্তের মত যথার্থভাবে জীবের মনপ্রাণ তাঁহার চরণে নমিত হইয়া পড়ে। জীব-কর্ত্তৃত্ব বলিয়া আর কিছু দেখিতে পায় না। সে ভগবানের বশে চলিতে থাকে, ভগবানের বশে কার্য্য করিতে থাকে, ভগবানের বশে এ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুর আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন হইতেছে দেখিতে পায়।

আর এক অপূর্ব্ব জিনিষ সে দেখে। সে দেখে—ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞায় চালিত হয়, এ অনন্ত জগত সেই ভাবে তাঁহার আজ্ঞায় চালিত হইতেছে না। লোক সকলকে তিনি কর্ম্মে নিবদ্ধ করিতেছেন না। কর্ত্তৃত্বাভিমান দিয়া জীবকে তিনি বিমূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না। লোক সকলের কর্ম্ম তিনি সৃজন করিতেছেন না। কর্ম্মের ফল-বিধানও তিনি করেন না। লোক সকলের স্ব স্বভাব সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। জীব সকল স্ব স্ব স্বভাববশে পরিচালিত হইতেছে। সূর্য্যকিরণ সম্পাতে কুসুমদল যেরূপ প্রস্ফুটিত হয়, তাঁহার জ্যোতিঃসম্পাতে জীব-স্বভাব তেমনই কর্ম্মময় হইয়া জীবকে কর্ম্মফলে নিবদ্ধ করে। সমুদ্র-বক্ষ অবলম্বন করিয়া তরণী সকল যেমন স্বেচ্ছানুসারে দিকে দিকে যাত্রা করে, জীবও তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব স্বভাবানুসারে তদ্রূপ চালিত হয়। মাতৃ-অঙ্কে শিশু স্বীয় স্বভাবানুসারে যেমন কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, জগৎমাতার অঙ্কে জীবসকল তদ্রূপ স্বীয় স্বভাবানুসারে কর্ম্ম-বৈচিত্র্য রচনা করে। ইহাই জীবের স্বাধীনতা। যতক্ষণ জীব তাঁহাকে দেখিতে না পায়, ততক্ষণ দেখে কে যেন তাহাকে অপরাজেয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে চালিত করিতেছে। ইহাই প্রথম অবস্থা। কর্ম্মফলাসঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভগবানে যুক্ত হইয়া জীব যখন কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, তখন দেখে কেহ তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করে নাই। স্নেহময়ের স্নেহে সে আপনার ইচ্ছানুযায়ী বর গ্রহণ করিতেছে। আপনার ইচ্ছায় সে বিচিত্র কর্ম্মভোগ করিয়া হর্ষ-বিষাদ প্রাপ্ত হইতেছে। তখন তাহার ধাঁধা ছুটিয়া যায়। তখন সে তাহার ইচ্ছাকে বহুমুখ হইতে সংযত করিয়া ভগবৎ-চরণে একমুখী করে।

তাঁহার উদার অনাবিল মুক্ত মূর্ত্তিদর্শন করিয়া জীব মুক্ত উদার অনাবিল হইবার জন্য

ইচ্ছাময় হয়। জীব-স্বভাব বহির্ম্মুখে না ছুটিয়া অন্তর্ম্মুখে তাঁহারই চরণতলে জীবকে ছুটাইয়া লইয়া যায়। ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা। তৃতীয় অবস্থায় জীব-স্বভাব ভগবৎ স্বভাবে বিলীন হইয়া তাঁহার সহিত একীভূত হয়। তখন দেখা যায়, কর্ত্তা-ভোক্তা সমস্ত কর্ম্মের সর্ব্ব লোকের একমাত্র মহান ঈশ্বর সর্ব্বভূতের সুহৃদ, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ নহে। কেন না, জীব স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে ফললাভ করিলেও তাঁহার মঙ্গল ঈক্ষণের সীমা অতিক্রম করিতে জীব-বাসনা সক্ষম হয় না।

যাহা হউক, ভগবৎযুক্ত হইয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিলে জীব কার্য্যতঃ অন্তর্ম্মুখী হইয়া পড়ে। বরফ-খণ্ড জলান্বেষী হইলে যেমন সে স্বীয় অন্তরেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তদ্রূপ জীব ভগবৎ অন্বেষী হইলে স্বতঃই তাহার নিজ অন্তরের দিকে লক্ষ্য পড়ে। তাই জীব এ অবস্থায় অন্তঃর্জ্যোতি, অন্তঃসুখ, অন্তরারাম অন্বেষী হয়। তাহার কার্য্য মাত্র বহির্ম্মুখী না থাকিয়া বাহিরে কার্য্য করিলেও সে অন্তরের দিকে চাহিয়াই কার্য্য করে। বাহিরের সেবা করিয়াও কার্য্যতঃ সে অন্তরেরই সেবা করে। জগজ্জীবের সেবা করিলেও কার্য্যতঃ সে অন্তর্য্যামীরই সেবা করে। এইরূপে বাহির ছাড়িয়া অন্তর্দ্রষ্টা হওয়াই সন্ন্যাসের লক্ষণ।

সন্ন্যাস যদি প্রকৃত সন্ন্যাস হয় এবং গৃহস্থ যদি প্রকৃত কর্ম্মী হয়, তাহা হইলে উভয়েই পরম মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু পারিলেও সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই প্রশস্ততর। সাধনায় অন্তরের অবস্থাই প্রধানতঃ লক্ষ্যণীয়। সাধকের চিত্ত ভগবৎবেদনে কতটুকু সম্বেদিত, এইটুকুই লক্ষ্যের বিষয়। সে সম্বেদন কর্ম্মত্যাগের সাহায্যেই হউক, কর্ম্ম-যোগের সাহায্যেই হউক, তাহাতে কিছু ইতর বিশেষ হয় না। কিন্তু তত্রাচ কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই উত্তম।

যদি সাধক হইতে চাও, তবে মায়ের এই কথাটী ভুলিও না। এই অমৃতময়ী মহাবাণী বিস্মৃত হইয়া যে উন্মার্গগতি মনুষ্য-সমাজে প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহার জ্বালাময় সংঘাত লোক-সমাজের স্তরে স্তরে আজ ধর্ম্মকে ব্যথিত করিতেছে। সন্ন্যাসীদিগের ত কথাই নাই ; তাহারা এখন কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্ম-ত্যাগী। গৃহীরাও কর্ম্ম করে, কিন্তু করিতে বাধ্য হয়—তাই করে। আমি মাত্র নিত্যকৃত্য উপাসনাদির কথা বলিতেছি না—সাধারণ কর্ম্ম সম্বন্ধেও সমভাব। আলস্য-পরায়ণ, নির্জ্জীব, জাড্যভাবাবলম্বী, ভগ্ন-হৃদয়, আশা-উৎসাহ শূন্য, কোন প্রকারে দিন কয়টা অতিবাহিত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে যেন পরিত্রাণ পায়, এই শ্রেণীর লোকে আজ সমাজ পূর্ণ।

দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বশতঃ জাগতিক সুখ সম্পদে যাহারা প্রতিষ্ঠিত, মদ্যাদি উত্তেজক ঔষধ সেবনে সন্নিপাতগ্রস্ত রোগীর জীবনের ন্যায় তাহাদের জীবন সাময়িক উদ্দীপনাময় কিন্তু বস্তুতঃ নির্ব্বাণোন্মুখ! ঈষৎ বিষয় স্বার্থ হইতে বঞ্চিত হইলে অমনি ব্রহ্মাণ্ড তাহাদের পক্ষে অন্ধকার। ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ উঠিলেই পণ্ডিত মূর্খ সকল শৃগালের এক স্বর—গৃহে হইবে না, সংসার না ছাড়িলে কিছু হয় না। সঙ্গে সঙ্গে

শাস্ত্রের ও মহাপুরুষের বাক্য আবৃত্তি। এ সকল বামঘোষ মাত্র রাত্রিরই ঘোষণা করে। দিবার ঘোষণা করিবার ইহাদিগের ক্ষমতা নাই। এই সকল বামঘোষের ঘোষণা স্তব্ধ করিয়া সংসারে দিবা ঘোষণা করিবার জন্য মা আমার আবির্ভূতা হইয়া সাধক অর্জ্জুনের অধবদ্ধা ধারণ করিয়া বজ্র নির্ঘোষে গীতার ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন ও তুলিয়া থাকেন। এই কর্ম্মযোগ যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেয়স্কর অর্জ্জুনকে এই কথা শুনাইবার জন্যই গীতা। তাই বলি যদি সাধক হইতে চাও তবে এ মহাবাণী ভুলিও না—ভুলিও না। কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেয়ঃ এ অপৌরুষেয় বাণী বৈদিক যুগের মত আজ জগতে আবার চৈতন্যময় হউক। জগতে সত্য যুগ ফিরিয়া আসিবে।

কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ কিসে শ্রেয়স্কর তাহা বুঝাইবার জন্য আগে প্রকৃত সন্ন্যাসের মর্ম্ম কি তাহাই বলিতেছেন।

সন্ন্যাসের মর্ম্ম নির্দ্বন্দ্ব ভাব। দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব হইতে যাহার হৃদয় মুক্ত হইয়াছে তাহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলে। কর্ম্ম না করিলে এ নির্দ্বন্দ্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কর্ম্মক্ষেত্রে না বিচরণ করিলে দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষার ঘাত প্রতিঘাত উদ্দীপিত হইবার অবসর কোথায়? দরিদ্র সর্ব্বত্যাগী বলিলে যেমন একটী অসার হাস্যোদ্দীপক বাক্য মাত্র হয়, কর্ম্ম সংঘাতে না থাকিয়া, কর্ম্মময় গৃহস্থাশ্রমের বাহিরে বসিয়া নির্দ্বন্দ্ব হইয়াছি তাহাও ঠিক তদ্রূপ। মা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বুঝাইয়াছেন যে, লোকের নিষ্ঠা দুই প্রকারের। কাহারও জ্ঞান যোগে কাহারও বা কর্ম্ম যোগে। কিন্তু যাহাদিগের নিষ্ঠা কর্ম্মে নহে—জ্ঞানে, তাহারাও যেন ভুলিয়া না যায়, কর্ম্ম না করিয়া কেহ নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না। কেন না শরীর-যাত্রার জন্যও অন্ততঃ কর্ম্ম করিতে হইবে। সুতরাং সেখানে মা স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে যদি জীবের সন্ন্যাসেই নিষ্ঠা থাকে তত্রাচ তাহার পক্ষে অগ্রে কর্ম্মই করণীয়। তার পর ইচ্ছা হয় কর্ম্ম বর্জ্জন করিতে পার। ইহা বুঝাইবার পর যদি কেহ এমন ভাবে যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য মাত্র সন্ন্যাসাশ্রমের জন্য প্রস্তুত হওয়া। অর্থাৎ মায়ের অভিপ্রায় এই যে, সকলেই আগে কর্ম্ম-যোগ অবলম্বন কর, তার পর চিত্তশুদ্ধি হইলে সকলকেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। এই রূপ আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্যই গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে মা বিশেষ করিয়া সন্ন্যাসের প্রকৃত মর্ম্ম প্রথমে বলিতেছেন। দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা যাহার প্রাণে জাগে না—তাহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া বুঝিবে। দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইলেই সমস্ত বন্ধনের কবল হইতে জীব মুক্তি লাভ করে। এই দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষার আক্রমণ জয় করিতে হইলে, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী হইতে হইবে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রের বাহিরে এ দ্বেষাকাঙ্ক্ষা সম্যক্ উদ্দীপিত হয় না—সুতরাং ইহাদিগকে জয় করারও অবসর পাওয়া যায় না। এমন ভাবিও না যে যেখানে দ্বেষাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইবার অবসর পায় না, কার্য্যতঃ সেই ক্ষেত্রই সমধিক মঙ্গলকর। দ্বেষ আকাঙ্ক্ষার বীজ প্রতি জীবের অন্তরে সংস্কাররূপে নিহিত থাকে, এবং উহা কাল দেশাদি সুযোগ পাইলেই নিশ্চয় জাগ্রত হইয়া থাকে। যত দিন ভগবৎ যুক্ত হইয়া ভগবানকেই সর্ব্বত্র ভোক্তা কর্ত্তা সর্ব্বত্র একমাত্র বিভু বলিয়া বোধ না জন্মায় ততদিন দ্বেষাকাঙ্ক্ষা শরীরী মাত্রেরই হৃদয়ে উদ্দীপিত হইবে। সুতরাং যেখানে উহা সত্বর স্পষ্ট উদ্দীপিত করার মত কার্য্য বিকাশ হইবার সুবিধা পায় এবং ভগবানের কর্ম্ম ভাবিয়া জীব যেখানে উহা দমন করিতে পারে সেই

ক্ষেত্রই প্রশস্ত। কেন না নির্দ্বন্দ্ব হইতে হইলে দ্বন্দ্বের আবশ্যক—নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে হইলে কর্ম্মের প্রয়োজন। দ্বন্দ্বই যদি বিশেষ ভাবে না থাকে—নির্দ্বন্দ্ব কি করিয়া হইবে. কর্ম্মই যদি না থাকে নিষ্কর্ম্ম কেমন করিয়া হইবে। বন্ধ্যার পুত্র শোক কি?

সন্ন্যাস নৈষ্কর্ম্ম্য বিশেষ। কর্ম্ম বর্জ্জনে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয় না—কর্ম্ম জয়ে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয়। যাঁহারা ত্যাগ ত্যাগ করেন তাঁহারা যদি বুঝিয়া দেখেন যে, প্রকৃতি ত্যাগ করিবার উপায় নাই—প্রকৃতি ত্যাগ শরীরীর পক্ষে একটী হাস্যোদ্দীপক কথা মাত্র—প্রকৃতি জয়ই কর্ম্ম এবং প্রকৃতি জয়ই সন্ন্যাস। তাহা হইলে ত্যাগের কথা মুখে আনেন না। এই জন্য শিক্ষার জন্যই গৃহস্থাশ্রম। দয়া ক্ষমা সত্য অহিংসা সরলতা প্রীতি প্রসাদ মধুর্য্য অক্রোধ প্রভৃতি যম, দান, তপস্যা, ধ্যান, অধ্যয়ন, ব্রত উপবাস উপস্থনিগ্রহ স্নান মৌন প্রভৃতি নিয়ম, এ সকল সংসারীর একান্ত পালনীয়। এইরূপ শম দম যম নিয়ম ও অন্যান্য নৈতিক নিয়মাবলী বিশেষ ভাবে পালন করিয়া মুক্তি-জয় করাই সংসারের অন্যতম উদ্দেশ্য। স্বেচ্ছাচারের পক্ষে এ সকল শৃঙ্খলবৎ যন্ত্রণাদায়ক, সুতরাং সহজেই দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সংসার কঠোর কারাগারবৎ প্রতীয়মান হয়। এবং আলস্য পরায়ণ জীব এ দুরূহ ভার বহনে সহজেই পশ্চাদ্পদ হইয়া গৈরিক বসনে তনু আবৃত করিয়া নিশ্চিন্তে বিচরণ করিতে অগ্রসর হয়। বিশেষতঃ এ অন্ন-দ্বন্দ্বের দিনে—দ্বন্দ্ব না করিয়া নির্দ্বন্দ্ব হইতে অনেকেরই সাধ জাগে। এখন সংসারে শম যম দম নিয়মের বাঁধা বাঁধি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না—কিন্তু না থাকিলেও লোক সমাজে নিদারুণ প্রতিদ্বন্দ্বীতা সর্ব্বতো-মুখী—তার উপর জ্ঞান হইয়াছে—সংসার অনিত্য—কে কার—সুতরাং গেরুয়া লও। ইহাই এখন অনেক স্থলে যুক্তি। কিন্তু এ যুক্তি শাস্ত্রমতের ক্ষেত্র হইতে—প্রকৃতি জয়ের রণস্থল হইতে তাহাদিগকে যে দূরে অপসৃত করে ইহা তাহারা ভাবিয়া দেখে না।

যাহা হউক, কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস উভয়ই শ্রেয়স্কর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কর্ম্ম-সন্ন্যাসাপেক্ষা কর্ম্মযোগই বিশিষ্টভাবে মঙ্গলপ্রদ। ইহা ভগবৎ বাক্য।

শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহানুভূতি।

রামধনের সাধের বাগানের সন্তঃফল গাছটীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাড়ার ছেলেদের দৌরাত্ম্যে গাছে আর একটীও পাতা নাই। শুধু তাই নয়; পাতা ছিড়িয়া, ডাল ভাঙ্গিয়া, ছেলেরা চারা গাছটীর অবস্থা যেরূপ করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে গাছটী যে আর অধিক দিন বাঁচিবে—সে আশা করা যায় না। অনেক পয়সা খরচ করিয়া, অনেক দূরদেশ হইতে রামধন সেই গাছটী আনিয়াছিল। সাধ করিয়া বাগানের এক ধারে কাঁটা বেড়ার ঘেরা দিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। পাড়ার ছেলেরা আগে সেটা জানিতে পারে নাই, জানিতে পারিলে বোধ হয় গাছটী তত বড়ও হইতে পাইত না। অনেক অনুসন্ধানে ছেলেরা তাহা টের পায়, সন্তঃফল গাছের ফলগুলি যে সাধারণের একটা বিশেষ প্রিয়বস্তু, সে তথ্য বালকেরা অতি সহজেই উপলব্ধি করিয়া লয়।

গ্রীষ্মের ছুটীতে যখন দেশের মধ্য ইংরেজী স্কুলটী দীর্ঘ দিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, তখন বালকদিগের দৌরাত্ম্যে গ্রামের সকলেই জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জ্বালাতন—রামধন। সমস্ত দুপুর গ্রীষ্মের ভরা রোদ মাথায় করিয়া ছেলেরা দল বাঁধিয়া টো টো করিয়া রাস্তার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। আর সুযোগ অবসরে রামধনের চক্ষে ধুলা দিয়া সন্তঃফল গাছের কচি কাচ ফলগুলি পাতাশুদ্ধ ভাঙ্গিয়া আনিত।

পাড়ার ছেলে—প্রায়ই ভদ্রলোকের ছেলে। চাষা রামধন জোর করিয়া গালাগালি দিত।

তাহাদের ছুটো কথা বলিতে একটু কুণ্ঠিত হইত। বালকেরা সে জন্য অত্যাচারের মাত্রাটা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। বাগানের আম পাড়িতে, লিচু পাড়িতে, রামধনের কোন নিষেধ ছিল না; নিষেধ ছিল—কেবল সেই সপ্তঃফল গাছের ফল ছিঁড়িতে।

যেইটী নিষেধ বালকেরা সেইটীই করিত। রামধন সেইজন্য তাহাদের উপর বড়ই রাগিয়া গেল। রাগ করিয়া বেচারী সমস্ত দুপুর সেই বাগানে সপ্তঃফল গাছের কাছে বসিয়া থাকিত। গাছটী চৌকী দিত। কাজে কাজেই বালকেরা পূর্ব্বের মত নীরবে গাছটীর উপর অত্যাচার করিতে সমর্থ হইত না। ছুটির দ্বিতীয় সপ্তাহ সেই ভাবেই কাটিয়া গেল। একদিন একটা বিশেষ কাজে রামধন বাগান চৌকি দিতে পারে নাই। জমিদারী কাছারীতে তলপ ছিল, বালিকা কন্যা অমিয়ার উপর সেদিনকার মত বাগানের ভার দিয়া রামধন সেখানে গেল।

বালকেরা সে সংবাদ পাইয়াছিল। বালিকা অমিয়াকে তাহারা ততটা ভয় করিয়া চলা ভীরুতার লক্ষণ বলিয়া মনে করিল। অমিয়াও বালিকাসুলভ চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া যখন বাগানের এক ধারে বকুল গাছের তলায় বসিয়া নিবিষ্ট মনে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে গান করিতে করিতে বকুল ফুলের মালা গাঁথিতেছিল, সেই সময় একদল বালক ধীরেধীরে সপ্তঃফল গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল! নরেশ গাছে উঠিল। ডাল ভাঙ্গিয়া আর আর বালকদিগের হাতে দিবার সময় অদূরে বাগানের পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র মেটে রাস্তার উপর রামধনকে দেখিতে পাইল. রামধন তখন কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। নরেশ ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি যেমন গাছ হইতে নামিয়া আসিবে, পা পিছলাইয়া একটা সরু ডালের উপর পড়িয়া গেল। ডালটি ভাঙ্গিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে নরেশও পড়িয়া গেল।

বালকেরা ছুটিয়া পলাইল। অমিয়া ডাল ভাঙ্গা শব্দ শুনিয়া আধ গাঁথা ফুলের মালাটী হাতে লইয়া সে দিকে ছুটিয়া আসিল. যাহা দেখিল তাহাতে অমিয়ার মুখ শুকাইয়া গেল। ক্ষুদ্র বুকখানি দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। নরেশের সংজ্ঞালুপ্ত; শরীর ক্ষত বিক্ষত। আর সেই ক্ষত স্থানের শোণিতস্রাবে তাহার পরিধেয় বস্ত্র রঞ্জিত।

অমিয়া হাতের মালা ফেলিয়া ক্ষিপ্র গতিতে জল আনিতে ছুটিয়া গেল. অদূরে একটী ছোট পুষ্করিণীর জলে অমিয়া আপনার আঁচল ভিজাইয়া লইল. তাড়াতাড়ি সেই জল নরেশের মাথায় দিল। তার পর ধীরে ধীরে তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। অমিয়া কি শুশ্রূষা করিবে? সংজ্ঞাহীনের সংজ্ঞালাভের জন্য যেরূপ শুশ্রূষার প্রয়োজন, সে তাহার কিছুই জানে না। কিন্তু না জানিলেও ভগবান দয়া করিয়া তাহার সম সহিষ্ণুতার পুরস্কার প্রদান করিলেন। অল্পক্ষণ পর নরেশের চৈতন্য লাভ হইল, চক্ষু মেলিয়াই নিকটে অমিয়াকে দেখিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। অমিয়া ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছেন বাবু?

নরেশ কোন উত্তর করিল না। অমিয়ার সেই ধীর কম্পিত কোমল কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রতিঘাত করিল। নরেশ আবার চক্ষু মেলিয়া অমিয়ার মুখখানির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, বালিকার মুখখানি কতই সুন্দর, আতপ-তাপ-সম্পর্কহীন-আধফুটন্ত বেলা বোধ হয়. তত সুন্দর কিংবা তত মধুর নয়। নরেশ অনিমিষ নয়নে সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বালিকার মুখখানি দেখিতে দেখিতে বোধ হয়—তাহার সকল বেদনা,সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া গিয়াছিল। বালিকা মাথা নীচু করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছেন নরেশ বাবু? নরেশ উত্তর করিল—ভাল আছি, তেমন কিছু বেশী লাগেনি। কিন্তু

পরিধেয় বস্ত্র রক্ত রঞ্জিত দেখিয়া নরেশ বলিল —গাছের ডাল লাগিয়া খুব কাটিয়া গিয়াছে।

নরেশ উঠিয়া বসিল। অমিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিল। তার পর অমিয়ার কাঁধের উপর ভর দিয়া নরেশ ধীরে ধীরে বাগানের বাহিরে আসিল। অমিয়া তাহাকে বাড়িতে রাখিয়া আসিল। এই ঘটনার পর হইতে, রামধনের উপর বালকগণের অত্যাচারের মাত্রা একেবারেই কমিয়া গিয়াছিল।

ভবিষ্যতের ফল বড়ই খারাপ হইল। চতুর বালকগণের কৌশলে প্রকৃত ঘটনাটী রূপান্তরিত হইয়া নরেশের পিতার কর্ণগোচর হইল। তিনি আপনার একমাত্র পুত্রের এই আকস্মিক বিপদের জন্য রামধনকে সম্পূর্ণ রূপে দোষী সাব্যস্ত করিলেন; এবং তাহার প্রতিকারের জন্য পুলিশের সাহায্য লইলেন। মোকর্দ্দমা চলিল, নরেশ সেইদিন হইতেই রোগশয্যায় শয়ন করিল।

অমিয়া প্রতিদিন একবার করিয়া নরেশকে দেখিতে আসিত। বালিকার হৃদয়ের মধ্যে যে একটু সহানুভূতি, যে একটী কাতরতা একটু একটু করিয়া স্থান পাইতেছিল, তাহা সমস্তই নরেশের জন্য দান করিতে অমিয়া সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত। অমিয়ার মনে হইত, নরেশের এই দুর্ঘটনার জন্য জগতের মধ্যে সে কেবল এক মাত্র দায়ী। বালিকা আপনার ক্ষুদ্র প্রাণের কাতরতা দিয়া ভগবানের কাছে নরেশের কুশল প্রার্থনা করিত। নরেশের আরোগ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের সকল সাধ বিলাইয়া দিতে স্বীকার হইত, ভগবান তাহা শুনিতেন কি না, কে জানে? কিন্তু এক সপ্তাহ পরে যে দিন অমিয়া শুনিল, নরেশের অসুখ বড় বেশী হইয়াছে, সে দিন সে তাহাকে দেখিতে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেও, পিতার আদেশে গৃহের বাহিরে পদার্পণ করিতে পারে নাই।

অমিয়া সেই দিন হইতেই বাড়ীর মধ্যে আটক পড়িল। রামধন ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী হইয়া নরেশের পিতার উপর বিশেষ রাগিয়া গেল, বালিকা তাঁহাদের এই মনোবিবাদের কারণ কিছুই ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু না বুঝিলেও পিতার অজ্ঞাতে নরেশকে দেখিতে যাইবার জন্য প্রায়ই সুযোগ অনুসন্ধান করিত।

অমিয়ার ক্রমাগত চেষ্টায় এক দিন একটা সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। নরেশের সহিত দেখা করিবার জন্য, নরেশের কুশল সংবাদ অবগত হইবার জন্য সে যে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছিল, ভগবান দয়া করিয়া তাহার সে অবসর আনিয়া দিলেন। মোকদ্দমার দিন রামধন গৃহে ছিল না। অমিয়া সেই সুযোগে দুপুর বেলা নরেশকে দেখিতে গেল। কয়দিনের অসাক্ষাতে অমিয়ার মনে কত কথা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কত কাতরতা, কত অনুনয়, নিভৃতে বসিয়া অমিয়া হৃদয়ের এক প্রান্ত সজ্জিত করিয়া নরেশের সাক্ষাৎ-আশায় উদ্বিগ্ন ছিল; কিন্তু হায়! সে সাক্ষাতে, সে সাধের সমস্ত রক্ষিত আকুল আবেগ যেন কোথায় লুকাইয়া গেল, বালিকা নরেশের রোগ শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার সেই রোগক্লিষ্ট শুষ্ক মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে যেন সকল কথাই ভুলিয়া গেল। অমিয়া কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

কিন্তু বালিকার অব্যক্ত মনের ভাষা, তাহার সেই নয়ন যুগলে যেন ফুটিয়া উঠিল। অমিয়া অনেকক্ষণ নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া শেষে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—এতদিন কেমন ছিলেন বাবু? নরেশ কোন কথা কহিল না। একবার সেই নিষ্প্রভ নয়ন দুইটী ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া কেবল মাত্র বালিকার মুখের দিকে চাহিল, নরেশের সে শূন্য দৃষ্টির অর্থ কে বুঝিবে? বালিকা অমিয়া বুঝিয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু তাহার ডাগর ডাগর চক্ষু দুটী সহসা জলে ভরিয়া উঠিল, নরেশ ধীরে ধীরে বলিল—ও কি অমিয়া তুমি কাঁদছ কেন?

অমিয়া চোখের জল মুছিল, নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, ক'দিন আর তুমি আসনি কেন অমিয়া? অমিয়া সেই কথার কোন উত্তর দিল না। ধীরে ধীরে নরেশের গায়ের উপর হাত রাখিয়া সঙ্কুচিতভাবে বলিল—আমায় ক্ষমা করিবেন নরেশ বাবু! নরেশ নীরব রহিল, অমিয়া ধীরে ধীরে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে কথা রামধনের কাণে উঠিতে বড় বেশী দেরী হইল না। রামধন অমিয়াকে বিশেষ তিরস্কার করিল। পিতার তিরস্কারে বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আর আমি কখনও আপনার অবাধ্য হইব না, আমাকে ক্ষমা করুন। রামধন অমিয়াকে ক্ষমা করিয়াছিল কি না, জানি না, কিন্তু তাহার পর দিন হইতেই সে অমিয়ার বিবাহের জন্য পাত্রের অনুসন্ধানে রত হইল।

বালিকা অমিয়া শৈশব-যৌবনের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটী মাত্র আদরের মেয়ে বলিয়া রামধন আজও তাহার বিবাহ দেয় নাই। বিবাহ না দেবার আরও একটী কারণ ছিল। রামধন বিপত্নীক। তাহার সংসারের সকল ভার বালিকা অমিয়ার উপর।

অমিয়া সংসারের কুটিলতা কতক বুঝিত, আবার কতক নাও বুঝিত। অমিয়া যাহা বুঝিত, তাহা খুব ভালরকমই বুঝিত, আর যাহা না বুঝিত, তাহা বুঝিবারও চেষ্টা করিত না। বালিকা আপনার জীবনের কোন উদ্দেশ্য বুঝিত না, বুঝিবারও চেষ্টা করিত না। কিন্তু সে উদ্দেশ্য-বোধহীন জীবনের নিকট হইতে সংসারের স্বার্থ সর্ব্বদাই দূরে থাকিত। বালিকা যে দিন মূর্চ্ছিত নরেশের সংজ্ঞা লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে যে তাহার হৃদয়ে কোন স্বার্থ নিহিত ছিল—তাহা নহে। বালিকা নিঃস্বার্থ ভাবে নরেশের জন্য আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সকল সহানুভূতি ঢালিয়া দিয়াছিল। বালিকা আপনার সেই সহানুভূতি বিনিময়ে আর কিছুই চায় না। সকল স্বার্থের বিনিময়ে, সে কেবল এক একবার নরেশকে দেখিতে চায়। বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিলেন।

পিতার তিরস্কারে অমিয়া আপনার কোমল হৃদয় অন্য ভাবে বাঁধিবার জন্য চেষ্টা করিল। বালিকা সমস্ত রাত কেবল কাঁদিয়াছিল; আর ভাবিয়াছিল। নরেশের কথা, নরেশ ভদ্রলোকের ছেলে; ধনীর সন্তান; আর সে কৃষক কন্যা। উভয়ের মধ্যে যে একটা ব্যবধান রহিয়াছে, অমিয়া তাহা জানিত না। কিন্তু সে জন্য তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? অমিয়ার কোন স্বার্থ ছিল না, অথচ নিঃস্বার্থভাবে নরেশের কুশল প্রার্থনার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবসরের পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্য ইংরেজী স্কুল খুলিয়াছে। কিন্তু আজও নরেশের পীড়ার উপশম হয় নাই। অধিকন্তু ডাক্তারেরা বালকের জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। পিতার প্রভূত অর্থব্যয়েও নরেশ সে যাত্রা রক্ষা পাইল না। গ্রীষ্মের শেষ বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে এক দিন অপরাহ্নে বালক নরেশচন্দ্রের জীবনের শেষ লীলা-খেলা সংসারের নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল।

একটা গভীর শোকোচ্ছ্বাসে অমিয়ার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি বিধ্বস্ত হইল। সে ছুটিয়া একবারে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন নরেশের শবদেহ চিতানলে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। অমিয়া খানিকক্ষণ নিস্পন্দভাবে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে একটা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অমিয়া সবেগে ভূতলে পড়িয়া গেল। সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাকে তুলিতে গিয়া দেখিল—অমিয়ার প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্ত শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র দে।

সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

[জগদীশ ও গদাধর]

ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ সাঙ্গ করিয়া গদাধর ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা উপাধি পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। তখন নবদ্বীপে পণ্ডিতগণের সম্মুখে পরিক্ষার্থিদিগকে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হইত। জগদীশ তর্কালঙ্কার উপাধি দেওয়ার ব্যাপারের বড়কর্ত্তা ছিলেন, গদাধর ভট্টাচার্য্য ভ্রাতাকে কহিলেন—তুমি যে রূপ কৃতবিদ্য হইয়াছ, তাহাতে তুমি উপাধি পাইবার যোগ্য কিন্তু জগদীশ তর্কালঙ্কারের আমার উপর বড়ই ঈর্ষ্যা, আমার ছাত্র পাইলে সে হয়ত উত্তীর্ণ হইতে দিবে না। * একে ছাত্র, তদুপরি তুমি আমার ভ্রাতা। আরও দুই বৎসর পরে যাইলেই ভাল হয়।

ভ্রাতার মন বড় ভার হইল। বলিল—"ন তেজ তেজস্বী প্রসৃত সপরেষা প্রসহতে" তাহাতে আর কি? তাহা বলিয়া আমিত ঈর্ষ্যার পাত্র হইব না, তাঁহার কঠিন প্রশ্নের উত্তরও আমি দিতে পারিব—এ ভরসা আমি করি।

জগদীশ তর্কালঙ্কার তখন বৃদ্ধ। তথাপি তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াই হউক আর স্বাভাবিক হউক তাঁহার দেহে অসীম বল ছিল। চণ্ডীমণ্ডপের একটি খুঁটী বদলান হইতেছে— পণ্ডিত মহাশয় নিজের স্কন্ধ দ্বারা সেই চণ্ডীমণ্ডপের ভার রক্ষা করিতেছেন, ছাত্রেরা খুঁটীটি বদলাইবার উদ্যোগ করিতেছে! এমন সময়ে গদাধর ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা তথায় যাইয়া দাঁড়াইলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় গদাধর ভট্টাচার্য্যের ছাত্র এবং ভ্রাতা ন্যায়শাস্ত্রের পড়া শেষ করিয়া পরীক্ষা দিতে আসিয়াছে শুনিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলেন।

পরীক্ষা গৃহীত হইল। জগদীশ তর্কালঙ্কার সাধারণ পরীক্ষায় উপাধিলাভের যোগ্য বলিয়া গদাধর ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতাকে সমাদর করিলেন। এইবার বিশেষ পরীক্ষা করার জন্য গদাধরের ভ্রাতা অনুরোধ জানাইলেন। তর্কালঙ্কার বলিলেন, "বেশ বাবা বেশ, তোমার ইচ্ছা মত তুমি যেকোন একটি স্থান ব্যাখ্যা কর।"

গদাধরের ভ্রাতা বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন—এ কেমন হইবে? আমার যাহা ভাল জানা আছে, তাহার ব্যাখ্যায় আর আমার গৌরব কি, আপনি যে কোন স্থান হইতে জিজ্ঞাসা করুন, আমি উত্তর করিতে পারি কি না দেখুন!

"বটে এতদূর! আমি প্রশ্ন করিব যে কোন স্থান হইতে, আর তুমি উত্তর দিবে! তুমি এত বড় পণ্ডিত হইয়াছ?" তখন তর্কালঙ্কার যে গ্রন্থের পঠন-পাঠন হয় না--এমন গ্রন্থ হইতে একটি কঠিন প্রশ্ন করিলেন। গদাধরের ভ্রাতার মাথা ঘুরিয়া গেল। পরীক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিবে কি, "দেখ তোমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদি ইহার উত্তর দিতে পারেন।" বলিয়া বৃদ্ধ সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

* আজকালি সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় যেমন করা বা না করা কর্ত্তাদের অনুগ্রহ সাপেক্ষ, তখনকার কালেও কি তাই ছিল?

গদাধর ভট্টাচার্য্য ভ্রাতাকে দেখিয়াই কিছু একটা হইয়াছে বুঝিলেন "আমি ত বারণ করিয়া ছিলাম, তুমিই সাধ করিয়া যাইলে" বলিয়া ভট্টাচার্য্য ভ্রাতার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। ভ্রাতা সমস্ত ঘটনাটি বিবৃত করিলেন—তখন ভট্টাচার্য্য কহিলেন"তোমারই ত অন্যায় হইয়াছে। যে কোন স্থান হইতে প্রশ্ন করুন, এমন কথা বলিতে গেলে কেন? তোমার বাক্যের সমীচীন প্রয়োগ শিক্ষাই এখনও হয় নাই—কাজেই বিশেষ পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যও হও নাই। সুখী হইলাম—জগদীশ কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী করেন নাই।

তার পর ভ্রাতা কঠিন প্রশ্ন ও সঙ্গে সঙ্গে তর্কালঙ্কারের সোপহাসোক্তি দাদাকে শুনাইলেন। কক্ষ নীরব! ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধ্যানস্থ। বাহ্য জ্ঞান বিরহিত অবস্থা। কিছুক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সেই ধ্যান ভঙ্গ হইল; জ্ঞান ফিরিয়া আসিল,। "এই লও উত্তর" বলিয়া একটি কাগজে উত্তরটি লিখিয়া "এখন তাঁহার নিকট যাও" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভ্রাতাকে আজ্ঞা করিলেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কার যখন সেই উত্তরটি হাতে পাইলেন, তখন তিনি যেন কেমন হইয়া গেলেন। বাহ্যজ্ঞান লোপ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বপ্নে কথা কহার মত তাঁহার মুখ হইতে অস্পষ্ট ভাবে এই কথাটি উচ্চারিত হইল "উঃ কি বুদ্ধি! তবে পড়া শুনা কম।

সকলে অবাক হইয়া গেল। বৃদ্ধ পণ্ডিত প্রলাপ বলিলেন? কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশ তর্কালঙ্কার কহিলেন—বলিহারী ভট্টাচার্য্য! সাবাস্ বুদ্ধি! বৃথাই মাথা ঘামাইলে! কোন নূতন জিনিষ বাহির হইল না। অমুক গ্রন্থের অমুক পৃষ্ঠায় ইহা লিখিত আছে। জানা নাই; জানা থাকিলে আর এ বৃথা মাথা ঘামাইতে হইত না। এই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তর দেওয়া গদাধরেরই সাজে।

বস্তুতই জগদীশ তর্কালঙ্কার গদাধর ভট্টাচার্য্য অপেক্ষা বিদ্যায় বড় ছিলেন। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্য স্থানে স্থানে জগদীশ অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিশক্তির বিকাশ দেখাইয়াছেন। উভয়েরই অনেক গুলি প্রণীত গ্রন্থ আছে। রঘুনাথ শিরোমণির নব্যন্যায় গ্রন্থের (টীকাগ্রন্থ) দুই জনারই টিকা, পঠন-পাঠন হইয়া থাকে। শব্দশক্তি প্রকাশিকা, শক্তিবাদ, বুৎপত্তিবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি সারা ভারতের লোকেই মহা সমাদর করেন!

জগদীশ যখন প্রৌঢ়, গদাধর তখন নব্য। জগদীশের যে সময়ে অসংখ্য ছাত্র, অগাধ প্রতিপত্তি; গদাধর সেই সময়ে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। নব্য অধ্যাপকের নিকট কেহই তখন পড়িতে আসিত না। গদাধর বৃক্ষদিগকে শ্রোতা করিয়া গঙ্গার তীরে বসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। জগদীশের ছাত্রেরাই প্রথম প্রথম শুনিয়া যাইতে লাগিল। ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া গদাধরের তখন আর ছাত্রের অভাব হইল না। গদাধর নব্য। প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে জগদীশের

পার্শ্বেই গদাধরের স্থান হইল। উভয়েই উভয়কে বুঝিতেন। তবে জগদীশ তর্কালঙ্কার গদাধরের উপর একটু ঈর্ষা করিতেন এইমাত্র, জগদীশ তর্কালঙ্কার পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। গদাধর ভট্টাচার্য্য বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার আর গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম বাঙ্গালার কাহারও অবিদিত নাই, নব্য ন্যায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা রঘুনাথ, জগদীশ ও গদাধরের প্রতিপত্তি নৈয়ায়িক সমাজে সর্ব্বাধিক। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি বাস্তবিকই অতুলনীয়! দার্শনিক, নৈয়ায়িক, আলঙ্কারিক এবং শাব্দিকগণ সকলেরই গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করা উচিত।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

দর্প চূর্ণ।

(পৌরাণিক গল্প।)

ভগবানের এক নাম 'দর্পহারী'। তিনি কাহারও এতটুকু গর্ব্বও সহ্য করিতে পারেন না, অহঙ্কারীর অহঙ্কার চূর্ণ করেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'দর্পহারী'।

ভক্তিমতী ব্রজবধূগণ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী ছিলেন, তাঁহাদের সে অহেতুকী প্রেমের—সে বিশুদ্ধা কৃষ্ণভক্তির—সে আদর্শ ভগবৎ-প্রীতির তুলনা নাই; কিন্তু তন্মধ্যে পরমা ভক্তিমতী শ্রীরাধিকার প্রেম-ভক্তিই ভক্তি-রাজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। তিনি ভক্তি-রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী ছিলেন! এমন কি তাঁহার অসাধারণ প্রেম-ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে ভক্তিমতী মহীয়সী মহিলা জ্ঞানে প্রাণাধিকা প্রিয়তমার উচ্চ সম্মান দানে যারপর-নাই প্রেম-প্রীতি প্রদর্শনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেন। মুহূর্ত্তের অদর্শনে তাঁহার প্রাণ রাধা রাধা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিত, তাঁহার রাধা নামের সাধা বাঁশরী দিবস-শর্ব্বরী "রাধা—রাধা" বলিয়া বাজিয়া বাজিয়া ধরণী-বক্ষে স্বর্গীয় পীযূষ-ধারা প্রবাহিত করিত!

একদা ব্রজগোপিগণের মনে এতটুকু ভক্তির অভিমান জাগিয়াছিল, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, আমরা সকলেই ত কৃষ্ণ-প্রেমের ভিখারিণী,—সকলেই তাঁহার শ্রীচরণ-সেবা প্রার্থিনী দাসী, তবে শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রিয়তমা মহীয়সী মহিলা বলিয়া এরূপ মহাগৌরবের উচ্চাসনের অধিকারিণী হইলেন কোন্ গুণে? ভগবানের একি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব?

অন্তর্যামী ভগবান তিনি, গোপাঙ্গনাগণের এ মনোভাব তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না; তিনি তাঁহাদের প্রবোধের জন্য—ভক্তের ভক্তির অভিমান চূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভীষণ শিরঃপীড়ার ভাণ করিয়া শয্যায় পড়িয়া 'আহা—উহু' ও ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন! যেন বিষম ব্যাধির দুঃসহ যাতনায় তাঁহার প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে; বুঝি এ যাত্রা আর তিনি বাঁচিলেন না! শ্রীকৃষ্ণের এ শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে ব্রজাঙ্গনাগণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! সমাগত ব্রজবধূগণ আকুল-চিত্তে

ত্যাগ করিয়া প্রাণপণ যত্নে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কত চিকিৎসা—কত ঔষধের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সে কল্পিত ব্যাধি দূর হইল না। ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কাল্পনিক যন্ত্রণায় সহসা শ্রীভগবান মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শোকে দুঃখে ব্রজাঙ্গনাগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সে নিত্য আনন্দপূর্ণ পুণ্য পবিত্রতাময় ধাম মহাবিষাদের গভীর আঁধারে সমাবৃত হইল। কত চিকিৎসক দেখিলেন, কত মহামূল্য ভেষজ দ্রব্য-সম্ভার আনীত হইল, কত প্রলেপ, সেক, তৈল, বটি—কত অমোঘ মুষ্টিযোগসমূহ ব্যবস্থা করা হইল, কিছুতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কঠোর পীড়া—সেই দুর্জ্জয় কল্পিত ব্যাধি প্রশমিত হইল না।

সর্ব্বশেষে যে বিচক্ষণ বৈদ্যরাজ তাঁহার চিকিৎসার্থ আনীত হইলেন, তিনি উত্তমরূপে রোগ পরীক্ষা করিয়া বিষাদ-গম্ভীর বদনে বলিলেন,—"এ বড় কঠিন রোগ—ইহা অতি কঠোর আধ্যাত্মিক ব্যাধি। এ পীড়া ত এমন সাধারণ ঔষধে প্রশমিত হইবে না। এ রোগ যেমন শক্ত, ইহার ঔষধও তেমনি অতি কঠিন —সুদুর্লভ!

চিকিৎসকের কথা শুনিয়া সমাগত ব্রজবধূগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"তা ঔষধ যত দুর্লভই হউক না কেন, আপনি বলুন, আমরা প্রাণপণ যত্নে তাহা সংগ্রহ করিব—হৃদয়-রক্ত দানে ভগবানের এ কঠোর ব্যাধি প্রশমিত করিতে একান্ত যত্ন করিব।

চিকিৎসক বলিলেন,—"শ্রীভগবানের জন্ত প্রাণ বা হৃদয়-শোণিত দান, সে ত অতি তুচ্ছ —অতি সহজ কথা, তাহা ত সকলেই দিতে পারে; যাহার প্রদত্ত প্রাণ, তাঁহাকে প্রদান করিব, এ আর একটা বিচিত্র কথা কি? কিন্তু এ যে প্রাণ বা হৃদি-রক্ত দান নহে, এ দান প্রাণদান অপেক্ষাও কঠোর—আত্মহৃদয়শোণিত প্রদান অপেক্ষাও অতি ভীষণতর দান! এ দানের বিনিময়ে অনন্ত নিরয়-যাতনা লাভ অনিবার্য্য। কে এমন মহাপ্রাণ মহাভক্ত এখানে বিদ্যমান আছেন, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পীড়াশান্তির জন্য—তাঁহার এ ভীষণ যন্ত্রণা উপশমের নিমিত্ত, যাচিয়া অনন্ত নরক বরণ করিয়া লইতে পারেন? এ ব্যাধির এক মাত্র ঔষধ ভক্ত-পদরেণু। জগতে ব্রজবধূগণের ন্যায় তাঁহার ভক্ত আবার কে? এ পীড়ার অমোঘ ঔষধ ভক্তিমতী ব্রজাঙ্গনার পবিত্র পদধূলি! শ্রীভগবানের ললাট-প্রদেশে ব্রজগোপীর পদ-রেণুর শীতল প্রলেপ ব্যতীত এ ব্যাধি দূর হইবে না।"

হরি! হরি! হরি! চিকিৎসকের এ কি বিষম ব্যবস্থা! এ কি বিচিত্র ঔষধ-বিধান! কথা শুনিয়া ভক্তিমতী ব্রজাঙ্গনাগণের মুখপদ্ম শুষ্ক হইয়া গেল, ত্রাসে কমল-আঁখি যেন আঁধার হইয়া আসিল; তাঁহারা অশ্রুপ্লুত পাণ্ডুবদনে একে অন্যের মুখপানে তাকাইতে লাগিলেন। ভগবানের ললাটে পদধূলি প্রদান করিয়া কেহই অনন্ত রৌরব বরণ করিয়া লইতে—আপনার সর্ব্বনাশসাধন করিতে সাহসী হইলেন না! ভগবানের মস্তকে—আপনার চিরারাধ্য প্রাণ-দেবতার পবিত্র শিরে পদরেণু দান, এত

কি মানুষে পারে ? এরূপ চিন্তাও যে মহাপাপ —অনন্ত নিরয়-যন্ত্রণাপ্রদ !

এদিকে কঠোর ব্যাধির দুঃসহ যন্ত্রণায় ভগবান মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভীষণ যাতনা অবলোকন করিয়া কোমলপ্রাণা ব্রজাঙ্গনাগণ অকস্মাৎ দুঃখে অজস্র অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। গভীর মর্ম্মবেদনায় তাঁহাদের করুণ হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। চারিদিকে 'হায় ! হায় !' রব সমুত্থিত হইল ! কিন্তু তথাপি দুর্জ্জয় নরক-ভীতিপ্রযুক্ত কেহই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র শিরে স্বীয় পদধূলি দানে সাহস করিলেন না।

কথাটা ক্রমে পরম ভক্তিমতী শ্রীরাধিকার কর্ণে পঁহুছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কঠোর ব্যাধি ও অপূর্ব্ব ঔষধের কথা শুনিয়া অমনি বিশ্ব ভুলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া যাইয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়া চিকিৎসককে বলিলেন,—"আমার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলে যদি ইঁহার এ দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণা দূর হয়, তবে এই লউন আমার পদধূলি—যেমন করিয়া দিতে হয় মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আপনি স্বহস্তে উঁহার ললাটপ্রদেশে লেপন করিয়া দিউন। ইনি রোগমুক্ত হইলেই হইল, ইঁহার এতটুকু ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত আমি হাসি মুখে অনন্ত নিরয় বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। আমার প্রিয়তমের—আমার প্রাণারাধ্য ধনের—শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের রোগ-যন্ত্রণা দূর হইলে আমি প্রাণে যে বিপুল প্রীতি অনুভব করিব, তাহার তুলনায় অনন্ত নরক-যন্ত্রণা অতি তুচ্ছ।" এই বলিয়া ভক্তিমতী শ্রীরাধিকা বৈদ্যরাজের হস্তে স্বীয় পদরেণু অর্পণ করিলেন।

হরি! হরি! হরি! মুহূর্ত্তে ইচ্ছাময়ের সে ইচ্ছাকৃত স্বকপোলকল্পিত ব্যাধি দূরীভূত হইল! তিনি প্রীতি-প্রফুল্লবদনে পরম ভক্তিমতী শ্রীরাধিকাকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তের সর্ব্বোচ্চ আসনে স্থান দান করিয়া ত্রিজগতে শ্রীরাধিকার অসাধারণ ভক্তির অত্যুচ্চ আলেখ্য —আদর্শ ভক্তের অসামান্য ত্যাগমাহাত্ম্য প্রদর্শন করিলেন!

কবি বলিয়াছেন,—

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিবিধ লক্ষণ।
লৌহ আর কাঞ্চন বৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
অতএব কাম-প্রেম অনেক অন্তর।
কাম অন্ধকার,—প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
(চৈতন্য চরিতামৃত)

ভগবানকে লাভ করা যায় ত্যাগে, ভোগে নহে, তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ—আত্মবিসর্জ্জনই তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। এ বিষয়ে শ্রীরাধিকার অসাধারণ আত্মত্যাগ—কামগন্ধহীন প্রেমের আর তুলনা নাই, তাই তিনি ভক্তিরাজ্যের রাজরাজেশ্বরী।

ব্রজবধূগণের ভক্তির অভিমান চূর্ণ হইল। এত দিনে তাঁহারা বুঝিলেন, আদর্শ ভক্তিমতী শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ প্রেমের তুলনায় তাঁহাদের প্রেম-ভক্তি কত ক্ষুদ্র—কত বাধিহীন।

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত আপনার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তাঁহার জন্য অনন্ত নিরয়-যাতনা বরণ করিয়া লইতে পারেন, আর তাঁহারা তাহা কল্পনা করিতেও ভয়ে শিহরিয়া উঠেন! তাই তাঁহাদের চেয়ে শ্রীরাধিকা এত বড়—তাই শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রেমের শিরোমণি—ভক্তি-রাজ্যের রাজ-রাজেশ্বরী।

কবি বলিয়াছেন—

"পীরিতি লাগিয়া আপন ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতে মিলয়ে তারে।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আশ।
পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

ভক্তিমতী শ্রীরাধিকা এই পীরিতি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অবস্থা হইয়াছিল,—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেহো মধুরবোল শ্রবণ শুনল
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥"

তখন প্রেম-ভক্তি বিহ্বলা শ্রীরাধিকার প্রাণ ভক্তিতে ডুবিয়া—প্রেম-রসে গলিয়া আপনাকে ভুলিয়া আপনি গাইয়াছিল,—

"বঁধুহে নয়নে লুকায়ে থোব,
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।"

তারপর তিনি কুলশীল ভুলিয়া—জাতি-মান সব বিস্মৃত হইয়া—দেহ-মন, আপনার সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ-পদে অর্পণ করিয়া প্রেম-ভক্তিতে উন্মাদিনী হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥" (চণ্ডীদাস)
"বঁধুহে আর কি ছাড়িয়া দিব,
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ,
সেখানে তোমারে থোব॥" (জ্ঞানদাস)।

ভক্তিমতী শ্রীরাধিকা হৃদয় চিরিয়া প্রাণের গুপ্ত কক্ষে শ্রীভগবানের পবিত্র আসন সংস্থাপন করিয়া,আত্মসুখ বিস্মৃত হইয়া কুল, শীল, লাজ, ভয় ত্যাগিয়া—বিশ্ব ভুলিয়া আপনাকে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন; তাই আজিও কৃষ্ণ-ভক্ত সাধক "রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া অগ্রে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তের গৌরব বর্দ্ধন—এক সঙ্গে ভক্ত ও ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণে ভগবানের সহিত ভক্তের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দানে আত্মতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীরাধিকার এত গুণ—এমন অনাবিল নিস্বার্থ প্রেম-ভক্তিই শ্রীভগবানকে 'রাধা-রাধা' বলিয়া এমন আত্ম-হারা করিয়া তুলিয়াছিল!

বস্তুতঃ শ্রীরাধিকার এ কাম-গন্ধহীন প্রেম-ভক্তিই আদর্শ প্রেম-ভক্তি। এ বিশ্বে এমন অসাধারণ প্রেম-ভক্তি আজ বিরল। তাই রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের এত গৌরব—তাই আজি ও ভারতের প্রেম-ভক্তির খনি, পবিত্র বৈষ্ণব-গৃহ "জয় রাধা-কৃষ্ণ" রবে নিয়ত মুখরিত।

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

কবিকুঞ্জ

কথামৃত।

ক্রোধ করি যদি কেহ বলে কুবচন,
তার প্রতি তুমি ক্রোধ করো না কখন।
আক্রোশকারীকে সদা কুশল কহিবে,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সদা তেয়াগিবে।
সপ্তদ্বার মুক্ত করি যে কথা কহিবে,
মিথ্যাকথা প্রবঞ্চনা তথা না রাখিবে।
আপন পৌরুষ যশ গোপন রাখিয়া,
সর্ব্বজীবে কর দয়া বিপন্ন দেখিয়া।
এই কয় উপদেশ করিলে পালন,
হইবে অবশ্য জয়ী মতের লিখন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী কাব্যনিধি।

বরষা।

ঝরিছে ঝর ঝর অবিরল বরষা।
বিটপী বন শাখে,
লুটিছে ঝাঁকে ঝাঁকে,
মুকুতা বারি যেন—
করি জগ সরসা।
বরষ পরে আজি, আসিয়াছে বরষা।
প্রখর রবির কর,
করেছিল জর জর,
আজিকে ভূধর সে
লভিয়াছে ভরসা।
বাঁচিবে যাঁরা যাবে সব ঘন বরষা॥
অই শোন অই শোন
গরজিছে ঘন ঘন
গগন মাঝ হ'তে—
দিয়া কোন সু-আশা।
বলিছে "ভয় নাই যাইতেছে" বরষা,
বায়ু গাহি "ভয় নাই"
চলিতেছে সাঁই সাঁই
চপলা মেঘ আড়ে
চমকিয়া সহসা
কহিছে "ভয় দূর করি দিবে বরষা,"
আর আছে কিবা ভয়,
বরষায় মধুময়
দরশ পেয়ে গেছি
লভিয়াছি পরশা,
বরষ পরে আজি আসিয়াছে বরষা।
শ্যামলা হয়েছে জগ
পেয়ে ধারা অনুরাগ,
কাটিয়া গেছে তার
নিরলতা নিরাশা।
গভীর গরজিয়া আসিয়াছে বরষা।
জগতের সব ঠাঁই
বারিহীন নাই নাই,
জীবন পেয়ে সব
হয়েছে কি সরসা।
ঝরিছে ঝর ঝর অবিরল বরষা॥

শ্রীনীহার রঞ্জন সিংহ।

অনুরাগ।

আমি প্রাণেতে আমার তোমার ছবিটি,
রেখেছি যতনে আঁকিয়া;

আমি ভকতি-কুসুমে পূজি নিরবধি;
সবটুকু প্রাণ ঢালিয়া!
আমি মুক্ত পবন-মাঝে আবেশে শুনি,
(তোমার) মোহন মুরলী-তান;
তুমি বাজাও বাঁশরী সে-স্বর লহরী
শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ!
আমি উষা-সমাগমে হেরি তব হাসি,
উজল মধুর জ্যোতি,—
প্রাণ মাতোয়ারা সে-হাসিটি তব,
মানস-নয়ন-প্রীতি!
তুমি মনে আঁকা আছ, হৃদয়ে পশেছ,
দেহেতে র'য়েছ মিশিয়া;
আমি প্রাণেতে আমার, তোমার ছবিটি,
গোপনে রেখেছি আঁকিয়া!
শ্রীযোগেন্দ্র মোহন বিশ্বাস।

নিবেদন।

"যখন হ'বে ধর্মের গ্লানি
গ্রহণ ক'রব অবতার"
বিস্মরণ কি হ'লে এখন
আপন বচন প্রতিজ্ঞার?
অগ্নি মূল্য সকল জিনিষ,
ছাইছে গগণ হাহাকার;
মাটীর সঙ্গে মিশছে দেখ
সকলের হায় কারবার।
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সব
সইছে দৈন্ত ক্লেশ অপার;
ইহার চেয়ে দুর্গতি হায়
আছে কি আর? কর বিচার।
প্রতি পলক, খুলছে শুধু
কতই দুঃখ শোকের দ্বার;
ধরণী আর ধ'রতে নারে
এত বিপদ রাশির ভার।
মনোরম এই বসুন্ধরা
হয় যে এখন ছারখার;
কর ত্বরা পাপের শাসন,
বহাও ধর্ম্ম-পীযূষ ধার।
শ্রীকালিচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ঝরা ফুল।

কোন্ সকালে ফুটেছিল সে গো
কোন্ বৈকালে গিয়াছে ঝরে।
কার আদরে মেতেছিল প্রাণ
কে দিল তাহারে পাগল করে।
সে যে ছিল সুখী সবার চেয়ে—
পূর্ণতা ছিল হৃদয় ছেয়ে।
কানন মাঝে ফুটিয়া আপনি
আপনি আবার বুজিয়া আছে;
আপনি ছিল আপন ভ্রমরে
সাদরে কেহ ত' ডাকেনি কাছে।
তবুও সে যে গো আপন প্রাণে—
গুঞ্জনে ভোর আপন গানে।
বৃন্ত-চ্যুত এখন তাহারে
করো না ঠাট্টা কঠোর প্রাণে।
মোহিয়াছিল একদিন সে গো
জগত আপন সুরভি দানে।
কালের ভীষণ পরশে আজ—
মূর্চ্ছিত সে যে ধরণী মাঝ।

কাল কবলে লুণ্ঠিত ধরা
তা' বলে ত' সে গো নহেক তুচ্ছ।
জগতে এ যে একদিন ছিল
আপন গরবে আপনি উচ্চ।
পতিত বলিয়া করো না ভুল
এ যে বোঁটা-ছেঁড়া শুকনো ফুল।
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সিংহ।

করুণা।

দরিদ্র আতুরে যেই ঘৃণা নাহি করে,
পরদুঃখে সদা যার অশ্রুরাশি ঝরে ;
অকাতরে করে যেই নিজ অন্নদান,
এ জগতে চিরদিন সে যে মহীয়ান্।
শ্রীগোপিকাকান্ত দে

ভুল।

ভুলিব তোমায় যত মনে করি
ভুলিতে যে পারি না।
ভুলিলে তোমারে থাকি যদি ভাল
পোড়া স্মৃতি ভুলে না॥
ভুলিতে গিয়া (সে) করুণ স্মৃতি
অশ্রুনীরে কেন গো ভাসি।
মাঝ হ'তে হেরি তবু তব ছায়া
মুছায় অশ্রুরাশি॥
মনেরে কহিনু মুছে ফেল স্মৃতি
সকলি ভুলিয়া যাও!
দিবস রজনী জীবনের কাজে
(কেবল) তাঁহার চরণ চাও॥

নাহি যেন উঠে (সে) স্মৃতি মধুর
পুনরায় ভুলে ভুলে।
নাহি যেন আসে দুরন্ত বাতাস
ভুলাতে আমারে ছলে॥
(আজি) চরণ চুমিতে এস হে বসন্ত
স্মৃতি পথে এস ত্বরা।
শেষের সে দিনে, সে সুখ বারতা দানে
ভুলায়ে দিও গো ধরা॥
শ্রীবলাই লাল মুনসী।

আকিঞ্চন।

(সিন্ধুমিশ্র—কাওয়ালী)

তনয়ে দানিয়ে দুখ,
তুমি যদি পাও সুখ;—
দাও মা যাতনা বেদনা
পাতিয়ে দিয়েছি বুক।
তোমারি মহিমা—এ দেহ উদ্ভব,
তোমারি চরণে দলিত হব;—
সম্ভব, বিভব তোমাতে উদ্ভব,—
তোমারি বাসনা আমাতে ফলুক।
চরণ পেষণে গুঁড়া হয়ে যাব,
রেণু রেণু হয়ে চরণে মিশিব;—
(তোর) আদর হতে মা অনাদর ভাল,—
দুখ দাও তারা—চে'য়ো না মুখ।
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, বি, এস, সি

অনুরোধ।

(১)

তুমি আছ আছ আছ,—

শুধু, এই গানটী গেও
হে-পরাণ প্রিয় !
পরশন নয়-দরশন নয়,—
আভাষ টুকু দিও।

২

দূরে যেথায় তারা ফোটে,
প্রাণে ফোটে ব্যাথা
ওই সেখানে থেকে-থেকে
সমীরণ কয় কথা
হে পরাণ প্রিয় !
পরশন নয়—দরশন নয়,—
আভাষ টুকু দিও ॥

৩

সন্ধ্যা যেথা নীরব থাকে
সারা রাতের মত,
কোলাহল সব থেমে আসে
হয়ে প্রতিহত,
হে-পরাণ প্রিয় !
পরশন নয়-দরশন নয়—
আভাষ টুকু দিও।

৪

প্রাণে যখন আগুণ জলে
জলে জলে দেহ,
তখন তোমার গানটী গেও
রবে না'ক কেহ
হে পরাণ প্রিয় !
পরশন নয়—দরশন নয়
আভাষ টুকু দিও।

৫

যখন, আকাশ কাঁদে বৃষ্টি-ছলে
হয়ে পাগল পারা,
অমানিশার ঝড় তুফানে—
নীরব সকল ধরা
হে-পরাণ প্রিয় !
পরশন নয়-পরশন নয়, —
আভাষটুকু দিও।

৬

সবাই যখন ঘুমে যাক্তে
আমি থাকি জেগে
প্রাণের ব্যাথা ডাক্‌লে কথা
কয় না-ক'সে রেগে—
হে পরাণ প্রিয়—
পরশন নয় দরশন নয়—
আভাষ টুকু দিও ॥

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার এম, বি।

উৎকণ্ঠিতা

সই, বল্‌তে পার কেন এমন হয় ?
দেখ্‌লে তারে প্রাণের মাঝে কেন তুফান বয় ?
শুনেছিনু নামটী শুধু তার,
কান্তি তাহার দেখিনি কভু আর,
অজানা দেখে কেন এ অজানা ভয় !
সই, বল্‌তে পার কেন এমন হয় ?
সই, বলতে পার পরান কেন টলে ?
দেখ্‌লে তারে আকুল হৃদয় কেন লো পড়ে চলে
কত কথা কইতে মনে হয়,
লজ্জা এসে পেছন টেনে লয়,
গাঁথি মালা, আবার রাখি তুলে ;
সই, বলতে পার পরাণ কেন টলে ?

সই, আঁখি কেন তারি পানে ধায় ?
দেখ্‌লে তারে সারা বুকে তড়িৎ বয়ে যায় ?
গোপনে তারে দেখ্‌তে সদা চাই,
ঐ চরণে বাধতে আপন ঠাঁই,
পাগল বুকে সরম এসে যায়,
তবু, আঁখি কেন তারি পানে ধায় ?
সই, বল্‌তে পার কেন এ দারুণ আশা ?
পাব তারে প্রাণের মাঝে কেন এ নীরব ভাষা ?
স্বপনে লো সই দেখেছি তারে রাতে,
ঊষার কোলে প্রভাত গানের সাথে,
কেন লো এমন। কেন এ দারুণ আশা !
এ কি তবে প্রণয় লো সই, এই কি ভালবাসা ?

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ নিয়োগী।

কুচবিহার বিপ্লব।

প্রথম বিপ্লব।

কুচবিহারের বক্ষঃদেশ প্লাবিত করিয়া, যে সময় সহস্র অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, যে সময় আইন-পদদলিত হইয়া কুচবিহার ভূমি কম্পিত ও নির্জ্জিত হইতেছিল, সেই সময় পুরুষ-কেশরী বিক্রমসিংহ রোগশয্যায় শায়িত হইয়া, অসহ্য রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে একদিন হঠাৎ একদল লুণ্ঠনকারী বা দস্যু তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে, রোগ-কাতর-পতি, পত্নী ধর্ম্মেশ্বরীকে কহিলেন, অয়ি পতিব্রতে! আমার লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজের বলিতেও কিছু রহিল না। অয়ি শোভনে! তোমার শরীর শোভন-সুন্দর অলঙ্কারগুলিও অপহৃত হইল; তুমি এতদিনে নিরাভরণা হইলে। অয়ি সুন্দরি! ভবিতব্যতার অখণ্ডনীয় নিয়মে এই দুর্দ্দিনে রোগগ্রস্ত প্রাণে আমিও সর্ব্বস্বান্ত হইলাম।" ধর্ম্মেশ্বরী কহিলেন, "স্বামিন্! জ্ঞানধর্ম্মই তোমার পরিচ্ছদ হউক। আপনি সামান্য বিভবের জন্য কেন ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন! অন্তরকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান করুন, ধর্ম্মই আপনাকে ধারণ করিবেন। সৎচিন্তায় ব্যাপৃত থাকুন, সৎজ্ঞানে ভগবানকে চিন্তা করুন, তিনিই আপনার মঙ্গল সাধন করিবেন। রোগ-শয্যাপরে শয়ন করিয়া মানসিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়া ভ্রাম্যমান হইবেন না। মনে করিবেন না, আমি নিরাভরণা হইয়াছি। পতিই তো রমণীর আভরণ স্বরূপ। আপনি বর্ত্তমান থাকিতে আমার অন্য কি অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইবে? মিথ্যা চিন্তায় কেন জড়িত হইতেছেন।" বিক্রমসিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন, "অলঙ্কার স্ত্রীজাতির একটা সম্পদ বটে, কি সভ্য, কি অসভ্য, সকল জাতীয়া রমণীগণই মূল্যবান অলঙ্কার ধারণ করেন। আমি অভাবে ঐ অলঙ্কারগুলি তোমার জীবনের শেষ সম্বল রূপে পরিগৃহীত ও পরিগণিত হইত, উহাতে তোমার জীবনের একটা সুযোগ বর্ত্তমান রহিত।"

ধর্ম্মেশ্বরী সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "নাথ! কেন অশুভ চিন্তা মনে স্থান দান করিতেছেন। উহা আর মুখে আনয়ন করিবেন না। আপনার চরণতলে আশ্রয় লাভই আমার জীবনের শেষ সম্বল। ভগবান করুন, ঐ সম্বল হইতে

যেন প্রবঞ্চিত না হই। ভগবৎ-কৃপায় আপনার স্বাস্থ্যোন্নতি হউক। বিভু-কৃপাবলে আপনি সজীব ও উত্তেজিত পরাক্রম হউন। মঙ্গলময়ের মাঙ্গল্যপূর্ণ ধরাধামে মঙ্গলময় কার্য্য-পরম্পরা জাগতিক হিতের নিদানস্বরূপ হউন, অনন্ত বিভু-সম্পদের মধ্যে ইহাই একমাত্র প্রার্থনীয়।

বিক্রমসিংহ বলিলেন,—"ধর্ম্মেশ্বরি! তুমিই আমার জীবন-মরুভূ উৎস্য। তোমার মনোহারিণী,প্রবোধদায়িনী,অমৃতময়ী বচনাবলী শ্রবণে আমার অন্তঃকরণে সুধার সঞ্চার হইতেছে, তদ্ধেতু মনে হইতেছে, তোমার কল্যাণ সাধনার্থ বোধ হয়, এ যাত্রা মহাযাত্রায় পরিণত হইবে না। আমি জীবন লাভ করিব। তোমাকে রাখিয়া মরিতে আর ইচ্ছা হইতেছে না! অয়ি কল্যাণময়ি! তোমার প্রীতিপ্রদ কল্যাণময় বাক্যাবলী শ্রবণে একটী অনন্ত-শক্তিময়ী জীবন-সঞ্চারক বিদ্যুৎপ্রবাহ আমার অন্তঃকরণে প্রবাহিত হইতেছে। তোমার মাধুর্য্যময়ী বাক্যাবলী শ্রোত্রবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া অভাবনীয় প্রীতি উৎপাদন করিতেছে। ঐ বচন-সুধা হইতে যে উত্তেজনাময়ী শক্তিবিকাশ হইতেছে, তাহাতে অন্তঃকরণে তো শান্তিলাভ হইতেছে, পরন্তু অন্তঃকরণের সমতা সাধনের সহিত যোগের সাম্য ভাবও উপলব্ধি করিতেছি; সুতরাং সুনিশ্চিত যোগাযোগ্যতার বিষয়ে নিঃসংশয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিপুল আত্মসুখ অনুভব করিতেছি। দেবী! তুমি মনে রাখিও বিপদ কখনও একাকী কাহারও সহচর হয় না। অতএব এই যোগ-প্রবণতা এবং সর্ব্বস্ব হানি এ সময় বিচিত্রময় নহে, তাহা উত্তমরূপে প্রতীয়মান করিয়াছি। এখন ধৈর্য্য ধারণ করাই বিজ্ঞের কার্য্য।

ধর্ম্মেশ্বরী কহিলেন—বিজ্ঞতম! অপূর্ণতায় পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে, তোমাতে আমাতে জীবনের অচ্ছেদ্য বন্ধনরূপ পরিণয়কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। তোমার দুঃখে দুঃখভোগ করা ও সুখে সুখিনী হওয়া, মদীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য। দুঃখের বিভীষিকা দর্শনে ভীত নহি; তোমার জীবন যুদ্ধের সহায়তায়ও পরাঙ্মুখ নহি। স্বামিন্! সংসার সমরাঙ্গনের দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদ করিতে, তুমিই একমাত্র সহায়। যদি এ অধীনীর, জীবন রথের উশৃঙ্খল-বৃত্তি-অশ্ব-রজ্জু দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং এ জীবন-রথের সারথ্যকর্ম্মে নৈপুণ্য-প্রদর্শনে বিমুখ না হও, তাহা হইলে ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, শক্তি, সদ্ভাব প্রভৃতি অব্যর্থ মহাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিয়া, নিশ্চয়ই আমি বীর্য্যবতী বীর-রমণী বলিয়া প্রসিদ্ধা হইব। অতএব হে স্বামিন্! তুমি ভব-সমর-সমরাঙ্গনে ভীত, রণ-বিমুখ উত্তরের উৎসাহদাতা এবং ভীত-বিহ্বল জ্ঞানে তদ্‌সদৃশ মদীয় রক্ষকরূপে মহারথ বেশে রথারোহণে বিপদ-কুরু-সৈন্য-সেনানীদলের সম্মুখীন হইয়া, আপদ-অরি-দল-বিমর্দ্দনপূর্ব্বক, অপরিণত ভীত উত্তরের বীর-বপুকে রক্ষার ন্যায়, আমাকে রক্ষা করত উত্তরার অভিলাষিত বিচিত্র বসনাবলী সংগ্রহের ন্যায়, আমার ঈপ্সিত সৎকর্ম্মরাজি প্রসাধনে যত্নবান হও? কায়ার অনুগামিনী ছায়ার ন্যায় জ্ঞান করিয়া এ চরণাশ্রিতাকে অনুগৃহীত কর। এ বিষয়ে আর কি অভিজ্ঞান প্রদান

করিব। বিক্রমসিংহ বিহ্বলভাবে কহিলেন, —সতি! প্রেমাপ্লুতভাবে তুমি যাহা কহিলে, তচ্ছ্রবণে পাষাণ-বিনিসৃত শৈল-প্রস্রবণনিভ, আমার নির্দ্দয় প্রাণেও প্রেমধারা প্রবাহিত হইতেছে। সরলভাষিণি! তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান তোমাকে উদ্বুদ্ধ করুক, তদ্বিষয়ে আর কি উপদেশ দিব? তবে একটী প্রবলাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উদ্রিক্তভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে, তুমি একান্ত প্রাণে ঈশ্বরের উপাসনা করতঃ, বিপদবারণ মধুসূদনের সন্নিধানে আমার মঙ্গল প্রার্থনা কর। বিভু যেন মদীয় বিপদোত্তীর্ণের ও রোগারোগ্যের সহায় রূপে উপনীত হন।

প্রফুল্লান্তঃকরণে ধর্ম্মেশ্বরী প্রত্যুত্তর করিলেন,—"স্বামিন্! যাহার প্রাণ পরার্থে নিয়োজিত, দেশোদ্ধারের জন্য, সতীর গৌরব রক্ষার্থে যিনি নিঃসঙ্কোচে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনে কাতর নহেন, এ হেন স্বনামধন্য বীর-পুরুষকে ভগবান অবশ্যই পরিত্রাণ করিবেন। যদি তাহাই না হয়, তবে শিবদাতা শিবের অকলঙ্ক নামে কালিমা লিপ্ত হইবে। নাথ! দুর্দ্দিনের বিষয় চিন্তা করিয়া কাতরতা প্রকাশ করিবেন না, অন্তঃকরণ প্রফুল্ল রাখুন, আরোগ্য লাভ বিষয়ে কৃতপ্রযত্ন হউন। স্বদেশ-দ্রোহ ঔৎপাতিক দস্যুভীতি প্রভৃতি বিবিধ অত্যাচারে দেশ পূর্ণ হইয়াছে। জন্মভূমি কুচবিহারে কি ভীষণ দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে দেখুন। এ সময়ে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান সম্ভবে না।" ধর্ম্মেশ্বরী নীরব হইয়া কিছুক্ষণ পরে বহুবিষয়িনী আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বিপ্লব।

নির্ম্মল চন্দ্রিকাজাল বিস্তার করিয়া চন্দ্রদেব আকাশে উদিত হইয়াছেন। মধুমাসের সান্ধ্য সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া নিজ অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়াছে। জ্যোৎস্না-পুলকিতা রজনী নিস্তব্ধতার অনন্ত শান্তি আনয়ন করিতেছে। সমস্তই নীরব, সমস্তই প্রসন্নতাময়। জগৎ হাস্য-সুধা বর্ষণ করিতেছে।

গৃহবাটিকার পার্শ্বে মন্দির। মন্দিরের সম্মুখভাগ চন্দ্রিকা প্রসারিত। ফুল্ল প্রসূনের ন্যায় একটি দেবীমূর্ত্তি তথায় দণ্ডায়মানা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন,—

"হে পবিত্রতাপূর্ণ ভগবন্! তুমি অশেষ মঙ্গলের আকর এবং অচিন্তনীয় করুণায় প্রবহমান! তোমার করুণা-প্রস্রবণ প্রবহমান হউক। ঐ করুণা-প্রস্রবণে স্নাত হইয়া, আমার রোগপ্রবণ স্বামী জলদজাল-নির্ম্মুক্ত প্রভাকরের ন্যায় বিকাশমান হউন। তোমার করুণা-ধারা সর্ব্বত্রই বিনিসৃত হইতেছে। গ্রহে, উপগ্রহে, দিবাকরে, নিশাকরে ভূভুর্বস্ব মহ, জনলোকে, রসাতলে, পাতালে; এমন কি প্রাণকে প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া, সর্ব্বত্রই করুণা বারি সিঞ্চন করিয়া, সকলকেই সিক্ত করিতেছ। জগতে এমন জীব নাই, ধরাধামে এমন ব্যক্তি নাই, যাহার প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি পতিত হইতেছে না।

হে জগন্নাথ! তুমি জগতের কল্যাণ ব্রতে ব্রতী হইয়া, কখনও নরাকারে, কখনও মৎস্যাকারে, কখনও বামনাকারে, ইত্যাদি বিবিধাকারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দৈব ও জনগণের

মঙ্গল সাধন করিয়াছ। তুমি করুণা-নিদান, তোমার করুণা অনন্ত। আমি নর,—স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি অবলা, অধিক আর কি বলিব, দেব! তুমি অনন্ত, তোমার অন্ত—কিরূপে বুঝিব। যদিও তোমার অজ্ঞেয় করুণা প্রভাব আমার বুদ্ধির অনধিগম্য, তাহা হইলেও স্থূল দৃষ্টিতে তোমার শক্তিশালীতা ও দয়া প্রতিভাত হইতেছে। একাকারে নহে, বিবিধাকারে। লক্ষাবধ প্রাণি-জঠরে জাত সন্তানের স্থিতি, আহার, পরিপুষ্টিতে, ক্রম-বর্দ্ধনে নিজ করুণার পরিচয় দান করিতেছ। শুধু মানব কেন, পশু-সন্তান কাহারও নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলেও, মাতৃস্তন্য পানে যে স্বভাবজ বুদ্ধি লাভ করিয়াছে,তাহাতেই তাহার জীবন রক্ষা হইতেছে। ইহাতে তোমার দয়ার বিশালত্বই বুঝা যাইতেছে। অনন্ত-কাল বিহারী নভোমণ্ডলের অত্যুচ্চ প্রদেশে হীরক খণ্ডের ন্যায় তারকারাজি মিটি মিটি, ঝিকি মিকি জ্বলিতেছে এবং মেঘজাল সমাকীর্ণ সরিৎপতি অম্বুধি বাত্যা বিতাড়িত হইয়া যে গম্ভীর গর্জনে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলিতেছে, তাহার অন্তঃস্থলে; বিরাটবপু নভঃমণ্ডলের প্রান্ত দেশে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগমে, হিমমণ্ডল প্রদেশের হিমানী পতনে, কি তত্ত্ব নিহিত আছে?

তাহা বুঝিলে, হে প্রভো! তুমি আমাকে যে স্বাভাবিক প্রজ্ঞা প্রদান করিয়াছ, তাহার বলেই বুঝা যায় যে জগন্নাথ! তোমার আশু করুণাতেই অজ্ঞাত প্রদেশের অজ্ঞেয় কার্য্যসমূহ সংঘটিত হইতেছে। তোমার করুনা বলেই জাগতিক সমস্ত কার্য্য শৃঙ্খলিত ও পরিপোষিত হইতেছে। হে দেব! তুমি যখন সর্ব্বত্রই আশু করুণাকণা বিতরণ করিতেছ, তখন আমার স্বামীর প্রতি করুণা বিতরিত হইবে না?

ধর্ম্মেশ্বরী তন্ময়-চিত্তে প্রার্থনায় রত হইয়াছেন, স্বামীর জন্ত তাহার প্রার্থনা অনন্ত। এ প্রার্থনা কতক্ষণে শেষ হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। বায়ুকোণে জলদজালের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হুড়, হুড়, দুড়, দুড়, শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যুগান্ত কালীন ঘোর গ্রাস-নিন্দিত নীরদপটলের কোলে শত বিজলীপাতে ভীষণ ঘোর ঘটার আবির্ভাব হইয়াছে, সতীর সে দিকে দৃক্‌পাত নাই। সতী প্রার্থনায় রত। কিছুক্ষণ পরে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের সহিত মুষল ধারে বারিপাত হইতে লাগিল, তাহাতেও সতীর চাঞ্চল্য নাই। তখনও সতী একাগ্রমনে প্রার্থনা করিতেছেন, হে ভগবান্! তোমার অন্ত বুঝিতে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং বারিধি কুমারী যখন তোমার পদসেবা করিয়া থাকেন। তখন আমি কিরূপে তোমার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিব বিভো! তুমি বিষয় ভোগে অনাশক্ত উর্দ্ধরেতা যোগ নিরত যোগী-গণের ধ্যেয় হইলেও জ্ঞেয় নহ। তুমি যদি জ্ঞেয়ই হইতে, তাহা হইলে যোগীরা আধার হইতে আধেয় গ্রহণের ন্যায় তোমার প্রদত্ত করুণা লাভ করিয়া অবশ্যই পরিতৃপ্ত হইত। তাঁহাদের কঠোর তপস্যার বিরতি ঘটিত। তুমি বিষয় বাসনাহীন তাপসগণের দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য, বিবিধ ছলনা চাতুরী প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্ত প্রয়াস

লাভ কর? ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি শিশুগণকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিলেও তাহাদের সরল বিশ্বাসভক্তি অবগত হইয়া অবশেষে সকলকেই অশেষ করুণাকণা বিতরণ করিয়াছ।

ঈশ! সুধীগণ বলিয়া থাকেন, তুমি নির্গুণ। সগুণ পথে ভ্রাম্যমান হইতে হইতে তোমার নির্গুণ আলয়ে সমুপস্থিত হইতে হয়, তাই অসম্ভাবিত কালবিলম্ব হয়; এইজন্য মনে করি তুমি দয়াহীন, তুমি নিষ্ঠুর। কিন্তু ইহা কি সত্য, ইহা কি যথার্থ? পিতৃ মাতৃ-হারা দিগ্‌ভ্রান্ত সন্তান যেমন সুদূরস্থিত পিতা মাতাকে আহ্বান করিলেও, তাহার করুণ-আহ্বান তাহাদের শ্রুতিগোচর হয় না।

তদ্রূপ কি এই জ্ঞানহীনা সন্তানের সকরুণ আহ্বান তোমার সুদূর বৈকুণ্ঠালয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে না। দয়াময়! আমি অসহায়া। আমার ভগ্ন কণ্ঠের এই অবিরাম চীৎকারের প্রতিধ্বনি কি তোমার নিকট ধ্বনিত হইতেছে না। যদি তাই হয়, তবে তোমার এই অধম সন্তানের কাতর ক্রন্দন নিশ্চয়ই নিষ্ফল। তবে কি, আমি তোমার করুণাকণা লাভ করিতে পারিব না? ভক্তাধীন! তুমি তো যুগে যুগেই ভক্ত সন্তানের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছ, তবে আমার বাসনা পূর্ণ না হইবে কেন? বিশ্বনাথ! তুমি বিশ্বের অণুচ্চে বিরাজমান আছে। কিন্তু বুধগণ তোমাকে ঘটেশ্বর বলে? সর্ব্বঘটে বিরাজ কর বলিয়াই তো ঘটেশ্বর নাম। তবে তুমি আমাতেও বিদ্যমান আছ, আমার বিলাপধ্বনি শুনিতেছ? জগদীশ্বর তুমি ভাবসমষ্টির আধার, অধম আমি তোমার ভাব কিরূপে বুঝিব? হে অচ্যুত! জীব যতই কেন, নিরবলম্বন বা নাস্তিক হউক, একদিন না একদিন সে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না। সৃজিত বস্তু দর্শন করিলেই স্রষ্টাকে হৃদয়ঙ্গম হয় সুতরাং ঘোরতর নাস্তিকও তোমার সৃষ্ট পদার্থসকল দর্শন করিয়া, যখন তোমায় ভুলিয়া থাকে না, তখন কিরূপে তোমার সন্তান ভুলিয়া থাকিবে? অতি ঘোরনারকী, আস্থাহীন নাস্তিকও তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বজীবই ন্যূনাধিক পরিমাণে তোমাতে বিশ্বাস ব্যক্ত করে; পরন্তু তুমি কাহারও হৃদয়-মন্দির হইতে একেবারে চ্যুত হও না, তাই তোমাকে পরম ধীমান মনীষীরা অচ্যুত নামে তোমার স্তুতি করিয়া থাকেন।. হে অচ্যুত! তোমার স্তুতিবাদীগণকে পরম অভয় প্রদান কর।

কৃপাময়, দাসীকে দয়া বিতরণ কর, আমার রোগ কাতর পতিকে স্বাস্থ্যোন্নতি দান কর। কুচবিহারবাসী নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, তাহাদের রোদন ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইতেছে, প্রিয়জন মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, বিগলিত অশ্রুধারায় স্নেহময়ী জননী, প্রিয়তমা ভার্য্যা, অপগণ্ড সন্তান ধরাতল সিক্ত করিতেছে, তাহাতে কি তোমার স্বাভাবিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। ঠাকুর? তুমি কি সমস্তই অতিক্রম করিয়া নির্গুণত্ব লাভ করিয়াছ, অথবা চরম নির্ম্মমতার ভাব প্রদর্শন করিতেছ। জগদীশ! তুমি অনেকের পক্ষে অতি নির্দ্দয়, অতি নিষ্ঠুর। অনেকে তোমাকে মমতাহীন বা দয়াহীন বলিয়া মনে করে না। পক্ষান্তরে

অত্যাচার, পক্ষীতে অত্যাচার, জীবের অত্যুচ্চ শ্রেণী মানুষে অত্যাচার, সকলেই অত্যাচারের বশবর্ত্তী। সংসারের ধর্ম্ম কর্ম্ম বিলোপ হইয়া যাইতেছে। মানুষের নির্ম্মল ভাবময় পবিত্র স্বভাবের বিপর্য্যয় সংঘটিত হইতেছে। পাপ কর্ম্মের বিষময় ফল শরীরকে আশ্রয় করিতেছে, তাই রোগোৎপত্তি হইয়া, সৌন্দর্য্য সুখময় জীবনের নিষ্পাপ সুরভি সুখ হরণ করিয়া লইতেছে। সুতরাং তোমাকে দোষী বলিব কি প্রকারে। আহার বিহারের অত্যাচারে, অতিরিক্ত পরিশ্রম অত্যাচারে, পাপময় কর্ম্ম প্রভৃতি বিবধ অত্যাচারে, মানুষ নিজ সুখ সম্পদে কণ্টক প্রদান করিতেছে।

শ্রীচন্দ্রদেব রায় বর্ম্মণ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শোণিততর্পণী। রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। পুস্তকখানির সকল প্রবন্ধই ত্রিশূল পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের ভাবাবলম্বনে উহা লিখিত; গ্রন্থকারের কবিত্বের পরিচয় এ পুস্তকের ভাব ও ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে; হিন্দুমাত্রেই ইহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন।

রায়বাঘিনী বা বঙ্গ-বীরাঙ্গনা। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত মূল্য ১॥ টাকা। উপন্যাসে ঐতিহাসিক তত্বের আলোচনা; গ্রন্থকার সাহিত্য সমাজে নূতন হইলেও রায়বাঘিনীতে তিনি যে সকল ঐতিহাসিক তত্বের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য; এককালে হাওড়ার অন্তর্গত গড় ভাবানীপুর গ্রামে যে ব্রাহ্মণ রাজবংশের এত অভ্যুদয় ছিল, তাঁহাদের প্রবল প্রতাপে যে মুসলমান নরপতিগণও ভয়ে শশঙ্কিত হইতেন, এই পুস্তকে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুরমণীর বীরত্ব কাহিনী এই পুস্তকে যাহা দেখান হইয়াছে—তাহা বাস্তবিকই চমৎকপ্রদ, পাঠক মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত ও মোহিত হইবেন। বিধুবাবু গ্রামে গ্রামে যাইয়া অনেক প্রাচীন কাহিনীর সার সত্য সংগ্রহ করিয়া ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কালাপাহাড়ের কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য, পুস্তকের ভাষা বেশ গুরু গম্ভীর, সরস অথচ সরল। পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। আমরা সাহিত্যসেবী পাঠক মাত্রকেই ইহার এক এক খানি ক্রয় করিতে অনুরোধ করি। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং হাওড়া কর্ম্মযোগ প্রেসে পাওয়া যায়।

পদ্যগুচ্ছ। শ্রীযুক্ত করুণাময় কর প্রণীত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। গ্রন্থকার নূতন ব্রতী, পদ্যের স্থানে স্থানে কষ্টসাধ্য মিলন থাকিলেও পদ্যগুলি নিতান্ত অপাঠ্য হয় নাই। চর্চ্চা থাকিলে ভবিষ্যতে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। সম্পাদক।
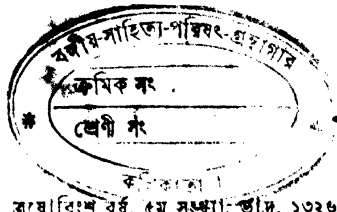
আলোচনা, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২৬ সাল।

মনুষ্যজন্মের সার্থকতা

শৈশবে বৈরাগীর মুখে যে মন মাতান মধুরস্বরে "পেয়েছ মনুষ্য জন্ম এমন জন্ম আর পাবে না" গীত শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা এখনও যেন বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া কর্ণকুহরে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মনুষ্য জন্ম কি এতই দুর্লভ? কি করিলে এই জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা যায়?

বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে, মনুষ্যের ভিতর অসীম শক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। দেশ-কাল-পাত্রভেদে প্রাকৃতিক অবস্থানুযায়ী মনুষ্য কতকগুলি সহজাত শক্তি লইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া থাকে, কাহারও শক্তি অধিকতর স্ফুরিত, কাহারও বা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। শক্তির বিকাশ সাধন করাই সকল মনুষ্যের লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে ক্রমোন্নতি জগতের ধারা; সেই ক্রমোন্নতি সাধনের জন্য মানুষের ইচ্ছা যদি বলবতী হয়, তাহা হইলে তাহা অতি সত্বর সম্পাদিত হয়। প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগরিত করা—আত্মার উন্নতি সাধন করা হিন্দুধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ-বিশেষ, সেই জীবাত্মাকে স্ফুরিত করিতে পারিলে তাহা মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া বিমল কিরণ বিতরণ করিতে সমর্থ হয়। ক্রমে ক্রমে মনুষ্য এমন অবস্থায় আসিয়া পড়ে যে, তখন পরমাত্মার সহিত তাহার আর পার্থক্য থাকে না, তখন আমিই সেই—সোহহং জ্ঞান তাহার জাগিয়া উঠে।

আত্মার বিকাশ সাধনের উপায় শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। শাস্ত্রকারগণ নানা প্রকার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ জ্ঞানযোগের পক্ষপাতী, কেহ কর্ম্মযোগের—কেহ বা ভক্তি-যোগের। এক সময়ে ভারতের তপোবনে জ্ঞানযোগের পরাকাষ্ঠা হইয়া গিয়াছে, মহা মহা যোগিগণ যোগবলে অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়া এক এক জন ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া চিন্ন যোগবলের অলৌকিক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তার পর কুরুক্ষেত্রের সময়ে ভগবানের মুখ হইতে কর্ম্মযোগের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এখন জ্ঞানযোগ কিংবা কর্ম্মযোগের কাল আর নাই। জ্ঞানযোগের পথিক হইতে হইলে অল্প সময়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না। যখন লোকের পরমায়ু বেশী ছিল, তখন লোকে জ্ঞানযোগের আশ্রয়

গ্রহণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। কলির জীবের পরমায়ু অতি অল্প। এই অল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞানযোগে সিদ্ধি লাভ করা কলির জীবের পক্ষে অসম্ভব, কর্ম্মযোগের পক্ষেও ঐ কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। যখন স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে কর্ম্মযোগের বিজয় দুন্দুভি ঘোষিত হইয়াছিল, তখন মানুষের দৈহিক অবস্থা কি এখনকার মত ছিল? অবস্থার ভেদে ব্যবস্থাও ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। দ্বাপরে ভগবান্ আবির্ভাব হইয়া বলিলেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

কলিতে অল্পায়ু, বলহীন মনুষ্য শাস্ত্রের জ্ঞানযোগ কিংবা কর্ম্মযোগের দ্বারা অবলম্বন করিয়া বিফলমনোরথ হইতেছে দেখিয়া, এবং ক্রমশঃ ভগ্ন মন্ত্রে লোকের আস্থা কমিয়া আসিতেছে, সুতরাং ধর্ম্মের গ্লানি হইতেছে দেখিয়া কলিতে ভগবান শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেশে ভক্তিযোগের বন্যা বহাইয়া দিলেন। কলির জীবের পক্ষে মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। "কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

হিন্দু ধর্ম্মের দৃষ্টি বরাবর অন্তরের দিকে। আত্মার উন্নতি সাধন মানসিক বৃত্তিচয়ের সংস্কার হিন্দু শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য। হিন্দুর নিকট বাহ্য জগৎ অতি তুচ্ছ। নিজ শরীর কিংবা ইন্দ্রিয়ের সেবা করা ত হিন্দু শাস্ত্রে ভূয়োভূয় নিষেধ করা আছে, অধিকন্তু মনে মনেও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলির আলোচনায় নিমগ্ন থাকাও অতিশয় দোষের কাজ। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যে ভণ্ড যোগী, বাহতঃ বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়নিচয়কে নিরুদ্ধ করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ব্যাপারের আলোচনায় থাকে সেই বিবেকবিহীন ব্যক্তিকে ভ্রষ্টাচার বা দাম্ভিক বলা যায়।

তবে শ্রেষ্ঠ কে? পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্ম যোগমসক্ত স বিশিষ্যতে॥

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন! যিনি মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়নিচয়কে আয়ত্তীকৃত করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা কর্ম্মরূপ যোগের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তিনিই শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হন।

ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতায় মনুষ্য জন্মের সার্থকতা হয় না; তাহার কারণ, তাহাতে যে সুখের উদ্রেক হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে লোকের বুদ্ধি বৃত্তি হ্রাস হয়, মনের শান্তি বিনষ্ট হয়, ও মানবকে ক্রমে ক্রমে পশুতে পরিণত করে। যাহা সত্য, যাহা নিত্য, যাহা মানসিক শান্তির চির আকর, যাহার উত্তেজনা আছে, অথচ অবসাদ নাই, যাহা কেবল বর্ত্তমানেই পর্য্যবসিত নহে, অধিকন্তু ভবিষ্যতেরও আনন্দদায়ক তাহাই শ্রেয়ঃ, তাহাই অবলম্বনীয়—হিন্দুধর্ম্ম একথা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে জগৎকে জানাইয়া দিয়াছে। সেইজন্য আমরা তাই আমাদের

ঘরের খবরের মর্ম্ম আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও করিতে পারি না, তাই আজ আমরা পথভ্রান্ত হইয়া আপনাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতেছি।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এখনও মানবের আদর্শ স্থির করিয়া দিতে পারেন না। কাহারও মতে Greatest good of the greatest number অর্থাৎ অধিক সংখ্যক লোকের মঙ্গল সাধন করা, আবার কাহারও মতে Eat, drink and be merry অর্থাৎ খাও, দাও, ফূর্ত্তি উড়াও—ইহাই মনুষ্য জন্মের চরম লক্ষ্য। পরজন্ম যদি বিশ্বাস না করাও যায়, কিংবা পরজন্মের সুখ-দুঃখেও যদি আমরা সন্দিহান হই, তাহা হইলেও ইহজন্মেও ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা মানবের শ্রেয়ঃ লক্ষ্য হইতে পারে না। মনের বলই মানবের প্রকৃত বল, মার্জ্জিত বুদ্ধিই মানবকে অন্যান্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে। ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা সেই মনের বল এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে হীনপ্রভ করিয়া ফেলে। সুতরাং এইরূপ আসক্তিকে দমন করিয়া রাখাই মানবের চরম লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

আজ জড়বিজ্ঞান আমাদিগকে মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে টানিয়া লইতেছে। রেল, জাহাজ, তারহীন টেলিগ্রাফ, আকাশযান, তাড়িৎ প্রবাহের অদ্ভুত কার্য্যাবলী প্রভৃতি আধুনিক যুগের নানা প্রকার যন্ত্রপাতি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে, আমরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছি, মনোবিজ্ঞানের দিকে আমাদের আর বড় একটা দৃষ্টি নাই। কিন্তু ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের কণামাত্র সূত্র অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ যে কত অদ্ভুত রহস্যের আবিষ্কার করিতেছেন, তাহা অন্ধ আমরা, অজ্ঞান আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। ভারতে কি জড়বিজ্ঞান কিছুই ছিল না? পুরাণ, ইতিহাস কি জড়বিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে না? মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদিতে এমন সব যান, এমন সব অস্ত্র-শস্ত্র, জড়বিজ্ঞানের এমন সব অদ্ভুত ব্যাপারের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহা বর্ত্তমানের জড়বিজ্ঞান এখনও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। আধুনিক কালের আকাশযানও পৌরাণিক যুগে অপরিচিত ছিল না, বরং মনে হয়, তখনকার আকাশ-যান এখনকার অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব হেতু এই সকল জড়বিজ্ঞানের কার্য্য যাহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাঁহারা সমাজের অতিশয় নিম্নস্তরে ছিল, শিক্ষা পদ্ধতি তাহাদের মধ্যে ছিল না, এবং নিজ বংশধর ব্যতীত অন্য কাহাকেও তাহারা তাহাদের বিদ্যা শিখাইত না, প্রভৃতি নানা কারণে ভারতের জড়বিজ্ঞান আজ অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল জড়বিজ্ঞানের কর্ত্তাগণ চিরকালই মনোবিজ্ঞানের কর্ত্তা যোগী ঋষিগণের নিকট মস্তক অবনত করিয়া আসিয়াছে। জড়বিজ্ঞান যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন মনোরাজ্যের অধিকারিগণের নিকট তাহাকে নত হইতেই হইবে। জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত, অলৌকিক মানসিক বলশালী, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাই ভারত-

সমাজের উপর এতদূর আধিপত্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাই এখনও তাঁহাদের রক্তকণা শরীরে বহন করিয়া আধুনিক ব্রাহ্মণ-সমাজ পূর্ব্ব সম্পদের দাবী করিয়া থাকেন।

তাই বলি, যদি মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবার আমাদের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বাহ্যাড়ম্বরের দিকে মনকে নিবিষ্ট রাখিলে চলিবে না, ক্ষণিক সুখের দিকে ধাবিত হইলে চলিবে না, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। যদি তুরীয় আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে, যাহার বিনাশ নাই, হ্রাস নাই, বা যাহা অবসাদবিজড়িত নহে, যদি সেই রকম আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আত্মার উন্নতি সাধনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ঈশ্বরপ্রদত্ত গুপ্ত ধনকে সুসংস্কৃত করিয়া উজ্জ্বল এবং প্রকট করিতে হইবে। অতি দুর্লভ এ জন্ম; যদি এ জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে না পারিলে তাহা হইলে সংসারে আসিয়া করিলে কি? ঐ শুন বৈরাগী গাহিতেছে,—

"পেয়েছ মনুষ্যজন্ম, এমন জন্ম আর পাবে না।"

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম।

গয়ার ইতিহাস

ফল্গুনদীর পূর্ব্ব পারে অর্থাৎ ৺বিষ্ণুপদ মন্দিরের অপর পারে "রামগয়া" ও "সীতাকুণ্ড" নামক দুই বেদী বর্ত্তমান। এইখানে সীতা দেবী স্বর্গীয় দশরথের পিণ্ড দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। রাজা দশরথের প্রেতাত্মা হস্ত পাতিয়া পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতের উপরে ভগবান্‌ রামচন্দ্র স্বীয় জনক রাজা দশরথের পিণ্ড দিয়াছিলেন। ৺গায়ত্রী ঘাটে শেষ পিণ্ড দিয়া গয়ালীর নিকট সুফল লইতে হয়। এইখানে কতকগুলি তীর্থবেদী আছে, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিষ্ণুপদ মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে ফল্গুনদীর অপর পারে যে পর্ব্বত দৃষ্ট হয়, তাহাকে হিন্দুশাস্ত্র মতে "নাগকূট" নামে অভিহিত করা হয়; এই পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে পর্ব্বতের নিম্নদেশে ভরতাশ্রম, দশাশ্বমেধ, রামসীতা, রামেশ্বর, হংসপ্রযত্ন, মাতঙ্গপদ, সীতাকুণ্ড, এবং রামগয়া তীর্থ অবস্থিত। এই রামগয়া পর্ব্বতে শ্রীমহেন্দ্র পাল দেবের এক ক্ষুদ্র প্রস্তর-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা তাঁহার রাজ্যারোহণের অষ্টম বর্ষে উৎকীর্ণ। পর্ব্বতের নিকটবাসী লোক সকল এবং ডাঃ কানিংহ্যাম প্রভৃতি মনীষিগণ বলেন যে, প্রকৃত প্রাচীন "রামগয়া" তীর্থ বরাবর পর্ব্বত মধ্যে অবস্থিত; গয়ালীগণ গয়ানগর হইতে বহুদূর আসিয়া তীর্থ কার্য্য করাইতে হইবে বলিয়া প্রকৃত রামগয়া পরিহার পূর্ব্বক গয়া নগরের নিকট নদীর পর পারে রামগয়াতীর্থ কল্পনা করিয়া যাত্রিগণকে ঠকাইয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। কিন্তু শাস্ত্র দেখিলে এই বিষয়ের দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। এই রামগয়া বরাবর পর্ব্বত হইতে এক মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। এইখানে প্রত্যেক বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির সময় মেলা বসে এবং দেশের যাবতীয় নিম্ন

ছোট জাতীয় লোকগণ পিতৃ-পিণ্ডদান করিয়া থাকে। রামগয়ার সম্মুখবর্ত্তী সমতল মঠের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, স্থানীয় লোক ইহাকে "মুড়লী" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহার শিখর-দেশ দিয়া পূর্ব্বে একটি রাস্তার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হয়; এই পথের উভয় পার্শ্বে বহু ভগ্নাবশেষ—বাটীর বা মন্দিরের স্তূপীকৃত ইষ্টক রাশি দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে এইখানে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল বলিয়া মনে হয়। এই মঠের পার্শ্বেই "সুন্ধ" নদী প্রবাহিত হইয়াছে; এই নদীর তীরে চৈত্র সংক্রান্তির সময় মেলা বসে। এইখানে কতকগুলি প্রাচীন গুহা আছে, সেই গুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গুহাগুলির সন্নিকটেই প্রাচীন বাড়ী ও মন্দিরের স্তূপীকৃত ইষ্টকময় স্তূপ প্রভৃতি বহুল দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বতের অধিত্যকার শেষ ভাগে একটী বড় কূপও বিরাজ করিতেছে। ইহার মধ্য হইতে কিছু বৎসর গত হইল কয়েক তাড়া চাবী এবং প্রাচীন যুগের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্বদিকে একটী বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই বাড়ীর পার্শ্বেই একটী ক্ষুদ্র গুহা আছে। ইহাকে "মির্জ্জানগুহা" নামে স্থানীয় লোকে অভিহিত করিয়া থাকে। এই সকল গুহার সুন্দর বিবরণ মিঃ মণ্টগোমেরী মার্টিন এবং ডাঃ বুকানান হ্যামিল্টন সাহেব প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। এই স্তূপের মধ্যে আরও কয়েকটি গুহা বর্ত্তমান আছে। এইগুলি নাগার্জ্জুনী গুহাসমষ্টির অন্তর্গত। গুহা ইষ্টক-প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত। স্থানীয় লোক ইহাকে "হাজী হুরমায়েনের দর্গা" বলিয়া থাকে। এই গুহাগুলির পার্শ্বেই যে ভগ্নাবশেষ ইষ্টক-বাটীর নিদর্শন আছে তাহাকে লোকে "নওয়াদীয়া সৈয়দের স্থান" বলে। এই বাটীর পার্শ্বেই ২।৩ স্থানে প্রাচীন শিলালেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শিলালেখের একটির দ্বারায় গয়ানগরের গদাধরের স্তম্ভ নির্ম্মাণের, যমের মন্দির রচনার বিষয় জানা যায়। যমরাজের মন্দির বিজয়সিংহ নির্ম্মাণ করেন। এই শিলালেখে তাঁহার পিতা অর্জ্জুনসিংহ, তাঁহার পিতা রাণা রুদ্রভূপাল সিংহ কোশোজাধিপতি মহারাজের উল্লেখ আছে। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কালের সময় ৭০৯ খৃষ্টাব্দ হইতেছে। এই স্থানের অপর আর একটী শিলালেখ পাঠ করিলে জানা যায় যে, গয়ার ৺পুণ্ডরীকাক্ষদেবের মন্দির মাম্পিলা-রাজ রাজা হাম্বীরসিংহ অতি প্রাচীন কালে নির্ম্মাণ করাইয়া যান।

এইখান হইতে কিছু দূর পূর্ব্বে জলালপুর নামক একটী সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম অবস্থিত। মিঃ বুকানান হ্যামিল্টন তাঁহার পুস্তকের প্রথম ভাগের ১০০ পৃষ্ঠায় ইহাকেই প্রকৃত "আদি গয়া" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিওন সিয়াঙ বা ফা হিয়ান তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই নগর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। ফা হিয়ান তাঁহার তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এই স্থানের বা বরাবর গিরিগুহা সমূহের কোনই উল্লেখ করেন নাই। কোন চৈনিক বা বৈদেশিক পরিব্রাজক রত্নগিরপুর মঠের উল্লেখ

করেন নাই কিন্তু আমরা ইহার নিদর্শন প্যালি পীঠক এবং গ্রন্থে পাইয়াছি এবং এই মঠের অস্তিত্ব সম্বন্ধে "সিবিলামা" আমাকে নিজে বলিয়াছেন; তাহাও আমি এই পুস্তকের যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি।* গয়া নগরের অন্তর্গত নাদ্রাগঞ্জ পল্লীর মধ্যে অবস্থিত ৺পিতা মহেশ্বর উত্তরমানস তীর্থের অব্যবহিত সম্মুখেই আমার বাটী "উমেশলজ" অবস্থিত। আমার বাটীর সম্মুখেই অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে নাথ-সম্প্রদায় ফকীরগণের এক প্রাচীন মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মঠে অতি প্রাচীন কালে বাবা খড়্গনাথ একনাথ ফকীর উত্তরাখণ্ড হইতে আসিয়া এই মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া অত্র স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন। ঐ সিদ্ধপুরুষের সমাধি-মন্দির এখনও এই মঠের মধ্যে বর্ত্তমান। উত্তর ভারতে মঠ-সম্প্রদায় ফকীরগণের যত মঠ আছে তাহার প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ গোরক্ষপুরের মঠ হইতেছে। নাথদিগের যত মঠ ও (মড়গী) উপমঠ আছে তাহা সবই গোরক্ষপুরের মঠের অধীন। গোরক্ষপুরের কানফাট্টা নাথ-সম্প্রদায়ের এখন মহান্ত বাবা গম্ভীরনাথ হইতেছেন। তিনি প্রশান্ত উদারমনা জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ হইতেছেন। ইনি গয়ায় ৺পাতাল গঙ্গা নামক স্থানে যথায় লাল্লা বাবার আশ্রম আছে, সেই খানে পরমহংস লাল্লা বাবার (রত্নেশ্বর স্বামীর) সহিত এক আশ্রমে থাকিয়া সাধন-ভজন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। লাল্লা বাবা ইহাকে খুব মান্য করিতেন এবং উভয় ফকীর এক আশ্রমে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপায় সাধন-ভজন করিয়া উভয়েই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। উভয় সন্ন্যাসীর মধ্যে খুব সৌহার্দ্দ ও সখ্যভাব ছিল। নাদ্রাগঞ্জের নাথ মঠের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মঠে বাবা ভোলানাথও ভাল সাধক ছিলেন। তাঁহার সমাধির পর অন্নপূর্ণা মাঞি এবং তদুপরে বাবা মোহননাথ এবং তদুপরে সরস্বতীনাথের পর হইতে এই মঠের কোন চেলাই থাকে নাই এবং এই সুযোগে একজন বাহিরের লোক নাথ বলিয়া আসিয়া সমগ্র মঠটি দখল করিয়া লইয়া স্ত্রী ও মদে সমগ্র প্রাচীন মঠটিকে বেচিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। বড় দুঃখের বিষয় যে, বাবা গম্ভীরনাথের এই প্রাচীন মঠ-সংরক্ষণের দিকে নাথ-সম্প্রদায়ের আজও দৃষ্টি পড়িতেছে না! আমরা একান্ত মনে আশা করি যে, নাথ-সম্প্রদায়ের কোন পৃষ্ঠপোষক মহাত্মা নাদ্রাগঞ্জের এই "কানফাট্টা" মঠটিকে ধ্বংসের মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করতঃ অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবেন। প্রাচীন কালে এই "কানফাট্টা" মঠটি বৌদ্ধমঠ ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। ৺রামসাগর নামক পুষ্করিণীর এবং ৺ভৈরব স্থানের বৃত্তি বাদশাহী সনন্দ মতে এই নাথ-সম্প্রদায়িগণ বহু প্রাচীন কাল হইতে পাইয়া থাকেন। উত্তর মানস-তীর্থ সন্নিকটে যে ৺পিতা মহেশ্বরের মন্দির আছে তাহারও বৃত্তি এই নাথ-ফকীরগণ পাইতেন; কিন্তু বিগত ২০ বৎসর হইতে উহা তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। ৺শীতলা দেবীর বৃত্তির ন্যায় এই স্থানের বৃত্তি গয়ালী-

* See Legge's Translation of Fa Hian.

গণের ভোগ্য স্ত্রী-গর্ভজাত সন্তানবংশের অধিকারে আছে। তাঁহারা অপর জাতি-গণকে ইহা দান-বিক্রয়াদির দ্বারা হস্তান্তরিত করিতেছে; এই পূজকগণকে "সুরতওয়ালা" নামে সাধারণে অভিহিত করিয়া থাকে। কানফাট্টা মঠের উপর মদ্‌পিতা ৺উমেশচন্দ্র সরকারের বিশেষ দৃষ্টি ও কৃপা ছিল। ৺বাবা গম্ভীরনাথ (যাঁহার আজকাল বাঙ্গলাদেশে বহু সেবক ও শিষ্য হইয়াছেন) এই কানফাট্টা মঠ মধ্যে মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং বাবা বৃদ্ধনাথের সমাধির উপর পুষ্প ও জল দিয়া পূজা করিতে আসিতেন। কানফাট্টা মঠে ভোলানাথ, মোহননাথ, সরস্বতীনাথ, দীননাথ, আনন্দনাথ মহাপুরুষগণ আমি গত হইতে দেখিয়াছি। শেষ মহান্ত বালক দীননাথ মৃত হওয়ায় এই মঠের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া গয়ার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে খুব মকর্দ্দমা হয়। তাহাতে এই প্রাচীন নাথ-সম্প্রদায়ের মঠের কর্ত্তা বাবা গুরুনাথ হইলেও তিনি তাহা স্থানীয় লোকের চক্রান্তে স্বাধিকারে রাখিতে না পারিয়া ভৈরবনাথের পীঠে গিয়া অবস্থিত করেন এবং গয়ার "কানফাট্টা" মঠে এক উদাসীন সন্ন্যাসী সপরিবারে আসিয়া দখল করিয়া বসে। সে অতি দুর্দ্দান্ত লোক ছিল; স্থানীয় কোন ভদ্রলোক কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করায় লাঠির জোরে এই মঠ অধিকার করে। বিগত ১৩১৮ সালের মহামারী প্লেগের প্রকোপে নাথ সপরিবারে অকালে কাল-কবলে নীত হওয়ায় গুরুনাথ আসিয়া এই পুনঃ মঠ অধিকার করিয়া বসে। এই প্রাচীন মঠ কবে যে নাথ-সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত হইয়াছে বলা যায় না, তবে আমার মনে হয় যে, ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিষ্কাশনের পর এই মঠ ও হরিণ পার্ক ক্রমশঃ বৌদ্ধ শ্রমণগণের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া নাথ-সম্প্রদায় ফকীরগণের অধিকারভুক্ত হইয়া থাকিবে।

আধুনিক সময়ের মধ্যে বহু মহাপুরুষ ভারতভূমে আবির্ভূত হইয়াছেন দেখা যায়। রামমোহন রায়, বিজয়কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, লাঙ্গা বাবা, ঠুড়িয়া বাবা, মৌনী বাবা, পরমহংস, শিবনারায়ণ স্বামী, তৈলঙ্গ স্বামী, রামদাস বাবাজী, ত্যাগী বাবা, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, রামেশ্বর স্বামী প্রভৃতি বহু সাধু মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে গম্ভীরনাথ বাবাও অন্যতম একজন। গয়ার সহিত তাঁহার সাধন-জীবনের এক অংশ বিশেষ ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত। গয়ার ৺পাতাল-গঙ্গার সন্নিকট কপিলধারা পীঠের পার্শ্বেই এক জীর্ণ চালার অভ্যন্তরে এক ক্ষুদ্র গুহায় প্রায় ৫০-৬০ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। তখন দেখিলে তাঁহার যৌবন অবস্থা বোধ হইত। তাঁহার বয়স যে কত তাহা কেহ বলিতে পারিত না। পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি আজীবন তাঁহাকে এক ভাবেই দেখিয়াছেন; আমিও তাঁহাকে আমার জ্ঞানাবধি সমভাবেই দেখিয়াছি। অনেকগুলি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বিষয় আলোচনা দেখিয়াছি। কিন্তু গয়াতে

তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান সময় লাঙ্গা বাবার সহিত এক স্থানে তপস্যা ও সাধনায় যে জড়িত তাহার উল্লেখ না করিলে যে দুইটি সিদ্ধ মহাপুরুষের ধর্ম্মজীবনী অশেষ থাকে তাহা প্রত্যেক পাঠকের মনে রাখা উচিত। এই দুই জন সাধুই সিদ্ধ এবং মহাপুরুষ ছিলেন তাহা গয়াবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। লাঙ্গা বাবা সম্বন্ধে যৎসামান্য আখ্যায়িকা "বসুধা" পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেছিলাম। কিন্তু অকালে তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহা বন্ধ হইয়াছে। এই দুইটি সাধুর মধ্যে কে বড় তাহা বলা যায় না। তবে লাঙ্গা বাবা (আমার গুরুদেব) ৺গম্ভীরনাথ বাবাকে সাক্ষাৎ হইলে বন্দনা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। বাবা গম্ভীরনাথ বড়ই সদাশয় ও দয়ালু সাধক ছিলেন। লাঙ্গা বাবা ও বাবা গম্ভীরনাথ পাশাপাশি গুহায় বসিয়া সাধনা করিতেন এবং উভয় সাধুর মধ্যে বিরল দেখা সাক্ষাৎ হইত। একদা লাঙ্গা বাবার কুটীর হইতে মাড়নপুর গ্রামের বদমায়েস চোরগণ লাঙ্গোট, বহির্বাস, কমণ্ডলু, থালাদি সব চুরী করিয়া লইয়া গেলে বাবা গম্ভীরনাথ বলেন, রত্নেশ্বর কেন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সামান্য দ্রব্য কুটীরে রাখে যাহাতে চোরের লোভ জন্মায়। রত্নেশ্বর ত বাবরের সময়ের লোক, পাতিয়ালার প্রাচীন মহারাণা প্রতাপসিংহ। সে কেন সামান্য লোভ উৎপাদক জিনিষ নিজ স্থানে রাখে, চোর চুরী করিবে না কি? সেই অবধি লাঙ্গা বাবা সর্ব্বত্যাগী হইলেন সিদ্ধত্ব লাভ করিয়া তাঁহার কপিলেশ্বর ধারার আশ্রমে অনেক সেবক বহু বাটী আসবাব, বিছানা পত্র করিয়া দেয় বটে কিন্তু বাবার কিছুতেই আসক্তি ছিল না। বাবা গম্ভীরনাথ সমাধি গ্রহণ করিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে গয়ায় সিদ্ধি লাভ করিয়া মির্জ্জাপুরে গিয়া গোরক্ষনাথের ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঠে গিয়া আস্থানা করিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন; পরে তত্রত্য মহান্ত পরলোকগমন কারণে তিনি মহান্তপদে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার শিক্ষার বিষয় অনেক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহার শিষ্যগণ সকল কথাই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন. তাহার পুনরুল্লেখ অত্র স্থানে নিষ্প্রয়োজন। বাবা গম্ভীরনাথ, পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ, লাঙ্গা বাবা ইদানীন্তন কালের মধ্যে উত্তর ভারতে আদর্শ সাধক-পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষা জনসাধারণের সদাই অনুকরণীয়। কানফাট্টা মঠের এখন বড়ই শোচনীয় অবস্থা তাহার পুনরুদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন। ভৈরব স্থানে ২।১টি বৌদ্ধ যুগের শিলা-লিপি আছে তাহা বহু চেষ্টা করিয়া আমি পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই।

ইহার পার্শ্বেই "নানু গোসাঞির মঠ" ইহাও ঐরূপ প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই মঠের নিম্নে একটি ঘাট ফল্গুর উপর ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র কেবল অতীতের স্মৃতি জাগরুক করিয়া দিতেছে। এই ঘাটটি ফল্গুর জল-স্রোতে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের

ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ফল্গু নদীর উপর "উত্তর-মানস-ঘাট"টি মধ্যে মধ্যে সংস্কারের জন্য নূতন দেখাইতেছে। এটি ঐরূপ বৌদ্ধ দেবালয়ের সংলগ্ন ঘাট। ইহা অতি দৃঢ় ভাবে নির্ম্মিত। সমগ্র গয়া সহরটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ছিল বলিয়া আমার মনে হয়, কারণ এখনও অনেক প্রাচীন বাটী খনন করিতে করিতে সমাধি, হাড়, ভগ্ন চৈত্যক, ভগ্ন সমাধিস্থল বাহির হয়, এবং আমাদের মনে বৌদ্ধ যুগের প্রাচীন স্মৃতি জাগরুক করিয়া দেয়। বাবু অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "গয়া-কাহিনীতে" এ সকল বিষয় আদৌ আলোচনা করেন নাই। বাসনীঘাট পল্লী নাদ্রাগঞ্জের মধ্যে অবস্থিত। এই খানেও ফল্গুনদীর উপর একটি ঘাট আছে। এইখানে কতকগুলি হিন্দু দেব দেবীর মন্দির আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের নির্ম্মাণ-বৈচিত্র্য পর্য্যালোচনা করিলে সেই গুলি যে বৌদ্ধ দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি হিন্দুর পূজ্য দেব দেবীরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। বাসনী ঘাটস্থিত"সূর্য্যদেবে"র (বিরিঞ্চি নারায়ণ) মন্দির ও মূর্ত্তি আমার কথার সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে !! এইরূপ বাসনী ঘাট হইতে শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত যত গুলি নদীর উপর ঘাট বিরাজ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের দেদীপ্যমান অনন্ত চিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। বিরিঞ্চি নারায়ণের মন্দিরের ছাতের নিম্নভাগে একটি শিলালিপি দৃষ্ট হয়, ইহা এত অস্পষ্ট ও কালের কঠোর শাসনে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে সহজে পাঠোদ্ধার করা যায় না। বামনী ঘাটের উপর একটি প্রস্তর-স্তম্ভশোভিত নাট মন্দিরের উপর বহু প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ আছে। কোন কোন স্তম্ভ গাত্রে পৃথ্বিরাজ দেবের নাম খোদিত, কোনটিতে অনন্ত বর্ম্মা দেব প্রভৃতির নাম খোদিত আছে। কোন কোনটিতে গুপ্ত এবং সেন রাজাগণের নাম অঙ্কিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কথিত পৃথ্বিরাজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর চৌহান রাজ দিল্লীশ্বর জয়চাঁদ জামাতা সংযুক্তা-পতি সম্রাট পৃথ্বিরাজ হইতে পারেন না। গয়ানগরের ইতস্ততঃ বহু বৌদ্ধ যুগের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলার প্রত্যেক পাদ-বিক্ষেপের ইতিহাস আছে। রামনা হইতে বাসনী ঘাট পর্য্যন্ত আমার মনে হয় প্রাচীন কালে "রমনক (রামনা) বা বৌদ্ধ যুগের deer park এর অন্তর্গত ছিল। এইরূপ deer park এর সারনাথেও অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। গয়া জেলার মধ্যে বৌদ্ধ যুগের সকল কীর্ত্তির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রাচীন উরুবিল্ব বা বুদ্ধ গয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি ছিল বলিয়া তাহার রূপান্তর না হইলেও সেই-খানে গয়া-শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি মতে এক বেদীতে পিণ্ডদান করিবার বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছে। বুদ্ধগয়ার প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের পার্শ্বেই শৈব-গিরি সন্ন্যাসী মহান্তদের প্রাচীন মঠ ভারতে হিন্দু ধর্ম্মের বিজয় ঘোষণা করিতেছে !! বিশেষতঃ ১৮৯৫ সালের বুদ্ধ গয়া মন্দির সংক্রান্তীয় মকর্দ্দমার পর হইতে বুদ্ধ প্রতি-মূর্ত্তির সেবা, পূজন, সংরক্ষণ আদির পারিপাট্য

হিন্দুধর্ম্মমতে বিশিষ্টরূপ দেখা যায়। এই মর্ম্মক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদালোচনা পরে যথা স্থানে করিব।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

সংসারে সুখ।

(ক্ষুদ্র গল্প)

[১]

আমার নাম শ্রীমান্ সুখেন্দুকুমার রায়। আমি আশৈশব সুখপিপাসু। আমার পিতা অতুল বিভবশালী জমিদার ছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র; এই কারণে এবং শৈশবে মাতৃহীন বলিয়া তিনি আমায় অত্যন্ত স্নেহাদর করিতেন। আমার কোন অভাবই অপূর্ণ থাকিত না, যখন যাহা চাহিতাম, তখনই তাহা পাইতাম। আমি যাহাতে সুখানুভব করিতাম, পিতা তাহাই করিতেন। এক কথায় আমি আমার পিতার "আলালের ঘরের দুলাল" হইয়া সুখ-অমরাবতীর আনন্দময় নন্দন-কাননের অতুল সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম।

ক্রমে একটু বড় হইয়া উঠিলাম। পিতা আমার অজ্ঞান-তিমির দূরীকরণ মানসে আমার গ্রামের গুরু মহাশয়ের পাঠশালার ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে আমার সুখের বিষম অন্তরায় ঘটিল। কেন না, আমার ন্যায় সুখ-পিপাসু জমিদারের ছেলের কোমল অঙ্গে একটা আঘাত পণ্ডিতের কঠিন বেত্রাঘাত সহ্য হয় কি? সুতরাং আমি পণ্ডিত মহাশয়ের বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত প্রায়ই স্কুলগৃহে না থাকিয়া বাগানে-বাগানে পাখীর ডিম ভাঙ্গিয়া ছানা পাড়িয়া ফিরিতাম। জমিদারের ছেলে বলিয়া আমার অত্যাচারের কথা পিতার নিকট বলিতে কেহই সাহস করিত না। কিন্তু এক দিন আমার সমপাঠী যতীন পিতাকে সমস্ত কথা বলিয়া দিল। আমি যতীনের উপর বিশেষ চটিয়া রহিলাম। পিতা সকল কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তিনি আমাকে কোন প্রকার শাসন কিংবা রূঢ় বাক্য বলিলেন না; বরং সস্নেহে কাছে ডাকিয়া লইয়া স্নেহার্দ্র স্বরে উপদেশ দিলেন। কিন্তু "চোরায় না শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী"।—আমার সুখ-পিপাসু প্রাণ প্রতিনিয়তই সুখের জন্য লালায়িত;—কঠিন বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া অসীম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে পারিবে কি? সুতরাং আমি আচিরেই মা সরস্বতীর নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া একটা অজ্ঞাত সুখ-সাগর-সন্ধানে উন্মত্ত হইয়া ছুটিলাম। 'সুখই' আমার জীবনের চরম লক্ষ্য,—বোধ হয় পিতা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই তিনি আমার সুখের পথে বাধা দিলেন না। অতএব আমি অবাধে সুখ-সন্ধানে আকুল চিত্তে ছুটিয়া চলিলাম। যখনই যাহাতে সুখানুভব করিতাম, তখনই তাহাতে মজিয়া সুখের বাল্য-জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

[২]

দেখিতে দেখিতে জীবনের বিংশতি বৎসর অতীত হইল।—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার

প্রাণে নানা প্রকার বাসনার সঞ্চার হইতে লাগিল। কি পাইলে প্রাণের সাধ মিটে—আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়, দিবারাত্রি কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।—ইতঃপূর্ব্বেই সিগারেট ও তাম্রকূট-সেবনে বিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছিলাম; তৎপরে সুখ শান্তিদায়িনী সুরাদেবীর অর্চ্চনায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক নানাবিধ রঙ্গরসে মাতিয়া দিবারাত্রি গান-বাজনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তবুও বাসনার তৃপ্তি হইল না—আকাঙ্ক্ষার শেষ হইল না; না জানি কি একটা অভিনব সুখ-রস পান করিবার জন্য অন্তরের মধ্যে একটা সুপ্ত পিপাসা ধীরে ধীরে জাগিতে লাগিল!

আমার ভাব-চরিত্র দেখিয়া পিতা আমার বিবাহ দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং শীঘ্রই সর্ব্ব সুলক্ষণা এক অনিন্দ্য-সুন্দরী পাত্রী ঠিক করিলেন।—শুভ দিনে, শুভক্ষণে মহা ধূমধামের সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিলাম,—স্বর্গ কতদূর? কৌমুদী-স্নাত শুভ্র রজনীতে ইপ্সিত সন্দর্শনে বিরহিনীর হৃদয়ে যেরূপ সুখোদয় হয়, নিদাঘ-তপন-তপ্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিক স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া ও সুশীতল সলিল পাইলে যেরূপ পুলকিত হয়;—অথবা সুখ-সুপ্ত নিশীথে নিদ্রালস-নয়নে বালিকা বধূটিকে দেখিতে পাইলে উদ্‌ভ্রান্ত যুবক যেরূপ আনন্দিত হয়, নবপরিণীতা পত্নীর অপরূপ-রূপ মাধুরী দেখিয়া আমিও তদ্রূপ সুখী হইলাম।

কিন্তু শীঘ্রই আমার মোহ ভাঙ্গিল—রূপের নেশা ছুটিল—সুখের আশা টুটিল।—আমি বুঝিলাম—আমি যাহা চাই সুখদাতে তাহা কিছুই নাই। (আমার পত্নীর নাম—সুখদা।) আমি চাই—প্রেম-পীযূষবর্ষিনী সুললিত কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত-ঝঙ্কার—অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত চরণ যুগলের মনোমোহিনী ভঙ্গিমা।—হায়! সে সব সুখদাতে কিছুই নাই। সে যে কেবলমাত্র একটী সৌন্দর্য্যময়ী পাষাণ-প্রতিমা!—পাষাণ-প্রতিমাকে লইয়া জীবনে সুখী হইব কি প্রকারে? যাহাকে চির-সঙ্গিনী করিয়া জীবনে সুখী হইব ভাবিয়াছিলাম, সেই সুখদা আমার সুখদা হইল না! হায়! এ-মোহময় যৌবনে মনে মনে যে নন্দন-কাননের অতুল সুখ কল্পনায় আনিয়াছিলাম,—হায়—মরু-মরীচিকা,—তাহা এক মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া গেল। হায়—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল;
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল!"

তার পর আমি ইয়ার-দলসহ কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে ডুবিয়া রহিলাম। সুখদার সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিলাম না।—নিত্য নব সুখ-সন্ধানে ফিরিতে লাগিলাম।

এইরূপ চিরাকাঙ্ক্ষিত সুখের পশ্চাতে ঘুরিতে ঘুরিতে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। আমার এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখিয়া পিতার শরীর দিন দিন ভগ্ন হইতে লাগিল। তাঁহার পূর্ব্ব উপশমিত হৃদ্‌রোগ পুনরায় দেখা দিল। তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। তার-পর অকস্মাৎ এক দিন তাঁহার হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া

বন্ধ হইয়া গেল। তিনি নিজের জমিদারী, ঘর-সংসার সমস্তই আমার হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া অপর এক অজানা দেশের উদ্দেশে মহা প্রস্থান করিলেন। সুখদা কাঁদিতে লাগিল, আমি কিন্তু বিন্দুমাত্র চোখের জল ফেলিলাম না; বরং একটা সুখের অন্তরায় দূর হইল বলিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।—পিতার বিষয়-সম্পত্তি হাতে পাইয়া আমার সুখের পিপাসা আরও বৃদ্ধি পাইল।—আমি আমোদ-প্রিয় সহচরদের সহিত উদ্দাম সুখ-তরঙ্গে ঝাপাইয়া পড়িলাম!

[৩]

প্রাগুক্ত ঘটনার পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সংসারের কত-কি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—তাহা কে বলিবে?—এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর যাবৎ আমি কেবল নিয়তই অনাবিল সুখ-সন্ধানে ঘুরিতেছি।—যখনই যাহাতে সুখ বোধ করিয়াছি—তখনই তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি। যতক্ষণ তাহাতে তৃপ্তি পাইয়াছি, ততক্ষণ তাহার সহিত সদ্ভাব—সম্প্রীতি রাখিয়াছি। কিন্তু হায়! পরক্ষণেই নিদারুণ দুঃখ আসিয়া সুখভোগে বাধা দিয়া তাহার সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। অমনি আর একটী নব সুখ-সাগরে ঝাপাইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু হায়, কিছুতেই হৃদয়াকাঙ্ক্ষিত বিমল সুখ পাইলাম না।

সংসারে আমার অভাব ত কিছুই নাই।—আমি ঐশ্বর্য্য-সম্পদে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি—ভোগ-বিলাসের কণকবল্লরী বেষ্টিত হইয়া আছি, গৃহে নবযৌবনা কামিনীগণ নিয়তই আমার সেবায় নিযুক্তা রহিয়াছে—তাহাদের কোকিল-কণ্ঠ-বিনিসৃত সুমধুর সঙ্গীত-হিল্লোল অহরহ আমার শ্রবণ-বিবরে সুধাধারার ন্যায় বর্ষিত হইতেছে; তবু সুখের সাধ মিটিল না—জীবনে সুখী হইলাম না। সুখভোগ করিতে গিয়া কেবল অহরহ দুঃখ-দাবদাহে দগ্ধীভূত হইতেছি।—মানুষ বলে—"সংসার সুখের হাট—হাটে সুখের ঢলাঢলি—গড়াগড়ি—ছড়াছড়ি! এই অনন্ত সুখপরিপূর্ণ হাটে নিয়তই অনন্ত অনাবিল সুখের বিকি-কিনি হইতেছে!" কিন্তু আমি ত এই সুখপূর্ণ বিশ্বহাটে "সুখ" কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না?—এই সুখের হাটে সুখ-সদাই• করিতে আসিয়া শুধু অনন্ত দুঃখরাশি কিনিয়া বসিলাম।

একদা সুখসুপ্ত নিশীথে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম—"সংসারে কি তবে সুখ নাই?—এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষ কি কেবল দুঃখভোগ করিতে আর আকুলভাবে কাঁদিতেই আসিয়াছে?—এটা কি দুঃখেরই সংসার—তবে সুখ কোথায়?"—

সহসা নৈশ গগন মুখরিত করিয়া দিগন্ত ভাসাইয়া অদূরে কে গাহিয়া উঠিল—

"সুখ সুখ করি হ'য়েছ অস্থির,
সুখ কি নাইরে ভবে—
এ বিপুল ধরা, শুধু দুঃখে ভরা,-
ভবে কিরে দুঃখী সবে?
পরের কারণ, এ জীবন-ধন,
সতত সঁপিয়া দাও;
চাল বিভু পায়, দেহ-মন-কায়,
যদি ভবে সুখ চাও!

আমি বিস্মিত নেত্রে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম—দিব্য কান্তিবিশিষ্ট প্রশান্তমূর্ত্তি এক সন্ন্যাসী!—আমি ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হইলাম।......সন্ন্যাসী স্থির নেত্রে আমার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহ-স্বরে বলিলেন—"সুখ-পিপাসু উদ্‌ভ্রান্ত-যুবক! সংসারে ভোগে সুখ নাই—সুখ ত্যাগে। যদি সুখ চাও-তবে স্বার্থসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ কর।—জানিও—অপরের নিমিত্ত আত্ম-বিসর্জ্জন ভিন্ন স্থায়ী-সুখ সংসারে নাই। ধন মান, যশঃ ও ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে সুখ—ক্ষণিক সুখ; তাহা অস্থায়ী—পরিণাম অনন্ত দুঃখ!

গীতায় আছে—

'বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎতদগ্রেঽমৃতোপমম্॥
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥'

অর্থাৎ—'বৈষয়িক সুখ প্রথম ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে অমৃত তুল্য অনুভূত হয়; কিন্তু কামনা বা রজোগুণ হইতে জাত বলিয়া পরিণামে বিষের ন্যায় ইহকালে ও পরকালে দুঃখের হেতু হয়।'—তাই বলি—বৎস! সেবা-ধর্ম্ম গ্রহণ কর! মনে রাখিও—'নারায়ণ জ্ঞানে নর-সেবাই সংসারে অনন্ত সুখ!—সেবা-ধর্ম্মই সকল সুখের নিদান! এ সুখে কখনও দুঃখ হয় না—এ সুখই অনাবিল—অনন্ত!'

মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

'নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব-সেবন।
সংসারে ইহাই সুখ শোন সনাতন॥'

আর পরমহংসদেব বলিয়াছেন—

'মনুষ্যরে সীতারাম ভজন কর গিয়া।
ভুখে অন্ন, পিয়সে পানি, নংগে বস্ত্র দিয়া॥

অর্থাৎ—'হে মনুষ্য, সীতারাম ভজনা কর! কিরূপ? ক্ষুধিতকে অন্ন, পিপাসিতকে জল এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান কর। ইহাতেই তোমার সীতারাম ভজন করার ফল হইবে!

তাই বলি বৎস! সেবা-ধর্ম্ম গ্রহণ কর, রোগীর পরিচর্য্যা কর, লোকের আশ্রয়াভাব, অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাব মোচন করিয়া দরিদ্রতা-দুঃখের প্রতিকার কর!—আর—

'আর এক মনে এক প্রাণে ডাক ভগবান,
ইহাই সংসারের পূর্ণ সুখের নিদান।"

বলিতে বলিতে সহসা সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমি ভাবিলাম—"পর-সেবাই কি অনন্ত অবিনশ্বর সুখ? হায় এতদিন তবে বৃথায় ভস্মে ঘৃত ঢালিলাম!"......মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম—নিশ্চয়ই আমি সেবা-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিমল সুখ লাভ করিব।—এবার—

'পরের কারণ সঁপিব এ দেহ
করিব পরের হিত।"

[৪]

তারপর একরাত্রে এক অসহায়া অনাথা বিধবার একমাত্র পুত্রের বিসূচিকা রোগের সেবা করিতে গেলাম। যাইয়া দেখিলাম, রোগীর অবস্থা অতিশয় শোচনীয়,—বাঁচিবার আশা খুব কম। তবু আশায় বুক বাঁধিয়া রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইলাম।—রাত্রি ১টা ঘণ্টা বাজিলে পর রোগীর মাতা বলিলেন—

"বাবু! আপনার সুখের শরীর—এত কষ্ট করিলে সহ্য হইবে না। আপনি একটু

নিদ্রা যান।"

বিধবার কথা শুনিয়া প্রাণে বড় আঘাত লাগিল।—ভাবিলাম—আমোদ-আহ্লাদ করিয়া জীবনের অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি; তাহাতে একদিনও কি প্রকৃত সুখশান্তি পাইয়াছি?—তবে আর কেন তুচ্ছ বিলাসিতা-সুখে মজিয়া রহিব? রে মূঢ় মন, পরের কল্যাণে আপনাকে মাতাইয়া দাও! রে আমার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষারাশি! ঐ নর-দেবতার পূত চরণ-তলে চিরদিনের মত তোমাদের বিসর্জ্জন দিলাম। আর তোমরা আমার মনের মধ্যে আসিতে পারিবে না।—আমি বিনীত-ভাবে বিধবাকে বলিলাম—"না, আমার কোন কষ্ট হইবে না—এই কাজেই আমি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছি।" বিধবা আমার কথায় আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

সমস্ত রাত্রি আমি ও রোগীর মাতা দুইজনে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহাকে ঔষধ খাওয়াইতে ও সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।—আহা সে কি সুখের নিশাযাপন।—সে কি অপূর্ব্ব পুলকানন্দ!! কি ধারণাতীত সুখ-তৃপ্তি!!! এ-আনন্দ, এ-সুখ এ-তৃপ্তি, যে চাপিয়া রাখিতে পারি না!—

এইরূপ পঞ্চম রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর রোগীর অবস্থা ভাল দেখা গেল।—তারপর ক্রমে ক্রমে সে আরোগ্য লাভ করিল—আমার প্রাণে অসীম আনন্দের সঞ্চার হইল। এরূপ আনন্দ আর জীবনে কখনও উপভোগ করি নাই।

তার পর এইরূপ কত রোগীর সেবা করিয়াছি—কত রজনী বিনিদ্র হইয়া কাটাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে একদিনও শরীরের কোন কষ্ট অনুভব করি নাই, বরং প্রাণে বড় বিমল সুখের উদয় হইয়াছে। অমর-বাঞ্ছিত স্বর্গ-সুখ কি জানি না,—বোধ হয় তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ!

এখন অসহায় রোগীর কথা শুনিলে, আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটিয়া গিয়া পরম যত্নে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করি।—রোগ নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কাছ ছাড়া হই না। আহা! সেবা-ধর্ম্মে কত সুখ। কত আনন্দ!—এই দুঃখ-তাপপূর্ণ পৃথিবীতে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করাই প্রকৃত সুখ! আমার ধর্ম্মের গুরু, আমার জ্ঞানের উপদেষ্টা, আমার মনুষ্যত্বের শিক্ষক সেই সন্ন্যাসী সংসারে সুখের এই নূতন পথ আমায় দেখাইয়া গিয়াছেন। আমি এখন সেই পথ অনুসরণ করিয়া প্রাণে অনন্ত বিমল সুখ অনুভব করিতেছি! এ-সুখে দুঃখ নাই—জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই নাই!—আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, নিঃস্বার্থ ভাবে জীব-সেবাই সংসারে অনন্ত সুখ! অনন্ত শান্তি!

সন্ন্যাসীর সেই মধুর সঙ্গীত ধ্বনি নিয়তই আমার কাণে বাজিতেছে—

"পরের কারণে সতত যতনে
আপন জীবন দাও;
ঢাল বিভু পায় দেহ-মন-কায়
যদি ভবে সুখ চাও।"

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব।

"আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!"
—রবীন্দ্রনাথ।

বাঙ্গালী হিন্দুগণ (স্থানবিশেষে মুসলমানও) শারদীয়া দুর্গা পূজার নামে বহু পূর্ব্ব হইতেই আনন্দিত ও সঙ্গে সঙ্গে চিন্তিত হইয়া থাকেন। ধনীর আনন্দ;—এবার খুব সমারোহ করিয়া দুর্গোৎসব করিব, তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে যাত্রা খেমটা আনিব, কত বড় বড় লোক আমার গৃহ আলো করিয়া বসিবে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রতিমার গঠন-নৈপুণ্য ও জাঁক-জমক দর্শনে নির্ম্মাতার সুখ্যাতি করিবে, আমি তাহার অংশভাগী হইব। যাত্রা-গান শুনিয়া, খেমটা নাচ দেখিয়া সকলে আমায় ধন্য ধন্য করিবে। কত 'পদস্থ' "সম্ভ্রান্ত' ব্যক্তি আমার গৃহে পূজার কয়দিন নানাবিধ মিষ্টান্ন উদরস্থ করিয়া হাই তুলিতে তুলিতে, ভুঁড়ি নাড়িতে নাড়িতে, আমার অর্থের 'সদ্ব্যয়ের' প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে ফিরিবে। তারপর এবার পূজায় গৃহিণীকে বহুদিন-বাঞ্ছিত, হীরক-মুক্তা-খচিত অমুক অমুক বহু মূল্য অলঙ্কারে সাজাইতে হইবে; পুত্রকন্যাগণকে গত বৎসর অপেক্ষা এবার অধিকতর মূল্যের বস্ত্রালঙ্কার না দিতে পারিলে লোকে কি বলিবে, ইত্যাকার বহল চিন্তাতরঙ্গ ধনীর মনকে বহু পূর্ব্ব হইতেই আন্দোলিত ও আলোড়িত করিতে থাকে। এবংপ্রকার নানা সুখ-স্বপ্ন তাহাদিগকে এ মর্ত্ত্যলোক হইতে দিব্য ধামে লইয়া যায়!

এখন দরিদ্র, বস্ত্রহীন ও দুঃখীর চিন্তার কথা বলিব। 'পূজা আসিতেছে' এই শব্দ দরিদ্রের কর্ণে কত টুকু সুখ প্রদান করে তাহা ভাবিবার কথা। তাহারা 'পূজা আসিতেছে' এই রব শ্রবণে অনেক সময় বড় দুঃখে বলিয়া থাকে 'কাল আসিতেছে!' মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র বাঙ্গালী ৺পূজার নামে যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। তাহাদের অধিকাংশই হয় চাকুরীজীবী, নয় ত শ্রমজীবী—'দিন ভিক্ষা তনু রক্ষা।' কেমন করিয়া এই দুর্ব্বৎসরে এই অল্প আয়ে "পূজার খরচা নির্ব্বাহ করিবে ইহা ভাবিয়াই তাহারা আকুল। এদেশে হিন্দুগণের মধ্যে চিরাচরিত প্রথা আছে যে, দুর্গোৎসবের সময় নববস্ত্র পরিধান করিবে—ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে আবহমান কাল হইতে আমাদের বাঙ্গালী হিন্দুরা ইহা মান্য করিয়া আসিতেছে। তারপর হিন্দুর সংসার কেবল নিজ স্ত্রীপুত্র লইয়া নহে। হিন্দুর যে একান্নবর্ত্তী পরিবার, ভ্রাতা ভগিনী, বৃদ্ধ পিতামাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত লইয়া হিন্দুর সংসার গঠিত। ইঁহারা গৃহস্বামীর অবশ্য প্রতিপাল্য ও সম্মানভাজন। বৎসরান্তে ৺পূজার সময় ইঁহাদিগকেও নববস্ত্র পরিধান করাইতে হয়। এবার কাপড়ের বাজার কিরূপ চড়া তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এমন অবস্থায় তাহাদের প্রাণ যে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। ৺পূজার সময় কি ধনী কি দরিদ্রের শিশু পুত্র কন্যাগণ রঙিন জামা

জোড়া পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। শিশুগণ নূতনের আস্বাদ পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। যেবের পুত্তলী সন্তান সন্ততিগণ যখন "বাবা, ও বাড়ীর সুকুমারের মত আমার পিরাণ চাই, আমার জুতা কিনিয়া দাও।" ইত্যাদি বলে বৃত্তিপরায়ণ দরিদ্র পিতার নিকট সমুপস্থিত হয়, তখন সন্তানবৎসল বাঙ্গালী পিতা পৃথিবী অন্ধকার দেখেন, তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইতে থাকে, তিনি নিজের অবস্থা চিন্তা করিয়া মরমে মরিয়া যান, আর মনে মনে বলিতে থাকেন, মা বসুমতী! দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।

৺পূজা উপলক্ষে বিবিধ বিলাস-দ্রব্য সংগ্রহ করাই যেন এ কালের অধিকাংশ বাঙ্গালী-ভ্রাতার একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা "কেশরঞ্জন", "জটো দিলবাহার", "ল্যাভেণ্ডার", "ল্যাভেণ্ডার", "পমেটম" মাখিবে, আর তোমার পার্শ্বের বাড়ীর লোকজনেরা ও বালক-বালিকারা একখানা নূতন কাপড়ের জন্য বিষণ্ণবদনে দাঁড়াইয়া থাকিবে, আর তুমি তাহা স্বচক্ষে দেখিবে। কবি বলিয়াছেন,—

> "দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
> ম্লানমুখে বিষাদে বিরস;—
> তবে মিছে সহকার-শাখা
> তবে মিছে মঙ্গল-কলস।"

তুমি স্যাকরার দোকানে গৃহিণীর নেক্‌লেস্ তৈয়ারি করিতে দিতেছ—আর তোমার শত শত ভ্রাতা-ভগিনীগণ শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া ম্লানবদনে নিরানন্দে উপবিষ্ট। এ আনন্দের দিনে—আনন্দটা তুমি একা উপভোগ করিলে তাহাতে কি সুখ পাইবে? আনন্দটা দশ জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দাও, দেখিবে তোমার আনন্দ বাড়িয়া গিয়াছে, দীন-দুঃখীর বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ আনন্দের দিনে যে যত ব্যথিতের জলভরা চক্ষু মুছাইতে পারিবে, সে ততোধিক আনন্দসাগরে ডুবিবে। এ আনন্দের মেলায় আত্মস্বার্থ ভুলিয়া গিয়া আপন দেশস্থ দীন-দুঃখীকে কোল দাও। ছোট বড় ভুলিয়া যাও। বল "ভারতবাসী আমার ভাই।" ইহাই সমবেদনার সোপান, সামঞ্জস্য বিধানের উপায়, সৌহৃদ স্থাপনের প্রশস্ত পথ। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

শ্রীরাধাচরণ দাস।

রাধার স্বপন।

> সখি! কেমনে রাখিব প্রাণ
> নিশিতে স্বপনে হেরিনু কালার
> মোহন মূরতি খান।
> যমুনা পুলিনে কদম্বের তলে,
> যার রূপ হেরি' গিয়াছিনু ভুলে,
> স্বপনে নেহারি সে রূপ হিয়ায়
> খেলিছে প্রেমের বাণ।
> নারিনু সজনি রাখিতে আবরি',
> লাজ-ভয়-কুল-মান।
> সখি! ত্রিভঙ্গ বাঁকা ঠামে
> স্বপনে শিয়রে হেরিয়াছি সেই
> অধর-ধরিত তানে।

নীল কলেবরে সে' মোহন সাজ
তেমতি বাঁশরী ধরি রসরাজ,
হাসি হাসি যেন দাঁড়ালো আসিয়া
চূড়াটি হেলায়ে বামে;—
সে রূপে ভুলিয়া রাধিকা-হৃদয়
ডুবিল অপার প্রেমে।

সখি, কেমনে কহিব হায়!
শ্যামের আঁখির চাহনির কথা
কহন নাহিকো যায়।
মদনের বাণে আছে বটে ত্রাণ,
কাল আঁখি-বাণে নাহি পরিত্রাণ,
পরাণ বিঁধিয়া তিয়াসা জাগায়,
কুল রাখা বড় দায়;—
সে আঁখির পানে চেতনা সজনি,
রাধিকা ডুবিয়া যায়

সখি, আর নাহি ভয় লাজ!
শ্যাম চাঁদে স্মরি' কলঙ্ক-সাগরে
ভাসিতে চলিনু আজ!
ননদিনী ভয় নাহি করি আর,
বলুক গোকুলে কলঙ্ক আমার
যাঁহারে দেখিনু স্বপনে, তাঁহারে
করিব হৃদয়-রাজ!
তাঁহার পরশে ভুলিব যন্ত্রনা
বিপুল বিশ্বমাঝ।

শ্রীবঙ্গচন্দ্র নাথ কাব্যবিনোদ।

মৃত্যু।

মৃত্যু নহে ভীষণ তেমন।
নীরব ছায়ার মত
পাছু পাছু অবিরত
ঘুরিতেছে দিবা নিশি বন্ধুর মতন,
সেত নহে কঠিন এমন।
মৃত্যু নহে ভীষণ তেমন।
লয়ে যাবে ধীরে ধীরে
যেমন নিদ্রার ঘোরে
নিস্পন্দ পড়িয়া থাক বিলুপ্ত চেতন,
মৃত্যু যে গো সহজ এমন।
মৃত্যু নহে নিষ্ঠুর তেমন।
সব তাপ সব জ্বালা
জীবনের যত মলা
মুছাতে মুছিয়া দিবে করিয়া যতন।
কেন ভাব কঠিন মরণ?
মৃত্যু নহে ভীষণ তেমন,
পলকে হইবে শেষ,
যাতনার নাহি লেশ,
তার পর সুখময় জগৎ কেমন—
সেথা যে গো সকলি নূতন।
পর পারে সুরম্য নগর
সুখ শান্তি প্রীতিপূর্ণ
রোগ শোক দুঃখ শূন্য
ব্যবধান মধ্যে মাত্র আঁধার সাগর
মৃত্যু তার খেয়ারী সুন্দর।
পড়ে আছে বিশাল প্রান্তর
দেখা যায় দূরান্তরে
পরিচিত গৃহ পড়ে
ফিরে যেতে নিজ গৃহে আকুল অন্তর
শ্রান্ত ক্লান্ত জীবন দুর্ভর।
যাবে ফিরে কেমনে সেথায়?
একাকী অজানা দেশে

ঘূর্ণাবর্ত্তে ভেসে ভেসে
একেলা সম্বলহীন লেগেছ সেথায় !
কে দেখাবে সে পথ তোমায় ?
পথ নহে সুগম তেমন
শত বিঘ্ন শত ভয়
সারা পথ কাঁটাময়
মাঝে মাঝে আছে তায় গহন কানন
পথ সে গো বড়ই দুর্গম।
আছে সঙ্গে সুহৃদ মরণ
সে তোমারে কোলে করে
লয়ে যাবে তব ঘরে,
সহিতে হবেনা কিছু পথের বেদন।
কেবা আছে স্বজন এমন ?
ভাসে বুক তপ্ত অশ্রুধারে,
বিষাদে মলিন মুখ—
দীর্ঘ শ্বাসে পুড়ে বুক
সতত কাতর ক্লান্ত জীবনের ভারে,
আশা ডোর ছিন্ন চিরতরে।
ছিল শত প্রিয় পরিজন
অদৃষ্টের নিষ্পেষণে
একে একে দিনে দিনে
চির তরে পরিত্যাগ করেছে এখন !
কেহ নাহি জগতে আপন।
জীর্ণ দেহ বিগত যৌবন,
শ্লথ অঙ্গ লোল চর্ম্ম
শতধা বিদীর্ণ মর্ম্ম
নাহি সে কল্পনা আশা নবীন উদ্যম,—
গেছে ছেড়ে সকলে এখন,
আছে মাত্র বন্ধু একজন
অভাগা তোমারে হেরে
সকলেই গেছে ছেড়ে
সে তোমারে তবু কিন্তু করে না বর্জ্জন,
চিরসঙ্গী মরণ সেজন।
অকপট বন্ধু সেই জন,
সম্পদের সাথী যারা
নহে কভু বন্ধু তারা
সংসার বিপদে যেই দেয় আলিঙ্গন
নাহি করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন।
মৃত্যু নহে জীবনের শেষ,
জীবন প্রারম্ভ মাত্র
ভেঙ্গে গড়া শুধু মাত্র
সাধিবারে আমাদের কল্যাণ অশেষ
সুমঙ্গল বিধাতৃ নির্দেশ।
তবে কেন এ দীন ক্রন্দন
মৃত্যু ভয়ে কেন ধরা
হাহাকারে সদা ভরা
কে হেন সুহৃদ আছে মৃত্যুর মতন ?
কেন ভাব মৃত্যু কি ভীষণ।

শ্রীশান্তিকণ্ঠ রায়।

রিক্ত।

(নিতান্ত গল্প নহে)

"দরিদ্র-নারায়ণ" তাহার প্রকৃত নাম নহে। শৈশবে জনক-জননী তার নাম রাখিয়াছিল, নারায়ণ ; কিন্তু সে বড় গরীব, তাই লোকে বলিত তাহাকে "দরিদ্র নারায়ণ।" সে জাতিতে নাপিত,—জাতীয় ব্যবসায় তার ক্ষৌরী করা। দু'কাঠা ধানের জমী, দশ পাঁচ ঘর গ্রাহক, তাহার জীবন-সম্বল। ক্ষুদ্র পরি-

বার। সে নিজে, তাহার স্ত্রী এবং একটী পাঁচ বৎসরের ক্ষুদ্র শিশু, এই ত্রিমূর্ত্তিতে তাহার সংসার গঠিত। এ সংসারে তাহার আর কেহ নাই। যারা ছিল, বহুদিন তারা স্নেহের ডোর কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সে আপন জমীটুকু চষিয়া, ফল-শস্য বিক্রয় করিয়া এবং গ্রাহকের কাজ করিয়া অতি ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ; তাহার দিন আর চলে না। দু'বেলা দূরে থাকুক, সকল দিন এক বেলা শাকান্নও জুটিয়া উঠে না। তাহার আপন-জন—বাথারবাথী এমন কেহ নাই যে, এ দুর্দ্দিনে একমুষ্টি অন্ন কি একখানি ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা তাহার একটুকু সাহায্য করে। সে বান্ধবহীন কাঙ্গাল, সে চির দীন—চির রিক্ত।

লোকে কাজ করায়, কিন্তু বহুদিন বেতন দেয় না। তাহারা আপনারাই যে অভাবের ভীম তাড়নায় নিয়ত অস্থির। "দশ টাকা চাউলের মণ, দুই টাকা মরিচের সের, পাঁচ সিকা তৈল সের, চারি পাঁচ আনা কেরোসিনের বোতল, চারি আনা ডাউলের সের, পাঁচ সাত টাকায় একজোড়া মোটা কাপড় মেলা ভার; আমরা নিজেরাই খাইয়া বাঁচি না, তা তোমার বেতন দিব কোথা হ'তে নারায়ণ? আশীর্ব্বাদ করি, দেবতার কৃপায় আবার সুদিন ফিরিয়া আসুক, আবার পৃথিবী ধন-ধান্যে পূর্ণ হউক,তখন কড়ায়-গণ্ডায় সব বুঝিয়া পাইবে।"

শুধু আশীর্ব্বাদে উদর পূর্ণ না হইলেও এসব কথার পর নিরীহ দরিদ্র-নারায়ণ আর কি বলিবে?—আর বলিয়াই বা ফল কি? আজ সর্ব্বত্রই যে এক কথা,—সর্ব্বত্রই প্রায় অভাবের হা হুতাশ এবং অনন্ত দুঃখ-দৈন্যের নিদারুণ উষ্ণ নিশ্বাস! যারা সমর্থ—যারা দু'পয়সা দিতে পারে, আপন আপন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তারাও বড় কেহ এককড়া হাতের বাহির করে না; কঠোর জীবন-সংগ্রামে সকলেই আত্ম-চিন্তায় ব্যস্ত—আপনার লইয়াই মহা বিব্রত। তা পরের মুখে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল উঠিল কিনা সে চিন্তার অবসর কোথায়? এ বিশ্ব রসাতলে যাউক, আমার ভোগ-সুখের ব্যাঘাত না হইলেই হইল; এ ভাব এখন প্রায় সর্ব্বত্র! সহস্র "দরিদ্র-নারায়ণ" অনশনে অকালে কালের কোলে চলিয়া পড়ুক তাহাতে ক্ষতি কি? আমার সোণার অঙ্গে এতটুকু আঁচ না লাগিলে—আমার "নন্দদুলাল" "দুধে-ভাতে" বাঁচিয়া থাকিলেই হইল। দরিদ্র এ সংসারে দুঃখ-ভোগ করিতে—মরিতে আসিয়াছে দুঃখ-ভোগ করিবে, মরিবে, তাহাতে ধনীর কি?—ধনীর কাজ চলুক, নির্ধন "দরিদ্র-নারায়ণের" ক্ষুধায় অন্ন—তৃষ্ণায় জল এবং লজ্জা নিবারণের বস্ত্র না-ই বা মিলিল, তাহাতে লক্ষ্মীপুত্রের আসিয়া যায় কি? এ ধরা "দরিদ্র-নারায়ণের" সেবাশ্রম নহে, ইহা ধনীর বিলাস নিকেতন—ইহা ঐশ্বর্য্যবানের ভোগ-সুখ পরিপূরণের প্রমোদ-ভবন।

আজ দুই তিন বৎসর যাবৎ দরিদ্র-নারায়ণের ক্ষেতে ভাল ফসল হইতেছিল না। যাহা কিছু জন্মিয়াছিল, ক্ষুধিতের মুখে তাহাতে দু'মাসও সঙ্কুলন হয় নাই, অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায়, মরুভূমে বারি-সিঞ্চনের মত তাহা নিঃশেষে

সব ফুরাইয়া গিয়াছে। কোন দিনই তাহার সংস্থান কিছু ছিল না; গৃহে থাল, লোটা, বাটী, ঘটি, গ্লাস প্রভৃতি দু'চারিটা বৎসামান্য তৈজসপত্র যাহা কিছু ছিল, অভাবের তীব্র তাড়নায় বহুদিন সে সব দ্রব্যের মায়া কাটাইয়া বসিয়া আছে। ভীষণ "ম্যালেরিয়ায়", অনশন ও অচিকিৎসায় সে নিজে কঙ্কালসার জীর্ণ দেহযষ্টি লইয়া এখনও কোনরূপে বাঁচিয়া আছে, কিন্তু তাহার প্রাণের চেয়েও অধিকতর মূল্যবান্ মনে করিয়া সে জীবনের সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া এতদিন যাহাকে লালন-পালন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া আপনার প্রাণে আপনি বিপুল প্রীতি অনুভব করিয়া আসিতেছিল, দরিদ্রের সর্ব্বস্ব ধন সে সুকুমার শিশুটি আজ পনর দিন হইল শ্রাবণের একটা ঘোর বঞ্ঝা-বাদলের দিনে দু'দশ ফোঁটা বেদানার রস, দু'চারি খানা ইক্ষুখণ্ড, একটুকু দুগ্ধ এবং এক ফোঁটা ঔষধ-পথ্যের ও শীত-বাত-তাপ নিবারণের উপযুক্ত শয্যা ও বস্ত্রাদির অভাবে, দারুণ রোগ-যন্ত্রণায়—ক্ষুৎ-পিপাসার কঠোর তাড়নায় নীরবে জনক-জননীর স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিয়া যেখানে ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, আপন-পর ভেদ নাই, যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, দুঃখ-দৈন্যের হাহাকার নাই, যেখানে মৃত্যু নাই, কিন্তু অমৃত পানে অমরত্ব লাভ করা যায়, সেখানে চলিয়া গিয়াছে। দরিদ্র-নারায়ণের গৃহ-পিঞ্জর শূন্য; তাহার অতি যত্নের পোষা পাখী কি জানি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। দীনের গৃহ—নিয়ত হাহাকার-পরিপূর্ণ।

সে আজ তিন দিন উপবাসী। তাহার স্ত্রীর মুখেও এ তিন দিন এক গ্রাস অন্ন বা এক ফোঁটা জল যায় নাই। তাহাদের এ উপবাস ব্রত নিয়মে নহে, অন্নাভাবে। তাহারা প্রতিবাসিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পয়সা-কড়ি, চাউল-ডাউল, তৈল-লবণ ধার করিবার জন্য বহু প্রয়াস পাইয়াছে; দোকানদারের নিকট হইতে ধারে ক্রয় করিবার নিমিত্ত বহু যাতায়াত—কত কাকুতি-মিনতি করিয়াছে, পাইবার আশা না থাকিলে ধার দেয় কে? তাই আজ তিন দিন তাহাদের অনশন। পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, এতদিন মাথা রাখিবার যে ক্ষুদ্র কুটীরখানি ছিল, বৈশাখের ঝড়ে—বর্ষার বাদলে তাহাও মনুষ্য বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। গৃহের আচ্ছাদন তৃণগুলির অধিকাংশ প্রবল বাতাসে উড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে। অর্থের মধুর ঝঙ্কার ব্যতীত সে প্রাণহীন নির্দ্দয় তৃণগুচ্ছ আর সে গৃহ-চূড়ে ফিরিয়া আসিবে না! হায় নির্জ্জীব তৃণদল! নির্ম্মম মানবের ন্যায় তোমরাও যে অতি নিষ্ঠুর!—দরিদ্রের প্রতি সকলেই যে সম বিমুখ!

সে অর্দ্ধখানি পরিমাণ শতভালিযুক্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া বাটীর অদূরে তাহার আশার শেষ সম্বল ক্ষুদ্র জমীটুকুর একপ্রান্তে বসিয়া ক্ষেত্রের ভাবী শস্য, মধ্যাহ্ন গগনের প্রখর সূর্য্যের অগ্নিময় বিরাট বিচিত্র আপন মূর্ত্তি, কি তদপেক্ষাও অধিকতর ভীষণ অতি বিচিত্র আপন অদৃষ্টের অদ্ভুত খেলার বিষয় চিন্তা করিতেছে, এমন সময় তাহার জনৈক দূরাগত সজাতীয় বান্ধব আসিয়া বলিল,—

"উঃ—বড় পিপাসা! বেলাও অধিক হইয়াছে, চল নারায়ণ, আজ এবেলা তোমার বাটীতেই বিশ্রাম করিয়া যাইব।"

সে প্রমাদ গণিল। তাহার অনশনক্লিষ্ট বিশুষ্ক বদনমণ্ডল সেই মুহূর্ত্তে আরও শুকাইয়া গেল। সে আজ তিন দিন উপবাসী, ক্ষুৎ-পিপাসায় তাহার কণ্ঠতালু সব শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, চক্ষু তাহার কোটরগত, শরীর কঙ্কালসার, দুর্ব্বলতায় মুখে কথাটি ফোটে না! গৃহে তাহার সরলা সাধ্বী সহধর্ম্মিনী—তাহার পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী অনশনে মরিতে বসিয়াছেন, এ দুর্দ্দিনে তাহার অদৃষ্টে এ কি ভীষণ অভি-শাপ? নির্দ্দয় বিধাতার এ কি নিষ্ঠুর পরি-হাস? তাঁহার এ বিচিত্র খেলা?—এ কি ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষা?

সে মনে মনে ভাবিল, তাহার গৃহ আজ গৃহস্থের বাসভবন নহে, সে গৃহ আজ অন্ন-জলহীন উত্তপ্ত মরুভূমি, সে গৃহ আজ ভীষণ শোকের শ্মশান, সেখানে আজ শুধুই দৈন্যের ভীষণ রাজত্ব, সেখানে আজ বিসর্জ্জন আছে, কিন্তু আবাহন নাই, সে গৃহ আজ অতিথি-সৎকারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। দরিদ্র-নারায়ণ একটুকু প্রকৃতিস্থ হইয়া—হৃদয়ে বলসঞ্চয় করিয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে আপনার বাটী দেখা-ইয়া দিয়া ধীর-নম্র-বচনে বলিল—"ঐ আমার বাড়ী দেখা যাইতেছে, মহাশয় তথায় যাইয়া বিশ্রাম করুন, জলপান করিয়া একটুকু শীতল হউন, আমার স্ত্রী আছেন, আপনার অযত্ন হইবে না, আমি একটা অতি আবশ্যকীয় কাজ সারিয়া এখনই আসিতেছি।"

অতিথি দরিদ্র-নারায়ণের বাসভবনাভি-মুখে চলিয়া গেল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর। মাথার উপর বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অগ্নি বর্ষণ করিতেছেন। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র বাজারের এক ক্ষুদ্র বিপণিতে দোকানদার আপন পশরা লইয়া দূরে গ্রামা-ন্তরে হাটে যাইবার জন্য ব্যস্ত। এমন সময় দরিদ্র-নারায়ণ অতি নম্র অতি করুণ স্বরে বলিল, "ভাই, বড়ই বিপদে পড়িয়া আজ আবার তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। দাও ভাই, দয়া করিয়া আমাকে এক সের চাউল দাও; এই দুপুর বেলা গৃহস্থের দ্বারে এখনও অভুক্ত অতিথি বসিয়া আছেন, আজ আমাকে এক সের চাউল, কিছু ডাউল ও একটুকু তৈল-লবণ ধারে বিক্রয় করিয়া গৃহস্থের লজ্জা, জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা কর। দোহাই তোমার, আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমি যেমন করিয়া পারি, তোমার এ ঋণ শোধ না করিয়া আর জলবিন্দুও গ্রহণ করিব না।"

দোকানদার চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অতি রুক্ষ স্বরে বলিল, "না, সেটি হইবে না, কাহাকেও আর এক কড়ার মালও বাকী বিক্রয় করিতে পারিব না; ধার-বাকীর দিন চলিয়া গিয়াছে, যাও, তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ গিয়া—এখান হইতে দূর হও।" এই বলিয়া দোকানী আপন পশরা মাথায় বহিয়া হাটের পথে চলিয়া গেল।

দরিদ্র-নারায়ণ কত দোকানে গেল, কত গৃহস্থের দ্বারস্থ হইল, কত কাকুতি মিনতি কত

উচ্চ অশ্রুপাত করিল, হাতে পায়ে ধরিল, কিন্তু "পাষাণে কর্দ্দম নাস্তি," কাঙ্গালের রোদনে কাহারও পাষাণ-কঠোর প্রাণ গলিল না, কেহ এক মুষ্টি চাউল-ডাউল দিয়া "দরিদ্র-নারায়ণের" অতিথি-পূজার সহায় হইল না—তাহার গৃহস্থ-ধর্ম্ম রক্ষা করিল না।

গৃহ-দ্বারে ক্ষুৎপিপাসাতুর অতিথি ডাকিয়া বলিতেছেন, "ঘরে কে আছেন? বড় পিপাসা, একটুকু শীতল জল দিয়া অতিথির প্রাণ রক্ষা করুন।"

দরিদ্র-নারায়ণের সহধর্ম্মিনী তখন গৃহ-কোনে বসিয়া আপনাদের শোচনীয় দৈন্যের বিষয় চিন্তা করত নীরবে অশ্রুপাত করিতে-ছিল। হায়! আজ তিন দিন সে স্বামীকে এক মুষ্টি অন্নদানে সমর্থ হয় নাই। এ তিন দিন সে নিজেও জলবিন্দু গ্রহণ করে নাই, সে নিজেও ক্ষুৎপিপাসায় যারপর নাই কাতর, ক্ষুধায় তাহার উদর জ্বলিয়া যাইতেছিল, অত্যাধিক দুর্ব্বলতায় শরীর অবসন্ন বোধ হইতে ছিল, মস্তক ঘুরিতেছিল, চক্ষু আঁধার হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু সে বিষয়ে যেন ভ্রুক্ষেপও ছিল না. সে কেবলই তাঁহার স্বামীর দুরবস্থার বিষয়—তাঁহার অনশন-ক্লেশের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া অশ্রুজলে ধরা সিক্ত করিতে ছিল, আর থাকিয়া থাকিয়া প্রার্থনা করিতে-ছিল, "ভগবান! আমার স্বামীর এ দুর্দ্দশা দূর কর, তাঁহার ক্ষুধার অন্ন মিলাইয়া দাও।" কাঙ্গালের কাতর প্রার্থনা ভগবানের দয়ার দুয়ারেও পঁহছে না কি?

যত্নাভাবে সে অর্দ্ধ উন্মাদিনী। তাই সতী প্রচ্ছন্ন ভাবে গৃহ কোনে বসিয়া ছিল। অতিথির হাঁক-ডাকে তাহার চিন্তা-স্রোত বাধা প্রাপ্ত হইল, তাহার চিন্তামগ্ন চিত্তের লুপ্তপ্রায় সুপ্ত চৈতন্য যেন প্রাণের কোন এক গুপ্ত কক্ষ হইতে পুনঃ ফিরিয়া আসিল। সে ত্রস্তে উঠিয়া একটি মৃন্ময় পাত্রে জল পূর্ণ করিয়া দ্বারের অন্তরালে আত্মগোপন করতঃ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক অতিথিকে জল প্রদান করিল। অনন্তর সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বিনীত ভাবে বলিল, "ওখানে আসন আছে দয়া করিয়া বসুন, জল পান করুন, গৃহস্বামী বাটিতে নাই, তিনি না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

অতিথি জল পান করিয়া অলিন্দে নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিন্তু বহুক্ষণ অতীত, তথাপি দরিদ্র-নারায়ণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করায় তাহার মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে যে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত!

কিয়ৎকাল অন্তে দরিদ্র-নারায়ণ রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরিল। সে আসিয়াই যোড় হস্তে অতিথিকে বলিল, "মহাশয়ের বড় কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই; বড় ঠেকিয়া পড়িয়াছিলাম, ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া সে গৃহে প্রবেশ করিল।

এদিকে গৃহ মধ্যে ক্ষণকাল অতি মৃদুস্বরে পতিপত্নীতে কি যেন একটুকু আলাপ হইল, অনন্তর অতি মৃদু অতি কম্পিত স্বরে দম্পতীর প্রাণের প্রবল আবেগ পূর্ণ করুণ প্রার্থনা যেন শ্রুত হইল; পরে গৃহ মধ্যে একটুকু হস্ত-পদ বিক্ষেপ শব্দ—একটু আকুল গোঁঙানী যেন

পথিকের শ্রুতিগোচর হইল। তার পর সে গৃহে আর জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই!—একটি প্রাণীর নিশ্বাস বায়ুও যেন সেখানে আর বহিতেছিল না! মুহূর্ত্তে সব নীরব!

কে যেন কি একটা অভূতপূর্ব্ব অব্যক্ত আতঙ্কের কাল ছায়া অতিথির প্রাণে মুহূর্ত্তে ঢালিয়া দিল! ভয়ে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

অতিথি বিস্ময়-ভীত কম্পিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে "নারায়ণ! নারায়ণ!" বলিয়া দরিদ্র-নারায়ণকে দুই চারি বার ডাকিল; কিন্তু কোথা হইতেও কেহ উত্তর প্রদান করিল না। তখন সে চীৎকার করিয়া প্রতিবাসীদিগকে ডাকিল। প্রতিবাসিগণ তথায় সমবেত হইলে দরিদ্র-নারায়ণের গৃহ-দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। হরি! হরি!! হরি!!! দম্পতীর একি অভাবনীয় শোচনীয় লোমহর্ষণ পরিণাম। গৃহ-মধ্যে একি ভীষণ—একি করুণ দৃশ্য! দম্পতীর অনশন-ক্লিষ্ট প্রাণহীন অর্দ্ধ উলঙ্গ শীর্ণ দেহ শূন্যে উদ্বন্ধনে ঝুলিতেছে! কাঙ্গালের দুঃখ-দৈন্যের চির অবসান হইয়াছে, সব ফুরাইয়া গিয়াছে!

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

দাস আমি—পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থকার ভাবুক—ভাবের ঘোরে অনেকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া আমিত্বের অহমিকাকে ভুমিত্বে বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্বজনীন সেবার জন্য দাস আমি নাম ধারণ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নামিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। দ্বিজসন্তান পরের দাসত্ব অপেক্ষা নিজের দাসত্ব, যথা, বিশ্বের মাঝে আপনাকে ডুবাইয়া দুই পয়সা কম মজুরিতে দশের দাসত্ব করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য করিতে পারা যায়। দ্বিজ হরিশ্চন্দ্র তাহাই করিতে প্রয়াসী—মা বিশ্বজননী তাহার প্রয়াস পূর্ণ করুন। পুস্তকখানির মজুরী ॥• আনা। আজকালকার দিনে মজুরী বেশী বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতা গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

সরলা—নন্দিনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস গুপ্ত মহলানবীশ প্রণীত। গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। অনেকানেক প্রবন্ধ রচনায় আমরা ইতঃপূর্ব্বে তাহার প্রভূত মুন্সিয়ানার পরিচয় পাইয়াছি। উপন্যাস রচনা ইহাই তাহার প্রথম হইলেও হিন্দু নর নারীর পাঠের উপযোগী চরিত্র চিত্রণ ইহাতে বেশ প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা পুস্তকখানি পাঠে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, পুস্তকের ছাপা ও কাগজ সুন্দর, বাঁধা খুব মনোজ্ঞ, বন্ধু বান্ধবকে উপহারে দিবার পক্ষে খুব ভাল, মূল্য ১।• টাকা। ২১৪ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট কলিকাতায় বিজনবাসিনী পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

আলোচনা, ত্রয়োবিংশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২৬ সাল।

দশভুজাষ্টক।

১

মহাশক্তি দশভুজা মহিষ-মর্দ্দিনী,
সিংহ পৃষ্ঠাসনা, আস্যে সুহাস্যধারিণী,
মধ্যাহ্ন সূর্য্য-সন্নিভ নেত্রাগ্নিবর্ষিণী
প্রসীদ মা জগন্মাতঃ ত্বংহি নারায়ণী।

২

দশ করে দশ অস্ত্র উজ্জ্বলকারিণী,
ক্রমে দশ গুণোত্তর শক্র বিঘাতিনী,
হাসি ও হুঙ্কারে কাঁপে যুগপৎ মেদিনী,
প্রসীদ মা জগন্মাতঃ ত্বংহি নারায়ণী।

৩

সে হাসির শান্তরসে সরসরূপিণী,
হুঙ্কারে বিরূপরসে বিরূপধারিণী,
এ সাম্য ভৈরব দৃশ্যে স্থিতি সংহারিণী,
প্রসীদ মা জগন্মাতঃ ত্বংহি নারায়ণী।

৪

মহামায়া মহাজ্যোতিঃ দিগন্তব্যাপিনী,
তাতে সব চণ্ড দেবশক্তি প্রকাশিনী,
শিবশক্তি শীর্ষদেশে, শক্তি সঞ্চারিণী,
প্রসীদ মা জগন্মাতঃ ত্বংহি নারায়ণী।

৫

অনন্ত তোমার মায়া অনন্তরূপিণী,
অকালবোধনে রাম-ভয় বিনাশিনী,
মানস-সরসে তুমি শান্তি-সরোজিনী,
প্রসীদ মা জগন্মাতঃ ত্বংহি নারায়ণী।

৬

হিমালয় মেনকার চিত্ত বিমোহিনী,
কন্যারূপে আগমন, দুঃখ নিবারিণী,
তাই বঙ্গ সুখে গায় গীত আগমনী,।
প্রসীদ মা জগন্মাতঃ ত্বংহি নারায়ণী।

৭

এরূপ সুরূপ চির সুখ বিস্তারিণী,
গুহ গজানন লক্ষ্মী শ্রীবাক্‌বাদিনী—
সম্মিলন, তুমি মধ্যে শক্তি প্রদায়িনী,
প্রসীদ মা জগন্মাতঃ ত্বংহি নারায়ণী।

৮

পূর্ণ এ সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি বিশ্ব-প্রসবিনী,
তাই বঙ্গ আত্মহারা হে আত্মারূপিণী,
পূজিছে শ্রীবৃন্দাবন—সে পূজা জননী,
প্রসীদ মা জগন্মাতঃ ত্বংহি নারায়ণী।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।

আবার পূজা।

আবার এসেছে পূজা, পড়ে গেছে ধূম।
পুলকে শিহরে প্রাণ, নাচে-রুম্ রুম্।
শুনিয়ে সানাই ধ্বনি, মনে মনে অনুমানি,
আপনি আমোদ ভরে, হয়ে আসে ঘুম্।
পুলকে শিহরি উঠি' নাচে রুম্ রুম্॥
প্রতিপদ-ঘট ওই বাঙ্গালার ঘরে।
মার্কণ্ডেয় চণ্ডীপাঠ নিয়ম আচারে॥
জোছনায় শরতের ডুবু ডুবু বান।
জলভরা ধানক্ষেতে আগমনী গান॥
দূরের ঘুঘুর ডাক্ পড়ন্ত বেলায়।
বিরলে শুনিলে কভু ভোলা কি-সে-যায়?
তেমনি আমোদভরা ধরণীর কোলে।
মূঢ় কেও অজ্ঞান হেন আঁখি নাহি খোলে!
গুরু-গুরু দেয়া ডাক্ নাগারার বোল!
বলে, জয় "দশভুজে" রব ওঠে উতরোল॥
সেই আনন্দে মাতি' মনরে আমার!
দুর্গতিনাশিনী মায়ে ডাকিবি কি আর?
বিসর্জ্জন দশমীর—প্রভাত তাহার,
যদিও জানরে তুমি, কত বেদনার,—
তথাপিও বাঁধ বুক দৃঢ় কর প্রাণ।
গাহিতেই হ'বে ওই আরতির গান॥

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার।

মাতৃ-আবাহন।

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

আজ শারদীয়া পূজা সমাগমে কোটি কণ্ঠে সন্তান মাকে ডাকিতেছে—"এস।" মায়ের আবার আসা যাওয়া কি ভাই? তিনি ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্রে বিরাজিতা, স্থাবর জঙ্গমে, জলে-স্থলে, বনে-কান্তারে, অনলে-অনিলে, গগনে-পবনে, বৃক্ষ-লতায়, জলদের গায়, শশ-তারকায়, এমন কি অণু-পরমাণুতে যিনি রহিয়াছেন, তাঁহার আবার আগমন-গমন কিরূপে হইতে পারে? যিনি এক দণ্ড না থাকিলে সৃষ্টি লোপ পায়, পৃথিবী অচল হয়, যিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভরণ-পোষণ-কর্ত্রী তাঁহার বৎসরান্তে একবার ধনীর বাড়ীতে পূজা খাইতে আসা, হাসির কথা বই কি? আর যিনি ধনি-দরিদ্র সকলকেই সমভাবে পালন করিতেছেন, তাঁহার শুধু ধনি-ভবনে একচেটিয়া আগমন কখনই সমদর্শিতার পরিচায়ক হইতে পারে না। কেন না তিনি ত' পার্থিব জীব নহেন যে, আমাদের মত উদর-সর্ব্বস্ব হইবেন।

মোহাচ্ছন্ন জীব সর্ব্বদা তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই তাঁহার আগমন কল্পনা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্যও স্থির করা। ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করিতে, ব্যথিতের জলভরা চক্ষু মুছাইতে, দরিদ্রের অনশন দূর করিতে, মাতৃভক্ত শিশুগণকে আনন্দরসে অভিষিক্ত করিতেই মায়ের আগমন। মায়ের আগমন কালও অতি মনোরম। দুঃখের পর সুখের আস্বাদ বড়ই মধুর—বড়ই তৃপ্তি ও আনন্দদায়ক। বর্ষার ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জন, গগন মণ্ডল সর্ব্বদা

জলধারাক্ত, বন্যায় দেশ প্লাবিত, লোকে নানা দুঃখ দুর্দ্দশায় পীড়িত ও অবসন্ন, এমন সময়ে ধীরে ধীরে সিন্দুরবরণা শরৎ সুন্দরী আনন্দের ডালা লইয়া বঙ্গের অঙ্গনে অঙ্গনে দেখা দিলেন, মেঘ কাটিয়া গেল, প্রকৃতি হাস্যময়ী হইলেন, রজনী কৌমুদীবিধৌত ও জনগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তখনি জগজ্জননীর শুভাগমন। দুঃখ-যন্ত্রণায় অসাড়-হৃদয় মানবের শক্তি:সঞ্চারণ করিতে দশ-প্রহরণ ধারিণী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী জননী বঙ্গে আসিতেছেন। (তাই ভক্ত ইহাকে শক্তি-পূজা বলিয়া থাকেন) সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয় ও সিদ্ধিদাতা গণেশ আসিতেছেন। অশিক্ষায়, কুশিক্ষায় দেশ আচ্ছন্ন, তাই যাঁহার করুণাবলে মূক বাচাল হয়, মূর্খ পণ্ডিত হয়, সেই বাগ্বাদিনী বাণী বীণাপাণির আগমন। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের প্রবল প্রকোপে এবারও হতভাগা দেশের সন্তানকুল অনশনে মৃতপ্রায়, তাহাদের অনশন ও অর্দ্ধাশন মায়ের প্রাণে বড় বাজিয়াছে, তাই মা অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী আসিতেছেন। তাই আজ আমরা ধনি-নির্ধন, ছোট বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে উৎফুল্ল হৃদয়ে মায়ের আহ্বান করিতেছি! আশা—হৃদয়ে বল পাইব, মনে উৎসাহ পাইব! মায়ের আগমনে আমরা কয় দিনের জন্য শোক-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া আনন্দে মাতিব, ইহাই আকাঙ্ক্ষা। বস্তুতঃ, তাঁহার আগমনে সংসারের সন্তাপ থাকে না, দুর্গতিনাশিনীর সমক্ষে দুর্গতি দাঁড়াইবে কি করিয়া? আর মা যে আমাদের আনন্দ-ময়ী! আনন্দ বিতরণ করিতে আসিতেছেন, আর বলিতেছেন—"কে নিবি গো তোরা কে নিবি গো আমায় কিনে।" পাষণ্ড ধন তাঁহার নাগাল পায় না। তাঁহাকে কিনিতে হইলে 'ভক্তি-মূল্য' চাই। তিনি ভক্তের সম্পদ, অভক্তের কেহই নন। আজ কোটী কোটী সন্তান মায়ের পূজা করিবে। কিন্তু তাঁহাকে যে যত ভক্তি অর্ঘ্য দিতে পারিবেন, তিনি তাঁহারই হৃদয়-মন্দিরে তত অধিষ্ঠিতা থাকিবেন। পূজার ভারটি শুধু পুরোহিতের উপর দিয়া যিনি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকেন অথবা বাজে কাজে রত থাকেন, মা কি কখনো তাঁহার দিকে একবারও ফিরিয়া চান? তাই বলিতেছিলাম ভক্তি-মূল্যে বিকাইয়া যাইতে হইবে। দুঃখের বিষয়, সকল জিনিষের প্রাচুর্য্য হইলেও বর্ত্তমান সময়ে আমাদের একটি আসল জিনিষের নিতান্তই অভাব হইয়াছে। সেটি হচ্ছে—ভক্তি। আমরা মায়ের পূজার নাম করিয়া বিরাট বিলাসের আয়োজন করিয়া থাকি, ডাকের সাজ দিয়া মায়ের সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া দিই, আঙ্গিনায় ঝাড় লণ্ঠন গ্যাসের আলো দিয়া দর্শকের চক্ষু ঝল-সাইয়া দিই—পূর্ব্বের মত মায়ের রূপ দেখিয়া হৃদয়ে কিন্তু আর তেমন ভক্তি-ভাবের সঞ্চার হয় না। মায়ের মণ্ডপ সমক্ষে বেশ্যার নাচ ও মত্তপের বক্তৃতা, খেমটা, যাত্রা, থিয়েটারের অভিনয় করাইয়া আমরা এখন লোকের বাহবা লাভে তৎপর। ভক্তিহীন হইয়াছি বলিয়াই ত আমাদের এমন দুর্গতি হইয়াছে। তাই মাকে ডাকিতেও ভয় পাই। আবার

যে কলুষিত। মাকে বসাইব কোথায়? ভক্তি-সলিলে হৃদয় মার্জ্জিত করিয়া তবে মাকে আহ্বান করিতে হয়। তাই চিন্ময়ী জগদম্বার কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি "মা আমাদের হৃদয়ের কলুষতা নাশ কর। তোমাকে আমাদের হৃদয়াসনে বসাইয়া তোমার ভূবন-মনোমোহিনী রূপ নয়ন ভরিয়া দর্শন করি;

শ্রীরাধাচরণ—

শ্রীশ্রীদুর্গামূর্ত্তি

সাকার ভাবে দেব দেবীর চিন্তা বাঙ্গালীর বিশেষত্ব। যতদিন ধ্যান ধারণা, পূজা উপাসনা ততদিন সাকার ভাবে দেবতার চিন্তা না করিলে আর উপায় নাই। নিরাকার ভাবের চিন্তা নাই—আর দেবতারা যে নিরাকার তাহা ভাবিতে যে বাঙ্গালীর মন উঠে না, প্রাণ মজে না। বিশ্বকর্ত্তা নিরাকার বা নির্গুণ বলিতে বাঙ্গালী প্রাণে বড়ই আঘাত পায়। যিনি বিশ্বের আদিভূত, ভূমা পুরুষ, তাঁহার রূপ নাই, গুণ নাই, একথা বলিলে যেন তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব হইতে তাহাকে খুব ছোট করা হয়। তাঁহার নাই কি? যাঁহার সব লইয়া এই জগতের সমস্ত প্রকাশ পায়, যাঁহার শক্তিতে এই জগৎ শক্তিমন্ত, যিনি বিশ্বরূপ, যিনি সকল গুণের আধার, তাহার এটী নাই, ওটী নাই, বলিলে যেন তাহার শ্রেষ্ঠত্বতে দোষারোপ করা হয়। আমরা যাহা দেখি—যাহা আমাদের নয়-নের গোচরীভূত, সে সমস্তই তাঁহার রূপ। জগতের প্রত্যেক বস্তুতে যখন তিনি স্বরূপে বর্ত্ত-মান, তখন তাঁহার রূপ নাই, তিনি নিরাকার কেমন করিয়া বলিব? তিনি যাবতীয় গুণ এবং রূপের আধার, তাঁহার এতরূপ ও এতগুণ যে আমরা তাহা ধারণায় আনিতে পারি না, তজ্জন্য সময়ে সময়ে আমরা তাহাকে নির্গুণ বা নিরা-কার বলিয়া ফেলি। ইচ্ছাময় চৈতন্যস্বরূপ ভগ-বান সৃষ্টি করিবার মানসে নিজের রূপ ও গুণ দিয়া এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, যখন হইতে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতেই তিনি সাকার এবং সগুণ, সৃষ্টির পূর্ব্বের কথা—সান্ত আমরা—অনন্তের ভাব বুঝিবার আমাদের অধিকার কি? ক্ষুদ্র সরোবরের সফরী আমরা, অতল সমুদ্রের কথা কহিয়া লাভ কি? অনেকানেক সাধক যখন ভগবানকে সাকার মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন, তখন তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া মনের মধ্যে একটা বিষাদ-ভাব আনয়ন করি কেন? আমাদের সাকারে যত আনন্দ—মায়ের নিকট আবদারে ছেলের মত ইহা দাও উহা দাও বলিয়া চাহিয়া, কাঁদা কাটা করিয়া যত সুখ, যত শান্তি, নিরাকারের নীরস সাধনায় তত সুখ আমাদের কোথায়? সাধক মনের মধ্যে মন্ত্র দ্বারা যে মূর্ত্তি গড়িয়া হৃদয়-মন্দিরে বসাইয়া ধ্যান-ধারণা করেন, বাহ্যমূর্ত্তি তাঁহারই অভিব্যক্তি। ভিতরের মূর্ত্তিই বাহিরে প্রকাশ। সাধক যখন অতৃপ্ত বাসনা লইয়া হৃদয়-মন্দিরে মাকে বসাইয়া পূজা করেন, তখন তিনি আর কাহাকেও দেখাইতে চাহেন না, একাকী আপন ভাবে বিভোর হইয়া ইষ্ট মূর্ত্তির পূজা করেন; তখন বলেন:—

আদর করে হৃদে রাখি আদরিণী শ্যামা মাকে
মন তুমি দেখ আর আমি দেখি
আর যেন মন কেউ না দেখে।

সাধক তখন অজ্ঞান-কুসঙ্গী প্রভৃতির সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া প্রহরীস্বরূপ নিজের জ্ঞানকে হৃদয়-দ্বারে বসাইয়া মানস পুষ্পে মায়ের চরণে অঞ্জলি প্রদান করে; কেবল একবার রসনার সাহায্য লইয়া ভক্তি-বিভোর চিত্তে প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে মা বলিয়া ডাকে আর পূজায় আত্মসমর্পণ করে। তারপর যখন তাহার সাধনার সাধ—মাকে আপন করিয়া লইবার সাধ মিটিয়া যায়, যখন প্রতি লোমকূপে সে মায়ের অস্তিত্ব অনুভব করে, তখন আর তাহার একা দেখিয়া, সামান্য দুইটী চক্ষের দৃষ্টিতে দেখিয়া সাধ মিটে না, তখন সেই হৃদয়ের দেবতাকে বাহির করিয়া সাকার ভাবে চক্ষের সম্মুখে বসাইয়া আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলে মিলিয়া সমস্বরে মায়ের গালভরা নাম উচ্চারণ করে, সেই ভুবনভরা রূপের পূজা করিয়া ধন্য হয়, ইহাই বাঙ্গালীর সাকার মূর্ত্তি-পূজা।

এ মূর্ত্তিপূজা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। সার্বণিক মন্বন্তরে রাজা সুরথ ও সমাধী নামক বৈশ্য এই দুর্গামূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন। সকল দেবতার শক্তি একত্র সমাবেশে মহিষাসুর বধের জন্য এই মূর্ত্তি দেবতাগণের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল; তবে মূর্ত্তিপূজা মিথ্যা বলিলে চলিবে কেন? ত্রেতায় ভগবান রামচন্দ্র ও রাবণ বধের জন্য ঠিক এমন দিনে এই মূর্ত্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন। [illegible] মূর্ত্তি সামান্য অধিকারীর জন্য বলিলে চলিবে কেন? আর শুনিবেই বা কে?

দুঃসাধ্য অসৎ প্রবৃত্তির নিবারণ যাহা হইতে হয় সেই জ্ঞানস্বরূপা শক্তিকে দুর্গা বলিয়া আখ্যাত করা যায় বা যাহাকে জানিতে পারিলে সংসার দুঃখের নাশ হয় তিনি দুর্গা—দুর্গা পরমাত্মা স্বরূপা।

আত্মা ভিন্ন জগতে কোন বস্তুই নাই সুতরাং দুর্গাই জগতের আধারভূতা রক্ষা-কর্ত্রী। তিনি দুর্গারূপে জগতের রীতি নীতি শিক্ষা দিতেছেন, দুর্গামূর্ত্তিতে সংসার-সংগ্রাম জয়ের অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইতেছে। মন্ত্রীর মন্ত্রণাক্রমে যুদ্ধ জয় হয় এবং তাহার স্থান বামভাগে, এই জন্য বিদ্যা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী বামে, শত্রু নিধনে বহুবিধ ধনের প্রয়োজন, এই জন্য দক্ষিণে ধনদাত্রী লক্ষ্মী, যুদ্ধে সেনাপতি সঙ্গে থাকা প্রয়োজন, এই জন্য বামে সেনাপতি কার্ত্তিকেয়—সর্ব্বসিদ্ধির সিদ্ধিদাতা গণপতি দক্ষিণে। যুদ্ধ জয় লাভ করিতে হইলে সিংহ বিক্রম আবশ্যক, এই জন্য মা আমার সিংহ-পৃষ্ঠে আরূঢ়া, সর্ব্ববিষয়ে উদ্যোগী হইতে হইলে মৃত্যু ভয় করিলে চলিবে না, এই জন্য মৃত্যুরূপ মহিষ মায়ের পদতলে। শত্রু সামান্য হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করিবে না—এই জন্য মহিষ-গর্ভ পতিত শত্রুকেও তাই মা নাগপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

বাহুবলে বলীয়ান্ হইলে জগতে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না; মহিষাসুর এই জন্য ভগবতীর সহিত ঘোরতর রণ করিয়া দেবীর কৃপা লাভ করিয়াছিল। দেবী এই ভক্তের

সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারেন নাই, ভক্তিবলে যখন মহিষাসুর রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিযুদ্ধ করিয়াছিল, যখন ভক্তি-তেজে উদ্দৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিল "মস্তক না কাটি' তব ছাড়িব চরণ" তখনই দেবী ভয় ভীতা হইয়া বলিয়াছেন "ভক্তবীর! আর যুদ্ধে কাজ নাই, বর গ্রহণ কর।" যে ভক্তিবলে ভক্তাধীনাকে বাঁধিয়াছে, সেত নিজের কিছু চায় না, স্বার্থ-সিদ্ধি ত তাহার উদ্দেশ্য নহে, তাই মহিষাসুর বলিল "মা! এই আমি তোমার মুক্তি মূলাধার পদতলে বশ্যতা স্বীকার করিলাম, আজ হইতে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, জীব দুর্গা দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিবে তাহার সেই কার্য্য সফল হইবে। আর, যদি না হয়, যে দিন যাত্রাকারীর দুর্গা নাম ব্যর্থ হইবে, সেই দিনেই আবার আমি এই বাৎসল্য-পাশ মুক্ত করিয়া বিশ্ববাসীর জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।" মা "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকৃতা হইলেন। ভাই! দুর্গা নামে সকল অমঙ্গল দূর হয়, আজ সেই মাকে সাধক প্রীতি-পুষ্প ভরা হৃদয়-কন্দর হইতে বাহির করিয়া তোমার নয়ন সম্মুখে ধরিয়াছেন। ঐ দেখ, মা আমার হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে দশ হস্ত প্রসারিত করিয়া তোমার দশদিক রক্ষা করি-তেছেন, অভয়া অভয় দিতে আজ তোমার চণ্ডী-মণ্ডপ আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

এস মা আনন্দময়ি! নিরানন্দ ভবনে।
আশাপথ চেয়ে আছি, জবা দিব চরণে॥

দাও ভক্ত! দাও সাধক! ঐ ত্রিলোকা-রাধ্য পদে রক্তজবা প্রদান করিয়া করযোড়ে বল,—

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
পুণ্যাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোঽস্তুতে।

সম্পাদক।

পুনর্ম্মিলন।

(গল্প)

শারদীয়া মহাষষ্ঠী। মা আনন্দময়ীর আগমনে আজ বাংলার প্রতি গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে আনন্দের নির্ম্মল উৎস ছুটিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে এক নব আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে। পবনদেব জগজ্জননীর শুভাগমন বার্ত্তা জগন্ময় ঘোষণা করিতেছে। প্রবাস-প্রত্যাগত কর্ম্মশ্রান্ত বাঙ্গালীগণ আন-ন্দের উচ্ছাস বুকে লইয়া প্রফুল্লমুখে দেশে ফিরিতেছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, সান্ধ্য-বায়ু ধীরে মালতী, সেফালিকা প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া মায়ের আগমনবার্ত্তা জগতে ঘোষণা করিতেছে। নরেশের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া সুরমা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া নরেশের কথা ভাবিতেছিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"বৌদি।"

"কে, ঠাকুরপো! এস ভাই এস; এত দেরী হ'ল কেন?"

নরেশ তাড়াতাড়ি আসিয়া সুরমাকে প্রণাম করিল। পরে বলিল,—"কোন একটা বিশেষ কারণে দেরী হ'য়ে গেল।"

"আমরা কিন্তু ভেবে ভেবে সারা হয়েছি। যোসেদের চাক আজ তিন দিন হ'ল বাড়ী

আসিয়াছে, তাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা কর্লেম, তা' সে কিছুই বল্তে পার্‌লে না।"

"চারু কেমন করে জান্বে! চারুদের বাসা ভবানীপুরে আর আমাদের মেস্ হ'ল হ্যারিসন রোডে; অনেক দূর।"

"সে যাক্, তুমি এখন হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে জল খাও।" এই বলিয়া সুরমা জলখাবারের যোগাড় করিতে গেল।

নরেশ মুখ হাত ধুইয়া আসিলে, সুরমা জলখাবার আনিয়া দিল। খাবারের পরিমাণ বেশী দেখিয়া নরেশ বলিল,—"বৌদি এ করেছ কি! এত খাবার কি খাওয়া যায়?"

"সবে এই ক'টা খাবার, তাও খেতে পার্‌বে না, কেন লজ্জা হচ্চে নাকি?"

নরেশ ঈষৎ হাসিয়া মিষ্টান্নগুলি একে একে গলাধঃকরণ করিতে লাগিল।

সুরমা বলিল—"ঠাকুরপো, তোমাকে এবার যেন বড্ড রোগা বলে বোধ হচ্চে, কোন অসুখ করেছিল নাকি?"

"হঁ। বৌদি! ডাইরিয়াতে প্রায় ১৫।২০ দিন ভুগেছি, তারপর মেসের খাওয়া—ডিস্পেপসিয়া লেগে আছেই।"

"তা' এতদিন অসুখে ভুগ্‌লে, আমাদের একটা খবর পর্য্যন্ত দিতে নাই?"

"খবর দিয়ে কেবল আপনাদিগকে ভাবান বই ত নয়?"

"তা' বলে অসুখ কর্‌লে খবর দেবে না! আজ প্রায় একমাস হ'ল, কোন খবর নাই, একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখ নাই, বেশ লোক কিন্তু?"

"আপনিই বা ক'খানা পত্র দিয়েছিলেন?"

"আমি ত ভাই মুখ্যু মেয়েমানুষ, চিঠি লিখতে জানি না।"

"আপনি নাই বা জান্‌লেন, আপনার সরস্বতী আছে ত, তাকে দিয়ে লিখতে পার্‌তেন, ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়।"

সুরমা বলিল,—"উপায় হইলে কি হইবে, তোমার সাবিত্রী যে পত্র লিখতে চান না, বলেন—আমি পারব না, আমার লজ্জা করে।

"লজ্জা নয়, ওটা লেখাপড়া জানার দেমাক।" এই বলিয়া নরেশচন্দ্র উঠিয়া গেল।

রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। ষষ্ঠীর চন্দ্রের ক্ষীণ রশ্মিটুকু তখনও পশ্চিম আকাশে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। এমন সময়ে নরেশ আহারাদি সমাপন করিয়া স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করত বিছানায় শয়ন করিয়া শ্রান্ত দেহে বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নরেশের ষোড়শী ভার্য্যা সাবিত্রী সুন্দরী চুপে চুপে নরেশের পার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল।

নরেশচন্দ্র পত্নীর মুখের কাপড় অপসারিত করিয়া স্নেহস্বরে বলিল—'সাবু, কেমন ছিলে?' সাবিত্রী অভিমানবিজড়িত স্বরে বলিল,—"আমার খবরে আর তোমার দরকার কি? তোমার ভালবাসা আমি সব জেনেছি। এত দিন অসুখে ভুগলে, তা' একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লেখ নাই।''

"আজকাল আমার সময় বড় কম সাবু। জান ত' এবার পরীক্ষার বছর, বি-এ পড়তে বড্ড খাট্‌তে হয়, সেইজন্যও চিঠি লিখবার সময়

পাই নাই।"

"এত খাটুনি যে একখানা চিঠি লিখবার সময় হয় না? আমার ভয় হচ্ছে, পড়ার ঝোঁকে আমায় শুদ্ধ পাছে ভুলে যাও।"

"সে কি সাবু! তোমায় কি এ জীবনে ভুলতে পারি, তোমার ভালবাসার প্রেমময়ী মূর্ত্তি আমার বুকে সকল সময়ের জন্য চির কালের মত অঙ্কিত রহিয়াছে।"

"সে এবারে বেশ বোঝা গেছে—" নরেশ বাধা দিয়া বলিল,—"আচ্ছা সাবু, সত্যি তুমি আমার জন্য খুব ভাব?"

"সে কথা তুমি কি জানবে? যদি মেয়ে-মানুষ হ'তে, তা হলে বুঝতে পারতে যে স্বামীর জন্য স্ত্রীর মন কি রকম হয়। বেশ, যাক্ সে কথা। এবার পূজায় আমার জন্য কি উপহার এনেছ?"

"তাড়াতাড়িতে কিছুই নিয়ে আসতে পারি নাই। আমার এক বন্ধুকে টাকা দিয়ে এসেছি, তিন চার দিনের মধ্যেই তোমার পূজার উপহার এসে পড়বে।"

"এত দেরী করে এলে, তাও তাড়াতাড়ি, আমি সব বুঝতে পেরেছি। থাক্, আমায় কিছুই দিতে হবে না,আমি উপহার চাই না।" এই বলিয়া সাবিত্রী বালিশে মুখ লুকাইল। নরেশচন্দ্র বলিল,—"রাগ করলে সাবু!"

সাবিত্রী মুখখানা একটু বাঁকাইয়া বলিল—"রাগ আবার কি, আমার যেমন বরাত।"

"তার জন্য কি এত দুঃখ করতে হয় সাবু! তোমার উপহার পরশ্ব দিন নিশ্চয় পাবে।"

"তোমায় আর আদর করতে হবে না। আমি সব বুঝে নিয়েছি। আমি কিছু চাই না।" এই বলিয়া কৃত্রিম রাগের সহিত পাশ ফিরিয়া শুইল। নরেশচন্দ্রের অনেক সাধা-সাধিতেও সাবিত্রী আর কথা কহিল না। অগত্যা নরেশচন্দ্রও পত্নীকে আর ত্যক্ত বিরক্ত না করিয়া সে রাত্রির মত নিদ্রিত হইল।

(২)

তার পর পূজার কয়টা দিন বেশ আনন্দেই কাটিয়া গেল। দশমীর দিন সকালে উঠিয়া নরেশচন্দ্র ওপাড়ার পিসিমাদের বাড়ী দেখা করিতে গেল। বেলা আটটার সময় পিয়ন আসিয়া একখানা চিঠি ও দুখানা পোষ্টকার্ড দিয়া গেল। নরেশ চন্দ্র বাড়ীতে না থাকায় চিঠি কয় খান সাবিত্রীর হস্তগত হইল। কার্ড দুখানা ইংরাজিতে লেখা। খামটার উপরে ছোট বড় অক্ষরে লেখা আছে "বাবু নরেশ চন্দ্র রায়।" চিঠির অপর দিকে লেখা আছে মালিক ভিন্ন খুলিবেন না। লেখকের (?) নিষেধ সত্বেও কৌতুহলী হওয়ায় সাবিত্রী খাম খানা আস্তে আস্তে খুলিয়া পড়িয়া লইল। পত্রের মধ্যস্থ অংশটুকু এই :—

"নরেশ বাবু!

এখান হইতে যাওয়া অবধি পঁহুছান সংবাদ পর্য্যন্ত দেন নাই। আমরা আপনার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছি। আপনার উপকার, আপনার ভালবাসা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। আপনি তো জানেন, সংসারে আমার আপনার বলিতে কেহ নাই। জগতে আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। যাইবার দিন মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া

না যাওয়ায় মা আপনার জন্য বড়ই ব্যাকুলা হইয়াছেন। একদিনের জন্যও আসিবেন। মা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। কোনও ওজর না করিয়া দয়া করিয়া আসিবেন। সাক্ষাতে সমস্ত বলিব। আশা করি, অভাগিনীকে হতাশ করিবেন না। শীঘ্র আসিবেন। নিবেদন ইতি।

আপনার চরণাশ্রিতা—

"নিরুপমা"

এ কি! নিরুপমা কে? কেনই বা সে এরূপ পত্র লিখিল? তবে কি স্বামী আমার তার প্রণয়াসক্ত! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাবিত্রী পত্রখানি মুড়িয়া স্বামীর পড়িবার ঘরে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল এবং বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। চিন্তা ও অভিমানের ঘন ছায়া তাহার প্রফুল্ল মুখখানিকে ঢাকিয়া ফেলিল।

সাবিত্রী স্বভাবতঃ অতিশয় লজ্জাশীলা। পত্রের কথা সে মুখ ফুটিয়া সুরমাকে বলিতে পারিল না। সাবিত্রী সমস্ত দিন যেন এক রকম হইয়া রহিল। নানাবিধ দুশ্চিন্তা তাহার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রহিল।

রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া নরেশচন্দ্র যথা সময়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সাবিত্রী শয়ন করিয়া আছে। নরেশচন্দ্র অন্য দিনের মত আজও সাবিত্রীর মুখের কাপড় খুলিলে সাবিত্রী কোন রূপ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। নরেশচন্দ্র বলিল, "কি হয়েছে সাবিত্রী? রাগ করছ কেন?" সাবিত্রী অভিমানবিজড়িত স্বরে বলিল, "তুমি আজ দিদিকে ব'লে কাল কলকেতা যাবে? কেন, কলিকাতায় তোমার এখন কি দরকার?" "আমি দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরিব। সেখানে কাজের মধ্যে তোমার ক'টা জিনিষ কেনা বৈত নয়?"

সাবিত্রী বলিল "মিথ্যে কথা!"

"কে ব'ল্লে মিথ্যে কথা?"

'কে আর ব'ল্বে, আমি বল্‌ছি। আচ্ছা সত্যি ক'রে বল দেখি, তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্লে ঠিক ঠিক উত্তর দিবে; গোপন করবে না?'

"কি কথা? ব'লব না কেন? আমি কি কখনও তোমায় কোন কথা গোপন ক'রেচি।"

"বেশ, তবে বল আজ তোমাকে কে কে চিঠি লিখেচে?" নরেশের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল, সাবিত্রী হঠাৎ আজ এসব কথা বলে কেন? প্রশ্নের কথাটা চাপা দিয়া বলিল "সতীন বাবু লিখেচে, ললিত বাবু লিখেচে, আর শরৎ লিখেচে।"

"আচ্ছা, নিরুপমা তোমার কে হয়?"

নরেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিল "নিরুপমা? সে আবার হবে কে? সে তো এক অসহায়া বিধবার মেয়ে।

"তাদের বাড়ী কোথায়?"

"তাতে তোমার কি?"

"বিশেষ দরকার।"

"আগে বাড়ী ছিল শান্তিপুরে, সম্প্রতি

কলিকাতায়।"

"তার বয়স কত? বিবাহ হয়েছে কি না?"

নরেশচন্দ্র একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল "তুমি তো Small Cause Court এর উকিলের মত বেশ জেরা ক'রতে সুরু ক'রলে দেখছি।"

"জেরা টেরা নয়, ঠিক বল।"

"তার বয়স প্রায় পনর। এ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা।"

"দেখতে খুব সুন্দরী?"

সাবিত্রী জোর গলায় বলিল "তুমি তাদের বাড়ী যাও। তুমি নিরুপমাকে ভাল বাস।"

নরেশ বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল "কে বল্লে তাদের বাড়ী যাই, তাকে ভাল বাসি। আমাদের মেসের পাশে এক গলিতে নিরুপমাদের বাসা। তার মায়ের অসুখ হয়েছিল। অসহায়া বিধবার এমন কেউ ছিল না যে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। নিরুপমার কান্না দেখে আমার প্রাণে আঘাত লাগে। আমি নিজ খরচে ডাক্তার ডেকে ৫।৭ রাত্রি জেগে বৃদ্ধার রোগ উপশম করি। সেই অবধি বৃদ্ধা আমাকে নিজের ছেলের মত ভাল বাসে। নিরুপমা আমাকে দাদা সম্বোধন করে। আসিবার সময় বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি নাই ব'লে আমাকে যাবার জন্যে অনুরোধ ক'রে পত্র লিখেছে।"

"তাই রাত্রি জেগে জেগে শরীরটা এমন শুক্‌নো কাঠ হয়ে গেছে। আমি কিছুতেই যেতে দেব না। দেখি তুমি কি ক'রে যাও।"

নরেশ বলিল "মাপ কর সাবু, আমাকে এক দিনের জন্যও যেতে দাও। আমি পরশু দিন নিশ্চয়ই আসব।"

"তারা তোমার কে, যে সেখানে যাবে? তুমি যদি যাও তো আমি মাথা খুঁড়ে——"

"অত অধীর হয়োনা সাবু! আমি যখন পরশু দিন ফিরব ব'লেচি তখন নিশ্চয়ই ফিরবো। না গেলে বৃদ্ধার মনে কষ্ট হবে এই জন্যেই যাওয়া। দিব্যি ক'রে বলচি দেখা ক'রেই ফিরব। আমার ট্রাঙ্ক, বই, বিছানা সব থাকলো। এবার বিশ্বাস হ'চ্চে তো?"

সরলা সাবিত্রী-সুন্দরী স্বামীর মনোগত ভাব বুঝিল না। সে স্বামীর কপটতা পূর্ণ কথায় বিশ্বাস করিল। নরেশচন্দ্র পত্নীকে নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া নিদ্রিত হইলেন। সাবিত্রীও নানা কল্পনা-জল্পনার পর ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সকালে নরেশচন্দ্র ভ্রাতৃ-জায়ার অসন্তোষসূচক অনুমতি লইয়া কলিকাতা রওনা হইল। যত-দূর দৃষ্টি চলে সাবিত্রী বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল। একদিন গেল, দু'দিন গেল, নরেশচন্দ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। সাবিত্রীর চঞ্চল নয়ন দু'টী স্বামী দর্শনের আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। নরেশচন্দ্র আসিল না। সপ্তাহ কাল গত হইল, অথচ নরেশচন্দ্র ফিরিল না, একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখিল না, পতিপ্রাণা সাবিত্রী স্বামী-বিরহে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সুরমা বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি

বোসেদের চারুকে ডাকাইয়া নরেশচন্দ্রের অনুসন্ধানের জন্য তাহার কোন পরিচিত বন্ধুকে পত্র লেখাইলেন।

পাঁচ দিন পরে উত্তর আসিল, "নরেশচন্দ্র বালাখানা লেনস্থ এক বৃদ্ধা ও তাহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ৺কাশীধাম যাত্রা করিয়াছে। ফিরিতে প্রায় দেড় মাস লাগিবে।"

এ বৃদ্ধা কে, কেনই বা সে তাহাদিগকে লইয়া কাশী গেল, সুরমা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

সাবিত্রী সব বুঝিল। সে তাহার স্বামীর ভালবাসার উপর সন্দিহান হইল। স্বামী যে নিরুপমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা ভাবিয়া আকুল হইল।

সুরমা সত্বর এ সংবাদ সাবিত্রীর পিতা বগলা বাবুকে পাঠাইলেন। বগলা বাবু শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তাড়াতাড়ি তাঁহার কোন আত্মীয় প্রতিবেশীকে সঙ্গে লইয়া কাশীধাম যাত্রা করিলেন। সেখানে অনেক অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু নরেশচন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। বগলা বাবু তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যে যেখানে ছিল, সকলকেই জামাতা বাবাজীবনের অনুসন্ধানের জন্য পত্র লিখিলেন, নিজে নানা স্থান ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু নরেশচন্দ্রের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না. দেখিতে দেখিতে ছয় মাস কাটিয়া গেল। এ পর্য্যন্ত নরেশচন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, জগতে সুরমার স্বামী নাই, পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু নাই, আপনার বলিতে কেহ নাই। সোদরপ্রতিম দেবর নরেশচন্দ্রকে দেখিয়া কোনরূপে সংসারে বাঁচিয়া থাকা, তাও আবার এমন কেন হইল? যে নরেশ তিন দিন বাড়ীর সংবাদ না পাইলে ব্যাকুল হইত, সে আজ ছয় মাস কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিল. এত ভক্তি, এত মমতা, সে আজ কেমন করিয়া বিসর্জ্জন দিল? সুরমা ভাবিয়া আকুল হইলেন।

সাবিত্রীর সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। সে পতিচিন্তায় নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া দিনে দিনে বৃন্তচ্যুত পুষ্পের মত শুকাইতে লাগিল। তাহার চাঁপা ফুলের মত রং মলিন হইয়া পড়িল। সাবিত্রীর আহারে প্রবৃত্তি নাই, মুখে হাসি নাই, সাজ-সজ্জায় ইচ্ছা নাই, গল্প-গুজবেও কেমন একটা বিরক্তি ভাব। সে মধ্যে মধ্যে পতির শয়ন-কক্ষে আসিয়া নতজানু হইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া কেবল ডাকে "স্বামী! নাথ!! অভাগিনীকে দেখলে না? ভগবান! তাঁকে সুমতি দাও, স্বামী আমার ফিরে আসুন। আমার ধন আমায় ফিরিয়ে দাও!" সাবিত্রী পাগলিনীর মত ধূলায় পড়িয়া লুটায়- কখনও স্বামীর তৈলচিত্র খানিকে বুকে ধরিয়া কাঁদে, কখনও বা ফুল-চন্দন দিয়া সাজায়, কখনও বা স্বামী-পদ-বন্দনা করে। আহারে, শয়নে, নিদ্রায়, জাগরণে পতিই তাহার ধ্যান, পতিই জ্ঞান, পতিচিন্তাই সাবিত্রীর জপমালা হইয়া দাঁড়াইল।

আরও ছয় মাস অতীত হইল। কোজে

দুঃখে বিরহে সাবিত্রীর দেহ জর্জ্জরিত হইল। শরীর একবার ভাঙ্গিলে তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা সহজ নহে, সাবিত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, নানাবিধ জটিল ব্যাধি তাহার সারা দেহটী ঘিরিয়া ফেলিল। সুযোগ বুঝিয়া ম্যালেরিয়া রাক্ষসী তাহাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে লাগিল। সুরমা বড়ই প্রমাদ গণিলেন। একে নরেশের ভাবনায় তিনি অস্থির, তাহার উপর আবার এই বিপদ। তিনি একা কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। সুরমা সাবিত্রীর চিকিৎসার জন্য কবিরাজ ডাকাইলেন। কবিরাজ মহাশয় রোগী দেখিলেন, ঔষধ দিলেন। কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই ঔষধ খাইতে চায় না, সে ফেলিয়া দেয়, দিদির কথা শুনে না। তার জীবনের একটা মায়া নাই, মমতা নাই, বাঁচিবার সাধ নাই। সে কেনই বা ঔষধ সেবন করিবে? কি সুখেই বা সে বাঁচিয়া থাকিবে?

সুরমা সাবিত্রীকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই সাবিত্রীর মন বোঝে না। সে কেবলই কাঁদে আর বলে আমাকে মরতে দাও দিদি! মরলেই আমি সুখী হব। সুরমা জোর করিয়া মাথার দিব্য দিয়া সারাদিনের মধ্যে দুটী বার মাত্র ঔষধ সেবন করান। সুরমা পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিলে দু এক গণ্ডুষ মুখে দিয়া ফেলিয়া রাখে। আহারে, ঔষধে, কথাবার্ত্তায়, আলাপে সাবিত্রীর বিষম বিরাগ, রীতিমত বিরক্তি।

আশ্বিন মাস ফিরিয়া আসিল। শরতের জ্যোৎস্না সৌন্দর্য্যে বসুন্ধরা আবার উদ্ভাসিত হইল। বাঙ্গালার লতায় পাতায় আকাশে বাতাসে সামান্য ধূলি কণাটিতেও এক নবীন উৎসাহ ফুটিয়া উঠিল। স্নেহশীলা জননীগণ কত দিন প্রবাসী পুত্র-কন্যার মুখ দেখিয়া চক্ষু জুড়াইবেন—তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, স্বামী-সোহাগিনী রমণীগণ পতির আগমন প্রতীক্ষায় পূজার দিন গনিতে লাগিল।

সুরমার পূজার উৎসাহ উদ্যম নাই, মুখে হাসি নাই, তাঁহার আর অন্য চিন্তা নাই। কি করিলে সাবিত্রীর রোগ উপশম হইবে, কি করিলে তাহার চিত্তচাঞ্চল্য কমিবে, সুরমার কেবলই সেই চেষ্টা, সুরমা শুধু সাবিত্রীকে লইয়াই ব্যস্ত।

পনর ষোল দিন অতীত হইল কিন্তু সাবিত্রীর রোগ কিছুমাত্র সারিল না, বরং ঔষধ সেবনের অনিয়মে ও মানসিক সন্তাপে তাহার রোগ দিনে দিনে তিল তিল করিয়া বাড়িতে লাগিল। সুরমা একা, তাঁহার অভিভাবক নাই, মাথার উপর আপনার বলিবার কেহ নাই, তিনি কি করেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সুরমা অনেক ভাবিয়া সাবিত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠান যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। তিনি সাবিত্রীর পিতাকে তাহার অসুখের কথা জানাইলেন, সাবিত্রীর পিত্রালয় হইতে গাড়ী আসিল কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই যাইতে সম্মত হইল না, সে সুরমার দুটী হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল "আমাকে সেখানে পাঠিও না দিদি; আমি এখান থেকে কোথাও যাব না; যদি মরি তো এই খানেই তাঁর নাম উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে

মরবো।" সাবিত্রী আর বলিতে পারিল না, টস্ টস্ করিয়া কয়েকবিন্দু চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িল।

"মরবে কেন বোন? আমি তোমায় কিছুতেই মরতে দিব না। ঠাকুর করুন, তুমি শীগগীর সেরে উঠ, এমন কি আর কারো হয় না? ছিঃ অমন করে কেঁদো না, তোমার চোখের জল আমি দেখতে পারি না। তুমি কাঁদলে আমার মনটা হু হু করে?" এই বলিয়া সুরমা অঞ্চল দিয়া সাবিত্রীর মুখ মুছাইয়া দিলেন। সাবিত্রী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "দিদি, আমাকে অমন করে মায়ার বাঁধনে বেঁধনা, আমাকে বিদায় দাও, মরলেই আমার সব জ্বালা জুড়ায়, মরলেই আমার চির শান্তি। তবে মনে হয়, মরবার আগে যদি তাঁর পা দু'খানি ধ'রে মরতে পেতাম, যদি তাঁর সেই মুখখানি একবার—উঃ! বড় জ্বালা, বুক যে ফেটে যায়, আর না—"

"অত অধীর হয়োনা বোন! তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাক।" এই বলিয়া সুরমা আস্তে আস্তে বাতাস দিতে লাগিলেন। সমস্ত দিনরাত্রি রোগিনীর অবস্থা এক ভাবেই চলিল। পর দিন সকালে কলিকাতা হইতে নরেশের সংবাদ আসিল; চারু পত্রে লিখিয়াছে— "বৌ দিদি! শুনিয়া সুখী হইবেন, নরু দাদা নানা দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া বৃদ্ধাকে লইয়া আজ দুদিন ** নং বালাখানা লেনে আসিয়াছেন। নরু দাদা যাহার প্রণয়াসক্ত, সেই নিরুপমা আর এ জগতে নাই—নিউমোনিয়ায় তাহার দেহান্ত হইয়াছে। নরু দাদা লজ্জায় বাড়ী যাইতে পারেন নাই, তাঁহাকে ছোট বৌ-দিদির অসুখের কথা বলিয়াছি। আপনি লিখিলেই তিনি যাইবেন। ছোট বৌ-দিদি কেমন আছেন। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—"

এ বৃদ্ধা কে? নরেশের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, নরেশ কাহার প্রণয়াসক্ত, এ সব কথা আলোচনা করিবার অবসর তখন সুরমার ছিল না। নরেশের যে অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নরেশ যে দেশে ফিরিয়াছে, এ সংবাদে সুরমা আত্মহারা হইলেন, তিনি অকুল সাগরে কুল পাইলেন। পত্রখানি সাবিত্রীকে পড়িয়া শুনান হইল। তাহার মৃতকল্প দেহে জীবনী সঞ্চার হইল, তাহার হৃদয়-দীপ একবার জ্বলিয়া উঠিল। পত্র পাইয়াই সুরমা নরেশচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করিলেন—"সাবিত্রীর সাংঘাতিক পীড়া, শীঘ্র আসিও, দেরী করিলে দেখা হইবে না।" টেলিগ্রাম পাইয়া নরেশের মন বড়ই চঞ্চল হইল, তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, সে বাড়ীর পানে ছুটিল।

পরদিন সকালে সাবিত্রীর জ্বর একটু কম হইল। সুরমা ধর-পাকড় করিয়া একটীবার মাত্র ঔষধ সেবন করাইলেন। এদিকে বেলা ৯টার সময় নরেশচন্দ্র ক্ষুন্ন-মনে শুষ্কপ্রাণে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। নরেশকে দেখিয়া সুরমা কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি নরেশকে সাবিত্রীর রুগ্ন শয্যার নিকট লইয়া গেলেন। নরেশচন্দ্র পত্নীর রোগজীর্ণ শরীরটা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। এখন সাবিত্রীর আর গৌর কান্তি নাই, মুখ বিশীর্ণ, চক্ষু কোটরগত, চুলগুলি

রুক্ষ—সম্পূর্ণ আলুলায়িত। চেহারা দেখিয়া সাবিত্রীকে সে সাবিত্রী বলিয়া সহজে চিনিতে পারা যায় না। নরেশচন্দ্র সাবিত্রীকে দেখিয়া অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরমা তাড়াতাড়ি নরেশের জন্য জল আনিতে গেল। নরেশচন্দ্র পত্নীর রোগ-শয্যায় বসিয়া পড়িল। সাবিত্রীর চক্ষে দুই একবিন্দু তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, সে ক্ষীণ-স্বরে বলিল,—"এসেচো, অভাগিনীকে মনে প'ড়েচে। হৃদয় থাকে দেখ, আমার বুকের ভিতর কি ক'রচে, আমার প্রাণে কি দারুণ জ্বালা উঠেছে!" বলিয়া স্বামীর হাতখানি লইয়া তাহার অস্থি-সার বক্ষের উপর স্থাপন করিল। নরেশের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। এখনও রীতিমত চিকিৎসা হইলে সাবিত্রী আরোগ্য লাভ করিতে পারে ভাবিয়া নরেশচন্দ্র একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার আনাইল। স্বয়ং পত্নীর পরি-চর্য্যার ভার গ্রহণ করিল। সে প্রাণপণে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু মুহুর্মুহু ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নরেশ-চন্দ্র জীবনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সাবিত্রীর সেবা করিতে লাগিল। পাঁচ দিন ছয় দিন গেল, সাত দিনের দিন সাবিত্রীর রোগ অনেকটা উপশম হইল। ডাক্তারের ব্যবস্থিত ঔষধের গুণে ও স্বামীর অশেষ যত্নে সে সে যাত্রা প্রাণ পাইল। দিনকয়েকের মধ্যে সাবিত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। উনিশ দিনের দিন সাবিত্রী অন্নপথ্য পাইল। তাহার দুর্ব্বল দেহে ক্রমশঃ বল সঞ্চয় হইতে লাগিল।

আবার শারদীয়া ষষ্ঠীর দিন আসিল। প্রভাত হইতেই আমোদপ্রিয় বালক-বালিকগণের আনন্দ-কোলাহলে ও পূজার উৎসব-বাদ্যে সমস্ত গ্রামটী মুখরিত হইয়া উঠিল। মা জগজ্জননীর শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে নরেশের মানসিক উদ্বেগ অশান্তি কোথায় চলিয়া গেল, তাহার মনে আবার সুপ্ত আনন্দ জাগিয়া উঠিল।

কয়েক দিন ক্রমাগত রাত্রি জাগিয়া শরীর অবসন্ন হওয়ায় নরেশচন্দ্র আজ সন্ধ্যার পরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি ৯টা বাজিতে সাবিত্রীও আস্তে আস্তে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর বসিল এবং চুড়ি কয়খানিকে টানিয়া হাতের উপর উঠাইয়া স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। পত্নীর রোগশীর্ণ শুষ্ক হস্তস্পর্শে হঠাৎ নরেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চক্ষু মিলিয়া চাহিয়া দেখিল, পদপ্রান্তে সাবিত্রী। "বাঃ, এখনও শোও নাই" এই বলিয়া নরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি একটা চুমো খাইয়া বলিল—"আর তোমাকে ভুলে থাক্‌বো না সাবিত্রী, জীবনে আর কখনও ভুল্‌বো না। তুমি দেবী, আমি তোমার মত সোণার লক্ষ্মীকে পদদলিত ক'রেচি, তোমার মত অমূল্য রত্নকে আমি এতদিন চিনি নাই। আমি তোমার স্বামী নামের অযোগ্য, আমি ঘোর প্রবঞ্চক, আমার জন্যই আজ তোমার এই দশা।"

সাবিত্রী কোন কথা বলিল না। সে স্বামীর বুকে মুখটি নত করিয়া কেবল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

সুদীর্ঘ এক বৎসরের পর আজ সাবিত্রী

স্বামীর সোহাগে প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াইল। একটী মৃদু চুম্বন তাহার সারা বৎসরের বিরহ-ব্যথা ভুলাইয়া দিল। সাবিত্রী হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া উপেক্ষা-অনাদর সব ভুলিয়া গেল। বহু দিন সঞ্চিত তীব্র বেদনা আজকার ক্ষণিক মিলনে চঞ্চলার চকিত আভার মত কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, ভাগ্য-বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে বিয়োগ-বিধুরা দম্পতীর দুটী প্রাণ আবার একসূত্রে আবদ্ধ হইল।

শ্রীভূতনাথ পত্রনবীশ।

——o——

গুরুকরণ।

অবস্থাভেদে চারি প্রকারে আশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অন্য জাতির পক্ষে তা' যত প্রতিপাল্য হউক বা না হউক, ব্রাহ্মণের ইহা অবশ্য প্রতিপাল্য; পালন না করিলে তাহার ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকে না। এই জন্য ব্রাহ্মণ-জন্মটা বড় দায়ীত্বপূর্ণ—ইহার দায়ীত্ব বজায় রাখিয়া কাল কাটাইতে পারিলে চতুর্ব্বর্গ ফল, এমন কি নির্ব্বাণ-মুক্তি তাহাদের করতলগত।

ইচ্ছা করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। কত জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া অশীতি লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া মানুষ হইতে হয়, তারপর আশ্রমধর্ম্মের মধ্য দিয়া বহু তপস্যা করিয়া তবে এই কর্ম্ম সন্ন্যাসীর—এই আদর্শ ত্যাগী ব্রাহ্মণ হইতে পারা যায়। ব্রহ্মচর্য্যে পাকা হইলে গার্হস্থ্য, গার্হস্থ্যে পাকা হইলে বাণপ্রস্থ, বাণপ্রস্থ পাকিয়া উঠিলেই যোগমার্গে বিজ্ঞপণ কর্ম্ম-যোগী হইয়া বিচরণ করেন। পৃথিবীর হিতার্থে তখন তাহারা আত্মদান করিয়া নিজত্ব ভুলিয়া যান। ভোগ-বাসনা ব্রাহ্মণের থাকে না। পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে এ সকলের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া তবে ব্রাহ্মণ হইতে হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণের ভোগ-বাসনা—ঐশ্বর্য্যলাভ একান্ত স্পৃহনীয়, সে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণের অবস্থা, যোগীর অবস্থা—ত্যাগের অবস্থা, পূর্ব্বে ঋষিগণ অতুল যোগসম্পন্ন হইয়া গুরুতলে, তপোবনের অন্তরালে বাস করিয়া কটু কষায় খাইতেন, কৌপিন পরিতেন—ক্ষমতা থাকিলেও কখন ভোগরূপ বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়িয়া আত্মনাশ করিতেন না। ঋষিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্বদেশাগমনের সময় সসৈন্য তাঁহাকে অশেষ ভোগসুখে অনুপম অট্টালিকায় রাখিয়া অতিথি সৎকার করিয়াছিলেন কিন্তু স্বয়ং ঋষি থাকিতেন তপোবনে, অতি দীনহীন ভাবে, কেন? তিনি ত ইচ্ছা করিলে ভোগসুখে মাজিয়া রাজাধিরাজ অপেক্ষাও সুখে থাকিতে পারিতেন কিন্তু তিনি জানিতেন সুখ ভোগে নহে—ত্যাগে। ভোগে যদি সুখ হইত, তাহা হইলে অতুলধনের অধীশ্বর রাজাগণ ত মহাসুখী, বাস্তবিক দেখিতে গেলে সুখ তাহাদেরও নাই। কামনা-বাসনার বৃশ্চিক দংশনে—পদমর্য্যাদার বিপুল তাড়নে তাহাদের তুল্য দুঃখী বোধ হয় আর নাই, তোমার আমার পক্ষে তাহারা সুখী হইলেও বিমল পরমানন্দ উপভোগ তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না; সে আনন্দ, সে সুখ ত্যাগ ভিন্ন উপভোগ করা অসম্ভব। যে অপার্থিব ধনের আশা করে, সে পার্থিব ধনে মজিয়া

পরকাল নষ্ট করিবে কেন?

পরমহংসদেব বলিতেন,—"কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ যোগীর লক্ষণ।" অনেক যোগীপদবাচ্য ব্যক্তি ইহা ভোগ করিবার সময় বলিতে শুনিতে পাওয়া যায়—ভগবান দিয়াছেন, নির্লিপ্ত হইয়া ভোগ করিতেছি; ইহাদিগকে ভণ্ড ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। ভোগের ভিতর থাকিয়া যোগের ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব। কামনা-বাসনার অনলস্তপাবকে দগ্ধ হইয়া ত্যাগের সুখ উপলব্ধি করা আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান হয়। নির্লিপ্তভাবে ভোগ করা কথার কথা—এমন জনক ঋষি জগতে কয়জন জন্মিয়াছে? কয়লার ঘরে ঢুকিলে—গায়ে কালীর দাগ লাগিবেই লাগিবে—তুমি যতই সাবধান হও। এইজন্ত দ্বিজজাতি চারিটী আশ্রমের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে ভোগ-সাগরের তীরে আসিয়া ত্যাগের রাজ্যে উপস্থিত হইতেন;—তাই তাহাদের পতন হইত না—জগতের কার্য্য সাধন করিয়া তাই পরিশেষে তাহারা নিষ্কাম হইয়া মুক্তি-পথের পথিক হইতেন। অনেকে মনে করেন—বেশী পুণ্য করিলেই তাহার মুক্তি হইবে, কিন্তু মুক্তি পাপেও নাই, পুণ্যেও নাই—পুণ্যকার্য্য করিলে পরজন্মে মহৎ গতি লাভ হয় মাত্র। মুক্তি লাভ তাহাতে হয় না, মুক্তি জিনিসটা এত সহজলভ্য বা গাছের ফল নহে।

আজকাল যোগী, সন্ন্যাসীর অভাব নাই। যিনি একটা গীতার শ্লোক বা দুই একজন সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট দুই একদিন ভ্রমণ করিয়া দুই একটা মজার কথা মুখস্থ করিয়া লন, আজকাল তিনিই সমাজের নেতা, কর্ত্তা, গুরুস্থানীয়, পরকে ভবপারে লইয়া যাইবার জন্ত ক্ষেপনী হস্তে দণ্ডায়মান। নিজে সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ; স্থূলদেহের মায়া তাহার সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান; পাঞ্চভৌতিক দেহের জন্ত ভাবিয়া আকুল। তিনি হন—লোকশিক্ষাদাতা গুরু।

পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং দশ ইন্দ্রিয় সংযোগে জীবের উৎপত্তি, ইহা সূক্ষ্মদেহধারী জীব;—তারপর পঞ্চজড় পদার্থ গঠিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে। স্থূল দেহখানা যাইলে সূক্ষ্মদেহ চিরকালই থাকে, এই জন্মে যাহাদের বিদ্যাভ্যাস বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইল, তাহারা পরজন্মে উপদেষ্টা হইতে পারেন না।

আজকাল জগতে কোন দ্রব্যই যখন খাঁটী পাওয়া যায় না, তখন মানুষ পাওয়া যাইবে কেন? ইহার মধ্যেও নানাপ্রকার ভেজাল প্রবেশ করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। যেখানেই আড়ম্বর—আমি ধার্ম্মিক, আমি সাধু, যেখানে এক একটা সিদ্ধাই দেখাইয়া লোক মজাইবার চেষ্টা, সেইখানে আসল কিছুই নাই, সমস্তই কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ; স্বার্থ সাধনের জন্ত ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া লোক মজাইতে ব্যস্ত। তিনি গুরু হইয়া ভগবৎ দর্শন করাইয়া দিবেন—শিষ্য লোভে পড়িয়া গুরুর পদে মাথা রাখিল—গুরু আয়ত্বাধীনে পাইয়া অমনি তাহার সর্ব্বনাশ করিলেন; ইহাই এখনকার গুরুগিরি। নতুবা যিনি যথার্থ গুরু হইবার উপযুক্ত, যিনি যথার্থ ভক্ত ভাবুক, তাঁহার কি এত বাচালতা থাকে? যিনি যথার্থ সাধক, তিনি গুরুগিরির ধার দিয়াও

যাইবেন না। তিনি আপনি আপনার আনন্দে বিভোর—পরকে বুঝাইবার সময় তাঁহার কোথায়? যে যথার্থ ভগবানের ভাব-নদীতে ডুবিয়াছে, সে বাচাল হইলেও তখন মূক হইয়া পড়ে, অতি-বড় পণ্ডিত হইলেও তখন তাহার সে ভাব ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, ভাষায় তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বেদ তাহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারে না, শ্রুতি সেখানে শ্রুতিহীন হইয়া পড়ে, তন্ত্র-মন্ত্র এত আড়ম্বর-যুক্ত হইয়াও সেখানে নিম্নের নিম্নতলে পড়িয়া হাবুডুবু খায়। তখন সে ভাবস্রোতে নিমজ্জিত ব্যক্তির বাক্য স্ফুরণ হইবে কেমন করিয়া, কেমন করিয়া তিনি বলিবেন—ভগবান কি জিনিস। বাক্য-মনের অতীত যে জিনিস, তাহা কি বিদ্যা দ্বারা—অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া বুঝান সম্ভব? চতুরানন, পঞ্চানন যাহা পারেন নাই – তুমি, আমি তথায় কে?

তবে যদি সহজ ও সরল ভাবে—প্রাণে প্রতারণার প্রবৃত্তি বর্জ্জিত হইয়া জগতের হিতের জন্য তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সেই মহা মহিমাময় ভগবান তোমার সে পথ সহজে প্রশস্ত করিয়া দিবেন। গুরু মেলা বড় কঠিন—জীবকে অন্ধকারের পথ হইতে আলোকে আনিয়া তাহার ইহকাল-পরকাল নিস্তার করিয়া দিতে পারেন, এমন লোকের সন্ধান কি পথে-ঘাটে পাওয়া যায়—না তাহা এত সহজলভ্য, পূর্ব্ব-জন্মের বহু সুকৃতি না থাকিলে কি এমন মহাপুরুষের কৃপালাভ করিতে পারা যায়?

ব্রাহ্মণ ভিন্ন গুরু হইবার ক্ষমতা আর কাহার নাই—জীবকে পারত্রিক নিস্তারের অধিকার শাস্ত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকেও দেন নাই। চারিটী আশ্রমে পরিপক্কজ্ঞান গুরু দ্বিজ জাতিই চিরকাল সকলের গুরু হইয়া আসিতেছেন;

আজকাল কিন্তু অনেক স্থলে তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেতর জাতিও এই সকল অনধিকার চর্চ্চা করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। সন্ন্যাসী সাজিলেই আর জাতিভেদের আবশ্যক নাই; তিনি যে জাতিই হউন, তখন তিনি ব্রাহ্মণের শিরে পদধূলি দিতেছেন, শিষ্য ব্রাহ্মণ হইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। অবশ্য এ সকল ব্রাহ্মণই যে কতদূর খাঁটি, তাহা আমরা বলিতে পারি না কিন্তু আধুনিক গুরুগণের আচার-ব্যবহার দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি।

এখন আবার অনেক সন্ন্যাসীর দুই একজন গৃহীকে শিষ্য করিয়া আশা মিটে না। কোন মঠের বা মন্দিরের কর্ত্তা সাজিয়া অজস্র লোকের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি সন্ন্যাসীরা গিরি বা স্বামী নামে অভিহিত হইয়া ভোগের সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তাহাদের ভোগের লালসার মাত্রা—তাহার আড়ম্বর দেখিলে বাস্তবিক স্তম্ভিত হইতে হয়, সংসারী যেরূপ ভোগ করিতে পারে না, অহঙ্কার বাড়িবে বলিয়া গৃহী যে ভোগ-বিলাসের ধার দিয়াও যায় না, এই সকল সাধু-সন্ন্যাসী তাহা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া থাকেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে নিতান্ত নির্লজ্জের মত বলেন—ভগবান দিয়াছেন, তাই

ভোগ করিতেছি। এই সকল প্রতারক সন্ন্যাসী গুরুর দ্বারা দেশ ছাইয়া যাইতেছে। শিষ্য সাবধান! ইহাদের নিকট যাইয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করিও না।

শাস্ত্র বলিতেছেন—কুলগুরু পরিত্যাগ করা মহাপাপ; হউন না তোমার গুরু মূর্খ কিন্তু তিনি তোমার কুলদেবতার বিষয় যেরূপ বিশিষ্টভাবে অবগত আছেন, একজন নবাগত পুরুষ কি সেরূপ ভাবে অবগত হইয়া তোমার আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিবেন, সাধন-ভজনের বিষয়, ভগবৎপ্রেমে মত্ততা আনিবার অধিকার একজন পণ্ডিত অপেক্ষা মূর্খের খুব বেশী আছে; পণ্ডিত যাহা বহু শাস্ত্র গবেষণার দ্বারা, বহু তর্ক-বিতর্কের দ্বারা পারিবেন না, মূর্খ সরল বিশ্বাসে—হৃদয়ের ভক্তিপ্রবণতায় তাহা অপেক্ষা শতগুণে সমর্থ। আর উদ্ধারের জন্য তোমাকে স্বয়ং প্রস্তুত হইতে হইবে, সরলভাবে তোমাকে নিজেই সে পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে—নতুবা কেবল গুরুর সাধ্য নাই যে, তিনি তোমাকে অতীব কুকর্মান্বিত দেখিলেও নিজ ক্ষমতা বলে স্বর্গের সোপানে তুলিয়া দিয়া তোমার ইষ্টসাধন করিতে পারেন। তুমি ধার্ম্মিক হইলে ভগবান তোমার সহায় হইবেন—আবশ্যক হয় ত তিনিই তোমার মনোমত গুরু মিলাইয়া দিবেন। চলিত কথায় বলে—"গুরু মেলে লাখ লাখ, চেলা মিলে এক।" গুরু ত অনেক পাওয়া যায়, সময় হইলে জগদ্গুরু স্বয়ং আসিয়া তোমার সে অভাব পূরণ করিতে পারেন। পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুবের যখন মধুবনে গুরুর আবশ্যক হইয়াছিল, তখন ধ্রুব কি জানিতেন, কোথা গুরু পাওয়া যায় বা কে গুরু হইবার উপযুক্ত, না তাহার সে জ্ঞান ছিল? আবশ্যক হইল—ভগবান স্বয়ং হরি-ভক্ত দেবর্ষি নারদকে পাঠাইয়া দিয়া তাহার সে অভাব পূর্ণ করিলেন। অতএব গুরু আবশ্যক, অদীক্ষিত অবস্থায় জীবন-যাপন করা উচিত নয় বলিয়া যাহার তাহার নিকট—অজ্ঞাতকুলশীল একটা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট যেরূপ সেরূপ ভাবে এত বড় একটা মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করা কখনই উচিত নহে। গৃহীর গৃহী ভিন্ন সন্ন্যাসী গুরু কখন হইতে পারে না। হিন্দু গৃহস্থের নিত্য আবশ্যকীয় ও পূজনীয় গুরু-পুরোহিত সম্পদে-বিপদে সকল সময়ে তাঁহারা গৃহস্থের সহায়, এরূপ অবস্থা সন্ন্যাসী গুরু হইলে, যাহার আশ্রমের কোন স্থিরতা নাই, তেমন লোককে গুরু করিলে অপকার ভিন্ন উপকার নাই, পরন্তু সেরূপ কার্য্যে শাস্ত্রসম্মত প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়।

গুরু মনুষ্য নহেন—স্বয়ং ঈশ্বর। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর—এই গুরুদেবের পদই পরম পদ—এইরূপ ভাবিয়া গুরুপূজা করিতে হইবে। যাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বনে জীবের ভববন্ধন দূর হয়, যাহার প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপে ইহকাল-পরকালের সমস্ত পাপ হইতে জীব মুক্ত হইয়া পরমগতি মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তিনি কি মানব হইতে পারেন? নরাকারে তিনি দেবতা; সসীম মানবের উদ্ধারার্থে ত্রিদিবপতিই নরাকারে অধিষ্ঠিত

হইয়া জীবের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। সেই পরম পদার্থ ভগবান, অখণ্ডমণ্ডলাকারে, যিনি চরাচর পরিব্যাপ্ত সেই মোক্ষমূলাধার পাদপদ্ম যাহার দ্বারা দর্শন লাভ হইবে, তিনি কি এক-জন কপটাচারী, ভোগ-বিলাস-কূপে নিমজ্জিত মানব হইতে পারেন?

গুরুগিরি আজকাল একটা ব্যবসার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোক, খাটিয়া খাইতে অক্ষম ব্যক্তি সাধুর ভাণ করিয়া সংসারটাকে মজাইতে বসিয়াছে। এই সকল লোকের কোন দায়ীত্বজ্ঞান নাই, ধর্ম্মভাব অন্তরে কিছুমাত্র স্থান পায় না, কেবল বাহ্যিক ভাবে তিলক ও টিকটাধারী হইয়া, শাস্ত্রের কতকগুলি বড় বড় কথা শিক্ষা করিয়া বা দুই একটী সিদ্ধাই লাভ করিয়া সংসারটাকে ছার-খার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের লোকেও ভ্রমে পড়িয়া মহৎ ব্যক্তি জ্ঞানে তাহাদের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মনে করিতেছে, কি নিধিই লাভ করিলাম কিন্তু কালে ইহা যে কোন প্রকার কার্য্যকরী হইবে না বরং তদ্দ্বারা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা কেহই বিচার করিয়া দেখে না। এইজন্য সংসারী ব্যক্তি কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভক্তি-বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিলে পরিণামে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

দুর্ভিক্ষে আহ্বান।

চিরশস্যশ্যামলা বঙ্গ দেশের ভাগ্য-গগন-প্রান্তে কিছু দিন হইতে যে দুর্ভাগ্য-কৃষ্ণ-মেঘ আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা আজ কয়েক বৎসর হইতে ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগাদি আকারে বর্ষিত হইতে হইতে বর্ত্তমান বর্ষে দুর্ভিক্ষরূপ ভীষণ প্রলয় সূচনা করিয়াছে। বঙ্গের বহু জেলায় দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী করালবদন ব্যাদান পূর্ব্বক সর্ব্বগ্রাসে সমুদ্যত। অবশিষ্ট জেলাগুলি আসন্ন দুর্ভিক্ষের আতঙ্কে শঙ্কিত,—কম্পিত। বঙ্গদেশ আজ হাহাকারে পরি-পূর্ণ।

এ হেন নিদারুন দুর্ভিক্ষ সময়ে মাতৃ-ভূমির সুসন্তানগণ! সমাজ ও দেশ সংস্কারক-গণ! আসুন, সকলে মিলিয়া প্রকৃত দেশহিতে—প্রকৃত সংস্কারে লাগিয়া যাই। যদি স্বদেশকে—মাতৃভূমিকে, মাত্র সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা স্বর্ণপ্রসূ ভূমিখণ্ড মনে না করিয়া—স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা মনে করিয়া থাকেন,—যদি বঙ্গবাসী নরনারীদিগকে মাত্র আমার স্বদেশ বাসী না ভাবিয়া—আমার সহোদর সহোদরা ভ্রাতা ভগ্নী ভাবিয়া থাকেন, তবে আসুন। আর বিলম্ব করিবেন না, দেশের জন্য—দেশবাসীর জন্য—স্বার্থ-বিরহিত প্রাণে কার্য্যে অগ্রসর হউন, স্বদেশবাসীর মঙ্গল-কামনা পূরণের শুভ সুযোগ উপস্থিত; এ শুভ মুহূর্ত্তের অপব্যবহার করিবেন না—এ সুবর্ণ সুযোগ, একাধারে এই পরোপকার ও মহত্ত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইবার আদর্শ সুযোগ হেলায়

ত্যাগ করিবেন না। এ দুর্দ্দিনে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া ভ্রাতাদিগকে—স্বদেশবাসী সহোদরদিগকে রক্ষা করিতে বদ্ধ পরিকর হউন।

দেশ ও সমাজ সংস্কারের মূল, দেশ ও সমাজ রক্ষা। যদি খাইতে না পাইয়া দেশ শ্মশানে পরিণত হয়,—সমাজ হাহাকারে পরিপূরিত হয়,—গ্রাম নগর শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হয়, তবে কিসের সংস্কার করিবেন? তাই যদি স্বার্থ বলিদান করিয়া প্রাণপণে দেশের—দশের সেবায় লাগিয়া যাউন। দেশের—সমাজের প্রকৃত সংস্কার হইবে—প্রকৃত হিতসাধন করা হইবে। মুখের কথায়,—বক্তৃতায় সময় আর নাই, প্রকৃত কাজের সময় উপস্থিত, আসুন কাজে লাগিয়া যাউন।

দেশের বিলাসি বাবুগণ! এ দুর্দ্দিনে বিলাস ব্যসন কমাইয়া যাহাতে দেশের সেবা,—দশের সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারেন, তাহাতে মনোযোগী হউন। একবার জ্ঞাননয়ন উন্মীলন করিয়া দেখুন,—দেশের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইবে, বুঝিতে পারিবেন,—এ সময় বিলাসের সময় নয়,—দরিদ্র রক্ষার সময়; ভোগের সময় নয়,—ত্যাগের সময়। ভাবিয়া দেখুন, যাঁহাদের মাতৃভূমির দশা এমন,—(বঙ্গজননীগণ সন্তানদিগকে আহার দিতে অসমর্থা বুঝিয়া নিরন্তর মনাগুণে দগ্ধ হইতেছেন)—যাঁহাদের দেশবাসী দরিদ্র ভ্রাতাগণ অনাহারে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া অন্নাভাবে বন্য-শাক-পত্রে জঠর জ্বালার নিবৃত্তি করিতে গিয়া কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে গমন করিতেছে,—তাঁহাদের কি এই বিলাসিতা শোভা পায়? এ সময় বিলাস-ব্যসন কমাইয়া ঐ অর্থ,—মাসের মধ্যে মাত্র দুই দিনের বিলাসিতাপূর্ণ আহার—চপ, কাট্‌লেট, মোহনভোগ পরিত্যাগ করিয়া ঐ অর্থ,—(যাঁহাদের স্বদেশবাসী ভ্রাতাগণ এক মুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল তাঁহাদের এই বিলাসিতাপূর্ণ আহার কি করিয়া মুখে উঠে?) থিয়েটার রং তামাসা দেখায় ব্যয় কমাইয়া ঐ অর্থ,—গরীব ভাণ্ডারে প্রদান করুন,—দেশের দুই জন গরীব নিরন্নের মুখে এক মুষ্টি অন্ন তুলিয়া দিন—বিলাস অপেক্ষা ইহাতে অধিক শান্তি পাইবেন।

দেশের ধনি-সম্প্রদায়! শুধু ধন সঞ্চয় করা মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে। সদ্ব্যয়ই উহার উদ্দেশ্য। এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ-সময়ে মুক্ত হস্তে দান করিয়া,—দেশবাসী দরিদ্র ভ্রাতাদিগকে অন্নবস্ত্র দান করিয়া ধনের সদ্ব্যয় করুন। যে দেশের গরীব ভ্রাতাগণ উদরান্নের জন্য লালায়িত,—অন্নাভাবে কালকবলিত, সেই দেশের ধনী ভ্রাতাদের কি ক্ষুদ্র স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখা শোভা পায়,—না, তাহা কর্ত্তব্য? ভগবান আপনাদিগকে ঐশ্বর্য্য রাশি প্রদান করিয়াছেন,—দশ জনকে প্রতিপালন করিবেন বলিয়া,—সঞ্চয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে নহে—বিশেষতঃ উহা যখন পরলোক পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে যাইবে না,—তখন সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া বিত্তদত্ত দানের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

দেশের জমিদারগণ! আপনারা চিরকালই ত প্রজাদের অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছেন,—আজ একবার সেই প্রজাদের

দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। অনাহার-ক্লিষ্ট প্রজাদের নয়নাশ্রুমোচন করিয়া, তাহাদের অভাব মোচন করিয়া, এ দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে করভার মুক্ত করিয়া,—পুত্রবোধে অন্নবস্ত্র দান করিয়া আপনার প্রজাদিগের জমিদার নামের—পিতা নামের সার্থকতা প্রদর্শন করুন।

দেশের উন্নতিকামী ত্যাগী যুবকসম্প্রদায়! আপনারা স্বার্থ বলি দিয়া ধন্য হইয়াছেন। আপনারা দেশের জন্য—রাজার জন্য স্বার্থ বলিদান পূর্ব্বক ইয়োরোপের মহাসমর প্রান্তে রণক্লান্ত সিপাহির শুশ্রূষা করিতে জীবন পণ করিয়া লাগিয়াছিলেন। আজ একবার দুর্ভিক্ষ দানবকে দমন করিবার জন্য দেশবাসিগণের সেবায় অগ্রসর হউন। তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দানে একদিকে নিশ্চিন্ত অপর দিকে জ্ঞান প্রদান করত উদ্বুদ্ধ করুন। এইরূপ দেশের সেবা কার্য্য আপনাদিগের দ্বারাই সম্ভব।

পল্লীগ্রামবাসী নিষ্কর্ম্মা যুবকমণ্ডলী! কত-দিন আর অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া, কর্ত্তব্যপথ ভ্রষ্ট হইয়া, তাস, পাশায় সময় ক্ষেপন পূর্ব্বক দুর্লভ মানব জীবন বৃথা অতি-বাহিত করিবেন? ভগবানের অনন্ত করুণাগুণে সৃষ্টির রত্নস্বরূপ মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করুন। দেশের,—দশের,—সমাজের সেবা করিয়া,—দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিয়া, নিষ্কর্ম্মা জীবনকে কর্ম্ম পথে পরিচালিত করিয়া জীবন ধন্য করুন, দেশের ধনি সম্প্রদায়ের নিকট ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া, তাহা কোন সেবা সমিতিতে প্রেরণ পূর্ব্বক এ দুঃসময়ে নিরন্নের মুখে এক মুষ্টি অন্ন প্রদানের উপায় করিয়া দিয়া মনুষ্য নামের সার্থকতা প্রদর্শন করুন। প্রাণে অতুল শান্তি পাইবেন। দেশ হাহাকারে পরিপূর্ণ, এ সময় জাগিয়া ঘুমাইবেন না, বধির হইয়া থাকিবেন না।

মহাশক্তির অংশস্বরূপিনী নারীগণ! মাতা হইয়া সন্তানদের এ দুর্গতি আর কতদিন দেখিবেন, আর কতদিন সহিবেন? মাতা সন্তানের দুঃখে চির কাতরা; কিন্তু কৈ, দেশ-মাতার সন্তানগণ আজ অন্নাভাবে কাতর—আজ সে সহানুভূতি কৈ? নিজ স্বামী-পুত্রের অন্নমুষ্টি হইতে মুষ্টিমেয় পরিমাণে অন্ন সংগ্রহ করিয়া,রন্ধনকালে "মুষ্টি" তুলিয়া রাখিয়া তাহা হইতে দরিদ্রের সেবা সহানুভূতি করিয়া যথার্থ মাতা নামের সার্থকতা প্রদর্শন করুন।

বঙ্গের ধনী, জমিদার, রাজা, মহারাজ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, দেশভক্ত, যুবক সকলেই উদ্বুদ্ধ হউন। যাহাতে মাতৃভূমির প্রাণ স্বরূপ নিরক্ষর কৃষক-ভ্রাতাগণ এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষে এক মুষ্টি অন্নাভাবে মৃত্যু মুখে পতিত না হয় সকলে মিলিয়া যথাযোগ্য তদ্বিষয়ে মনোযোগী হই আসুন। যাঁহার যে দিক দিয়া যে প্রকারে সাহায্যের সুবিধা হয় সেই প্রকারে সাহায্য করিয়া এই দুর্ভিক্ষপীড়িত ভ্রাতা-ভগিণগণকে এ বিপদে রক্ষা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হউন। যাঁহাদের একান্ত অভাব তাঁহারা মাসের মাত্র দুই দিনের অথবা এক দিনের আয়টুকু "সেবা-সমিতি"তে পাঠাইয়া দিন, তাহাতে বহু উপকার হইবে। বহু

নিরন্নের মুখে অন্নমুষ্টি উঠিবে। বাঙ্গালীর মজ্জাগত কলঙ্ক স্বার্থপরতা বলিদান করিয়া, পরের জন্ত আপনার বোধে প্রাণপনে দেশের—দশের সেবা করিয়া, দরিদ্র-নারায়ণের পরিচর্য্যা করিয়া জীবন ধন্ত করিতে অগ্রসর হউন। ভোগ-সুখসম্বল পশুজীবন পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমি কল্যাণরত দেবজীবন অবলম্বন করুন। স্ব স্ব ক্ষমতাকে এই প্রবল দুর্ভিক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অযোগ্য ক্ষুদ্র ভাবিয়া অবসন্ন হইবেন না। স্থির জানিবেন, এই ক্ষুদ্র সংহতি-শক্তির শক্তিদানের জন্ত স্বয়ং মহাশক্তি অগ্রসর হইয়াছেন। তিনিই এই খেলা খেলিতেছেন।

সদাশয় গভর্ণমেন্ট! একবার করুণা-নয়নে বঙ্গদেশ পানে চাহিয়া দেখুন। আপনাদের ন্যায় সুসভ্য গবর্ণমেন্টের এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি অবধারণ করুন। যে বঙ্গবাসী রাজভক্তি প্রদর্শনে সমস্ত জগৎকে মোহিত করিয়াছে,—যে বঙ্গবাসী রাজার জন্ত অকাতরে ইউরোপের সমর ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে গমন করিয়াছিল,—যে বঙ্গবাসী এত হীন অবস্থাতেও কোটি কোটি টাকা সমর-ঋণ দিয়া মহামান্ত গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করিয়াছে, সেই বঙ্গবাসী আজ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, অন্নাভাবে অকালে কালকবলিত। তাহাদের এ দারুণ দুঃখ-তিমির বিনাশ কি আপনাদিগের কর্ত্তব্য নহে? বিশেষতঃ, যে বঙ্গদেশে একদিন টাকায় আটমণ চাউল বিকাইয়াছে, সেই বঙ্গদেশে আজ আট টাকায় একমন চাউল পাওয়া যাইতেছে না, স্থানে স্থানে ১১।১২ টাকা হইয়াছে; ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়? এসময় বঙ্গবাসী প্রজাদের দুঃখ মোচনার্থ জলের মত অর্থব্যয় করুন,—বিদেশে রপ্তানির পথ বন্ধ করিয়া দিয়া—চাউল ও বস্ত্রের দর বাঁধিয়া দিয়া ও ঋণদান এবং রিলিফ কার্য্য করিয়া,—এ দুর্দ্দিনে প্রজাদের রক্ষা করুন। চিরকৃতজ্ঞ বঙ্গবাসীর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইবে। এদুর্দ্দিনে রাজা—ভিন্ন সদাশয় ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট ভিন্ন কে আর দুঃস্থ বঙ্গীয় প্রজারক্ষণে যত্নবান হইবে? বঙ্গবাসীর কাতরতায় কর্ণপাত করুন, দেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে প্রজাবর্গকে মুক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের হৃদয়ের ধন্তবাদ গ্রহণ করুন।

শ্রীতারাপদ রায়।

কবিকুঞ্জ।

টানের দৃশ্য।

আমার সদাই মর্ম্মে জাগে
সবাই সে কোন অনুরাগে,
জড়িয়ে ধরে আছে সদা
অপরাপর সকলকে।
হয় তো ভেবে ঘৃণার চোখে,
নয় তো ভালবাসার ঝোঁকে,
টানটি সবার পড়ে আছে,
সবার মরম ফলকে॥
অনেক ভয়ে ভাবতে নারে
ঘৃণায় বাঁধে কেমনে,
টেনে আনে হৃদয় দ্বারে
অপরকে সে যতনে॥

হয় তো ভাবে আমার সে যে
নয় তো ভাবে অপর এ যে,
ভাব্‌তে তবু দেখি তারে,
তাহার জীবন আলোকে,
তাই তো মানস-পটে মম
রাগানুরাগ মধুরতম
টানের নব দৃশ্যসম
দেখ্‌ছি সকল পলকে।
শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ।

মৃত্যু।

(১)

গভীর আঁধারে তুমি
জাগিছ সতত
প্রলয় ঝঞ্ঝার মাঝে
তুমি জাগরিত।

(২)

এই বিশ্ব মরু মাঝে
মোহমুগ্ধ জীবে,
চমক ভাঙাও আসি
বিকট তাণ্ডবে।

(৩)

তোমায় স্মরণ করি
পাপী তাপী যত
ক্ষণ তরে তারা সবে
হয় জাগরিত।

(৪)

যে দিনে এই জীবের
বিশ্ব-কুহেলিকা।

ঘুচে যাবে, তুমি তারে
দেখে আসি দেখা।
শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

চির আহ্বান।

আমি চির আশা ক'রে বসে আছি ওহে বন্ধু,
আজি ক্লান্ত হয়ে পার করিতে না পারি ভবসিন্ধু,
আমি তব পানে চেয়ে আছি ওগো পূর্ণিমার বিন্দু,
আজি এই মধু যামিনীতে দেখা দাও ওহে বন্ধু।
আকুল হৃদয়ে তব করিতেছি আহ্বান,
আপন হারা হয়ে তবু পাইনা'ক সন্ধান;
অস্ফুটস্বরে ডাকিতেছি "ওগো কর অবসান"?
"আজি ঘোর নিশীথে হায় হবে মম নির্ব্বাণ"?
তুমি মম হৃদয়ের তারা, নয়নের ফোটা ফুল,
তুমি আর এই অভাগারে—ক'রনা আকুল;
তোমার হৃদয় মাঝে,এখনও কি ফোটেনি করুণা?
তব প্রেমে ভাসাও মোরে,দূর কর হৃদয়-বেদনা।
আর সহিতে না পারি ব্যথা ঘোর অবিরাম,
নিশিদিন তব তরে—দহিতেছে মম প্রাণ;
বল, ওহে সখা পায়ে ধরি গো তোমার,
তুমি করিবে নাকি প্রেম-দান হৃদয়ে আমার?
আমার নয়নে হায়! ঝরিতেছে অশ্রুধার,
এস, এস, সখা এস, সহিতে না পারি আর;
পথের ভিখারি হয়ে চাহিতেছি "প্রেমদান",
তাই সখা করিতেছি এই। "চির-আহ্বান।"
যুগ-যুগান্তর হ'তে, আমি ঘুরিতেছি চারিধার,
দিশেহারা হ'য়ে আমি ডাকিতেছি অনিবার,
"কোথা তুমি! কোথা তুমি!" তবু এই রটি আমি
না জানি কিরূপে আমি হব তব পথগামী।
শ্রীরাজেন্দ্রলাল সিংহ।

আমি তুমি

(১)

আঁধার রুদ্ধ ঘরের দ্বার,
আঘাত করে কে বার বার,
জিজ্ঞাসিল ঘরের মধ্য হ'তে,
আমি ওগো খোলো দ্বারের খিল,
গৃহ হ'তে বলে ঠাঁই নাই এক তিল
ছোট ঘর আঁটবে না-কো দু'জন কোন মতে।

(২)

শব্দ হ'ল আড়াই ঘণ্টার পরে,
আবার দ্বারে কে প্রহার করে।
হাওয়ার মত আওয়াজ এসে বলে তুমি,
গৃহ বলে আমি ত অন্দরে,
সেই আমি ফের, বাহিরে কেমন করে।
খুলব না খিল্ খুলব না খিল্, বুঝেছি দুষ্টামি!

(৩)

গভীর নিশিতে আবার অর্দ্ধরাত্রি পরে,
অতি ধীরে আঘাত হ'ল দ্বারের উপরে,
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কে গো, কপাট কে পাড়ে,
হ'লনা জবাব এবার ঘরে কোন,
খুলল কপাট্ ছুটিল আঁধার ঘন।
এক নিমিষে মিলন হ'ল আমি তুমির করে!

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী।

কবির উক্তি।

(কবিপত্নীর প্রতি)

আমি বড় ভালবাসি সন্ধ্যা-সাগরে
গাহিতে বিভুর গান।
তুমি লাজে অধোমুখ কুসুম-নয়নে
ধরিবে মোহন তান।
আমি ইন্দুসম তব সোওরি সে মুখ
হতেছি অধির পরাণ।
তুমি ওকারে তখন ভরিয়া দিবে
আমার পতিত প্রাণ।
আমি লালিমা মাখিয়া ভাবের সাগরে
রচিব কেবল কবিতা।
তুমি ভাষারূপ ধরি লেখনীতে মোর
রহিও রহিও গাঁথা॥
আমি তব আলিঙ্গনে উঠিব কাঁদিয়া
ছিঁড়িতে মায়ার বন্ধন।
তুমি (সে) বন্ধন হ'তে চির-বন্ধনে লভিবে
(প্রভুর) স্বপন-চরণ।

শ্রীবলাই লাল মুন্সী।

সমালোচনা।

শিলং পাহাড়।—শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১।০ টাকা। রামপদ বাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। ইতঃপূর্ব্বে তিনি অনেকগুলি সদ্গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। "শিলং পাহাড়" তাঁহারই লিখিত। পুস্তকখানি একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। রামপদ বাবু সপরিবারে কামাখ্যা মন্দির ও শিলং পাহাড় ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং যে সকল অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছেন—ইহাতে তাহাই প্রকটিত করিয়াছেন। পড়িতে বেশ আগ্রহ হয়, কলিকাতা গুরুদাস বাবুর দোকানে প্রাপ্তব্য।

গান।—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বেহারীলাল সরকার প্রণীত, মূল্য ৷০ আনা। বেহারী বাবু সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত, বহু সভাসমিতিতে আমরা তাঁহার সঙ্গীত গীত হইতে শুনিয়াছি। তাহার এই গানে ভক্ত-হৃদয়ের অনেক উচ্ছ্বাস, আবেদন নিবেদন, প্রাণমুগ্ধকর ভাষায় গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্ত গ্রন্থের অধিকাংশই শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত। অতএব হিন্দু সন্তানের এই শক্তি-আরাধনার দিনে ইহা সাতিশয় প্রিয় হইবে। গ্রন্থকারের নিকট "বঙ্গবাসী" আপিসে ও গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

আলোচনা, ত্রয়োবিংশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩২৬ সাল

বিজয়োৎসব।
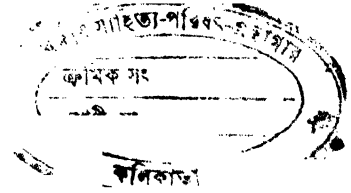
আনন্দের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখা যায় না। পার্থিব কোনও অমূল্য নিধি পাইলে হৃদয়ে যে আনন্দের উদ্রেক হয়, মানুষ তাহা চাপিয়া রাখিতে পারে না, সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সেই আনন্দের ভাগ প্রদানের জন্য ব্যস্ত হয়। পার্থিব বস্তু লাভে যখন এইরূপ হয়, তখন অপার্থিব বস্তু লাভে যে কত আনন্দ—তাহার কি পরিমাণ আছে? সাধক হৃদয়ভরা মাতৃমূর্ত্তি অন্তরের অন্তরস্থলে প্রতিষ্ঠা করিয়া আনন্দময়ীর অতুলনীয় আনন্দে দিশাহারা হইয়া যখন প্রাণ ভরিয়া মা মা রবে ডাকিতে থাকে, যখন নিজ প্রাণের কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি সাধিত হয়, তখন সে আর থাকিতে পারে না, একাকী ডাকিয়া আর তাহার আশা মিটে না, তখন দেহ-ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট পর্ব্বত শিরে সহস্রারস্থা মাকে বাহির করিয়া ফেলে, সেই অতুলনীয় হৃদয়-ভরা মূর্ত্তি বাহিরে পূজা করিতে একটা সাধ হয়—ইহাই হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজা। দুই তিন দিন ভক্তিভাবে প্রাণের উচ্ছ্বাসে পূজা করিয়া সকলে সমস্বরে সমান ভক্তিভাবে মাতৃ-চরণ পূজা করিয়া আবার সেই তেজোময়ী দেবতাকে "গচ্ছ দেবি মমান্তরং" বলিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে পূরিয়া ফেলে—ইহাই হইল দেবীর অন্তর বিসর্জ্জন। নতুবা পৃথিবীতে এমন জলাশয় কোথায়, যথায় সেই বিরাট মূর্ত্তি নিমজ্জিত হইতে পারে? মৃন্ময়ী মূর্ত্তি—যাহাতে মাতৃভাব আরোপ করিয়াছিলাম—আপনার প্রাণ প্রয়োগ করিয়া যাঁহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, সেই প্রাণের তেজোময়ী জননীকে পুনর্ব্বার হৃদয় মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া আধারটাকে মহোৎসবের সহিত পার্থিব জলাশয়ে নিমজ্জিত করি—ইহা বাহ্যিক বিসর্জ্জন।

এক সময় দেবগণ দৈত্য-সংহারের জন্য মায়ের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডভরা বিরাট মূর্ত্তিকে দুর্গতি নাশের জন্য দুর্গা-রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। আপনাদের শক্তি সমভাবে প্রদান করিয়া বিশ্বশক্তির আধারভূতা দেবীকে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তার পর সেই মূর্ত্তি সমাধী নামক বৈশ্য ও সুরথ রাজা আপনাদের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য পূজা করেন—ত্রেতায় রঘুকুল নির্ম্মূল করিবার

জন্য শ্রীরামচন্দ্র অকালে এই দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। সাধক-হৃদয় ত এ মূর্ত্তি ছাড়া নয়, শাক্তভক্তের হৃদয়ের প্রত্যেক স্তরে স্তরে এ শক্তিমূর্ত্তি গাঁথা রহিয়াছে। ইচ্ছা হইলে সেই মূর্ত্তি বাহিরে লইয়া পূজা করেন। কত কি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করেন, তার পর সেই বিরাট, অবাঙ্মনসোগোচর মূর্ত্তিকে আপনার মত ছোট করিয়া, অনন্তকে সান্ত করিয়া পূজা করিয়াছিলেন—এই জন্য "দুর্গাদেবী ক্ষমস্ব" বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য শরতে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে এখন সেই পূজাই প্রবল। বসন্তে রাজা সুরথের পূজা আর তত প্রবল নহে। বসন্তের পূজা দানব-দলনের জন্য নয়, শত্রু-সমরে জয় লাভের জন্য ত এ সময় মায়ের পূজা করা হয় নাই, তাই তাহাতে বিজয়োৎসব নাই। শরতে শ্রীরামচন্দ্র দেবীর প্রসাদে রক্ষঃসমরে বিজয়-লাভ করিয়া মহা সমারোহে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, পূজায় সফলকাম হইয়া সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। বানর কটক মিলিয়া সিদ্ধি-পানে পরস্পর আলিঙ্গন, অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—এ উৎসব শরতের দুর্গাপূজা ভিন্ন আর কোনও পূজায় অনুষ্ঠিত হয় না, হইবার নিয়মও নাই। দেবীর এ সময়কার বিসর্জ্জন তাই বিজয়োৎসব নামে বিখ্যাত।

সাধক হৃদয়-সিংহাসনে মনোময়-পুষ্পে ভক্তি-গঙ্গা-জলে চিরদিন যে আরাধ্যা মূর্ত্তি পূজা করিতেন, আজ তাহা লইয়া সম্মুখে প্রাণের পরিতৃপ্তির সহিত ছোট বড় সকলে মিলিয়া সেই মুক্তি-মূলাধর পাদপদ্মে হৃদয়ের প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিয়া ধন্য হইলেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে মায়ের আবাহনও নাই, বিসর্জ্জনও নাই, তিনি আমাদের ছাড়িয়া কোথাও যান না, আমাদের ভুলিয়া নিদ্রিতাও হন না, তাহাকে উদ্বোধনও করিতে হয় না; মা আমাদের সদা সর্ব্বদা, সময়ে অসময়ে কোলের ছেলে কোলে করিয়াই বসিয়া আছেন; তিনি কোন দূর-দূরান্তরে নাই, আমাদের অন্তরেই সদা সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। প্রাণ-স্বরূপা, জ্ঞান-বুদ্ধি-স্বরূপা দেবী তিলেক আমাদের ছাড়িলে কি রক্ষা আছে, তিনি এক দণ্ড ছাড়া হইলে কি বদন কিছু বলিতে পারে, না হাত পা কিছু করিতে পারে—না প্রাণের স্পন্দন সমাহিত হয়? প্রাণময়ী তিনি প্রাণ-রূপে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে সজাগ ভাবে জাগিয়া বসিয়া আছেন, তিনি নাই এমন স্থান নাই, তিনি করেন না, এমন কাজ নাই, তিনি ধরেন না, এমন রূপই নাই, তিনি সকল ঘটে বিরাজ করেন—ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন। তবে বাহেন্দ্রিয় গুলিকে কর্ম্ম-শক্তি প্রদান করিবার জন্য, তাহারা না অক্ষম হইয়া যায়—এই জন্য বাহ্যভাবে পূজা। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, চক্ষে তুমিই মা দৃষ্টিশক্তি, মুখের তুমিই মা বাক্‌শক্তি, এ সকলগুলোকে উৎ-সাহিত করিবার জন্য এক একবার সাধক প্রাণময়ীকে প্রাণের বাহির করিয়া পূজা করেন।

আজ সেই পূজার পর বিসর্জ্জন বা বিজয়োৎসব। এস সাধক,এস শাক্তভক্ত মায়ের প্রিয়পুত্র, এস আজ সকলে কৃতাঞ্জলী হইয়া বলি—"ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং সফলং জীবনং মম, আগতাসী যতো দুর্গে মহেশ্বরী মদাশ্রয়ং।" তারপর মাকে সহস্রদলকমলে পুনঃস্থাপন করিবার সময় বল—"গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থান স্বস্থানং পরমেশ্বরী, সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।" এস ভাই!- আজ বিজয়োৎসব, আজ শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি ভক্তগণ আজ বিষ্ণুভক্তি-প্রদা দেবীর চরণে প্রণত হইয়া আমরা ভাই ভাই আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হই, আমাদের অনুগ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলী, হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলিঙ্গন, অভিবাদন করিয়া আজ দুর্গাপূজার বিজয়োৎসব জ্ঞাপন করিতেছি, সকলে মাতৃচরণে প্রার্থনা করুন, যেন তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে কোনও প্রকার অবহেলা প্রদর্শন না করি।

সম্পাদক।

শ্রীক্ষেত্র-বৈচিত্র্য।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক তাপে তপ্ত জীবনের উপরে, অজ্ঞের অদৃশ্যভাবে সময়ে সময়ে ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। সেই ভ্রান্তি হইতেই চিত্ত ক্রমে কি এক ভাবে—কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব নিয়মের প্ররোচনায় উদ্ভ্রান্ত হয়। তখন মানুষ আপনহারা হইয়া উঠে—অপর চিন্তা হৃদয় হইতে সরিয়া যায়। তবে যে প্রেম, যে ভালবাসা রক্তসংমিশ্রণে সতত আকৃষ্ট করে, যাহার জোয়ার-ভাটা নাই, একটানা স্রোতে এক ভাবে বিভোর করিয়া এক পারিবারিক ক্রিয়া, সংসারের এক গভীর উন্মাদনা আনিয়া দেয়, তাহা হৃদয় হইতে যায় না। পরন্তু মেঘাচ্ছাদিত ভাবে, একবার ঢাকা পড়ে, আবার বাহিরে আসে।

মানবের জন্মগ্রহণ একটী প্রহেলিকা;—ইহার মধ্যে থাকিয়া আমার পিতৃহীন বাল্যজীবন, মনে না থাকিলেও, সহজেই অনুমেয়! যাক্ সে সুদূর অতীত বেদনা—যাক্ সে গভীর আর্ত্তনাদ! ক্রমে বয়সের সহিত মানুষের পার্থিব ক্রিয়া-কলাপ একে একে দেহ-মনকে জড়াইতে জড়াইতে জীবন-স্তম্ভের অনেকগুলি সোপানে উঠিয়া পড়িল। হাসি-কান্নার ঢেউ একটীর পর একটীর আঘাতে,বিভিন্নভাবে অবস্থার দাসত্বে, কখন আমোদ—কখন বিষাদের ছবি দেখাইয়া চলিতে লাগিল। আমি অবস্থার দাস—ভাগ্যের সহচর; সুতরাং আমিও মুখ চোক বুজিয়া, ঊর্দ্ধ-অধঃপার্শ্বে, অগ্র-পশ্চাৎ কোন দিকে না তাকাইয়া, তাহাদের নিপীড়নের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। ক্রমে এ—ও আসিল,—এ গলা ধরিল,—ও চুমু খাইল,—রঙ্গালয়ের এই অভিনয়েই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল—ইহার স্থিতি কতক্ষণ? বায়ু-চালিত মেঘেরও স্থিতি আছে—জলরেখাও মানুষের মুখ চাহিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতি কাহারও নয়। তাহার যেমন আহ্বান—কার্য্যান্তে তেমনি বিসর্জ্জন, দুয়ারের খাড়-

প্রতিঘাত অনিবার্য্য। মানুষ এক যন্ত্র-চালিত সেই দুইটী চক্রের নিষ্পেষণে কখন কি ভাবে, কোন্ দৈবী, মানুষী বা পিশাচী-শক্তির বশীভূত হয়—তাহা কে বলিবে? সে রহস্য বড়ই গুপ্ত, আবার বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় প্রকাশমান। আমিও সেই ধাঁধাঁয়—সেই কর্ম্মের ফেরে, আহ্বানের পর ভোগ ও তৎপরে বিসর্জ্জনের পর্য্যায়ে উপস্থিত হইলাম।

উপবনে যে নানাজাতীয় ফুল ফুটিয়াছিল, তাহাদের যেগুলি প্রিয়—আনন্দপ্রদ—যেগুলির পরিমলে চিত্ত বিভোর হয়—পরেশ প্রেমে প্রীতি প্রেমে ও উধাও হইয়া সেই দিকে ছুটিয়া যায়—জন্মের সাফল্য রক্ষিত হয়, সেইগুলির মধ্যে অনেকেই একে একে শুকাইল। সুদূর বাল্যের কোমল স্মৃতি পিতৃদেবের পবিত্র পদাম্বুজকে বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় হৃদয়ে ফুটাইতে লাগিল। যৌবনের অনন্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে চির-জীবনের প্রীতির স্থান—ভজন-সাধনের ধ্রুবতারা, বৃদ্ধ ও বাল্যের আহ্বান, স্বর্গাদপি গরীয়সী যে মাতা—পুণ্যসলিলা কৈবল্যদায়িনী ভাগীরথীর তীরে নারায়ণ-ক্ষেত্রে (১) গলদশ্রুলোচনে তাঁহার অন্তর্জ্জলী করিলাম। সোহাগের ছবি পুত্র-কন্যার ও বিলাসের সহচরী সহধর্ম্মিনী পত্নীর আমার দেহ-শ্মশানের কোলে চিতার বক্ষে বিসর্জ্জন দিলাম। হায় রে ভালবাসার পরিণতি,—হায় রে সংসার-প্রেমের কুহক,—হায় রে অমৃত-নিস্যন্দিনী সুখ-যাত্রার পার্থিব আরাম,—তোমরা কোথায়? শোকসন্তপ্ত অবসন্ন জীবনের ক্রিয়া একবার দেখ।

এ অবস্থায় সহজেই নির্ব্বেদ আসিয়া পড়িল। যেদিকে তাকাই—শূন্য, যেন অষ্টবজ্র এক হইয়া পিশাচ-মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে তাণ্ডবে উন্মত্ত। ভালবাসার সব চিত্র, শ্মশান-বক্ষের সমস্ত ছবি এখন আমার স্মৃতির সহচর হইয়া দাঁড়াইল। আর থাকিতে পারিলাম না। গ্রীষ্মের অবকাশে জীবনী-শক্তি যেন ছিঁড়িয়া যাইবে বোধ হইল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, একটীমাত্র পুত্রের হাত ধরিয়া পুরী যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। বাসনা, বিদেশ ভ্রমণ ও পুরুষোত্তম হরি-দর্শনে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ। ভাবিলাম, এরূপ করিয়া দীর্ঘ অবকাশটা একরূপ কাটিয়া যাইবে।

শূন্য গৃহ—অধিকতর শূন্য ও গাঢ় অন্ধকারে পূর্ণ করিয়া যাত্রা করিলাম। সঙ্গে কেবল উপবনস্থিত একটীমাত্র স্ফুটনাবস্থ কুসুমের ন্যায় সুকোমল অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র।

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া, পুরীর গাড়ীর ধূম উদ্গীরণের আহ্বান লক্ষ্য করিলাম। এমন সময় দেখি একটী আত্মীয়-যুবক পিতার উৎপীড়নে (১) বিষণ্ণ-চিত্তে গৃহ-ত্যাগে প্রস্তুত। তাহার হৃদয়ে যাহাই থাকুক, তাহার মাতা-পিতার তিরস্কার বা পুরস্কার যে ভাবেই তাহাকে আশ্রয় করুক, আমার দুঃখ-ভরা জীবন তাহার জন্য একটু কাঁদিল। সে যদিও আমার সঙ্গী হইবার প্রার্থনা, আমাকে স্পষ্টতঃ জানাইতে সাহসী হইল না। কিন্তু

(১) গঙ্গাতীরের জলপ্রান্ত হইতে চারি হস্ত পরিমিত স্থান।

(১) যেমন তাহার নিকট শুনিয়াছিলাম।

তাহার সুদীন নয়ন, বিষাদ-কালিমাযুক্ত মুখ-মণ্ডল, নির্ব্বেদযুক্ত চিত্ত দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। ভয় হইল, পাছে চিত্তের এই অবস্থায় সে কোন স্থানে চলিয়া যায়। এ অবস্থায় তাহার পিতাকে সংবাদ দিবার বা তাহাকে তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া দিবার সময় আর আমার ছিল না। এরূপ স্থলে আমি আর কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইলাম। দেখিলাম যে, বিনা-নিমন্ত্রণে এইরূপ উদর পূর্ত্তি হওয়ায় সে বড়ই সুখী হইল। তাহাকে সঙ্গে পাইয়া আমার পুত্রটিও একটু আনন্দিত হইল দেখিলাম। যাহাই হউক, একটী লোককে বিদেশ ভ্রমণে সঙ্গে লওয়া—আমার মত অবস্থাপন্ন লোকের কতদূর সঙ্গত, তাহা আমি আর ভাবিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, পরমেশ্বর ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন না কোন মঙ্গল গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন, নতুবা এরূপ ঘটিবে কেন? এই ভবিষ্যৎ-তত্ত্বে বিভোর হইয়া দুইখানি পূর্ণ ও একখানি অর্দ্ধ টিকিট এবং কিছু জলখাবার কিনিলাম। গাড়ী ছাড়িতে ৭।৮ মিনিট বিলম্ব। সঙ্গে একটী Trunk, পুত্রটির পাঠ্যপুস্তকগুলি, কাপড়-চোপড়, বাটি-ঘটি প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যে পূর্ণ। তাহার উপরে শয্যা। মোটটি অবশ্যই একটু ভারী হইয়াছিল। কুলি মহাশয় এ অবস্থায় ষ্টেশনে যেরূপ আপ্যায়িত করেন, তাহার কিছুই ব্যতিক্রম দেখিলাম না। ট্রেণ ছাড়িতে আর দেরী নাই, আমিও ব্যস্ত হইলাম। ছয় আনা পয়সা দক্ষিণা লইয়া কুলি মোটটি গাড়ী-গর্ভে ফেলিয়া দিল। আমরাও তৃতীয় শ্রেণীর সেই যুক্ত কারাগারে রুদ্ধকণ্ঠে বদ্ধ দৃষ্টিতে ঝাঁপ দিলাম। Trunkটি উপরের আশ্রয়স্থানে রাখিয়া একখানি বেঞ্চিতে সঙ্কীর্ণ ভাবে আমরা তিন জনে বসিলাম। গাড়ী ছাড়িল। ছাড়িলে কি হইবে—লোকের ভিড় ও ঠাসাঠাসিতে বড়ই কাতর হইলাম। ওদিকে চিত্তটা যেন একটু কেমন কেমন হইল—বুঝিলাম, ইহা গৃহের টান! হায় রে গৃহ! হায় রে সংসার! তবু তোমরা শূন্য—তবু আমি শূন্য, এ শূন্যস্থান পূর্ণ থাকিলে না জানি তোমরা কি!

রাত্রিকালে গাড়ীতে থাকিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তত ভালরূপ লক্ষ্য করিতে পারি নাই। তবে যেখানে যেখানে নদী, নিকট বা দূরে পাহাড়শ্রেণী ছিল, চাঁদের আলোতে বেশ বুঝিলাম। তটিনীর জ্যোৎস্না-বিধৌত জল-রাশি মস্তকে ও গর্ভে তারাচন্দ্র-রাজিকে ধরিয়া যে সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছিল। দূর-পাহাড়ের ধূসরবর্ণ মেঘরূপে ভ্রান্তি জন্মাইয়া যে আনন্দ দিয়াছিল, বাস্তবিকই তাহা ভাবনার বক্ষকে গলাইয়া দিবার মধুময় দৃশ্য। এইরূপে চিন্তা-চকিত-চিত্তে বিনিদ্র চক্ষে নিসর্গের অনুপম শোভার আংশিক শান্তি ভোগ করিতে করিতে প্রভাত সময়ে ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। অনতিদূরে মহাকাল ভুবনেশ্বরের মন্দির-চূড়া স্বতঃই ভক্তি আনিয়া দিল—ভব-জলদ আরও প্রবলতর হইল। উদ্দেশে ভগবান স্বয়ম্ভু শিবকে প্রণাম করিয়া, এ যাত্রায় তাঁহাকে দর্শন করিতে না পারার জন্য ক্ষমা চাহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই তথা হইতে পুরীর জন্য গাড়ী ছাড়িল।

কিছু দূর গিয়াই বহু দিনের আকাঙ্ক্ষার নির্বেদযুক্ত হৃদয়ের আশার আলোক—পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দেখিলাম। যাহার জন্য বঙ্গদেশ এক সময় ভাসিয়া গিয়াছিল, কত ধর্ম্মপ্রাণা রমণী গুপ্তভাবে কোলের শিশু ফেলিয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া যে মহাপুরুষের জন্য অসংখ্য নদ-নদী, কঙ্করযুক্ত কুটিল পার্ব্বত্যপথ অতিক্রমে এই সুদূরপ্রদেশে ছোটে, তাহা এই শান্তির আশ্রয়,—তপ্ত-জীবনের শান্তিবিন্দু প্রভু জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা। সেই ধ্বজা দেখিয়া ভক্তিভাবে প্রণত হইলাম। দেখিতে দেখিতে গাড়ী পুরী ষ্টেশনে পৌঁছিল, আমরা কারামুক্ত হইলাম।

ষ্টেসন হইতে পুরীর পথ চিনিবার ও নূতন স্বভাবের শোভা (যদি থাকে) দেখিবার ইচ্ছায় অশ্বযান বা গোযানকে উপেক্ষা করিয়া একজন মুটের মাথায় মোটটি দিয়া আমরা পদব্রজে স্বর্গদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বলা বাহুল্য, মুটেই আমাদের পথ-প্রদর্শক। দূর হইতে সিন্ধুর কল্লোল শুনিয়া আমার পুত্র ও সঙ্গী যুবকটি চমৎকৃত হইল এবং সমুদ্র দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল।

আমার প্রতিবেশী সুবাদে এক ব্রাহ্মণ ভ্রাতা পুরীতে অবস্থিত এক রাজ সংসারে গুরু শিক্ষক রূপে ছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথমে রাজ বাটীতে যাইলাম। তিনি আমাকে পাইয়া অতিশয় যত্নের সহিত তখনি আমাদিগকে লইয়া বাসার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। হঠাৎ উপযুক্ত বাসা পাওয়া গেল না, তখন জ্ঞানরাজ্যে ভারতের একচ্ছত্রী পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মঠের অস্থায়ী নেপালী সন্ন্যাসী-প্রবরকে (১) আমাদের অবস্থা জ্ঞাপন করায়, তিনি স্বর্গদ্বারেই, মঠের অধিকারভুক্ত একটী একতালা বাড়ীর একটী কুঠারী খুলিয়া দিলেন। তাঁহার ও তাঁহার বালক সন্তানের অজ্ঞাতকুল-শীল ব্যক্তির প্রতি এরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। শুনিলাম মঠাধিকারীর কার্য্যই এই এবং এই সমস্ত গৃহ এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে। যে সকল যাত্রী বাসা না পাইয়া বিপন্ন হন, খালি থাকিলে, তাহারা দুই এক সপ্তাহ এইখানে থাকিয়া বাসা ঠিক করিয়া লইতে পারেন। পুরীর কোন পর্ব্বোপলক্ষে যাত্রীরা অনেকেই এইখানে থাকেন। থাকার জন্য কোন অর্থ দিতে হয় না।

পুরীর পাণ্ডাদিগের ৩।৪ জন লোক প্রায় খড়্গপুর ষ্টেসন হইতে আমাদিগকে হস্তগত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, আমরা ধরা দিই নাই। পুরী ষ্টেশনে নামিয়া ও আসিবার পথে সে দূতের অভাব হয় নাই, তবে তত পীড়াপীড়ি দেখিলাম না।

পুণ্যজীবন শঙ্করের মঠাধিকারে আশ্রয় পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। অট্টালিকায় চারি দিকেই খোলা। দক্ষিণ ও উত্তরে রাস্তা, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বালুকার বিস্তৃত ময়দান। পূর্ব্বদিকে ২ মিনিট যাইলেই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অনন্ত সিন্ধু পরিদৃশ্যমান।

শক্তিসঙ্কুল মকরালয় শব্দায়মান নীলসিন্ধু

(১) মঠাধ্যক্ষ তখন তীর্থভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন

দর্শন করিয়া, গভীর আবেগে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাহার অসীমত্বের সহিত সেই অসীম কৌশলময় স্রষ্টাপুরুষের সত্বার কণাংশের সমন্বয় করিয়া তাহার কূলে প্রণত হইলাম। শুভ্র-ফেনপুঞ্জ-শির তরঙ্গরাশি বক্ষে করিয়া সিন্ধুরূপে তিনি যে আংশিক বিরাট মূর্ত্তিতে দর্শকের সমক্ষে উপস্থিত, তাহা দেখিয়া সততই ভাবপ্রবণ চিত্তের ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তাহার সহিত মহাসাধক কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সেই ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা,—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূত-
বিশেষ সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ মৃষীংশ্চ সর্ব্বানু-
রগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেক বাহূদর বক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং
সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি
বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।

মনে পড়িয়া সেই বিরাট মহাপুরুষের বিরাট মূর্ত্তির পূজা করিতে ইচ্ছা হইল।

স্নানান্তে বাসায় ফিরিয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে যাইবার পথে প্রথমে রামেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া প্রভুর শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলাম। বেলা অধিক হওয়াতে দেখিলাম, মন্দির-দ্বার তখন রুদ্ধ হইয়াছে। অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মহাপ্রসাদ কিনিবার জন্য আনন্দবাজারে যাইলাম। বেলা তখন ২টা। প্রথম দিন বাসায় সমস্ত গুছাইতে এত বেলা হইয়াছিল।

আনন্দবাজার ত আনন্দের বাজারই বটে। সেই বিমল আনন্দ রাখিবার স্থান নাই—চতুর্ব্বর্ণ সমন্বয়ের এক মহাযুগ। সকলে সকলের মুখে উচ্ছিষ্ট ভাত তুলিয়া দিতেছে। ব্রাহ্মণে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট হাসিতে হাসিতে খাইতেছে। অনেকে তরকারী চাকিয়া, অবশিষ্টটুকু তরকারীর হাঁড়িতে ফেলিতেছে দেখিয়া এ আনন্দে মগ্ন হইলাম। প্রভু জগন্নাথের অপার মহিমা, যাহা অবিরাম গতিতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে গলিয়া গেলাম। এ বিকার-রাহিত্যে কে না গলিয়া যায়—কে না উদ্ভ্রান্ত হয়? এই দেখাশুনার পর প্রসাদ কিনিয়া বাসায় ফিরিলাম। ফিরিতে ফিরিতে ভাবিলাম—আনন্দবাজার যথার্থই মহাপ্রকৃতির রন্ধন ও অতিথিশালা, অবারিত দ্বার,—কর্ম্ম কর—খাও,—কখন আহার্য্যের অভাব হইবে না।

আনন্দবাজারের মহিমা—জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মহিমারই প্রতিবিম্ব। কিন্তু সাদা সরু ভাত জগন্নাথের ও রাঙা মোটা ভাত বলরামের প্রসাদ শুনিয়া—চমকিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, ভগবানের সহিত মানুষেরও পক্ষপাত! কিন্তু প্রাণ তাহা মানিল না। বহু দিনের প্রচলিত প্রথার মধ্যে কোন রহস্য আছেই—সে রহস্য পরীক্ষা। কাল জগন্নাথ, সাদা বলরাম প্রসাদরূপে, দুই মূর্ত্তিতে অবস্থিত। তাহারা কাল সাদা এক! কাল ও সাদা পৃথক বর্ণ নয়। বৈজ্ঞানিকদিগের মতেও রামধনুর সপ্তবর্ণেও কাল সাদা নাই। তাহা হইলেই জগন্নাথ বলরাম এক। এই একত্ব প্রসাদেও আছে। তবে দেখিতে বর্ণ ও

আকৃতি পৃথক্, খাইতেও স্বাদ বিভিন্ন। ভক্ত ভুবের লালসায় লাল ও সাদা প্রসাদ দেখিলে জগন্নাথ-বলরামকেই পৃথক্ ভাবা হইল—একটু ঘৃণার ভাব আসিল—এস্থলে সে ভক্তিতে অনুত্তীর্ণ। সামান্ত খাওয়ার সুখ-দুঃখ হইতে যখন সে এড়াইতে পারিল না, তখন ভগবানকে পাইবে কিরূপে? উভয়কেই এক ভাবে দেখিতে হইবে—এক ভাবিয়া ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া যদি ভাল প্রসাদ খায়, তাহা অন্ত কথা। ভাল-মন্দ প্রসাদ সমান ভাবে খাইলেই সে বিকারশূন্ত হইল, ইহাই ভগবানের পরীক্ষা। ভগবানের প্রসাদের ভাল মন্দ কি? এই তত্ত্বে প্রহ্লাদ মত্ত ছিলেন, তিনি ভগবানের নিবেদিত প্রসাদে সুধা-বিষ সমান জ্ঞান করিতেন, সেই জন্মই বিষেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। অতএব ভক্ত! ভগবানের পরীক্ষা কত কঠোর ও গুপ্ত দেখ। তুমি তাঁহার বেলায় ভাল-মন্দ দেখিতেছ—কিন্তু তোমার বেলায় তিনিও ভাল-মন্দ দেখেন না—সমান ভাবে চন্দন বিষ্ঠায় ধরিয়া রক্ষা করেন। সেই জন্ম বলি—সাবধান হও—অবিকৃত চিত্তে যে প্রসাদ ইচ্ছা কিনিয়া খাও। কর্ম্ম কর,—খাও। কখন আহার্য্যের অভাব হইবে না।

বৈকালে ৬টার সময় সমুদ্রতীরের শোভা-সন্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সৈকত-ভূমিতে জনসঙ্ঘ, পুরোভাগে নীল বারিধি, যেন নীল আকাশ-কোলে ছিন্ন শুভ্র মেঘের মহা-মেলা। এই জনসমূহের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক বোধ হইল। স্থানে স্থানে ইউরোপীয়গণও কেহ ভ্রমণে—কেহ জলক্রীড়ায় মগ্ন। কেহ তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ম সিন্ধুজলে লাফাইতেছেন, তরঙ্গের আঘাতে কোথায় চলিয়া যাইতেছেন। জানিলাম, রোগবিশেষে এইরূপে দুই বেলা স্নান অনেকের পক্ষে শুভজনক। যদিও নীলত্ব অসীমত্ব গম্ভীরভাবদ্যোতকরূপে সিন্ধুর মহাভাব সকল আনয়ন করে, তথাপি তরঙ্গের উপর সর্পচক্রবৎ তরঙ্গের পতন,—বালুকাময় তীরভূমির বহু দূর পর্য্যন্ত ফেনপুঞ্জের দ্বারা রৌপ্যময় শয্যাস্তরণ প্রস্তুতকরণ, এই দুইটি তাহার মহান্ দৃশ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনন্ত অসীম রত্নগর্ভ সিন্ধুর মহিমা অবর্ণনীয়।

পরদিন প্রাতঃকালে স্নানান্তে বিশুদ্ধ-চিত্তে জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলাম। দেখিলাম, শত শত পাণ্ডা আমাদিগকে ঘিরিয়া কে আমাদের পাণ্ডা, জিজ্ঞাসা করিল। আমাদের বংশীয়দিগের পাণ্ডার নাম না জানায়, তাহাদের একজনকে আশ্রয় করিলাম। তাহার হাতে একগাছ বেত্র,—এরূপ লোককে যুড়িদার বলে। তাহারা আসল পাণ্ডার চেলা। সেই যুড়িদারের পয়সার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও তত বেশী বলিয়া বোধ হইল না। তাঁহার সহিত অন্ধকারাবৃত রত্নবেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মিটি মিটি বাতির আলোকে মহামূর্ত্তিত্রয় দর্শন ও পূজনে চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। এ জল ভক্তিমিশ্রিত ও আর একটি দুরাবগাহ শক্তির আদান-প্রদানে গভীর বেদনা গলিত। কেন না, স্ত্রীর সহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও তীর্থ-ভ্রমণ হিন্দুশাস্ত্রের প্রকাণ্ড আদেশ, একজন স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী। আজ আমি একা রত্নবেদীর

সম্মুখে, আর সেই ধর্ম্মাশ্রয়ের সঙ্গিনী কোথায়? এই অশ্রুর একটী ধারা, সেই জন্য হৃদয় কাঁদাইয়া, চক্ষু ফাটাইয়া গৈরিক স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত। পুত্রের সহিত রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণত-শিরে মন্দির ত্যাগ করিলাম। দর্শন ত করিলাম—কিন্তু সাধ মিটিল কৈ? মন্দির-ত্যাগে ইচ্ছা হইল না। বাহিরে আসিয়া জগমোহনে গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম। পাণ্ডা সম্ভবমত দক্ষিণা লইয়া অন্যত্রে চলিয়া গেলেন। সেই শান্তিস্থলে কতক্ষণ থাকিয়া প্রথমে অন্যান্য দেবদেবীকে দর্শন করিবার জন্য বিমলাদেবীর মন্দিরে যাইলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।

বলিদান।

শক্তিপূজায় বলিদান প্রশস্ত। স্নান, পূজা, বলি, হোম এই চারি প্রকারে পূজা না করিলে শক্তিপূজা সিদ্ধ হয় না—শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ-প্রয়োগের অভাব নাই। যজ্ঞার্থ পশুবধ চারি যুগ ধরিয়া প্রচলিত রহিয়াছে, কিন্তু আজকাল অনেক স্থলে ইহার অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের বাটীতে চিরকাল শক্তিপূজায় বলিদানের প্রথা ছিল, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ বহু দিন ধরিয়া এই প্রথার অনুমোদন করিয়া আসিতেছিলেন, আজকাল নব্য শিক্ষিতের সময়ে সে বিধির, সে প্রথার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—এখন আর সে বাটীতে বলিদান হয় না। শিক্ষিত বাবু-বৃন্দের সকল বিষয়ে না হউক, এই বিষয়ে স্নেহের উৎস উথলিয়া উঠে, বলিদানটা একটা নৃশংস কাণ্ড বলিয়া তাঁহাদের প্রাণে আঘাত লাগে, তাই বলিদান করিতে তাঁহাদের আর ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কসাইয়ের খড়্গে অসংখ্য পশু হনন হইতেছে, তাহা উদরস্থ করিয়া রসনার তৃপ্তি করিতে কাহারও অপ্রবৃত্তি নাই। আজকাল যেখানে সেখানেই ত এইরূপ অবাধে পশুবধ হইতেছে, তাহা দেখিয়া ত কাহারও প্রেমের পাথার উথলিয়া উঠে না বরং দিন দিন বিক্রয়াধিক্য বর্দ্ধিত হইয়া, বধ সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে—আমরা মহানন্দে এই বৃথা মাংসে উদর পূর্ত্তি করিয়া দেহের মেদ-মাংস বৃদ্ধি করিতেছি, হৃষ্টপুষ্ট কান্তি-বিশিষ্ট হইতেছি। আমরা যদি এই বৃথা মাংস ভোজন পরিত্যাগ করি এবং ইহা যদি পাশবিক অত্যাচার বলিয়া আমাদের অন্তঃকরণে আঘাত লাগে, তাহা হইলে কত পশুর যে জীবন রক্ষা হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না কিন্তু এদিকে দৃষ্টিশক্তি কয়জনের আছে? কেবল দেবীর পূজোপকরণরূপে যে বলি ব্যবহৃত হয়, সেই সময়ই যত গণ্ডগোল, যত দয়ামায়ার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়।

বলিদান পূজার উপকরণ, বিনা বলিদানে দেবী-পূজা হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যখন দেশে ধর্ম্মের প্রবল স্রোত প্রবাহিত ছিল, ধর্ম্ম যখন মানুষের অস্থি-মজ্জা-গত ছিল, সে সময়ও যজ্ঞে পশুবধ প্রচলিত ছিল। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ যে যজ্ঞের পরামর্শদাতা—বিধান-কর্ত্তা ছিলেন; ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডবগণ যাহা

সে যজ্ঞে পশুবধ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যজ্ঞে পশুবধ করিয়া মাংস-ভক্ষণে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি ইহা পাপ-কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহা হইলে ভগবান কখনও এ বিষয়ে অনুমোদন করিতেন না, আর শাস্ত্র কখনও এ বিধি-নিষেধ প্রচার করিয়া পাপের প্রশ্রয় দিতেন না।

পূজোপকরণরূপে বলি প্রদান করিলে তাহাতে পাপ নাই ; শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
অতস্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধ।"

পশুগণ যজ্ঞের জন্ত ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব যজ্ঞে যাহা বধ করা হয়, তাহা অবধ অর্থাৎ তাহাতে বধজনিত পাপ হইতে পারে না। তবে যজ্ঞকর্ত্তা যদি পূজোপকরণরূপে বলিদান না করিয়া তাহার বন্ধুবান্ধবগণের রসনা তৃপ্তির জন্ত অসংখ্য বলিদান করেন, তাহাতে নিশ্চয়ই পাপ হয় এবং সেরূপ বলিদান যত না হয়, ততই মঙ্গল।

আজ অনেকেই শাস্ত্র না বুঝিয়া বলেন— বলিদান মানে রিপু বলিদান—ছাগাদি পশু নহে। ইহারা আবার একপ্রকার বিকট প্রকৃতির লোক—রিপু বলি মানেই আমরা বুঝি না; তাঁহারা হয় ত আমাদের ষড়রিপুর নিয়োগই বলিদান বলিয়া, বলিদানের ব্যাখ্যা করেন। যে মহাত্মা ষড়রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির হস্ত হইতে যাঁহারা অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বাহিক এই আড়ম্বরযুক্ত পূজারই বা আবশ্যক কি? রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত মানব ত জীবন্মুক্ত—তাহাদের বাহিক আড়ম্বর করিয়া লোক-দেখান পূজার কোন প্রয়োজন হয় না। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে পূজা তিন প্রকার। উক্ত প্রকার পূজা সাত্বিক-প্রকৃতির লোকের জন্য ব্যবস্থিত, তাঁহাদের কোন প্রকার বাহিক পূজোপকরণের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা হৃদয়-সিংহাসনে মাকে অধিষ্ঠিত করিয়া মনোময় পুষ্পে, প্রণতি-চন্দন মাখাইয়া ভক্তি-গঙ্গাজলে তাঁহার পূজা করিবেন, সেখানে বাদ্যোদ্যমের প্রয়োজন নাই, দেহ-ঘটস্থিত ওঁকার নাদই তাঁহাদের বাদ্যোদ্যম, ঝাড়লণ্ঠনের আবশ্যক নাই, তাঁহারা জ্ঞানা-লোকে হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া তাহাতে মায়ের মঙ্গল আরতি করিয়া পরিতৃপ্ত হন। কিন্তু সেরূপ লোক কয়জন? আজকাল অধিকাংশ পূজাই রাজসিক, ধন, মান, যশের জন্ত, নিজের মঙ্গলের জন্য সমাহিত হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে পূজোপহারের ক্রটী হইলে পূজা করা চলে না—সে পূজা অসিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য অন্যান্য উপকরণের ন্যায় বলিও প্রয়োজন।

সাধক বীরাচারে এই শক্তিপূজা সমাহিত করিবেন। রাজসিক ভাবে এই পূজা সমাহিত করিতে পারিলে, কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। এই বলিদানে সাধকের স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মানুষ সকলের অংশপ্রদান করিতে পারে কিন্তু পুণ্যের অংশ প্রদান করিতে কেহই স্বীকৃত হয় না—এমন কি পিতামাতাও পুত্রের জন্য

পুণ্যের অংশ ত্যাগ করিয়া পাপ-ভাগী হইতে চাহেন না। কিন্তু পরার্থ হীত-ব্রত শক্তি-সাধক, শাক্ত-ভক্ত একটা নিকৃষ্ট পশুকে উদ্ধার করিবার জন্য, তাহার পশু-পাশ বিযুক্ত করিয়া পরম গতিমুক্তি প্রদানের জন্য আপন পুণ্যের অগ্রভাগ প্রদানেও তিলমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। তিনি অকাতরে নিজের সঞ্চিত পুণ্যের অগ্রভাগ প্রদান করিয়া বলিরূপে সমাদৃত পশুকে উদ্ধার করিতে স্বতঃ পরতঃ সচেষ্ট—এমন উদার ভাব, বলিদানের ন্যায় এমন স্বার্থত্যাগ কি আর কোথাও আছে? যে মায়ের আহ্বানে ছেলে, এক মুহূর্ত্তে যে মায়ের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে, বীর-ভাবে যে মায়ের চরণে আপনার সমস্ত দান করিয়া মাতৃময় হইয়াছে,মাতাপুত্রে যেখানে পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, তাহার যে একটা পশুকে পুণ্যের অগ্রভাগ দিয়া উদ্ধার করিবার শক্তি নাই, তাহা কে বলিল? কাঁদিয়া কাটিয়া ত তাহাদের পুণ্য-সঞ্চয় করিতে হয় নাই। তাহারা যে মায়ের আবদারে ছেলে, জোর করিয়া ভক্তি-মুক্তি করতলগত করিতে সমর্থ। তাহাদের কি পুণ্যের অভাব, বিশ্বজননীর চরণ যাহারা ইহ-পরকালের সার সম্বল করিয়াছে, বলিপ্রদান করিয়া একটা জীবোদ্ধারের ক্ষমতা তাহাদের যথেষ্ট আছে। যজ্ঞার্থে পশুবধ করিতে যাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তাহারা ঘোর স্বার্থপর, পুণ্য-সঞ্চয় তাহাদের খুব কম, পরার্থে একটু ব্যয়িত হইলে তাহাদের আর সঞ্চয়ের ক্ষমতা নাই।

যে পশু সকল যজ্ঞে বধের জন্য সংগৃহীত হয় তাহাদের পুণ্যেরও ইয়ত্তা নাই। কারণ অকারণে কত শত স্থানে বৃথা বধের জন্যও তাহাদের প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইল না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দেবীর নিকট দুইটী শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সতেজ ছাগ ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে আনয়ন করা হইল,একটী আনয়নের কিয়ৎক্ষণ পরে পীড়িত হইয়া পড়িল, মাতৃ পদে উৎসর্গীকৃত হইল না। অপরটী আনন্দের সহিত প্রাণদান করিল। তাহাকে মন্ত্রপূত করিয়া বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল, ছাগ বন্ধন মুক্ত হইয়াও পলায়ন করিল না, হাঁড়িকাঠের কাছে কাছে ঘুরিতে লাগিল। তার পর বধকর্ত্তা যখন পশুপাশ বিমুক্তির গায়ত্রী কর্ণে বলিয়া, তাহার পুণ্যের অগ্রভাগ প্রদান করিয়া তাহার পশুপাশ বিমুক্তির সাহায্য করিল, তখন বলিতে কি, ছাগপশু ঠিক মানবের মত মা মা রবে মায়ের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল,পশ্চাতে জয়ঢাক গম্ভীর রবে নিনাদ করিয়া উঠিল "চল্ চল্ চল্ চল্‌রে, চলে মায়ের কাছে যাই।" তার পর সেই মহা পবিত্র পুণ্যপূত মহামাংস সাধু ভক্তগণ মহাপবিত্র জ্ঞানে তাহাকে উদরে স্থান দান করিয়া কৃতার্থ হইল। ইহাই শাক্তের শক্তিপূজার মহা উপচার বলিদান—ইহা হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পন্থা নহে। হিংসাবৃত্তি নাশ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সোপান, স্বার্থত্যাগের যথার্থ মহিমা এখানেই সম্যক্‌রূপে পরিব্যক্ত।

আজকাল একশ্রেণীর মানব নিকৃষ্ট পিপীলিকার প্রতি দয়া করিয়া চিনি খাওয়াইয়া বহু বুদ্ধি প্রদর্শন করেন, গাভীগণকে ভিক্ষার প্রদান

করিয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন না কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তাঁহারা অজস্র ভেজাল প্রদান করিয়া পরমার্থ নষ্ট করিতেও পশ্চাদ্‌পদ নহেন। এই ভেজালের প্রকোপে কতশত উৎকৃষ্ট মানব অকালে ভীষণ রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—এ সময়ে তাহাদের দয়ার সাগর উথলিয়া উঠে না, স্বজাতীয় মানবকে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগ করিতে তাহাদের প্রাণে আঘাত লাগে না। ইঁহারা অর্থের জন্য কিরূপ জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন—তাহা একবার ভুলিয়া দেখেন না, স্বার্থ এমনিই মহা রতন। ঘৃত, তৈল ময়দা আর কত বলিব—দেশ আজ ভেজালে পরিপূর্ণ—এই ভেজালের দায়ে মানুষ মৃতপ্রায় আর ভেজালকারিগণ গাভী পিপীলিকাকে মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া মনে করিতেছেন—চতুর্ব্বর্গ লাভ হইবে। ভাই হইয়া অর্থের জন্য ভায়ের রক্ত-শোষণ করিতেছে, এমন পাপ কার্য্য নাই যাহা ভায়ের বিষয় ফাঁকি দিবার জন্য অনুষ্ঠিত না হয়। আর তাহাদেরই প্রাণ দেবী-পূজায় বলিদানের জন্য কাঁদিয়া উঠে, হিংসাবৃত্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া বলিদান তুলিয়া দেন—হায় রে কলি। দেবী-পূজায় বলিদান কি ইহাপেক্ষা পাপাভিনয়—মহামহোপাধ্যায়গণ, তাহার বিচার করুন।

সম্পাদক।

"আকাশ-কুসুম।"

(গল্প)

কলিকাতা সহরের পশ্চিমাংশে 'লালদীঘি' একটী সুবৃহৎ এবং মনোরম সরোবর, ইহার চারিধারেই গবর্ণমেণ্ট অফিস, সওদাগরী অফিস প্রভৃতি সুরম্য প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা-গুলি বেষ্টন করিয়া আছে। সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালী অফিসারগণ কর্ম্মক্লান্ত দেহখানি ক্ষণেকের তরে বিনোদন করিবার নিমিত্ত ইহার তীরে সমবেত হইয়া সান্ধ্যবায়ু সেবন করিয়া থাকেন। ইহার তীরে পার্কটীও পরম রমনীয়; তথায় নানা-বিধ বৃক্ষলতা, অসংখ্য ফুলের গাছ, লতাকুঞ্জ প্রভৃতি শোভায়মান। লতাকুঞ্জগুলির ভিতরে একখানি করিয়া বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে, সেখানে বসিয়া লোকে আপন আপন প্রিয়-জনের সহিত কত সুখদুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া থাকে। কলিকাতার অন্য অন্য পার্কের ভিতর রাত্রে আলো দেওয়া হয় কিন্তু এখানে সেরূপ কোন বন্দোবস্ত নাই সুতরাং সন্ধ্যার পর হইতেই ইহা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে; বোধ হয়, প্রণয়ীযুগলের নির্জ্জন আলাপের সহায়তা করিবার নিমিত্ত এইরূপ বন্দোবস্ত।

সেদিন শনিবার। অফিসারগণ সকালে ছুটী পাইয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া গিয়াছেন, সেজন্য লালদীঘি আজ প্রায় জনশূন্য। তখন পূর্ণিমার সন্ধ্যা; পূর্ব্বগগনে চন্দ্রদেব একখানি বৃহৎ সোণার থালার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। আকাশে কচিৎ দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে মাত্র; বোধ হয়, চন্দ্রের রূপে পরাস্ত হইয়া আজ তাহারা আত্মগোপন করিয়াছে। অমাবস্যায় রাত্রে যখন চাঁদের দর্শন মেলে না, তখন তাহারা তাহাদের

রূপের পসরা লইয়া সদলবলে আকাশে উদিত হয়; কিন্তু কৈ তাদের রূপের ছটায় ত জগত আলোকিত হয় না। আজ যে এক চাঁদের আলোতেই বসুন্ধরা আলোকিত হইয়া গিয়াছে; জ্যোৎস্নাস্নাত বৃক্ষপত্রগুলি মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোলে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া দর্শকের মন কতই না বিমুগ্ধ করিতেছে।

তখন সেই সুনির্ম্মল সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতে করিতে একটী যুবক এক বালিকার হস্ত ধারণ করিয়া কুঞ্জমধ্যে একখানি বেঞ্চের উপর গিয়া উপবেশন করিল এবং মুগ্ধ হইয়া কৌমুদীপ্রফুল্ল প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কেহ কাহারও সহিত আলাপ করিল না; উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিল।

লতাকুঞ্জের উন্মুক্ত পথ দিয়া চন্দ্রকিরণ বালিকাটীর মুখের উপর পড়িয়াছিল। এবং তাহার মুখখানি প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। যুবকটী সেই মুখপানে একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল; সে কতদিন তাকে সঙ্গে লইয়া এই লালদীঘির ধারে বেড়াইতে আসিয়াছে, কতদিন এই কুঞ্জে বসিয়া কত গল্প করিয়া সময় কাটাইয়াছে, কিন্তু এমন ভাবে যুবকটী বালিকার পানে আর কখনও ত তাকায় নাই, আর উহার যে এত রূপ আছে, ইহাও ত যুবকের মনে কখন উদয় হয় নাই, আজ সে দেখিল, যেন কুঞ্জের ভিতর একটী স্থলপদ্ম ফুটিয়াছে—সে যেন অসংখ্য ফুলের মধ্যে ফুলের রাণী হইয়া বসিয়া আছে, আর তার শোভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া লতাকুঞ্জকে আমোদিত করিতেছে। যুবক বালিকার সেই ভুবনমোহিনী রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া গেল। তাহার হৃদয় আলোড়িত হইল; হৃদয়ের রুদ্ধভাবগুলি ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হুহু করিয়া ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিল। সে যে দীনদরিদ্র, সে কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলিয়া গিয়া এক আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়া ফেলিল! ভাবিল,—যদি ইহাকে পাই তা'হলে স্বর্গকামনাও তুচ্ছ বোধ করিব—আর যদি না পাই, তবে এ হৃদয়মধ্যে যে জ্বালাময় মরুর সৃষ্টি হইবে, শত বর্ষণেও তাহার শান্তি হইবে না।

নৈশ প্রকৃতির সেই অপূর্ব্বশোভা সন্দর্শন করিয়া বালিকার মনেও যে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার হইতেছিল না, এমন নহে। এক অব্যক্ত মধুর ভাব তাহার মনকে প্রফুল্ল করিতেছিল, ইহা সে অনুভব করিতে পারিয়াছে কিন্তু কেন যে এরূপ হইতেছিল, তাহা বুঝিতে পারে নাই।

বালিকাটী সবে কৈশোরের প্রান্ত সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল-তার যৌবনকুঞ্জে বসন্তের পাপিয়া মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছিল, তাই সে এরূপ অভিনব ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেছিল।

এমন সময়ে যুবকটী বালিকার কর পল্লব আপন করে ধারণ করিয়া আবেগ ভরে ডাকিয়া উঠিল 'অনি!' বালিকাটীকে সকলেই 'অনি' বলিয়া ডাকিত। সে তখন অন্যমনস্ক হইয়া কি চিন্তা করিতেছিল-এমন সময়ে যুবকের সেই শব্দ শ্রবণে হঠাৎ চমকিত হইয়া একবার

যুবকের মুখপানে তাকাইল এবং আবার অধোমুখে কি চিন্তা করিতে লাগিল। যুবক পুনরপি বলিল, 'অনি,তুমি আমায় ভালবাস ?' বালিকাটী অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া ফেলিল 'হাঁ। ভালবাসি।' এই উত্তর দিয়াই বালিকার চমক ভাঙ্গিল। সে যেরূপ উত্তর দিয়াছে, তাহার জন্য লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং মুখখানি যুবকের বুকের ভিতর লুকাইল। যুবকটীও তাহাকে আপন বাহুডোরে বাঁধিয়া গদগদ স্বরে বলিতে লাগিল 'অনি, তোমার এই সুন্দর মুখখানা কি চমৎকার, এতরূপ তুমি কোথায় পাইলে ? তোমার এই ঠোঁট দুটী—উহাতে যেন ভগবান পৃথিবীর সমস্ত মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন ; তোমার গাল দুটীতে যেন জগতের যাবতীয় পুষ্পের লাবণ্য লইয়া স্থাপন করিয়াছেন। তোমাকে দেখিয়া আমি সব ভুলিয়া গিয়াছি ; জগতে তোমাকে পাওয়া ভিন্ন আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখি না—যদি তোমাকে বিবাহ করিতে পাই তবে স্বর্গকামনাও তুচ্ছ করিব। বল, তুমি কি সত্যই আমাকে ভালবাস ?'

৩

বালিকাটী এবার মহাসমস্যায় পড়িল। সে এবার যে কি উত্তর দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। সে যুবকটীকে ভাল বাসিত—ভালবাসিয়া সুখ পাইত, তাই ভালবাসিত। সে যখন প্রথম ভালবাসিয়াছিল, তখন ভোগ কাহাকে বলে তাহা জানিত না, অথচ প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছিল। যুবকের সহিত তাহার যে বিবাহ হইবে, এ ধারণা তাহার মনের মধ্যে কখনও স্থান পায় নাই। সে ভাবিল 'মানুষ দেবতাকে ভালবাসে কিন্তু দেবতার সহিত ত কাহারও বিবাহ হয় না—তা, তবুও ত ভালবাসে। এই ভালবাসাই পরম সুখ। প্রাণের ভিতর লুকাইয়া ভালবাসিতে পারা বড়ই আনন্দ, পরম সুখ, তাই সে বলিল 'তোমাকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রাণের ভালবাসা ঢালিয়া পূজা করিব।'

যুবক তখন ধীরে ধীরে বলিল 'তুমি ধনীলোকের কন্যা, আমি দরিদ্র. তুমি আমায় কখনও ঘৃণা করিবে না ?'

এ কথায় অনি, তত সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, সে করুণার স্বরে বলিল 'দেখ, এতদিন তোমায় ভাল বাসিয়াছি কি না জানি না কিন্তু তোমায় ক্ষণেক দেখিতে না পাইলে মনটা অস্থির হয়ে উঠে, তুমি কতক্ষণে কলেজ থেকে ফিরবে, আমি ঘড়ীর পানে কেবল চাহিয়া থাকি। পড়া সুন্দররূপে মুখস্থ করিয়া তোমার কাছে পড়া দিতে যাই কিন্তু একটী কথারও নির্ভুল উত্তর দিতে পারি না—তোমার কাছে গেলে আমি সব ভুলে যাই। তুমি গরীব বলিয়া দুঃখ কর কেন, আর কদিন পরে পাশ দিলেই ত কত চাকরী পাবে, তখন ত আর কোন কষ্ট থাকবে না। তুমি অমন করে ও সব কথা আর বলিও না, তাহলে আমি বড়ই ব্যথা পাব।'

বালিকার এই কথা শুনিয়া যুবক আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল।

তখন উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নীরবে

বসিয়া রহিল। আজ তাহাদের কাছে পৃথিবীটা যেন স্বর্গরাজ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, নিম্নে হাস্যময়ী ধরণী, আর সেই লালদীঘির চন্দ্রমা ধবল জলরাশি আজ তাহাদের এই পরস্পর হৃদয় বিনিময়ের সাক্ষী হইয়া রহিল।

অদূরে গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ৭টা বাজিয়া গেল। ঘড়ীর শব্দে তাহাদের চমক ভাঙ্গিল এবং রাত্রি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া লালদীঘি হইতে বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

* * * * * *

গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের আদি নিবাস রামকৃষ্ণপুরে। তিনি কর্ম্মসূত্রে প্রায় ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন গৌরীবাবু প্রথমে সামান্য পদ লইয়া পুলিসে ঢোকেন, অতঃপর নিজভাগ্য বলে পদোন্নতিলাভ করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছেন।

গৌরী বাবুর বয়স যখন কুড়ি বৎসর তখন পরমা সুন্দরী এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় কিন্তু বিবাহের তিন বৎসর পরেই সে স্ত্রীটি মারা যায়, তাহাকে তিনি খুব ভালবাসিতেন, সুতরাং তাহার মৃত্যুতে একেবারে অধির হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার যৌবনের নবোন্মেষ—সংসার প্রবেশের পথেই এত বড় একটা গুরুতর আঘাতে তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়েন এবং তিনি আর বিবাহ করিবেন না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশিগণের পুনঃ পুনঃ অযাচিত অনুরোধ তাঁহাকে বড়ই বিরক্ত করিয়া তুলিল এবং তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য একেবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং পুলিসের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই চাকুরি লওয়াতে তাঁহার স্বার্থ ছিল—তিনি জানিতেন ইহাতে ছুটী খুবই কম সুতরাং দেশে যাওয়া ততু ঘটিয়া উঠিবে না এবং তা'হলে প্রতিবেশিদিগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডাইবে কে? গৌরী বাবুর পিতা দেশে অনেক পাত্রীর সন্ধান করিয়া গৌরী বাবুকে পত্র লিখিতে লাগিলেন কিন্তু প্রত্যেক বারেই গৌরী বাবু ছুটী পান নাই এইরূপ ওজর করিতে লাগিলেন। অবশেষে গৌরী বাবুর পিতা একজন প্রতিবেশীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতাতেই পাত্রীর সন্ধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার গৌরী বাবু প্রমাদ গণিলেন; পুত্র হইয়া পিতার কার্য্যে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। শুভদিনে কলিকাতার অদূরস্থ ভবানীপুরে কোন দরিদ্র গৃহস্থের কন্যা সরযূর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

সরযূ দরিদ্রের কন্যা—তাই তাহার বিবাহের সময় বয়স একটু বেশী হইয়াছিল। তখন যৌবনের অপূর্ব্ব তরঙ্গ তার সারা অবয়বে একটা হিল্লোল তুলিয়াছে। সুগোল নিটোল হাত, মুখে লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছিল গৌরীবাবু এই গৌরকান্তি যুবতীকে আপন সহধর্ম্মিনীরূপে পাইয়া বড়ই সুখানুভব করিতেছিলেন এবং একটু একটু করিয়া পূর্ব্ব পত্নীর স্মৃতি ভুলিয়া যাইতেছিলেন।

তারপর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সরযূ ইতিমধ্যে এক কন্যা প্রসব করিয়াছে এবং সাধ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছে "অনুপমা।" কিন্তু সকলেই তাহাকে "অনু বা অনি" বলিয়া ডাকিত।

অনুপমা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই গৌরী বাবুর পদোন্নতি আরম্ভ হইয়াছে এবং একণে বাসের নিমিত্ত সাহেব পাড়ার ভিতরে একখানি সরকারী গৃহ পাইয়াছেন।

দেশ হইতে গৌরী বাবুর পিতা স্বদেশের মায়া কাটাইয়া কলিকাতার এই বাসায় আসিয়াছেন। তিনি যখন কলিকাতায় আসেন তখন তাঁহার এক প্রতিবেশী পুত্র রুহিদাসও সঙ্গে আসিয়াছিল। রুহিদাস দরিদ্রের সন্তান; তাই যখন গ্রাম্য স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া অতঃপর কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না, তখন গৌরীবাবুর পিতা দয়াপরবশ হইয়া তাহার উচ্চশিক্ষার সুবিধার নিমিত্ত তাহাকে কলিকাতা লইয়া আসেন।

রুহিদাস তখন কিশোরবয়স্ক এবং অনুপমা ৯ বৎসরের বালিকা। রুহিদাস আর কখনও বিদেশে যায় নাই সুতরাং প্রথম প্রথম কলিকাতায় আসিয়া বাড়ীর জন্য তাহার মন কাঁদিয়া উঠিত। যা'হোক্ সে অনুপমাকে সঙ্গীরূপে পাইয়াছিল বলিয়া এ চাঞ্চল্যটুকু শীঘ্রই তিরোহিত হইয়া গেল। অনুপমাও রুহিদাসকে পাইয়া একটী নূতন খেলার সাথী লাভ দেখিয়া খুবই খুসী হইয়াছিল। সে রুহিদাসের কাছে কত গল্প বলিত ও শুনিত এবং মাঝে মাঝে পড়া বলিয়া লইত। অনুপমা তখন মহাকালী পাঠশালায় পড়িতে-ছিল। রুহিদাস তাহাকে প্রত্যহ বৈকালে লালদীঘির বাগানে বেড়াইতে লইয়া যাইত এবং গাছ হইতে তাহাকে কত ফুল পাড়িয়া দিত, ছুটাছুটী খেলা করিত; এইরূপে সে সর্ব্বপ্রকারে তাহার মনস্তুষ্টির প্রয়াস পাইত।

অনুপমা দেখিতে বড়ই সুন্দরী ছিল, রুহিদাস সময়ে সময়ে মুগ্ধ হইয়া তাহার ডাগর চোখদুটীর দিকে তাকাইয়া থাকিত। খেলা ভুলিয়া কতবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছে —কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভাল বাসিয়াছে! প্রকৃতি-শিশুর ন্যায় রূপে আসক্তি আর কাহার আছে? তবে আসক্তি জনিত যে লজ্জা তাহা রুহিদাসের ভিতরে ছিল না। একটী সুন্দর ফুল দেখিলে তাহার দিকে যেরূপভাবে তাকাইয়া থাকিত, অনুপমার দিকেও সে ঠিক সেইভাবে তাকাইয়া থাকিত। পূর্ণিমার চন্দ্র কে না ভালবাসে? বাগানের সুন্দর গোলাপ কাহার না চিত্ত আকর্ষণ করে? রুহিদাস তাই অনুপমার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে কিন্তু তখনও পতঙ্গের মত রূপের আগুনে ঝাঁপ দিতে শিখে নাই। অনুপমার একটু অসুখ করিলে বা সে একটু কাছছাড়া হইলে তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িত। এমনি ভাবে একটু একটু করিয়া তাহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল।

এমনি করিয়া দীর্ঘ ৪ বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে গৌরীবাবুর পিতা অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। রুহিদাস একণে বি এ,

পড়িতেছে। সে বুঝিয়াছে এ জীবনে অনুপমা ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। কিন্তু সে যে দীন-দরিদ্র, তাহাদের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে—এ সব যখন মনে হইত, তখন তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। অনুপমা যখন তাহার কাছে পড়িতে আসিত, তখন তাহাকে দেখিয়া রুহিদাসের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিত। সে তখন আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইত; তাহার বুদ্ধি, চিন্তা-শক্তি, চৈতন্য সব যেন লোপ পাইত—অনুপমার ডাকে আবার তাহার চমক ভাঙ্গিত। তাহার বাল্যকালের ভালবাসাটা একটু একটু করিয়া বাড়িয়া এক্ষণে অপরিমিত হইয়াছে কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাহার ভালবাসার কথা অনুপমাকে জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করিত।

তাহাদের এই ভালবাসার পরিণতি—লালদীঘির চন্দ্রালোকপরিশোভিত লতাকুঞ্জের ভিতর বসিয়া তাহাদের প্রণয়ের সেই প্রথম মধুর সম্ভাষণ, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

• • • • * *

সেবার গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশ পাইয়া রুহিদাস রামকৃষ্ণপুরের বাড়ীতে গিয়াছিল। কলেজ খুলিলে পুনরায় যখন সে কলিকাতায় আসিল, তখন তাহার কাছে সবই যেন কেমন নূতন নূতন বোধ হইতে লাগিল। অন্যবার দেশ হইতে রুহিদাস আসিয়াছে, শুনিলেই অনুপমা ছুটিয়া তাহার কাছে যাইত এবং নানারূপ প্রশ্নে তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। এবার কিন্তু সে তাহার কাছে আসিল না; আবার তাহার দিকে চোখ পড়িতেই সে যখন মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল, তখন রুহিদাসের মন সংশয়াকুল হইয়া উঠিল। তার পর সে যখন শুনিল আগামী মাসেই অনুপমার বিবাহ, তখন তাহার আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না।

রুহিদাস এতদিন মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে, অনুপমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে, কারণ,—সে তাহাদের পাল্টী ঘর, সে নিতান্ত মূর্খ নয়, আর তাহার পিতাও পুত্রের বিবাহ দিয়া যে বড়লোক হইবেন, এরূপ আশা করিতেন না, অধিকন্তু গৌরীবাবুর পিতা জীবিত থাকিতে রুহিদাসের সঙ্গে অনুপমার বিবাহ দিবেন বলিয়া উহাদিগকে কত ঠাট্টা করিতেন। তাহাদের পক্ষে বিবাহ না হইবার যে কোন যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা রুহিদাস কখন ভাবিয়া দেখে নাই বা ভাবিবার চেষ্টাও করে নাই। তাই সে যখন শুনিল, তাহার সঙ্গে বিবাহ না হইয়া অন্য পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন সে অবাক হইয়া গেল।

অনুপমার বিবাহের বয়স হইয়াছে, তাহাকে শীঘ্রই পাত্রস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন—গৌরীবাবু শ্বশুরের নিকট রুহিদাসের কথাটা একবার পাড়িয়াছিলেন কিন্তু শ্বশুর সে কথায় অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া 'আমার মেয়ের বিয়ে পাড়াগেঁয়ে একটা অসভ্য ছেলের সঙ্গে কখনই হইতে দিব না' এইরূপ রায় দিয়া বসিয়াছিলেন। তাই গৌরীবাবু কলিকাতায় বহু চেষ্টার পর একটী পাত্রের সন্ধান পাইয়া আগামী মাসেই বিবাহ হইবে এইরূপ স্থির

করিয়াছেন।

অনুপমা এই বিবাহের কথা শুনিয়া আদৌ সুখী হইতে পারে নাই। সে নির্জ্জনে বসিয়া কত চিন্তা করিত—ভাবিতে ভাবিতে তাহার শরীর মলিন হইয়া যাইতেছিল। সরযূ তাহা লক্ষ্য করিল; প্রণয়ের লক্ষণ স্ত্রীজাতিরাই সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে পারে। সরযূ তাহাকে কত তিরস্কার করিল, রুহিদাসের কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতে বলিল এবং তাহার সঙ্গে রুহিদাসের বিবাহ হইতেই পারে না, তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল।

পৈতৃক খোলার ঘর ছাড়িয়া আসিয়া এবং দাসদাসীদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে পাইয়া সরযূ বেশ একটু অহঙ্কৃতা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পিতামাতা যে একটী পাড়াগেঁয়ে, দোঙ্গবরে, পায়ে পট্টিজড়ান মাথায় লাল পাগড়ী আঁটা একটী সামান্য জমাদারের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সে কথা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল; তাই রুহিদাসের সঙ্গে বিবাহ দিতে ওরূপ আপত্তি তুলিতে পারিয়াছিল।

অনুপমা আর রুহিদাসের নিকট আসিতে পাইত না। অনুপমাদের থাকিবার ঘর ছিল তেতালায়, রুহিদাস একতালায় একটী ক্ষুদ্র কুটুরী পাইয়াছিল। তেতালার গবাক্ষে দাঁড়াইলে রুহিদাসের ঘর দেখা যাইত। সে কলেজ হইতে আসিয়া আর কোথাও বেড়াইতে যাইত না; সে আপন কক্ষে বসিয়া ভূহমেত্রে জানালার দিকে তাকাইয়া থাকিত—যদি একবার অনুপমা সেখানে আসিয়া দাঁড়ায়, তা'হলে ত একবার দেখিতে পাইবে—চক্ষু ভরিয়া রূপ-সুধা পান করিবে। তাহার সঙ্গে যে অনুপমার বিবাহ হইল না, ইহাতে সে তত অসুখী হয় নাই কিন্তু যেদিন সে শুনিল অনুপমাকে রুহিদাসের সঙ্গে বেড়াইতে বারণ করা হইয়াছে, সেইদিন হইতে তাহার শোকাবেগ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। সে অনুপমার সঙ্গে আর বেড়াইতে পাইবে না, তার স্বভাবসুন্দর হাসি, সরল কটাক্ষ আর সে যে দেখিতে পাইবে না—এই চিন্তাই অহর্নিশ তীক্ষ্ণ ছুরীকার ন্যায় তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে কত আশা করিয়া যে আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়াছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া আকাশেই মিলাইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে অনুপমার বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ রুহিদাস আপন চিত্তকে বশ করিতে পারিতেছিল না। রাত্রিকালে সে আপন পরিচিত শয়ন-কক্ষে যাইয়া একখানা পাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিল কিন্তু পাঠে তাহার মন লাগিল না। কক্ষের সঙ্গে কত স্মৃতি বিজড়িত! এই কক্ষে বসিয়া অনুপমা তাহার সঙ্গে কত গল্প করিত। এই কক্ষে শয়ন করিয়া সে ভবিষ্যতের কত সুখস্বপ্ন দেখিয়াছে—কল্পনার তুলিকায় কত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে—তাহার মধ্যে সবই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কক্ষে আর তাহার মন টিকিল না; সে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় কক্ষ ত্যাগ করিয়া লালদীঘির বাগানে গিয়া বসিল। এখানে আসিয়াও তাহার চিত্ত শান্ত হইতেছিল না। এই সভা-

কুঞ্জে বসিয়াই তাহাদের প্রণয়ের প্রথম অভিভাষণ! সেদিনকার ন্যায় আজও আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল, ফুলের সৌরভে বাগান মাতাইয়া তুলিতেছিল, মৃদুমন্দ বায়ু তাহার গাত্রে একবার ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যাইতেছিল; কিন্তু এসব তাহার কিছুই ভাল লাগিল না। তাহার হৃদয় বিষাদময় হইয়া গিয়াছিল, তাই সে সমস্ত জগৎটাকে বিষাদের ছবি বলিয়া বোধ করিতেছিল। তাহার মন যে কতদূর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার হৃদয়ের বুকভরা নিশ্বাসে আভাষ পাওয়া যাইতেছিল। অনুপমার সহিত প্রথম দর্শনাবধি আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা তাহার মনের মধ্যে একে একে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে সে আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিল; বাক্স হইতে সুন্দর সুন্দর পোষাকগুলি বাহির করিয়া বরবেশে সুসজ্জিত হইল এবং পূর্ব্ব সঞ্চিত খানিকটা আফিং খাইয়া শুইয়া রহিল।

বিবাহের গণ্ডগোলে সে রাত্রে কেহ তাহার সন্ধান রাখিল না; পরদিন সকালে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, কৃত্তিদাসের প্রাণশূন্য দেহ শয্যার উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। এমনি ভাবে একটী অস্ফুটন্ত কলি অকালে শুকাইল; জলবুদ্বুদের ন্যায় সে পৃথিবীতে আসিয়াছিল, বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণকাল পরে মিশাইয়া গেল।

অনুপমা সে বিবাহে সুখী হইয়াছিল কিনা জানিনা, তবে সে যদি কৃত্তিবাসের জন্য এক কোঁটাও অশ্রু ফেলিয়া থাকে, তবে তাহার আত্মা কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিবে এ কথা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি।

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিকুঞ্জ।

প্রাণোচ্ছ্বাস।

প্রাণ ধর্ম্ম, প্রাণ কর্ম্ম, প্রাণ যজ্ঞসার।
নিষ্কাম কর্ম্মের সেতু প্রাণ সাধনার॥
প্রাণ ব্রহ্মা, প্রাণ বিষ্ণু, প্রাণ মহেশ্বর।
নিষ্কাম নির্গুণ ব্রহ্ম, প্রাণ পরাৎপর॥
নাম রূপ দিয়ে হয় সংসার রচনা।
প্রাণ বিনা দেখ বিশ্ব ঘোর বিড়ম্বনা॥
মনোব্যাপ্ত দিক আর প্রাণব্যাপ্ত কাল।
প্রাণে মনে ঐক্য কর ঘুচিবে জঞ্জাল॥
প্রাণে সুর, প্রাণে তাল, প্রাণে মান লয়।
প্রণব সঙ্গীত উৎস প্রাণেতে উদয়॥
প্রাণের আদানে আর প্রাণের প্রদানে।
দেখা দেন জগন্মাতা আপন সন্তানে॥
আদান প্রদান বিনা ইষ্ট দরশন।
কভু নাহি জাগো তব হ'বে সংঘটন॥
প্রাণের যজ্ঞেতে প্রাণ আহুতি না দিলে।
সাধনার ফল মোক্ষ কদাপি না মিলে॥
নিত্য, সত্য, বুদ্ধ প্রাণ, প্রাণ মোর গুরু।
চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা বাঞ্ছাকল্পতরু॥
প্রাণ মোর ইষ্টমন্ত্র, সাধনার জপ।
প্রাণ উপাসনা মোর, প্রাণ মোর তপ॥
যেই গীতা কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তে করে পূজে।
সেই গীতা হন যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ॥

সেই প্রাণে ক্ষুদ্র মোর প্রাণ দিমু ঢেলে।
অবহেলে তরে যাব হরি হরি বলে॥

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্-এ।

কবির দান।

(১)

যেই তোকে করে অপমান
ফিরে পুনঃ যা'না তার কাছে,
সেই তোকে দেখাবে সম্মান।
মনুষ্যত্ব আছে কিনা আছে,
তোরি যেথা দেখাইতে হবে,
ফিরে গিয়ে কে কোথায় কার
লভিয়াছে প্রেম প্রতিদান?
চেয়ে দেখ-এবিপুল ভবে
স্থান তোর হবেই যে হবে—
ভুলে যারে প্রেম-অভিমান।

(২)

আজ হোক্ দুই দিন পরে
মানবের হইবে মিলন
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঘরে।
কেটে গিয়ে সংস্কার-বন্ধন
মানবত্ব পাইবে সন্ধান,
ভুলে গিয়ে সব ব্যবধান
নিবে তোকে আপনার করে,
এযে মহা বৈদ্যুতিক টান
মানবের প্রেমের সন্ধান,
দেশ-কাল বাধা ভেদ করে।

(৩)

মানবের এ মহা মিলন
নহে শুধু এ কবির কল্পনা,
দিবসের অলীক স্বপন।
মনে কভু করোনা ধারণা,
মনুষ্যত্বে রাখিবে চাপিয়া
যুগান্তের আবর্জ্জনা দিয়া
ব্যর্থ তোর হবে এ সাধন;
তুলা দিয়া অনলে চাপিয়া
রাখো যদি উঠিবে জ্বলিয়া,
সেত কভু না রবে গোপন।

(৪)

রাজ-নীতি, প্রজা-নীতি কিরে?
ধর মহা মানবের নীতি,
অপমানে যাস্ কেন ফিরে?
শোন্ মহা মিলনের গীতি,
দেনা এই সুরে মিশাইয়া—
ধ্বনিছে যা, এ বিশ্ব চুমিয়া
মানবের প্রান্ত সীমা ঘিরে—
তোর প্রেম-সুর যোগাইয়া,
অভিমান আপন ভুলিয়া
দাঁড়াস্ না আর তুই ফিরে।

(৫)

জ্ঞান-গর্ব্ব-মিথ্যা-আবর্জ্জনা
কতকাল রাখিবে চাপিয়া
মানবের অনন্ত সাধনা?
উঠিবেরে উঠিবে জাগিয়া
ছিন্ন করি জড়ের বাঁধন,
বিশ্ব আত্মা চিনিবে আপন
মিথ্যা তোর নয় এ সাধনা;
হবে মহা মানব মিলন,
প্রেম-সাথে প্রেম আলিঙ্গন—
তোরি মাঝে তারিই প্রচনা।

(৬)

ব্যাপি চারি যুগ, চারি কাল
উঠাইলি যে সাম্য সঙ্গীত,
ব্যর্থ যদি তাহা এতকাল ?
ভুলিবি কি বিশ্ব প্রেম-গীত
যুগান্তের সঞ্চিত সাধনা—
বিশ্ব-প্রেমে যারই বন্দনা
ধ্বনিতেছে ব্যাপি মহাকাল ?
পেয়ে যদি থাকগো বেদনা—
বিশ্ব যারে প্রেমের লাঞ্ছনা,
ভুলে যারে মানের জঞ্জাল।

(৭)

অস্ত্রে অস্ত্র বিনিময় করে
উঠিয়াছে মিলন-সঙ্গীত,
সামাসুর দুন্দুভির রবে ?
দ্বাপরে যে গীতার সঙ্গীত
"কুরুক্ষেত্রে" ধর্ম্মক্ষেত্রে তার
উঠাইল সাম্যের ঝঙ্কার
স্তব্ধ যদি সে মহা আহবে ?
"প্রভাসের" প্রেম তীর্থে তার
শোন প্রেম বাঁশরী ঝঙ্কার
বিশ্বপ্রেমে ধ্বনিছে গৌরবে !

(৮)

যেনা ওরে জাগাইয়া তবে
চির তোর সাধন-সঙ্গীত ?
মানবের শুনিতেই হবে,
কভু ওরে হবেনা বঞ্চিত
তোর প্রেম সঙ্গীত সাধন
সাধিবারে সে মহা মিলন,
ধ্বনিবেরে এ বিপুল ভবে
এক সুরে ঐক্যের বাদন,
কালের সে অনাদি বন্ধন—
বিশ্ব-আত্মা ভিন্ন নাহি রবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষাল বি-এ।

ত্রিবেণী।

যদি যাইবে অমৃত দেশেতে—
কর্ম্ম-প্রবাহে জীবন-তরণী
দাওগো ভাসায়ে ত্বরিতে !
কামনা সম্বল সাথে রাখিও না
কামনা থাকিলে তরণী চলে না;
মাতৃনাম গানে ভুলিও বাসনা
লাগিবে সমীর পালেতে !
পুলক পবনে ছুটিবে তরণী
প্রণব-নাদিত দেশেতে।

যদি যাইবে অমৃত ভবনে—
জ্ঞান-প্রবাহে জীবন-তরণী
চালায়ে দাওগো যতনে।
এই স্রোতে যাওয়া অতীব কঠিন
প্রতিকূল বায়ু বহে নিশিদিন,
ধৈরয থাকিলে মিলিবে সুদিন
অবিদ্যা কুহকে ম'জনা !
জ্ঞান-সুধা-পানে ডাকিও মায়েরে
প্রেমেতে বিলায়ে আপনা !

যদি যাইবে তোমার স্বদেশে
ভক্তি প্রবাহে জীবন-তরণী
সাজায়ে দাওগো হরষে !
সরল সুগম এই পূত ধারা—
ভুলেও এপথ হ'ও নাকো হারা,

করিও যতন জীবন-রতন—
ফুটিবে হৃদয়-সরসে !
মিছে আর কত কাটাইবে কাল
অনিত্য ভুবন প্রবাসে।
তথা কি আর বসিয়া ভাবিবে—
ত্রিবেণীর এক স্রোত অনুকূলে
স্বরগে যাইতে হইবে।
জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ত্রিবেণী প্রবাহ
বিভিন্ন বলিয়া-ভাবিওনা কেহ
মোক্ষ-সাগরের তীরে উপজিলে
একই তিনেরে হেরিবে !
নাম, রূপ, ছেড়ে জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী
একই অমৃতে মিশিবে !

শ্রীবঙ্কচন্দ্র নাথ কাব্যবিনোদ।

প্রণাম।

যাঁহার আদেশে, সুনীল আকাশে,
ফুটে রবি-শশী তারকাচয় ;—
যাঁহার আদেশে, প্রভাতে প্রদোষে,
কাননে কুসুম ফুটিয়া রয় !
যাঁহার মহিমা, যাঁহার গরিমা,
গাহিয়া গাহিয়া তটিনী ধায় ;—
যাঁহার মহিমা, সঙ্গীত-সুষমা,
বিহগ সকল পুলকে গায় !
যাঁহার কৃপায়, এসেছি ধরায়,
ব'সে আছি যাঁর স্নেহের ছায়' ;
প্রাণে প্রাণে শুধু, ঢালে যিনি মধু,
—সারা দিবস নিশায়—
আজি প্রণাম তাঁর দু'টী পায়।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

বিষাদে শান্তি প্রতিষ্ঠা।

স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া পরেশ যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সে প্রলয়ের নিশিতে পরেশের বিশাল অট্টালিকা প্রকাণ্ড একটা দৈত্যপুরীর মত দেখাইতেছিল। অন্ধকার ঘরগুলি যেন ক্ষুধিত হইয়া বিশ্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত। বাগানে গাছের পাতার মর্ম্মর শব্দে একটা আকুলতা, একটা হাহাকার ধ্বনিত হইতেছিল। শ্মশান-ঘাট হইতে ফিরিয়া পরেশ শয়ন-গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। খোলা জানলা দিয়া বাগানের বেল, যুঁইর সুমিষ্ট সৌরভে ঘর ভরিয়া গিয়াছিল। সে সৌরভ তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। পরেশ জানলা বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে শয্যায় শুইয়া পড়িল। একটু আগে সে শয্যায় শুইয়াছিল, তার অস্তিত্ব এখনও যেন সেখানে রহিয়াছে। সে শয্যাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া রহিল। সেই শয্যা, সেই তার জিনিষপত্র, সেই তার বইগুলি সবই পড়িয়া আছে, কেবল সে নাই।

বেদনায় পরেশের বুকের হাড়গুলি যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। একটা আকুল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিল। মরিবার আগে নিরুপমা তাকে কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বলিতে পারে নাই, কেবল ঠোঁট দুটী একটু কাঁপিয়াছিল মাত্র। আর

চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল। কি সে কথা! নিভৃত হৃদয়ের কোন বেদনার কথা! সে কথা চিরকালের জন্য অব্যক্তই রহিয়া গেল। সে সময় নিরুপমা পরেশের হাতের মধ্যে তার জীর্ণ হাতখানি রাখিয়াছিল। যেন সে দৃঢ়বন্ধন মৃত্যুকেও পরাস্ত করিবে! মৃত্যুকালে সে অনিমেষ নয়নে পরেশের দিকে চাহিয়াছিল। তাকে দেখিতে দেখিতেই নিরুপমা চিরতরে চোখ বন্ধ করিয়াছে। এতক্ষণ বেদনায়, যাতনায় পরেশের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু চোখে জল নাই। এখন সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, শিশুর মত কাঁদিয়া আকুল হইল। যে তার হৃদয় আলো করিয়াছিল, যে তার সর্ব্বস্ব, যার সুখের জন্য এত সব আয়োজন, সে আজ তাকে ফাঁকি দিয়া কোন্ অজানা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে!

আজ ছয় বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। সেই দিন হইতে—সেই শুভদৃষ্টির সময় হইতে কি যে অন্তরের মিলন হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম কেবল তারা দুজনেই বুঝিয়াছে। সে মিলনের নিবিড় সুখ কেবল তারা দুজনেই উপভোগ করিয়া আসিয়াছে। সংসারের কোন লোকের সহিত তাদের সহিত সম্পর্ক ছিল না। এ বিশ্বে যেন তারাই কেবল দুটী প্রাণী, দুজনে দুজনকে ভালবাসিবার জন্যই আসিয়াছে।

পরেশের অট্টালিকার চারি পার্শ্বে কত লোকের বাস। পরেশ একদিনের জন্যও তাদের কোন খোঁজ-খবর লয় নাই। তাহাদের সুখ-দুঃখে তার হৃদয় একমুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই। পরেশের পাড়া-প্রতিবাসীরাও তাকে ভয় করিত। কখনও পরেশ নিরুপমাকে লইয়া বাড়ীর নিকটে নদীর ধারে বেড়াইতে গেলে, পাড়ার কোন লোক সম্মুখে পড়িলে সন্ত্রস্ত হইয়া সরিয়া যাইত। নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে হৃদয়ের সব প্রেম নিরুপমাকে ঢালিয়া দিয়া সে যখন পরম পুলকে জীবন কাটাইয়া দিতেছিল, তেমনি বিধাতা তার সুখের ঘর ভাঙ্গিয়া দিলেন। যাহার জন্য তার জীবন, যাহার মধ্যে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সে যখন নিষ্ঠুরের মত তাকে ফেলিয়া পলাইল, তার কি দশা হইবে, একবার ভাবিয়াও দেখিল না, তখন পরেশ অসার অবোধ নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। বাড়ীতে দাস-দাসী লোকজনের অভাব নাই, সকলেই প্রভুর সেবার জন্য—প্রভুর চিত্তবিনোদনের জন্য অস্থির। কিন্তু পরেশের সে সকলে আর প্রয়োজন নাই। পৃথিবী যার কাছে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, চন্দ্র-সূর্য্যের আলো যার কাছে নিভিয়া গিয়াছে, তার আর দৈহিক সুখের প্রয়োজন কি?

পরেশ কোন দিন একবেলা আহার করিত, কোন দিন তাহাও করিত না। কেবল সেই শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকিত। সে ঘরে নিরুপমার জিনিষপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া ঝাড়িয়া দিন কাটাইয়া দিত। এইরূপে দিনের পর দিন গেল।

দিনের প্রখর আলোকে, কাজ-কর্ম্মের কোলাহলে, লোকজনের যাতায়াতে বিষণ্ণচিত্ত

যখন দিবাও স্পষ্ট হইয়া উঠিত, তখন সে অন্তরের বেদনা কোন রকমে চাপিয়া দিন কাটাইয়া দিত। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার যখন ধরণী ছাইয়া ফেলিত, বিশ্ব যখন নিতান্ত অস্পষ্ট হইয়া এক মায়া-জগৎ সৃজন করিত, তখন এক নিষ্ফলতাপের আবেগে অন্তর আকুল হইয়া উঠিত—অশান্ত হৃদয় হাহাকার করিয়া মরিত, চোখের জল আর বাধা মানিত না, ঝর ঝর করিয়া কেবলই ঝরিয়া পড়িত। এমন উদ্দেশ্যহীন—এমন লক্ষ্যবিহীন জীবন লইয়া সে কি করিবে, ভাবিয়া অস্থির হইয়া বেড়াইত।

হায়! আর কতকাল—কত দীর্ঘকাল এ দুর্বহ জীবনের ভার তাকে বহন করিতে হইবে; এ বোঝা বহিয়া তাকে আর কতকাল এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! যার মধুর সঙ্গ ব্যতীত সে নিজের জীবনের অস্তিত্ব পর্যান্ত কল্পনা করিতে পারিত না, তাকে হারাইয়া কতদিন সে বাঁচিবে! এমন বোঝা বা রাখিয়াই দরকার কি? এ জীবন পৃথিবীর কাহারো যদি কাজে না লাগিল তবে তাহা রাখিয়া ফল কি? জীবনকে যদি কেহ প্রেমদান না করিল,—এ জীবন যদি কাহারো নিকট মধুবর্ষণ না করিল, তবে তাহা শেষ করিয়া দেওয়াই উচিত। রাত্রে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে পরেশ শয়নগৃহের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে গিয়া দাঁড়াইতেই মনে পড়িয়া গেল, এইখানে সে কতদিন নিরুপমার সহিত বেড়াইয়াছে। নদীর বাঁধানো ঘাটে বসিয়া কত চাঁদনী রাত শুধু দুজনে দুজনকে দেখিয়া কাটাইয়া দিয়াছে, একটিও কথা হইত না।

পরেশের চোখে জল নাই। শুষ্ক চোখ দিয়া যেন রক্ত ফাটিয়া বাহির হইবে মনে হইল। "এ যাতনা আর বহিতে পারি না," বলিয়া পরেশ নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে গেল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে কাতর স্বরে বলিল, "বাবু, সারাদিন না খাইয়া রহিয়াছি, আর পারি না, একটা পয়সা দিয়া আমাকে বাঁচান।"

পরেশ ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া দেখিল, একটি নগ্নকায় জীর্ণদেহ বালক। সজল নয়নে তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে কি সকাতর চাহনি!

পরেশ থমকাইয়া দাঁড়াইল, একি বিপর্যয় ব্যাপার! অতুল ঐশ্বর্য্য পায় ঠেলিয়া, এমন ভোগ সুখের জীবন তুচ্ছ করিয়া সে যাহাকে শান্তির আলয় বলিয়া সাদরে বরণ করিতে যাইতেছিল, আর একজন সেই সম্পদেরই এক কণা আকাঙ্ক্ষা করিয়া তারই সাধের মৃত্যু হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য আকুলস্বরে তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। এ কি অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস। মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরিবার জন্য সে কি সকরুণ আহ্বান?

পরেশের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে আহ্বান উপেক্ষা করিবার শক্তি তাহার রহিল না। পরেশ বালকের হাত ধরিল। বালক ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"বাড়ীতে আমার মা আজ ক'দিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, আমি ভিক্ষা করিয়া তাঁহার পথ্যের যোগাড় করি, আজ ভিক্ষা মিলে নাই, মা আজ উপবাসী।"

স্থির দৃষ্টিতে বালককে দেখিতে দেখিতে পরেশ কাম্পিতকণ্ঠে বলিল—"চল, তোমার মাকে দেখিয়া আসি। বালকের সঙ্গে পরেশ তার জীর্ণ কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। বালকের মাতার অবস্থা দেখিয়া পরেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। বালক দৌড়িয়া গিয়া জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"মা, আজ ভিক্ষা মিলে নাই, কিন্তু এক দয়ালু বাবুর দেখা পাইয়াছি, এইবার আমাদের সব দুঃখ ঘুচিবে।" জননীর দুই গণ্ড বহিয়া জলধারা বহিল। শীর্ণ হাতখানা তুলিয়া পরেশের নত মস্তকের উপর রাখিতেই নীচে পড়িয়া গেল। তিনি চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র দে।
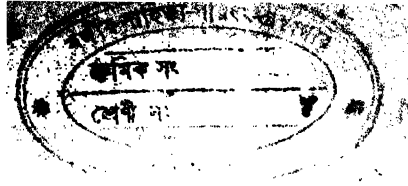
আলোচনা, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬ সাল।

প্রেম-সাধনা।
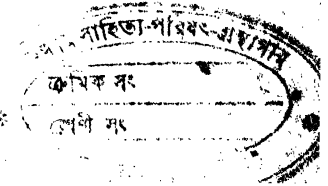
প্রেম! এই প্রেম জিনিষটী কি? ইহার অর্থই বা কি? ইহার অর্থ আর কিছুই নহে—সোজা কথায়, সহজ সরল ভাষায় বলিতে গেলে আমরা বলিব—প্রেমের অর্থ-ভালবাসা। আমরা সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে দেখিতে পাই—এই প্রেম জিনিষটী দুই প্রকারের। একটী কামজ ও আর একটী নিষ্কাম প্রেম। প্রথমটী কেবলমাত্র নামেই প্রেম, কার্য্যতঃ একটা কলুষিত লিপ্সা মাত্র, আর দ্বিতীয়টী প্রকৃত বিশুদ্ধ, পবিত্র, স্বর্গীয় সুধা। এই প্রবন্ধটীতে এই নিষ্কাম প্রেম সম্বন্ধেই দুই একটী কথা আমরা বলিব। কি সংসারের দৈনন্দিন কর্ম্মে, কি জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি সাধনার ক্ষেত্রে, যে দিকেই আমরা একটু চোখ মেলিয়া দেখি সেই দিকেই আমরা প্রেমেরই জয় দেখিতে পাই। সংসারে পিতা-মাতায় প্রেম, পিতা-পুত্রে প্রেম, মাতা-পুত্রে প্রেম, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভক্ত এবং ভগবানে প্রেম।

সাধনার উচ্চতমস্তর—যাহা আমরা দেখিতে পাই তাহা এই প্রেম। সাধকের এই স্তরের পরই মুক্তি। যখনই ভক্ত এবং ভগবানে প্রেমের উদ্ভব হইল, তাঁহার অব্যবহিত পরেই ভগবান তাঁহার ভক্তের নরদেহের মুক্তি বিধান করেন। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, কৃষ্ণতেই তিনি আপনার সত্তা বিলাইয়া দিয়াছিলেন। রাসলীলায় গোপী-গণেরও সেইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিজের দেহ, মন, প্রাণ যাহা কিছু সকলি তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল। আপনার বলিতে তাহাদের কিছুই ছিল না; এক কথায়, তাহারা কৃষ্ণতেই বিলীন হইয়া গিয়াছিল। প্রেম না হইলে হরি মিলে না, আপনা ভুলিয়া আপনাকে বিলাইয়া দিতে হইবে! বিনা প্রেমে নন্দলালকে আপনার করিয়া কেহ আজ পর্য্যন্ত লইতে পারেও নাই, পারিবেও না—

মীরাবাই স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন—

"দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।"

স্বর্গীয় প্রেমে আর একটী মহৎ তাৎপর্য্য আছে।—

তাহাতে একটি অতি মহতী আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়; আর সে বড় মধুর, বড় নির্ম্মল। প্রিয়জনকে দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়, আরও দেখিতে চায়—আকাঙ্ক্ষার বিরতি নাই, শেষ নাই, অন্ত নাই। যেমন—

"জনম অবধি হাম ওরূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল"

এই চারিটী পদ হইতেই প্রেমের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ প্রেমের শেষ বড়ই মধুর, বড়ই মহিমাময়। এই পবিত্র প্রেমের শেষ একটা অনির্ব্বচনীয় শান্তির উৎস। কবি সেক্সপিয়ার বলিয়া গিয়াছেন—তোমার প্রাণের অনাবিল শান্তিই তোমাকে বুঝাইয়া দিবে তোমার প্রাণ প্রেমে ভরিয়া উঠিয়াছে—তিনি বলিয়াছেন—

Your crown is on your heart
not decked with diamonds
and Indian's stones,
not to be seen, your crown is called
content"

কেন আসিবে না, পবিত্র প্রেম হইতে এ শান্তিটুকু আসিবার পরিষ্কার কারণ রহিয়া গিয়াছে—কারণ ইহা প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না; আপনাকে বিলাইয়াই তাহার তৃপ্তি, আপনাকে বিলাইয়াই তাহার শান্তি, এবং এই জন্য তাহার প্রাণে অনাবিল শান্তির নির্ঝরিণী।

প্রেমের ক্ষমতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রেমেই বিশ্বকে পাগল করিয়াছিলেন। তাঁহার অগাধ প্রেমের প্রভাবেই বিশ্বজগৎ একদিন তাঁহার চরণ-প্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। জগাই, মাধাইকে তিনি যুদ্ধ করিয়া বশীভূত করেন নাই—প্রেমে তিনি তাহাদের পাপ-কলুষিত হৃদয় মুহূর্ত্তে জয় করিয়াছিলেন। মানুষ প্রেমেই দেবতা, প্রেমপূর্ণ প্রাণ যাঁহার তিনিই প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য, মনের সম্পদেই মানুষ মানুষ। বিশ্বপ্রেমিক তাঁহাকেই বলিব, যিনি প্রেমে বিশ্ব আপনার করিয়া লইয়াছেন। যিনি প্রেমিক তিনি কেবল ভালবাসিয়া যান, তিনি শুদ্ধ প্রেমের রাজ্যে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়া চলিয়া যান, প্রতিদানের পানে তিনি ফিরিয়া চাহেন না। চাহিবার প্রয়োজনও বোধ করেন না—কারণ নিষ্কাম ভালবাসার, নিষ্কাম প্রেমের প্রতিদান স্বর্গ হইতে দৈববাণীর মত আপনা হইতেই একদিন নামিয়া আইসে।

কবি Stumer বলিয়াছেন—

"Love on! Love on! the time
will come
When he in return will give"

তাই বলিতেছিলাম—মানুষকে ভালবাসিতে হইবে, দেশকে ভালবাসিতে হইবে, সমগ্র বিশ্বকে ভালবাসিতে হইবে। পরের দুঃখে কাঁদিতে হইবে, পরের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিতে হইবে, আর্ত্তের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে—আর প্রেমের মহাসন হইয়া বসিতে হইবে। তবেই প্রেম সার্থক—তবেই প্রাণ সার্থক—তবেই জীবন সার্থক

তুমি বিশ্বের, বিশ্ব তোমার—তারপর প্রদীপ নিবিয়া গেলে মহাতীর্থের মহাশান্তি।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ নিয়োগী।

সংসারের খেলা।

(গল্প)

ফেল্, ফেল্, ফেল্। ফেল্ হওয়াটা যেন গা-সেসা হইয়া গেল। লোকে যেমন ঘরভাড়া বা জমিজমার মাসিক বা বার্ষিক খাজনা দেয়, আমিও ঠিক সেইরূপ ভাবে কলেজের মাসিক মাহিনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ফি আদায় দিতে লাগিলাম; তাহাতে বাবারও যেমন বিরক্তি ছিল না, আমারও মনে বড় একটা কিছু দাগ বসিত না। এই রকম করিয়া যখন এফ এ পরীক্ষারূপ "সিকে ছিঁড়িলাম", তখন আমার বয়স ঠিক ২৩ বৎসর ৫ মাস। বিয়ের বাজারে আমার একটা বেশ নাম বাহির হইয়া গেল, চারিদিক হইতে কণের বাপেরা আমাদের বাড়ীতে যেন রাস্তা ফেলিয়া দিল। স্ত্রীলোকের আদর্শরূপ কি প্রকার হওয়া উচিত, তাহার একটা ছবি আমি মনের মধ্যে বেশ আঁকিয়া লইয়াছিলাম, এ বিষয়ে আমার সহায় ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, দামোদর গ্রন্থাবলী আর বটতলার অনেক কুঁচো নভেল। সুতরাং আমার মত লোকের প্রণয়নী যে কিরূপ হইবে, তাহা লইয়া আমার মনের ভিতর কোন বাকবিতণ্ডা না থাকিলেও, ঐ কল্পিত আদর্শ বাস্তবের সহিত মিলিবে কি না, তাহা লইয়া এক নির্ব্বাক আন্দোলন আমার মনকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু উপায় নাই! মাথার উপর বাবা রহিয়াছেন; মনের কথা ত' খুলিয়া বলিতে পারি না। তবে সান্ত্বনা ছিল এই যে, মা টুকটুকে বৌ না হইলে ত' বিয়ে দিবেন না।

বিয়ে ত' হইয়া গেল। বাসর ঘরে বৌ দেখিলাম, আরে ছি, ছি, ছি! এই আমার বৌ! লোকে বলিল, কণে মন্দ নয়, বেশ মাজা মাজা রং, বয়স কালে দেখিতে বেশ ভাল হইবে। আরে ছি, ছি, ছি! তাতে কি আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি? আমি চাই চম্পকবরণা, নিলোৎপলসদৃশ চক্ষু, আমি চাই সেই রূপ, যে রূপে বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ মজিয়াছিল, আমি চাই সেই রূপ যে রূপে রোহিণী সুন্দরী গোবিন্দলালকে মজাইয়াছিল; আমার আদর্শ যে এই বাস্তবের সঙ্গে কিছুতেই মেলে না। এত গেল রূপের কথা, আবার প্রণয়-সম্ভাষণও হইল মন্দ নয়, বাসর-ঘরে শ্যালিকারা জিজ্ঞাসা করিল 'কবে কলিকাতায় যাবে'—আমি বলিলাম, 'শীঘ্রই যাইতে হইবে।' কণে ঘোমটার আড়ালে বলিল "ফেলের পড়া ত' এত ব্যস্ত কেন?"

মাথা ঘুরিয়া গেল, যাহা খুঁজিয়াছিলাম, তাহা না পাওয়াতে মাথা ঘুরিয়া গেল। ওসব চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া এবার ভাল করিয়া পড়াশুনায় মন দিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম, নাটক নভেল আর ছুঁইব না, ওগুলো সব বাবিস, গ্রন্থকর্ত্তার কল্পনামাত্র। বন্ধু মহলে সকলে আমার পড়াশুনার আগ্রহ দেখিয়া স্তম্ভিত

হইয়া গেল, বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল "ওরে দেবেনটা, এবার বৌয়ের কাছ থেকে কি মন্তর নিয়ে এসেছে রে, বড় পড়ার আঁটা"। ঠাট্টাই করুক আর যাই করুক আমি কিন্তু ঠিক আগ্রহের সহিত পড়াশুনা চালাইতে লাগিলাম। যথাসময়ে বি-এ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত একবারেই উত্তীর্ণ হইয়া পড়িলাম। আত্মীয়বর্গ সকলেই আমার এই অপ্রত্যাশিত সফলতায় বিশেষ আনন্দিত হইলেন, কিন্তু এই আনন্দের সহিত তাঁহারা যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন তাহা আমার ভাল লাগিল না। খাটিয়া খুটিয়া পাস করিলাম আমি, আর লোকে বলিল কিনা "দেবেন, এবার বৌয়ের পয়ে একবারে বেশ ভাল পাস করিয়া ফেলিল।" হা ভাগ্য!

বি-এ ত, পাস করিলাম, কিন্তু এবার কোন দিকে যাই, তাহা লইয়া অনেক দিন ধরিয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল। ডাক্তারী,—ভাল নয়, নোংরা কাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং—মন্দ নয়, কিন্তু বয়স নাই। অবশেষে অগতির গতি ল পড়াই স্থির করিলাম; কলিকাতার এক আইন কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ল দেখিতে লাগিলাম; কোন রকমে আবশ্যকীয় হাজিরা শেষ করিয়া আইন কলেজের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। এবার পড়িয়া পরীক্ষা দিতে পারিলেই হইল।

শুধু ঘরে বসিয়া থাকিয়া কি করিব? ল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত কোন কাজ করিলে মন্দ হয় না। বর্দ্ধমানের ৩৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী গ্রামের হাইস্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, বি-এ পাসের পর শ্বশুর মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অনেক বার তাহার বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে—(পাঠক, হাসিতেছেন? তাহাকে নয়, তাহার কন্যাকে? আচ্ছা তাই) কৃতার্থ করিতে হইয়াছিল। সে রূপ টুপের গোলমালের ভিতর আর আমি ছিলাম না; সে সব আর মনে স্থানই পাইত না। স্কুলের চাকরী লওয়ার সংবাদ যখন মায়ের নিকট বলিয়াছিলাম, তখন তিনি দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন "তা বাবা মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে এস" তখন ত জোর করিয়া বলিতে পারি নাই "হ্যা মা, আসব বৈ কি!" কিন্তু যখন স্ত্রীর নিকট এই সংবাদ দিয়া বিদায় চাহিয়াছিলাম, তখন স্ত্রীর সেই ভাসা ভাসা চোখে অশ্রুবিন্দু দেখিয়া আমি কেন আপনা হইতেই বলিয়াছিলাম, "বিন্দু, কেঁদ না, শনিবার শনিবার তোমাদের এখানে আসব।" তাহা তোমরা বলিয়া দিতে পার? সংসার এই-রকমই নাকি!

ল পড়া চলিতেছে, আর মাষ্টারিও চলিতেছে, আর প্রত্যেক শনিবারে বাড়ী—থুড়ি,—শ্বশুরবাড়ী যাওয়াও আছে কিন্তু এক দিনের ঘটনা এখনও মনে বেশ স্পষ্টরূপে বিরাজ করিতেছে। বর্দ্ধমানে আসিয়া মধ্যমশ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীটী সম্পূর্ণ খালী ছিল, আমি উঠিবার কিছু পরেই আর দুইজন ভদ্রলোক উঠিলেন, একজনের বয়স ৭০ বৎসরের কম কিছুতেই নয়, মাথাটী সমস্ত শুভ্রবর্ণ পককেশে আবৃত, যেন কাশফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, পরণে থান ধুতি, গায়ে একটী

নয় কোর্ট নয় সার্ট পাংশুবর্ণের অদ্ভুত জামা, ও পাকান চাদর, পায়ে ক্যানভাসের সাদা জুতা, হস্তে একটী ক্যানভাসের ব্যাগ ও ছাতি। সঙ্গের লোকটীর বয়স ১৮।১৯ বৎসর হইবে, পরণে ধুতি, সার্ট, চাদর ও জুতা; বেশের বিশেষ কোন পারিপাট্য নাই। বৃদ্ধটী গাড়ীর জানালার ধারে বসিল, আর তাহার সঙ্গী ঠিক তাহার সম্মুখের বেঞ্চে জানালার ধারে বসিল। বৃদ্ধ ক্যানভাসের ব্যাগ খুলিয়া তাহা হইতে কলিকা, তামাক, টিকে বাহির করিয়া যুবককে দিল, যুবক তাহার পকেট হইতে দেয়াশালাই বাহির করিয়া টিকে ধরাইতে লাগিল। বৃদ্ধ হুকাটী ডান হস্তে ধরিয়া বাম হাত দিয়া স্কন্ধের চাদরখানি যেন যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া একটা ছোট রকমের কাশি কাশিয়া যুবককে বলিতে লাগিল,—"দেখ হরেন, তুমি যেরূপ এজাহার দিয়াছ, তাহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। যেমন শিখাইয়াছিলাম, ঠিক সেই রকমই বলা হইয়াছে; মকদ্দমা ত' এখন হাতের মুটোর ভিতর।"

যুবক। "কিন্তু দাদামশাই, লোকটার যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে, ভিটে মাটী—"

বৃদ্ধ বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিল, —"অত ধর্ম্ম-টর্ম্মর দিক দেখলে চলবে না হে—চলবে না; যাকে জব্দ করতে হবে, তাকে এইরকম করেই জব্দ করা চাই। মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছ বলে ভয় পাচ্ছ, কিছু ভয় নেই, তোমাদের বয়সে অমন ঢের সাক্ষী দেওয়া আমার হয়েছে। ওতে ভয় করলে চলবে না। আমি ভবনাথ মুখুজ্যে, যা'র ভয়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, আমি ওর জায়গা একটু চাপিয়ে নিয়েছিলুম বলে কিনা, বেড়া উপড়ে নিতে হ'বে। এখন কেমন চালটা চেলেছি বল দিকিন। শরৎকে দিয়ে মকদ্দমা করে দিয়ে কেমন মজা হয়েছে। হাকিমের বেশ বিশ্বাস হয়েছে যে, আমাদের মকদ্দমাটা সব সত্য। দেখ হরেন, মকদ্দমা-মামলা যা' কিছু বল, ওসব কেবল তদবির ও যোগাড়। হলো, ধরেছে—" বলিয়া হরেনের হাত হইতে বৃদ্ধ কলিকাটী লইয়া হুকার উপর রাখিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল। আমি বৃদ্ধের হাব-ভাব দেখিয়া এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, বৃদ্ধ একটী মস্ত মামলাবাজ লোক, লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলে ছাড়েন না, মিথ্যা সাক্ষীর যোগাড়ও করিয়া থাকেন। তার পর বৃদ্ধ তামাক টানিতে টানিতে বলিতে লাগিল,—"দেখ হরেন, দু' পয়সা হচ্ছে মন্দ নয়; শরৎকে বেশ ভালমানুষ পাওয়া গেছে কিনা; মেয়েয় মেয়েয় ঝগড়া হ'ল, শরতের স্ত্রী বল্লে, মুখুজ্যে মশাইকে ধর, ওদের সকলকে জব্দ করে দিক। আমিও ত এই রকম চাই, এমন মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়েছি যে সহজে ছাড়বার নয়, দুই পক্ষই নষ্ট করে তবে ছাড়। হা—হা—হা—" করিয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিল, হরেনও বৃদ্ধের সহিত হাসিতে লাগিল।

আমি উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, এরা না করিতে পারে কি? মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া,

মিথ্যা সাক্ষী দিয়া লোকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা ইহারা এইরূপভাবে নষ্ট করাইয়া দেয়, ইহারাই দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া পল্লীগ্রাম অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে। ভাবিলাম, ওকালতী করিয়া কি করিব? এইরূপ প্রকৃতির লোকের সহায়তা করিতে হইবে, এই প্রকারে লোকের সর্ব্বনাশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। ইহাপেক্ষা আমার মাষ্টারি করা যে শতগুণে ভাল। হিন্দু আইনের একখানা বই পড়িতেছিলাম, তাহা মুড়িয়া ফেলিয়া এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, আইন পরীক্ষা আর দেওয়া হইবে না।

বৃদ্ধ ও যুবকের কথা আর ফুরায় না। অনবরত মকদ্দমা আর মকদ্দমা। আমি উন্মুক্ত বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া মাঠের শোভা দেখিতে লাগিলাম।

অস্তাচলচূড়াবলম্বী মার্ত্তণ্ডদেব স্নিগ্ধ রশ্মিজালে গগনমণ্ডল ছাইয়া ফেলিয়াছে, আকাশের কোলে কোথাও একখণ্ড মেঘ নাই, বিহগদল নীল আকাশের গায়ে যেন মালা গাঁথিয়া উড়িয়া যাইতেছে, দূরে কৃষকবালক গরুর পাল লইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, পৃথিবী শান্ত, প্রকৃতি নীরব, কেবল আমাদের বাষ্পীয় শকট বিকট শব্দ করিতে করিতে গন্তব্য স্থানের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে; আর আমার মনও অনেক দূরেই সেই নিভৃত বাটীর সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত স্নেহের দিকে ধাবমান হইয়াছে।

গাড়ী আসিয়া ব্যাণ্ডেল জংসনে থামিল, আগন্তুক দুইজন এইখানে নামিয়া পড়িলেন। কয়েকক্ষণ পরে একজন বর্ষীয়সী বিধবা স্ত্রীলোক আমার সেই গাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম "এটা পুরুষদের গাড়ী, আপনি স্ত্রীলোকদের গাড়ীতে যান"।

স্ত্রীলোকটী বলিল "পুরুষ আবার কে? বাঙ্গালাদেশে পুরুষ আছে না কি? মেয়েরাই ত পুরুষদের মন্ত্রদাতা গুরু।" স্ত্রীলোকটীর মুখের ভাব ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এ রমণী কে? অপরিচিত পুরুষের সহিত এরূপভাবের কথা কহিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিল না? নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন রহস্য লুক্কায়িত আছে। আমি যেন অশান্তিবোধ করিতে লাগিলাম; মনে হইল, গার্ডকে ডাকিয়া ইহাকে নামাইয়া দিই। এমন সময় গাড়ী ব্যাণ্ডেল জংসন হইতে ছাড়িয়া দিল।

স্ত্রীলোকটী আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের কি কাজ করা হয়? আমাদের নীলুকে দেখেছেন কি?"

এরূপ অসম্বদ্ধ প্রশ্ন কোন স্থিরমস্তিষ্ক লোকের নিকট আশা করা যায় না। স্ত্রীলোকটী পাগল বলিয়া আমার ধারণা হইল। এক মামলাবাজ লোকের হাত এড়াইয়া আবার এক পাগলীর হাতে পড়িলাম বলিয়া মনে বিরক্ত হইতে লাগিল।

যাহা হউক, স্ত্রীলোকের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম, "আমি স্কুলে মাষ্টারি করি।"

স্ত্রীলোক। ওঃ, আপনি মাষ্টারি করেন, তা হ'লে ত' অনেক ছেলের খবর রাখেন, আর নীলুর খবরটা বল্‌তে পারেন না?

আমি। কে নীলু?

স্ত্রীলোক। কেন নীলু দে?

আমি। নীলু দে—কৈ নীলু দে বলে কোন ছোকরা ত' আমাদের স্কুলে নাই?

স্ত্রীলোক। স্কুলে নাই বা রইল, কখনও চোখে পড়েনি?

আমি। না; তবে যদি বিশেষ পরিচয় আমায় বলেন, তা হ'লে চেষ্টা করতে পারি।" বুঝিলাম স্ত্রীলোক উন্মাদিনী, এবং নীলুই তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ। ভিতরের রহস্য জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছিল, তাই পরিচয় দিবার জন্য স্ত্রীলোকটীকে বলিলাম।

স্ত্রীলোক বলিল,—"করবেন, চেষ্টা করবেন? আচ্ছা তবে বলি, মন দিয়া শুনুন। আর কাকেও বলবেন না, কেহ হয়ত বিশ্বাস নাও করতে পারে, কিন্তু আমি যা' বলব, তা' একবর্ণও মিথ্যা নয়। স্বামী আমার সওদাগরী আফিসে কাজ করতেন, বেশ ত' পয়সা রোজগার করতেন। কলিকাতায় একটী বাসা ভাড়া করিয়া আমরা থাকিতাম, সংসারে স্বামী ও একটী পঞ্চম বৎসরের পুত্র-সন্তান ভিন্ন আর কেহ ছিল না। আমায় কোন কাজ করিতে হইত না; ঝি চাকর রাঁধুনী সবই বন্দোবস্ত ছিল। তবু কি জানি কেন, আমার মন কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিত না। সর্ব্বদাই যেন চটিয়া থাকিতাম, আমার মুখের দৌড়ে সকলেই আমার প্রতি বিরক্ত ছিল। ঝি চাকর রাঁধুনী কখনও বেশী দিন টিকিত না। এখন বুঝিতেছি, স্বামী তাহাতে বিরক্ত হইতেন, কিন্তু আমার নিকট মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না; আমি এতই মুখরা ছিলাম।

"স্বামীর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনি সামান্য বেতনে এক চাকরী করিতেন। তাঁহারই ছেলের নাম নীলু। ভীষণ যক্ষ্মাকাশ রোগে ভাশুরের যখন মৃত্যু হইল, তখন নীলুর আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। নীলু তখন তের বৎসরের। স্বামী নীলুকে আমাদের বাসায় আনিয়া রাখিলেন। আমি কিন্তু হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলাম; কোথাকার এক পাজী পাড়াগেঁয়ে ছেলেকে আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিল বলিয়া আমার যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল; নীলু আমার চক্ষুশূল হইয়া পড়িল। খাইতে দিতে হয়, তাই খাইতে দিই, স্বামী আনিয়াছেন বলিয়া বাড়ীতে থাকিতে দিই, তাহা না হইলে আমার আন্তরিক ইচ্ছা নয় যে উহাকে বাড়ীতে রাখি। এইরূপে নীলু সম্পূর্ণ অযত্নে মানুষ হইতে লাগিল।

"এক দিন বেলা ৪টার সময়, আমার আদরের শিশু অজিত অতিশয় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, আমি তখন বৈকালিক নিদ্রা উপভোগ করিতেছিলাম; ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি যে, নীলু তাহাকে কোলে করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেছে, আর অজিতের কপালে কিসের আঘাত লাগিয়া

কাটিয়া গিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। দেখিয়া আমি রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেলাম; ভাবিলাম, এ নীলুরই কর্ম্ম; সে যে দুষ্ট ছেলে, সে ভিন্ন এ কার্য্য আর কে করিবে? সম্মুখে একটী ঝাঁটা পড়িয়াছিল, তাহা লইয়াই সপাসপ করিয়া নীলুর পিঠে বসাইয়া দিলাম। নীলু বলিল, "অজিত আপনি ইটের উপর পড়িয়া গিয়াছিল, আমি কোন দোষের দোষী নই, কাকি মা।" আর কোন কথাই বলিল না, চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। আহা; সে মুখ এখনও যেন আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। তারপর,—তারপর সে ফোঁপা-ইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামী আফিস হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেই তাহার নিকট নীলুর বিরুদ্ধে বেশ করিয়া বলিলাম। বলিলাম, দেখ, এই তোমার আদরের নীলু, আমার বাছার কপালে কি করিয়াছে; দেখ, ঢেলা মারিয়া কপাল ছেঁদা করিয়া দিয়াছে, নীলুকে এক্ষুণি বাড়ী হইতে তাড়াও, তা' না হলে আমি তোমার বাছাকে লইয়া এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাই, তুমি নীলুকে নিয়ে থাক। ঔষধ ঠিকই ধরিল। স্বামী তখনও আফিসের পোষাক ছাড়েন নাই, পা হইতে জুতা খুলিয়া নীলুকে বেদম মারিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। বাছা সকরুণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকা-ইয়া বলিতে লাগিল "আমি কোন দোষের দোষী নই, কাকা বাবু।" কাকা বাবু তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়াছিলেন, হাঁকিয়া রাগান্বিত স্বরে বলিলেন, "যা দূর হয়ে যা,' তোর কোন কথাই শুনিতে চাই না।"—আহা! বাছা সেই এক কাপড়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল, আর একবার মুখ ফিরাইয়া আমাদের দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; বাছার সে মুখ দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়, কিন্তু আমার কোন কষ্ট হইল না। ওহো হোঃ বাছারে—বলিয়া স্ত্রীলোকটী যেন অজ্ঞান হইয়া বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িল; আমি ত' থ হইয়া গেলাম। হস্তস্থিত আইন বইখানি লইয়াই তাহার মুখের নিকট বাতাস করিতে লাগিলাম। মনে মনে ভয় হইতে লাগিল, গাড়ীতে আর কেহ নাই, শেষে খুনের দায়ে পড়িব না কি? বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে স্ত্রীলোক-টীর চৈতন্যোদয় হইল। আমি তাহাকে আর কোন কথা বলিতে নিষেধ করিলাম, কিন্তু সে শুনিল না।

সে বলিল "আসল কথাটাই এখনও বলা হয় নাই, আপনি আমাকে নিষেধ করবেন না, এত কথা অনেক দিন আর কাহারও কাছে বলিবার সুবিধা পাই নাই। লোকে আমাকে পাগল বলিয়া তাড়াইয়া দেয়। আপনি দয়া করিয়া আমার সমস্ত কথা শুনিতে ছেন, তা'তে আমার হৃদয়ের ভার যেন অনেকটা লাঘব হইতেছে, আর পারেন ত, নীলুকে সন্ধান করিয়া আমায় সংবাদ দিবেন।

"নীলু ত বাড়ী ছাড়া হইল, কোন খোঁজ খবর নাই, আত্মীয় কেহও খোঁজ খবর লইবার চেষ্টাও করে নাই। আমার মনে তখন

তাহার জন্য একটুকুও কষ্টবোধ হয় নাই, একটা আপদ বাড়ী হইতে দুর হইয়াছে বলিয়া তখন আমার মনে হইতে লাগিল। স্বামীর আমার বাগানের বড় ঝোঁক ছিল, বাড়ীর সংলগ্ন একটী জায়গায় তিনি নানারকম ফুলের গাছ রোপণ করিয়াছিলেন, প্রতি রবিবার তিনি সেই বাগানে নিজ হস্তে মাটী খুঁড়িতেন, গাছের কেয়ারি করিতেন, ফুলের তোড়া বাঁধিতেন—এইরূপে অনেকক্ষণ বাগানে কাটাইতেন, অজিতকুমারও তাঁহার সঙ্গে ঐখানে থাকিত। নীলুকে যেদিন বাড়ী হইতে তাড়ান হয়, তাহার ঠিক পরের রবিবারে তিনি যেমন বাগানে যান, সেইরূপ গিয়াছেন, সঙ্গে অজিতকুমারও গিয়াছে। আকাশে বেশ মেঘ ছিল, ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হইতেছে, আবার থামিয়া যাইতেছে। স্বামী একটী ছাতা লইয়া গিয়াছিলেন। আকাশ আবার ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, আমি উপরের ঘর হইতে বেশ দেখিতে পাইলাম, স্বামী এবং অজিতকুমার এক ছাতার ভিতর বসিয়া একটী নারিকেল বৃক্ষের নিকট কি করিতেছেন। হঠাৎ কড়্ কড়্ শব্দে অশনি গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আমি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম, কাণে তালা লাগিল, চারিদিকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইয়া গেল। তারপর —তারপর, যাহা চক্ষে দেখিলাম, তাহা আর কি করিয়া বলিব! অজিতকুমার ও স্বামী সেই বৃক্ষতলে”—বলিতে বলিতে চোখ জলে ভরিয়া আসিল। আমি তখনই বুঝিতে পারিলাম যে, কি সর্ব্বনাশ তাহার ঐ সময় হইয়া গিয়াছে। কথা ফিরাইবার জন্য তাহাকে বলিলাম, “গাড়ী ত' বালী ছাড়াইয়াছে, আপনি কোথায় নামিবেন?”

স্ত্রীলোক বলিল, “হাওড়ায়। শুনুন না, আমার কথা; নারীজন্মের যাহা সার, আমার হৃদয়ের যে অমূল্য মণি সেই পতিপুত্র হারা হইয়া আমি শোকে অধীর হইয়া পড়িলাম। কি পাপে বিধাতা আমাকে একেবারে অনাথা করিলেন, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রার মত হইল, সেই তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক ব্রাহ্মণ নীলুকে কোলে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছে, নীলুর সেই ছল ছল চোখ, সেই চাহনী আর সেই কথা—“আমি কোন দোষের দোষী নয়, কাকী মা” আর চেহারাও ঠিক সেইরূপ, গোলাপফুলের মত টুকটুকে রং, রোগা রোগা দেহ, বাঁশীর মতন নাক, লাল ঠোঁট, বসা বসা চোখ—চোখের নীচে আঁচিল,—সেই সব—সেই আমার নীলু, এখনও যেন স্পষ্ট মনে পড়ছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মাথা যেন ঝনাৎ করিয়া উঠিল। আহা, নীলুকে তাড়াইয়া কি আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল? বাড়ীতে আর থাকিতে পারিলাম না, সেই ভোরেই নীলুকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমিও বাটীর বাহির হইলাম। সে আজ চার বৎসরের কথা, কত বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, গ্রামে নগরে রেলে, জাহাজে কত জায়গায় যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি তাহা আর বলবার নয়। দেখুন, আমার নীলুকে যদি ফিরাইতে

পারি, তাহার সন্ধান যদি কোন দিন পাই, তাহা হইলে আমার স্বামী ও অজিতকুমারকে ভগবান আমায় ফেরত দিবেন। তিনিই এ শাস্তি যখন দিয়াছেন, তখন ক্ষমা করিবার শক্তিও তাঁহার নিশ্চয়ই আছে।"

গাড়ী হু হু করিয়া চলিয়াছে, সহসা বাতাস সোঁ সোঁ শব্দে ভীষণ বেগে বহিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটী যেন চমকিত হইয়া উঠিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বাতায়নের নিকট গিয়া কি যেন কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল "ঐ, ঐ বুঝি নীলু গোঁ গোঁ করিয়া কাঁদিতেছে"—বলিতে বলিতে স্ত্রীলোকটী জানালা দিয়া বাহির হইয়া চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল, আমি বাধা দিবারও অবসর পাইলাম না, চকিতের মধ্যে যেন কি হইয়া গেল। বাতাস তখনও গোঁ গোঁ শব্দে বহিতেছে, উহারই শব্দ স্ত্রীলোকটী ভ্রম করিয়া নীলুর শব্দ বলিয়া মনে করিয়াছিল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না, রজনী ঘোর অন্ধকার। স্ত্রীলোক বাঁচিল কি মরিল, এ পর্যান্ত তাহার কোন সন্ধান পাই নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম।

অন্ধকারের প্রতি।

(১)

আমি তোমার বুকের মাঝে মুখ লুকিয়ে থাকি,
তুমি আমায় জড়িয়ে ধরে থাক;
আমি তোমার অঙ্গ মাঝে সংগোপনে জাগি,
তুমি আমায় কাণে কাণে ডাক।

(২)

বসন খানির মত আমার সারা দেহ ঢেকে
লুটিয়ে পড়, এলিয়ে পড় এসে,
ঘুমিয়ে পাড় চোখের পাতায় মৃদুস্বপ্ন মেখে
দুঃখভরা জাগরণের দেশে।

(৩)

বৃষ্টি পড়ে গাছের পাতায়, বাতাস বহে ধীরে;
আকাশ-পথে নিভে আছে তারা,—
এই নিশীথে, এই সুযোগে, এই বিজনের তীরে
রচ তুমি আমার তরে কারা।

(৪)

রুদ্ধ কর, মুগ্ধ কর, সুপ্ত কর মোরে
লুপ্ত কর স্মৃতি-তলের বাথা,
আমি তোমার বুকের মাঝে থাকি ঘুমের ঘোরে
পরশিয়ে শুব্ধ কোমলতা।

শ্রীকালিদাস রায়।

শ্রীক্ষেত্র-বৈচিত্র্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই বিমলা একান্ন পীঠের অন্তর্গত পীঠ-বিশেষ, ভৈরব জগন্নাথ। মহাশক্তি ও সর্ব্ব-শক্তিমান্ মহাবিষ্ণুর একত্র সমাবেশ—ইহা শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধকদ্বয়ের ভ্রান্তি-চক্ষু উন্মীলনের দ্বার। বিমলা ও জগন্নাথের এই স্বরূপতা—এই একতা—এই সম্মিলন বড়ই প্রীতিপ্রদ—বড়ই সাধনার উচ্চ মার্গ। এ সাধনার মুখ্য শিক্ষা—'একেই দুই'—'দুয়েই এক'—বিষ্ণু শিব শক্তি পৃথক্ নয়। বিবেকহীন মানব তাহাদিগকে পৃথক্ ভাবিয়া সুধাভ্রমে বিষ আশ্রয় করে। সে যে সাধনা করে, মনে এই পার্থক্যবশতঃ, তাহাতে সফলতা লাভ করিতে পারে না।

কেবল আলেয়ার আলোতে ছুটিয়া হাঁফাইয়া পড়ে, দিক্‌ভ্রম আরও গাঢ়তর হয়—ঐ আলো দেখে এই বুঁঝি ধরে ধরে, ওই পালায়, আবার বুঝি ধরে ধরে আবার পালায়,—শেষে সে আলোকের সত্বা কোথায় চলিয়া যায়, সে যে একা সেই একাই অসার ভাবেই পড়িয়া থাকে। এই বিমলা দেবীর পূজা করিয়া রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি, ধনদেবী লক্ষ্মী, বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলাম। অপরাপর দেবমূর্ত্তিও চিত্তের প্রভূত প্রসন্নতা সাধন করিল।

সিংহ দরজায় প্রবেশ করিতে পুরীমাঝে যে সকল মন্দির ও তাহাদের কারুকার্য্য দেখিলাম তাহাতে উড়িষ্যার পূর্ব্বতম স্থাপত্যবিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এই মন্দির সকল ব্যতীত নগরের মধ্যে যে স্থানে যে মন্দির দেখিয়াছি সমস্তই স্থাপত্যের পূর্ণ পরিচায়ক। উড়িষ্যার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে চিত্ত প্রসাদনের ইহাই অন্যতম পদার্থ। তবে জগন্নাথদেবের মন্দিরগাত্রে কতকগুলি কুৎসিত ছবি দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। এরূপ শান্তরসাস্পদ পবিত্র স্থানে ওরূপ চিত্ত-মোহকর কুৎসিত চিত্রের কারণ অনুসন্ধানে বুঝিলাম যে, বিকারের কারণ বর্ত্তমানেও যাঁহার চিত্ত বিকৃত না হয়, তিনিই সাধক যোগী, তাঁহারই সাধ-মন্ত্রের সঙ্গীতশব্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়। এই কথার সারবত্তা রক্ষার জন্যই ঐ চিত্রগুলির সৃষ্টি বলিলেও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হয় না। সেই শান্তি-নিকেতনে প্রথম ভগবৎ-প্রেমে চিত্ত গলিয়া যায়। সেই গলা অবস্থায় ঐ সকল চিত্ত-মোহকর চিত্রের দর্শনে চিত্তের পরীক্ষা হয়। যিনি ভগবানের ঐ কুটিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন অর্থাৎ ঐ গুলি দেখিয়াও দেখেন না—দেখিলেও ভগবানের পার্থিব বা প্রাকৃতিক ক্রিয়ার প্রতিরূপ মনে করিয়া, চিত্তের স্থৈর্য্যসাধন করেন,—তাঁহার পদারবিন্দের মকরন্দ হইতে চিত্তকে সেদিকে যাইতে দেন না—তিনিই ভগবানের ভক্ত। তিনিই পুরুষোত্তম দর্শনের প্রকৃত পাত্র।

মানব! তুমি চাও কি? 'ভাত' না 'ভাব'? অর্থাৎ 'ভোগাবস্তুসকল', না, 'সত্বময় শাশ্বত জিনিষটি'; ক্ষুধিত শিশুর দৃষ্টি মাতৃস্তনে—রত্নে নয়; তৃষার্ত্তের দৃষ্টি শীতল জলে,—সুখসেব্য দ্রব্যযোগে নয়! যদি না হয় —তবে জগন্নাথদেবের মন্দিরের উপরে থাক্‌ না কুৎসিত বীভৎস শত চিত্র, থাক্‌ না প্রলোভনের সহস্র সামগ্রী, ইহাই ত পরীক্ষা, অগ্রে অঙ্গনে যাইয়া তুমি চক্ষুকে মনকে ঐ সকল চিত্র হইতে টানিয়া লইয়া আত্মতৃপ্তি সাধন কর, তবে আত্মারামকে দর্শন করিবার জন্য রত্নবেদীর নিকট যাইবার তোমার অধিকার, নতুবা নহে। অনধিকারী হইয়াও যদি প্রবেশ কর, প্রথম ঢুকিতেই অন্ধকারে দিশেহারা হইবে, বন্ধুর স্থানে পাছে পদস্খলন হয়—সে চিন্তা আসিবে, যেখানে এসব চিন্তা চিন্ময় সে স্থানের নয়। তাই মন্দির প্রবেশের পথে ঢুকিতেই অন্ধকার। শেষে একটা ঢিবির উপর হাতকাটা চাকাযুগো কিনটে কি এক বিকৃত মূর্ত্তি রহিয়া আছে দেখিবে, সার্দ্ধ

জগন্নাথের এরূপ বিকৃত আকার ও গঠনের দ্বারাই বাহিরের কুৎসিত চিত্র,—ইহা তাঁহার ভক্তের প্রতি করুণা। সুতরাং প্রভুর দেহই পরীক্ষা-কেন্দ্র; ঐ বিকৃত দেহ দেখিয়া মন বিকৃত হইলে চলিবে না, পবিত্র ভাবিতে হইবে। না ভাব,পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ অবস্থায় অবশ্য একটা প্রণাম করিবে কিন্তু সে দর্শনের যে প্রণামের যে প্রেম বা তজ্জনিত হৃদয়ভরা যে আত্মপ্রসাদ ও পরিতৃপ্তি, তাহা আসিবে না, চক্ষুজলে বক্ষ ভাসিবে না, ভাবাবেশে দেহ অবসন্ন হইবে না। আর যদি তুমি বাহ্য দৃষ্টি বা চিন্তা হইতে মনকে ভগবানের পদ-সরোজে স্থির রাখিয়া অন্য দিকে নাচাইয়া তাঁহার গঠন পারিপাট্যে না ভুলিয়া, মন্দিরগাত্রের কুৎসিত চিত্রাবলী মন্দির পথের গাঢ় তমঃ না দেখিয়া, পিপাসুর জলাকাঙ্ক্ষার ন্যায় কেবল জলের দিকে চাও—পাইলে ভাল জলও পান কর, না পাইলে পঙ্কল বারিকেও ত্যাগ কর না, তবে ও মনমনকে দেখিতে পাইবে। পীযূষধারা পানে এক্ষেত্রে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আশা-আকাঙ্ক্ষা সব মিটিয়া যাইবে। একেই বলে পুরী যাওয়া ও পুরুষোত্তম দর্শন। এই দর্শনেই চৈতন্যদেব আবেগে চলিয়া পড়িয়াছিলেন। ইহারই নাম কৈবল্যলাভ। অতএব মানব! তোমার লক্ষ্য 'ভাতে' নয়—'ভাবে'. তোমার দৃষ্টি বাহ্যে নয় অন্তরে—তোমার দেহ স্থূল নয় সূক্ষ্ম—তুমি 'তোমারও নয় 'আমার'ও নয়। এতব-রাজ্যে ও অন্তররাজ্যে বিচরণ সাধনাসাপেক্ষ, কথায় হয় না, অনেক কাঠ খড় পুড়িলে তবে খাঁটি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। সাধনায় অনেক দূরে সিদ্ধি, তবে জগন্নাথে—প্রকৃত জগন্নাথ! তখন জগন্নাথের সিংহদ্বার হইতে, ভিতরের বাহিরের কোন বস্তু কোন ছবি কোন মন্দির কোন লোক লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইবে না। তখন মনের সহিত ঐক্যতান বাদনে কেবল জগন্নাথ।—তখন জগন্নাথের বাহিরের কাল বিকৃত অঙ্গহীন দেহ, সুভদ্রার সহিত জগন্নাথ বলরামের একত্র বাস, এই স্ত্রীত্ব পুংত্ব পার্থিব ভাব চিত্তে আসিবে না, এরূপ মন ও দর্শন যিনি যখন পাইবেন তখন জগন্নাথ তাঁহার প্রিয় এবং তিনিও জগন্নাথের প্রিয়, কেন না ভগবদুক্তি :—

সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো যে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

লিখিতে খুব পারি, কাজে যে কত কি করিলাম, তা জানি না, বলিতেও লজ্জা হয়। যাহা হউক ভাল মন্দ একরূপ দেখা শুনা শেষ করিয়া—

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥

বলিতে বলিতে বাসায় ফিরিলাম।

এইরূপে এখানে ওখানে,এ তীর্থে ও তীর্থে, এ মঠে ও মঠে যাইয়া আসিয়া দিন কাটিতে লাগিল। স্নানযাত্রা উপস্থিত। অসংখ্য যাত্রী দলে দলে সহর ঘিরিয়া ফেলিল। সে জনতা, সে দৃশ্য, সে ভাব, সে ধর্মপ্রাণতা বলিবার নয়—কেবল দেখিবার ও শুনিবার। আরও উচ্চতর ভাব মনে গাঁথিবার।

বহুপূর্ব্বে কর্ণাটদেশে গণপতি ভট্ট নামক এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ গণেশের উপাসক থাকিয়া,

একনিষ্ঠতার সহিত তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন। ব্রহ্ম দর্শনে মানবের মুক্তি, ইহাও বিশ্বাস করিতেন। এই আবেগে তিনি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী হন। কেবল ব্রহ্ম-চিন্তাই তাঁহার লক্ষ্য বা কার্য্য ছিল। তিনি সেই সারভূত ধন ব্রহ্মের অনুসন্ধানে শুনিলেন যে, 'নীলাচলে (পুরীতে) ব্রহ্ম আছেন, আর গণপতিকে পায় কে, পাহাড় পর্ব্বত জঙ্গল নদ নদী ডিঙ্গাইয়া শীত গ্রীষ্ম না মানিয়া সেই দিকেই ছুটিলেন। দেখিলেন কতকগুলি লোক ব্রহ্ম জগন্নাথকে দেখিয়া ফিরিতেছে। গণপতি ভাবিলেন, ইহারা ব্রহ্ম দেখিল, তবে মুক্তি কই; সন্দেহ করিল, ক্রমে ভাবিতে ভাবিতে জগন্নাথের সিংহদ্বারে উপস্থিত। সেদিন স্নানযাত্রা! জগন্নাথ স্নানমণ্ডপে উপ-বিষ্ট। গণপতি একবার দুইবার শতবার ভাল করিয়া জগন্নাথকে দেখিলেন, গাত্রে হাত দিলেন, বুঝিলেন দারুমূর্ত্তি, দেখিলেন পূজারি দর্শক কাহারও এ মূর্ত্তি দর্শনে মুক্তি হয় নাই। তবে এ মূর্ত্তি ব্রহ্ম কিরূপে? ভট্ট আরও দেখিলেন, এ মূর্ত্তি ত তাঁহার উপাস্যদেব গণেশ-মূর্ত্তি নয়! যিনি ব্রহ্ম হইবেন ভক্তকে তাহার ধ্যেয় মূর্ত্তি দেখাইবেন, তবে এ কি? তবে একনিষ্ঠ সংযত ব্রাহ্মণ কাহাকে প্রণাম করিবেন! জগন্নাথ ব্রহ্ম হইলে তিনিই গণেশ তিনিই অনাদি অনন্ত, তাঁহার করুণা কথাই ত ভক্তের সত্য, তবে এ কি! এই জন্যই কি এত কষ্টে এত দূরে আসিলেন। এইরূপ তর্কের স্রোতে অভিমানভরে তিনি ব্রহ্ম দর্শনের অভাবে উপাস্যদেব একব্রত গণপতি ক হৃদয়ে দেখিতে দেখিতে পুরী ত্যাগ করিলেন।

তিনি ত্যাগ করিলে তাঁহাকে ছাড়ে কে? তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা, অভিমান, জগন্নাথের কৌস্তুভরঞ্জিত হৃদয়ে লাগিল। তিনি গণপতি ভট্টকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য, প্রধান পাণ্ডাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন। পাণ্ডার সনির্ব্বন্ধ আহ্বানে ভট্ট পথ হইতে ফিরিলেন।

মনের আনন্দ বা ব্যথা, মন জানে আর মনের জিনিষ ভগবান জানেন। একনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে পূর্ণানন্দ ব্রহ্মানন্দ দিবার জন্য, সেই স্নানমণ্ডপে প্রভু জগন্নাথ তাঁহাকে তাঁহার ব্রহ্মমূর্ত্তি গণেশমূর্ত্তি দেখাইলেন। অদৃশ্যই এ দৃশ্য কেবল একনিষ্ঠ ভট্টের,—ভক্ত গলিয়া গেলেন, ভগবান আগেই গলিয়া গিয়াছেন। উভয়ের এই গলাগলির চিৎ সৎ ও আনন্দ এই তিন ভাবের সমন্বয় বড়ই মধুর বড়ই প্রীতি ও মুক্তিপ্রদ। গণপতি সেই ব্রহ্মদর্শ-নেই আত্মবিশ্বাসের বশবর্ত্তিতায় মুক্তি পাইলেন।

হায় রে ধনিপ্রদত্ত পূজার সামগ্রীসম্ভার! তোমরা কোথায়? হা বৈদিক মন্ত্র,—যাগ যজন যাজন! মন্ত্রহীন একনিষ্ঠ নেংটা ব্রাহ্মণের আত্মবিশ্বাসজনিত শক্তি ভক্তি ও মুক্তি দেখ, আর বল :—

বায়ু যথা কুসুমের গন্ধমাত্র লয়,
ভাব হ'তে ভক্তি লন বিভু দয়াময়।

এখন স্নানযাত্রা শেষ হইলে—আজ হইতে একপক্ষ প্রভু রুদ্ধ গৃহে বাস করেন। কাহারও দর্শনলাভ ঘটে না।

যেথা একবেয়ে টানে চলিলে জ্ঞান নাশে

না। ভ্রমণকাহিনীর ভিতরে এত জগন্নাথ এত যুক্তি কেন? যাক্‌ ওসব কথা, এই সহরের কথা, লোকজনের কথা একটু বলি।

পুরীর মধ্যে দেখিবার বা ভাবিবার জিনিষ ভক্তের জগন্নাথ প্রভৃতি দেবগণ্ডলী ও অনন্ত-সিন্ধু! অপর দর্শকের এক সিন্ধুশোভা ব্যতীত বালুকাময় সুবিস্তৃত তটভূমি ব্যতীত দেখিবার আর অন্য কিছু নাই বলিয়াই মনে হইল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানই স্বাস্থ্যকর, সহরের ভিতর তত নয়। উদরাময় রোগীর পক্ষে এখানের কোন স্থানই ভাল নয়। আবার শ্লেষ্মাযুক্ত লোকের পক্ষে পরম হিতকর। জ্বর থাকিলেও ম্যালেরিয়া কম। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অনেকের সহিত আলাপ হইল, জানিলাম তাঁহারা তত উপকার পান নাই।

সহরে মিউনিসিপ্যালিটি থাকিলেও মল-মূত্র ত্যাগের বিশেষ ব্যবস্থা নাই। অধিকাংশ লোকই প্রায় গৃহের পার্শ্বে বালুকাময় প্রান্তরে মল-মূত্র ত্যাগ করে। সহরের মধ্যে রাস্তার দুই ধারে আবর্জ্জনা অধিক জমিয়া থাকে। মৃত্তিকা প্রায় দেখা যায় না, সব স্থানই বালুকায় পূর্ণ। এজন্য প্রখর রৌদ্রের সময় পথ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, পাদুকাহীন পদে কেহ চলিতে পারে না।

বালুকা মধ্যস্থ কূপগুলি অতি গভীর, জল সাদাও! আশ্চর্য্যের কথা এই, সিন্ধুর জল লবণাক্ত—সিন্ধুর তীরস্থ কূপের জল স্বাদু, সৃষ্টিকর্ত্তার জীবরক্ষার এই অপার মহিমার আবেগে উত্তরনশীল মানস-বিহঙ্গ ক্লান্ত হইয়া পড়ে,—পক্ষদ্বয় তাহাকে ধরিয়া রাখাও যায় না।

খাদ্য-দ্রব্য দুর্ম্মূল্য, কোন কোন দ্রব্য দুষ্প্রাপ্যও বটে, তবে মৎস্য সহজলভ্য ও সুলভ। দুই এক যাত্রীতে সাধারণ ভাবে দ্রব্যাদি কিনিয়া পাক করা অপেক্ষা মহাপ্রসাদ কিনিয়া খাওয়ায় খরচ কম পড়ে বলিয়াই বোধ হয়। সিন্ধুতীরস্থ ভিক্টোরিয়া হোটেল ভ্রমণ-কারীদিগের আশ্রয়স্থল। বিচারালয় সহরের সহিত প্রায় সংশ্লিষ্ট। তথায়ও তাহার পার্শ্বে ইউরোপীয়দিগের আবাস গৃহ—সে সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই।

সাধু-সন্ন্যাসীর বহু রূপ দেখিলাম। জগন্নাথের মন্দিরের নিকটেই অধিক—সমুদ্র-তীরে ও পথের উভয় পার্শ্বে কতক দেখিতে পাওয়া যায়। ভিক্ষুকের সংখ্যা ও তাহাদের ব্যাকুলতা অধিক দেখিয়া বোধ হইল এ দেশের দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক।

এই সকল দেখাশুনার আবেগেই গণা দিন ফুরাইয়া যায়। যায় দেখিয়া সম্মুখে রথযাত্রার বিপুল আয়োজন দেখিয়াও আর থাকিতে পারিলাম না। চাকুরীর চাকচিক্য—কর্ত্তৃপক্ষের গম্ভীর মুখ সব মনে পড়িল,—তখন তীর্থ বা ভক্তি ভুলিয়া গেলাম। আর জীবমুক্ত যে বন্ধনের নীরব যাতনা অকাতরে সহিয়া থাকে, যাহার তীব্রতার বিষম টানে সূর্য্য-সান্নিধ্যে থাকিলেও স্বস্থানে আসিয়া পড়িতে হয়, এ'ত রেলের ১২।১৪ ঘণ্টার পথ—থাকিলে চলিবে কেন? একটি আহ্বানে একটি ঘণ্টায় ধ্বনিতে আনন্দ-বাজার ছাড়িয়া সোহাগ ভুলিয়া বৃক্ষপটের সৌন্দর্য্য চাপা দিয়া পুনঃ দর্শনের

জন্য প্রবৃত্ত হইলাম। বাসা না পাইয়া যাঁহার আশ্রয়ে বিনা ভাড়ায় প্রায় ১ মাস কাটাইলাম, এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ যাইবার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায়, পূর্ব্বোক্ত সেই ব্রাহ্মণ ভ্রাতাটির সহিত মঠাধিকারী সেই নেপালী সন্ন্যাসী মহোদয়ের নিকট যাইয়া আমাদের পুরীত্যাগের সংবাদ জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহার ইচ্ছা আমরা রথযাত্রা পর্য্যন্ত থাকি—কেন না এখানে সহসা আসা ঘটে না, বিশেষতঃ রথেরও আর বেশী বিলম্ব নাই। কিন্তু আমার অসুবিধা শুনিয়া তিনি পীড়া-পীড়ি করিলেন না। যখন পুরীতে আসিব, তখনই এই মঠে আসিয়া থাকিবার জন্য সরল প্রাণে মুক্তকণ্ঠে আমাকে আদেশ দিলেন। তাঁহার এই সাধু ব্যবহারে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। মঠের নিয়মানুসারে দেখিলাম, তিনি আমার নিকট ভাড়া কিছুই লইবেন না; কিন্তু আমার মন তাহা ভাল বুঝিল না। আমি তাঁহার পুত্রদের খাবার কিনিয়া দিবার জন্য পাঁচটি টাকা তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি আমার আগ্রহ দেখিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন, 'মঠ সংস্কারের জন্য ঐ যে পাথর কেনা হইতেছে, এই টাকা অবশ্যই ঐ কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।' এইরূপ অর্থ-নিস্পৃহতাই ত সন্ন্যাসীর লক্ষণ। আমি তাঁহার পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া দিলাম, তিনি তাহা মঠের কার্য্যবিশেষের জন্য গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বত্যাগী মহাত্মা শঙ্করের মঠাধ্যক্ষের এ ত্যাগশীলতা এ স্বার্থহীনতা অবশ্যই গৌরবদ্যোতক বলিতে হইবে। তিনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিলেন, আমি বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে উত্থানের পর্ব্বাহ্ণ আসিয়া পড়িল। তথায় একমাস থাকা প্রযুক্ত যাঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলাম। নয়ন ভরিয়া জগন্নাথ দেখিলাম, পেট ভরিয়া প্রসাদ খাইলাম। পুরীর ভালবাসা ও শান্তি-সিন্ধুর নীলিমা ও শোভা দূরে রাখিলাম। কেবল জগন্নাথের মূর্ত্তিকে হৃদয়ে বসাইয়া—

> বিশাল বারিধিমাঝে বহিত্র বাহিয়া
> কর্ণধার নির্ভীক অনেক দেশে যায়;
> সুস্থ চিত্তে নহে কিন্তু রহে কোথা গিয়া,
> নিরখিতে সেই ভূমি চিত্ত সদা ধায়।

এই মহামন্ত্রের টানে যেখানকার মানুষ, দেখিতে দেখিতে সেই খানে উপস্থিত।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।

"কুচবিহার-বিপ্লবে"।

তৃতীয় বিপ্লব।

ভারতের সর্ব্বোত্তর সীমাপথে, কুচবিহার-রাজ্যের প্রান্তদেশে, গহন-অরণ্যানী-সঙ্কুল উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গ-সমন্বিত, হিম-মণ্ডিত, দীর্ঘাকৃতি হিমালয়-গিরি, স্বকীয় সুদীর্ঘ দেহ বিস্তার করিয়া, সগর্ব্বে উন্নত মস্তক হইয়া যেন বিপুল আত্মাহঙ্কার প্রকাশ করিতেছেন। যেহেতু হিমাচলের তুল্য বহুন্নত শিখরবিশিষ্ট পর্ব্বত পৃথিবীতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভূবর্ত্তে

হিমালয় অদ্বিতীয় ও তন্ত্র-পুরাণাদিতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ মহীধর। এই সুবিখ্যাত ভূধরদেব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি উন্নত-শরীরিগণের বাসভূমি বা বিহার-ভূমি। সুতরাং সর্ব্বোচ্চ সম্মানার্হ।

এক সময়ে অহঙ্কৃত বিন্ধ্যগিরি, নিজ উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গ উত্তোলন পূর্ব্বক অনন্ত ব্যোমপথ অবরোধ করত, গগন-পথের অত্যুচ্চমার্গে বিহারশীল মার্ত্তণ্ডদেবের গতিপথ রোধ করিলে, দিক্-তিথ্যাদি ভেদ রহিত হওয়ায়, পারলৌকিক কর্ম্মে বিঘ্নসমুৎপন্ন হয় এবং যজ্ঞাদির অভাব জন্য দৈব-কার্য্যে অথবা পিতৃ-কার্য্যে, যত অসুবিধা হউক বা না হউক, বোধ হয় তৎ-কালে নগশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের গৌরব রক্ষার্থ বা সংবর্দ্ধনার্থ দেবগণ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া মুনিবর অগস্ত্য ঐ মহান্ গর্ব্বশীল বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন।

গিরিবর হিমালয় দেব দেব মহাদেবের শ্বশুরালয়। সুতরাং এ হেন পবিত্র ভূমির সম্মান সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়। এই জন্যই প্রতীতি জন্মে, আদিম কাল হইতে আনুগত্য বা পরাধীনতার বিরোধী ভোট, নেপাল বিশাল স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, সাহঙ্কারে স্বকীয় গরিমাগুরুত্ব সম্পাদন করিতেছে। বস্তুতঃ এ হেন গৌরব-মণ্ডিত সুস্বাধীন জাতি-নিচয়ের বিষয় চিন্তনীয়। ইহারা প্রাচীন কাল হইতে এখানে স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, কি পরে অন্য কোথা হইতে আগমন করিয়াছিল।

ঐতিহাসিক মহাত্মাগণের অনুমান সত্য হইলে বলিতে হয়, ইহারা ভারতের সমতল ভূমিতে আর্য্যগণ হইতে পরাজিত হইয়া অথবা অনুধাবিত হইয়া দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাই ইহাদের স্বাধীনতা-গৌরব শিরোভূষণ। আনুগত্য বা বশ্যতা কাহাকে বলে, তাহা ইহারা আজও হৃদয়ঙ্গম করে নাই।

ইহারা প্রাচীন অধিবাসীই হউক, অথবা ভারতের সমতল-ভূমি হইতে অপসারিত হই-য়াই হউক, এই সকল অসভ্য জাতি আবহমান কাল হইতেই হিমালয়ের অধিবাসী।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আর্য্য-অনার্য্য জাতির ভীষণ যুদ্ধে আর্য্যগণ জয়লাভ করিলেও, তাঁহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী শক্তি, হিম-মণ্ডিত হিমগিরির দুর্গম পার্ব্বত্যভূমিতে প্রতিহত ও প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও প্রাকৃতিক দুর্গাভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বাধীনচেতা ভোট ও নেপাল প্রভৃতি অসভ্য-জাতিচয় নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছেন।

ভারতের অন্যান্য স্থানে আর্য্য-অনার্য্য জাতিদ্বয়ের সুদীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ না ঘটি-লেও হিমালয়-সন্নিহিত তন্ত্র-পুরাণবর্ণিত পুণ্য-ভূমি প্রাগ্জ্যোতিষপুর ও পৌণ্ড্র প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত অমিত-বিক্রমশালী রাজ্যগুলি বর্ত্তমান সময়ের হিমালয়-পার্ব্বত্যবাসী ভোট, নেপাল ও চীনের মঙ্গোলীয় জাতিগণ হইতে বা কিরাতগণ হইতে বিজিত, শাসিত ও নিপীড়িত হইয়াছিল। আর্য্যজাতির গৌরব বিনাশার্থই হউক বা জিগীষা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃই হউক অনার্য্যগণ বা প্রাগুক্ত জাতি সকল

হিমালয়-নিম্নস্থ রাজ্যগুলিকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বতন প্রাগ্-জ্যোতিষপুর বর্ত্তমান কুচবিহার—কামরূপ ভূমি ও প্রাচীন মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের উপর দিয়া বিলক্ষণ অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

এই হেতুই উত্তুঙ্গশৃঙ্গ-মণ্ডিত হিমালয়পাদ-সন্নিহিত দেশের এই অংশে, আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রসিদ্ধ রাজ্যের ন্যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা সুশান্তি অব্যাহত ভাবে বিদ্যমান থাকে নাই। তদ্ধেতুই কুচবিহার-কামরূপ-ভূমিতে বিখ্যাত বংশগৌরব-মণ্ডিত সম্ভ্রান্ত ধন-কুবেরের বংশ একটীও পরিদৃষ্ট হয় না।

কুচবিহারের গুরুতর ধ্বংস-সাধনের মধ্যে দুইটী প্রধান বা মুখ্য কারণ—প্রথমতঃ আর্য্য ও অনার্য্য-জাতির বিরোধ অর্থাৎ অসভ্য পার্ব্বত্য-জাতির আকস্মিক আক্রমণ এবং হঠাৎ আক্রমণ জন্য বিশৃঙ্খল রাজ্যে, শাসন-শৃঙ্খলার অভাব জন্য দস্যু-তস্করের ঘোরতর লুণ্ঠন-উপদ্রব।

আমরা যে সময়ের কথা এস্থলে উল্লেখ করিব, তাহা মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজ্য ত্যাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়।

আর কয়েকটী অবান্তর কারণ উল্লেখ-যোগ্য; যেহেতু উহা উল্লেখ না করিলে প্রকৃত ঘটনার মর্ম্মাবগত হইতে সন্দেহ হইতে পারে, তজ্জন্য কয়েকটী কারণ উল্লিখিত হইল।

(ক) অনন্ত বিক্রমশালী প্রাচীন রাজ্য যেরূপ পূর্ব্ব বিজয়-গৌরবে সংস্কারবিহীন হউক, আত্মগরিমা স্বতন্ত্রভাবে স্বকীয় বাহুতাব—নীতি প্রদর্শন করিয়া, নিজ স্তবব প্রকাশ করে, কুচবিহার রাজ্যও তদবস্থ ছিল। মহারাজ চন্দনের রাজত্ব (১৫১০—১৫২২ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। পরে মহারাজ বিশ্বসিংহ ১৫২২ হইতে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অমিত প্রভাবে কুচবিহার রাজ্য শাসন করেন। মহারাজ বিশ্বসিংহের জীবনের প্রথম ভাগে অন্ততঃ ১০ দশ বৎসর কাল ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইলেও তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ প্রায় বিংশতি বৎসর কাল রাজ্য নিরুপদ্রব ছিল। সুতরাং শান্তিসুখ উপভোগহেতু তাঁহার সৈন্যদল যুদ্ধবিদ্যা হইতে একরূপ বিরত হইয়াছিল। মহারাজ বিশ্বসিংহ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তৎকৃতিমান পুত্র শ্রীমান্ নরনারায়ণ রাজ্য লাভ করেন। ইহার রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে আহমগণ কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিলে সৈন্যদলের সংস্কারাভাব হেতু প্রথম সংঘর্ষেই কুচবিহারপতি পরাভব লাভ করেন। সুশাসন ও সংস্কার সাধন দেশ-রক্ষার প্রধান উপায় হইলেও তৎকালে উহা দুরদৃষ্ট বশতঃ অনুসৃত হয় নাই।

(খ) কুচবিহার রাজ্যে প্রতি গ্রামে এক-জন রাজকর সংগ্রাহক ছিলেন। রাজকর আদায় করাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন প্রভৃতি দৈব উৎপাত পর্য্যন্ত ইহাদের জ্ঞান-গোচরে উপস্থিত হইত না। যে প্রকারেই হউক বিবিধ অত্যাচারে রাজকর সংগ্রহ করিত।

(গ) ইরশালদারের অত্যাচার। ইনি প্রতি বৎসরের রাজকীয় করের টাকা রাজ-সরকারে ইরশাল করিতেন। তিনি রাজ-

কর প্রদানে অসমর্থ হইতেন, তাহার জমি ইজারা লইয়া ইনি রাজসরকারে আদান প্রদান করিতেন। ইজারাদার ভবিষ্যতে এরূপ ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, যে রাজ্যের যেখানে সেখানে রাজকীয় ক্ষমতার বিলোপ সাধন অথবা রাজকীয় শক্তির অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেন। দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লেখ করা যায়;—ইজারাদারের গরুর পালে সাধারণের গরু প্রবিষ্ট হইলে গো-স্বামী ঐ গো ফেরত পাইত না, এরূপ প্রবাদ অনেক উল্লেখ করা যায়।

(ঘ) মুরজিয়া (মোজলীয়) জাতির অত্যাচার। মুরজিয়া জাতি রাজকীয় সমুদয় মিস্ত্র বিভাগে চাকুরি করিত। ইহারা বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত বর্ব্বর ছিল। রাজকীয় গৃহ নির্ম্মাণ ব্যপদেশে ইহারা রাজ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বাঁশ (বংশ) কর্ত্তন কার্য্য নিষ্ঠুরভাবে সম্পাদন করিত অর্থাৎ অনুচিত ভাবে ছোট বড় যে প্রকারের বাঁশই হউক না কেন কর্ত্তন করিত। উদ্দেশ্য, এরূপ ব্যবহার করিলে বংশ-স্বামী তাহাদিগকে উৎকোচ প্রদান করিবেন। পূর্ব্বে কুচবিহার রাজবাটী সুধাধবলিত ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল না।

(ঙ) ধর্ম্মশাসন;—কুচবিহার রাজ্যের প্রতি গ্রামে ছড়িদার (বেত্রদণ্ডদাতা) উপাধি-ধারী একজন ধর্ম্মশাসক ছিলেন। গ্রামে কেহ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিলে ইনি তাহাদের দণ্ড বিধান এবং গ্রামের দশজনের সহায়তায় প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কর্ম্ম-নির্ব্বাহ করিতেন। এই নিরঙ্কুশ ধর্ম্মশাসন পরে দুষ্ট বুদ্ধি প্রণোদনে অত্যাচারে পরিণত হইয়াছিল। অনেক সময়ে সাধু ব্যক্তিরাও প্রতারিত হইয়াছিলেন।

এই সকল অত্যাচারে কালে কুচবিহার রাজ্যে তৎসাময়িক সময়ে অনেক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। (১)

মহারাজ বিশ্বসিংহ অমিত প্রভাবে কুচবিহার রাজ্যশাসন করতঃ জীবন ক্ষণভঙ্গুর, মায়াজাল, অলীক জ্ঞানে, সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র শ্রীমান্ নরনারায়ণকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনের শেষভাগে ৫৩ বৎসর বয়সে রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া, যোগসাধন ও জীবন্মুক্তির উদ্দেশ্যে হিমালয়ের নির্জ্জন গহ্বরে আশ্রয়লাভ করেন। কুচবিহার রাজশক্তি-সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তগামী হওয়ায় বিপ্লব-দস্যুকুল নিরাপদে কুচবিহার জনপদে বিচরণ করিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমেই আহমপতি কুচবিহার রাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন।

(তৃতীয় বিপ্লব শেষ।)

শ্রীচন্দ্রদেব রায় বর্ম্মণ।

ভিখারী।

(সমাজ-চিত্র)

দৌবারিক—হে দেব!
ভিখারী এক দরশন আশে
দ্বারে দেশে উপনীত আসি, আনিব কি?
দিব কি ছাড়িয়ে দ্বার গৃহে প্রবেশিতে?
রাজা!—কি কহিলে? ভিখারী দুয়ারে?
লয়ে এস! (দৌবারিকের প্রস্থান)

---

(১) কুচবিহারের ইতিহাসে ঐ কারণগুলি উল্লিখিত হইবে, মনে করিয়া এখানে আর উহা উল্লেখ করা গেল না।

অসময়ে মোর ঠাঁই কেন এ ভিখারী!
বুঝিতে না পারি, সংশয়ে শিহরে প্রাণ;
ভিখারী কি করিয়াছে ভান? ছল করি
চাহে অন্য কিছু! যেবা হয় বুঝা যাবে,
দাঁড়ালে আসিয়ে পলকে চিনিব তারে।
যে হয় সে হয় অবজ্ঞায় কভু না ফিরাব;
মৃত্যু যদি আসে মোর ভিখারী হইতে,
সব বরি, প্রতারক তথাপি না হব।

(ভিখারীর প্রবেশ ও প্রণাম)

কহ ত্বরা কিবা তব বক্তব্য ভিখারী!

ভিঃ—রাজা রাজা! দীন আমি ভিক্ষা চাহি শুধু!
দিবে কি? দিবে কি? পরিবে কি বল
রাজা!
মিটাইতে এ জঠর জ্বালা? হাহাকার!
বিশ্বগ্রাসি ক্ষুধা পারিবে কি মিটাইতে?

রাজা—দ্বিধা তব সম্বরণ করি, কহ তুমি,
কহ হে ভিক্ষুক, কিবা চাহ, কিবা হলে,
হবে তব বুভুক্ষা নির্ব্বাণ, নিঃসঙ্কোচে
কহ কি বাসনা, সাধ্যাতীত না হইলে,
অবশ্য মিটাব আমি কামনা তোমার।

ভিঃ—ধন্য তুমি রাজা, বড় আশা দিলে মোরে
মিটাতে কামনা মোর। কিন্তু নাহি জান
জানিবার নহে তাহা, তোমার কি দোষ,
নীচ, ঘৃণ্য, পঙ্কিল সংসার রাখিয়াছে
আচ্ছাদিত করি, তোমা' অন্ধ আবরণে
দেখিতে দেখিতে সহিয়া গিয়াছে সব,
চলিতে চলিয়া গেছে। কারো চোখে আর
পড়ে না এ ক্ষীণ অশ্রুকণা, যার জ্বালা
সেই জানে' মরে, কাঁদিবার তরে আর
এ বিশ্ব জগতে কেহ নাহি তার। দেহ
ভিক্ষা দেহ প্রভু, অমূল্য সময় তব
চাহিনা করিতে হানি দীন ভিক্ষু তরে।

রাজা।—না কহিলে প্রকাশিয়া কিবা ভিক্ষা দিব
না জানিয়া না শুনিয়া, কিবা চাহ তুমি
কেমনে করিব স্থির, কিবা দিব দান।

ভিঃ—সত্য কি শুনিবে তবে, শুনিবে কি রাজা?
রাজকার্য্যের কণামাত্র ক্ষণ দিবে কি,
করিবে কি ব্যয় এই ভিখারীর তরে?

রাঃ—কহ শুনি কিবা তব দুখের কাহিনী?

ভিঃ—রাজা শোন তবে—বহুক্ষণ ধরি মনে
জেগেছিল বলিবার আশা; পারি নাই।
অবসাদ জর্জ্জরিত হিয়া ধরেছিল,
চাপি এ বক্ষ তাই আমি পারিনি বলিতে।
এই দেহ রাজা ছিল না এমন। যারে
সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য কহিছ সকলি সে
ছিল মোর। সুখের সংসার ছিল মোর
ছিল মোর স্ত্রী, পুত্র কন্যারা, আঁখি তারা
সম, ছিল রাজা সকলি আমার, কিন্তু
বিশ্বাস কি হবে তব আজ, দেখিয়া এ
দীন বেশ, জীর্ণ দেহ মোর? বুঝিবে কি
পারিবে কি কণামাত্র সাক্ষ্য দিতে তার!

ভিঃ—রাজা! সমাজ নিয়েছে কেড়ে সব!
নীচ, স্বার্থপর এই তস্কর সমাজ,
নির্ম্মম পিশাচ আসি' গ্রাসিয়াছে,
ভাঙ্গিয়া দিয়াছে মেরুদণ্ড মোর, কিন্তু
তবু আছি বেঁচে, শুধু তব তরে, শুধু
বারেকের তরে তোমার সদনে আসি
কহিবার তরে এই মর্ম্মবাণী মোর।
রাজা! শুনেছ কি 'বরপণ' কথা? কভু
বিবাহ-প্রস্তাব মাঝে দেখেছ কি তার

পৈশাচিক নরক ভঙ্গিমা? যার তরে
আজ মোর এই রিক্ত বেশ, যার তরে
অন্তরেতে মোর, সদা জ্বলে ক্ষিপ্ত বহ্নি।
কন্যার বিবাহে মোর সকলি গিয়াছে,
আছে শুধু বিদীর্ণ কুটীর, আর আছে
চক্ষু জুড়ে তার এক হাহাকার, যেন
কত ছিল আর, কত সে সম্ভার, আজ
প্রাণে তার মহারোল মহা শূন্য তার।
মাঝে মাঝে মনে হয় রাজা বুঝে দেখি;
সমাজের মুখোমুখি দাঁড়ায়ে বারেক,
দেখিবারে সাধ যায় ক্ষমতা তাহার।
কিন্তু হায় কা'রে ল'য়ে যা'ব, কার তরে
কে যাবে সমরে! সকলি আপনা লয়ে
ফেরে নীচ স্বার্থের তল্লাসে! রাজা! রাজা!
বিরাম মাগিছে কণ্ঠ, আর নাহি পারে,
আর না সরিছে কথা কণ্ঠ চেপে আসে।
এর কি নাহিক রাজা কোন প্রতিকার?

রাঃ—কি করিতে কহ তব তরে? দুঃখ তব
ঘুচাইতে বল মোর কিবা শক্তি আছে?

ভিঃ—কি কহিলে রাজা, শক্তি তব? স্বর্গ হতে
ভাগীরথী নির্ঝরিণী মত বরষিবে
তব ঐ শিরে; বারেকের তরে শুধু
দাঁড়াও উঠিয়া। আর কি কহিব রাজা
মোর দুঃখ তরে চাহিতেছি তব এই
করুণার দান! মোর তরে নহে রাজা
চাহি মোর স্বদেশের তরে। পথান্তরা
শান্তির নিলয়, শ্মশান সমান আজি!
কাঁদে হিয়া, তাই কৃপা চাহি রাজা!
তাই আসিয়াছি কৃপার ভিখারী হয়ে।
কাঁদিবে কি রাজা? ঝরিবে কি আজি তব
ঐশ্বর্য্যের আঁখি হ'তে এক ফোঁটা জল?
আশায় বাঁধিয়া বুক চলিনু রাজন্!
প্রণাম চরণে তবে বিদায় এখন্!

(ভিখারীর প্রস্থান)

রাজা—ভগবান কাতরের করুণ ক্রন্দন
শুনিয়া থাকেন যদি, হবে প্রতিকার।
ভৃত্য আমি চেষ্টা মাত্র সার, সফলতা
তাঁহার বিধান। (ধীরে প্রস্থান)

(সমাপ্ত)

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ নিয়োগী।

প্রার্থনা।

প্রভাতে মধুর হেসে দিবাকর ওঠে ভেসে
জাগে পাখী গেয়ে নাথ! মহিমা তোমার;
তরুলতা ব'সে বনে ডাকে তোমা নিজ মনে
তব পায় ফুলহার দেয় উপহার।
ঘুম ভেঙ্গে অলি ধায় মুখে তব গুণ গায়:—
"জয় জয় দয়াময় জগত জীবন।"
মৃদুল মধুর গেয়ে ফুলের সুরভি নিয়ে
তব পদ পানে ছোটে মলয় পবন।
আবার সাঁঝের বেলা ফুরায় জীবন খেলা
ঘুম ঘোরে মুদে আসে ধরার নয়ন,
পাখী, ফুল, অলি, মিলি দেয় সবে হুলাহুলি,—
"জয় জগতের নাথ! জগত পালন!"
নিশার চাঁদের ছটা, তারার মোহন ঘটা,
চাঁদ তারা ডেকে বলে, "কি দেখিবি আর,
"আমাদের যে গড়েছে সে যে দেখা কাছে আছে
আমাদের মাঝে দেখ তাঁরে দেখা যায়।"

সকলেই পূজে তোমা তুমি যে বিশ্বের পতি
মোরা শুধু ভুলে থাকি চাহি না তোমার প্রতি।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ নন্দী।

হরিনাম।

এস, ভাই সাধক! এস, ভাই শাক্ত-বৈষ্ণব! এস, ভাই ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান! এস, ভাই হিন্দু-মুসলমান! তোমরা সকলে সমস্বরে 'হরিবোল' বলিয়া শ্রীভগবানের অমিয়-মধুর নাম কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হও—পবিত্র হও, মানব জন্ম সার্থক কর। তোমাদের শ্রীমুখের 'হরিবোল।' 'হরিবোল!' মধুর রবে এবিশ্ব পূর্ণ হউক। সাধু-ভক্ত তোমরা,—তোমাদের পদরজস্পর্শে তোমাদের পবিত্র মুখে পবিত্র হরিনাম শ্রবণে এ অধম ধন্য হউক, পবিত্র হউক, আমার মনের মলিনতা, প্রাণের কুণ্ঠা—জাতীয় ঘৃণা-বিদ্বেষ সব দূর হউক। তোমরা প্রাণ ভরিয়া তাঁহার নাম কর,—যিনি শাক্তের শিব-দুর্গা, বৈষ্ণবের হরি-কৃষ্ণ-চৈতন্য—যিনি ব্রহ্মবাদীর নিরাকার ব্রহ্ম, হিন্দুর ঈশ্বর, মুসলমানের খোদা এবং খ্রীষ্টানের গড্, একবার তাঁহার পবিত্র নামে আত্মসমর্পণ কর। 'হরিবোল!' 'হরিবোল!' বলিয়া প্রাণের ব্যাকুলতায় সদা তাঁহাকে ডাক; ভক্তের ভগবান তিনি, প্রেমের ঠাকুর তিনি, দয়ার অবতার তিনি—তোমাদের শ্রদ্ধা ভক্তিতে, ব্যাকুল প্রাণের বহু সাধনায়—'হরিবোল'! 'হরিবোল!', বলিয়া সরল শিশুর ন্যায় আকুল ক্রন্দনে তিনি অবশ্যই দয়া করিবেন। বল, সাধক! অবিরাম শুধু 'হরি হরি' বল; হরিনামের মত এমন পতিতপাবন নাম—পাতকী উদ্ধারের এমন সরল পন্থা আর নাই। ঐ দেখ ভক্ত কবি গাহিতেছেন,—

"নামে সুধারস কে নিবি রে আয়।
এ যে দেবের দুর্লভ হরিনাম,
নামে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যায়,
নামের গুণে বোবায় বলে, পঙ্গু চলে,
অন্ধ চক্ষে দেখ্‌তে পায়॥

আবার,—"হরিণাম কি মধুর নাম।
নাম শুনে যে জুড়ালো রে প্রাণ॥
ওসে হরিনামের মোহন গুণে
গ'লে যায় কঠিন পাষাণ;
আর বল্‌ব কি নামের মহিমা
মরুভূমে ডাকে বাণ॥"

(৫)

এ বিশ্বে কেহই শ্রীভগবানের অপার কৃপায় বঞ্চিত নহে। তিনি পাপী-তাপী সকলকেই দয়া করিয়া থাকেন। বরং পাতকী-পাষণ্ডের প্রতিই তাঁহার সর্ব্বাধিক করুণা। কিন্তু আমরা না চাহিলে তাঁহাকে পাইব কেমন করিয়া?" "বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।" ভক্তি-বিশ্বাসহীন শুষ্ক যুক্তি-তর্কের ভিতর দিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহাকে পাইতে—তাঁহার করুণা লাভ করিতে চাহিলে, নিরভিমান সরল ভক্তি-বিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন। ভগবানের এক নাম দীনবন্ধু।

অহঙ্কারী পাপী যারা,
তাঁহার নাগাল পায় না তারা,

দীনজনের বন্ধু তিনি সকলে জানে।"

অভিমানে যাহাদের মস্তক উন্নত, অহঙ্কারে যাহাদের বক্ষ স্ফীত,—ধন, মান, জ্ঞান ও কুলশীল প্রভৃতির দুর্জ্জয় অভিমানে ধরাখানি যাহাদের নিকট সরাখানির মত, জগতের অনন্ত সম্পদে যাহারা নিয়ত মুগ্ধ, তাহারা স্বয়ংই ত এক একটী ঈশ্বর! তাহারা আবার কোন্ অজ্ঞাত ভগবানের চরণে মস্তক অবনত করিবে?

"ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান
সুখী।
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি
সদৃশোময়া।

আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান, আমি সুখী এরূপ আমিত্বের মহা বোঝা—অভিমানের বিশাল পর্ব্বত অবিরত যাহার বক্ষ চাপিয়া আছে, তাহার হৃদয়ে শ্রীভগবানের পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার স্থান কোথায়? তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে, দীনবন্ধুর দয়া লাভ করিতে হইলে, চাই ঐকান্তিক দৈন্য; তাঁহাকে পাইতে চাহিলে ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার, বিদ্যার গৌরব, কুলের অভিমান, সব বিসর্জ্জন দিয়া দীনতার পূত গঙ্গাজলে—ভক্তি-বিশ্বাসের পবিত্র অশ্রুপ্রবাহে হৃদয়-মন্দির ধৌত করা চাই। অভিমান শূন্য নির্ম্মল হৃদয়ে তাঁহার জন্য পূর্ণ বিকাশের স্বর্ণসিংহাসন স্থাপন কর, তখন দেখিবে দীনের ঈশ্বর কাঙ্গালের ঠাকুর, ভক্তের ভগবান তোমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন। শ্রীভগবানের করুণা লাভ করিতে হইলে,—

ঐশ্বর্য্য হইতে নামিয়ে আসিয়ে
ডাকিয়ে দৈন্যেরে কর হে বরণ;
পদে দলি তুচ্ছ বিভব-জঞ্জাল
ছিন্ন করি দাও আসক্তি-বন্ধন।
আঁধার হইতে এস হে আলোকে
অনলে দহিয়া ভোগ-নিকেতন;
নত শিরে ডাক এস ভগবান,
এস হে দয়াল অনাথ-শরণ।

অহঙ্কার ভাল নহে, অহঙ্কারী জীব হইতে ভগবান বহু দূরে থাকেন।" "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুতা।" ইহা বৈষ্ণব-শাস্ত্রের কথা। তৃণ হইতে নীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া শ্রীভগবানের সেবা করিতে হয়। কিন্তু অভিমান ত্যাগ করা বড় সহজ নহে; তাই কবি বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব হইতে বড় ছিল মনে সাধ,
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাধ।"

হৃদয় যাহার দুর্জ্জয় অভিমানে পূর্ণ, সে কি কখনও বৈষ্ণব হইতে—ভক্ত হইতে পারে? অভিমানে যে বক্ষ পূর্ণ, তথায় দৈন্যের স্থান কোথায়? তোমার কি আছে?—কিসের জন্যই বা তোমার এ অহঙ্কার? এ মাটীর দেহ মুহূর্ত্তে মাটীতে মিশিয়া যাইবে, তবে আর এত অহঙ্কার—অভিমান কেন?

"মাটি হ'তে হইয়াছে, মাটি হ'তে হবে।
মাটি হবার আগে কেন মাটী নহ তবে?"

অভিমান জিনিসটাই ভাল নহে, এমন কি ভক্তির অভিমানও ভাল নহে। ভগবানের এক নাম দর্পহারী; তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই জীবের দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন। সত্যভামার

দর্পচূর্ণের কথা আপনারা অনেকেই জানেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা, এক দিন তাঁহার মনেও এই অভিমান হইয়াছিল; তিনি ভাবিয়াছিলেন, "আমার মত ভক্ত বুঝি ভগবানের আর কেহ নাই,—আমিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।" তাই ভগবান তাঁহার দর্পও চূর্ণ করিয়াছিলেন।

তাই অর্জ্জুন মাটি হইয়াছিলেন, চূর্ণ অভিমান অর্জ্জুন মাটি হইয়াই বলিয়াছিলেন, "শিষ্যস্তেহং সাধিমাং ত্বাং প্রপন্নাম।" সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার অমিয় মধুর উপদেশে তাঁহার প্রিয় সখা অর্জ্জুনের জ্ঞাননেত্র পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছিলেন। অভিমান শূন্য না হইলে ভগবচ্চরণ লাভ করা যায় না। অভিমান ত্যাগ বড় শক্ত কাজ,তাই ভক্ত ভগবানের এত প্রিয়।

"ভক্তিহীন নর সুধা দিলে সুধাই নারে,
ভক্ত জন বিষ এনে দিলে খাই।"

ভক্তের প্রতি ভগবানের এরূপ দয়া নিত্য সত্য। দীনের প্রতি—ভক্তের প্রতি ভগবানের এত কৃপা বলিয়াই তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামার প্রতি এত অনুরক্ত—বিদুরের তণ্ডুল-কণার জন্য এত লালায়িত! এখানে ভগবদ্ভক্ত বিদুরের গৃহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আতিথ্য গ্রহণ সম্বন্ধীয় অদ্ভুত কাহিনীটি একবার স্মরণ করুন। বস্তুতঃ ডাকার মত ডাক্‌লে পরে, সে কি কখন থাক্‌তে পারে? তাই কৃষ্ণভক্ত কবি গাহিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ বিনা সংসারেতে বন্ধু নাহি আর।
অনাথের নাথ কৃষ্ণ সংসারের সার।
ভকত বৎসল প্রভু দেব জগন্নাথ।
নিয়ত রহেন তিনি ভক্তগণ সাথ।"
(যম-সংহিতা)

ভক্তের প্রতি ভগবানের এত দয়া বলিয়াই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডালকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলের পথে হরিভক্ত রজকের কাপড় কাচিয়াছিলেন, দক্ষিণ দেশের দুরন্ত দস্যু নওরোজীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং কূর্ম্ম তীর্থে কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ বাসুদেবকে মুক্ত করিয়া ভক্তি-মহিমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাই, ভাই! ভক্তিভরে প্রাণ খুলিয়া একবার 'হরি হরি' বলিয়া ডাক,—কাঁদ, ভাই! জীবন-সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইতে না হইতে 'হরি বোল! হরি বোল!' বলিয়া ভূতলে লুটাইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য একবার কাঁদ; পুত্র-শোকাতুরা জননীর মত একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদ। জল স্রোতের ন্যায় সময়-স্রোত যে অবিরাম বহিয়া যাইতেছে! তাই বলি ভাই! একবার "হরি হরি" ব'লে ডাক; যখন পাঁচ ভূতে মিলে সকলি তোমায় ফেলে, কে কোথায় যাবে চ'লে তার কি খবর রাখ?" বল, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

কবি বলিয়াছেন,—

"যে বুঝেছে মর্ম্ম নশ্বর সংসার দেখি
ভাবে সে তো ধন রত্ন তুচ্ছ পদরেণু প্রায়;
জানে সে জীব যৌবন গিরিনদী বেগ সম
মনুষ্য জলের বিন্দু জীবন বুদ্বুদ প্রায়।"
(বিজয়-গীতিকা)

ইহার জন্য আবার এত যত্ন—এত মান অভিমান কেন? এ সবই ত নশ্বর, সবই জলবিম্ববৎ ক্ষণস্থায়ী! ইহার জন্যই কি "পবিত্রতা দিলে ধরে; পায়ে ছুঁড়ে ...

ইহার জন্যই কি "কলুষ কলসী
লীলা-অঞ্জন চোখে" ফির সদা জগতের
ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! এভাব
ণ করিয়া একবার শ্রীভগবানের পাদ-
এই নিবেদন কর যে, "মোরে কর
ন, সত্য পথে অনুগামী।" একবার
রি! যেমন ভাবে রাখবে তুমি, তেমনি
াকিব।" একবার বল, "হরি চিদাভাস
প্রকাশ, মায়া-তমোনাশ তব পরশনে।
উদয়, তুমি ব্রহ্মময়, হর ভব ভয়, বিহিত
" (বিজয়-গীতিকা)। হরি নামের
াপে একবার সত্য-স্বপ্রকাশ হইলে
চিন্ময় পদার্থের আবির্ভাব ঘটিলে,
দের মায়ারূপ অন্ধকার অন্তর্হিত হইবে,
সংসার আসক্তি কাটিয়া যাইবে। তখন
প্রাণ নব ভাবে গঠিত হইয়া আপনি
উঠিবেঃ—

ঃ এ আশ্রমে আজি পাতিনু আসন।
ভাব ল'য়ে চিতে চিন্তায় মগন॥"

(বিজয়-গীতিকা)

ন তোমার প্রাণ পুলকানন্দে নাচিয়া
াহিবেঃ—

ার মাঝে, সদাশিব রাজে,
দের ধ্বনি, অনাহতে বাজে,
ন্ত বিভূতি অনন্তেই সাজে।
অনন্ত সাধনা করিব।"

(বিজয় গীতিকা)

তাই ভক্ত! আমরা একবার 'হরি
হরিবোল!' বলিয়া শ্রীভগবানের
াইয়া পড়ি—একবার তাঁহার
অবিনশ্বর অনন্ত রূপরাশির ধ্যান করি; ধ্যানস্থ
হইয়া অবিরাম বলি,—হরিবোল! হরিবোল!
হরিবোল! ঐ দেখ, ভক্ত কবি প্রাণ ভরিয়া
গাহিতেছেন,—

"কি মধুর রূপ তাঁর সদা জাগে প্রাণে,
কি মধুর কথা তাঁর সদা পড়ে মনে।
কি মধুর! কি মধুর তুলনা ত নাই,
কি মধুর মাধুর্য্য-স্রোতে আপনা হারাই!
মধুর সে হয় তাঁর সকলি মধুর,
চির মধুরতাময় সে যে পরম মধুর।"

(আনন্দ বাজার)

ব্রজগোপীগণ এ মধুর ভাবে আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা জগতের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যিনি এ মধুর ভাবে আকণ্ঠ ডুবিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই মানব-জন্ম সার্থক হইয়াছে,—তিনিই ধন্য হইয়াছেন! আবার তিনিই কুল, শীল, মান ত্যজিয়া 'হরিবোল! হরিবোল!' বলিয়া পাগল হইয়াছেন! এস, ভাই! নাম-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিবে ত 'হরি বোল! হরি বোল! হরি বোল!' বলিয়া বিশ্ব ভুলিয়া বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে ছুটিয়া এস, বল, হরিবোল! হরি বোল! হরিবোল! হরি হরিবোল!

"প্রণতি করিয়া ভাই শুন সজ্জন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম বল অনুক্ষণ॥
তীর্থযাত্রা হোম আদি নানা দান করি।
তথাপি না পাইবেক লভিতে শ্রীহরি॥
ভকত বৎসল প্রভু দয়াল ঠাকুর।
কলিযুগে হরিনাম শুনিতে মধুর॥
বন্ধু বান্ধব দেখ পুত্র পরিবার।
মৃত্যুকালে সঙ্গে দেখ না যায় কাহার॥
প্রাণ ছাড়ি দেহ পড়ি রহে সর্ব্ব ঘরে।
পুত্র পরিবার বলে চলহ সত্বরে॥
ধরাধরি করি লয় শ্মশান নিকটে।
চিতা জ্বালি দাহন করয়ে দিব্য ঘাটে॥
জলাঞ্জলি দিয়া তারা চলি যায় ঘরে।
হরিনাম বিনা জীবে কেবা মুক্তি করে?"

(যম-সংহিতা)।

ক্রমশঃ। শ্রীবরদাকান্ত ভাগবত

বৃদ্ধবয়সে শক্তিহীনতা।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "বঙ্গদর্শনে" একবার লিখিয়াছিলেন ;—"আধুনিক ভারতবর্ষে যিনি কায়ক্লেশে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া সমাপ্ত করিতে পারিলেন, তিনি শ্রমশীলতার আদর্শস্বরূপ সমাজে পরিচিত হইয়া উঠেন। অথচ স্কট, সৌদী প্রভৃতি ইংরেজী লেখকেরা কত লিখিয়া গিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। জেমস্ একা প্রায় আশী খানি উপন্যাস গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।"

ইংলণ্ডের ডাক্তার আলফ্রেড রসেল ওয়ালেস নব্বই বৎসর বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ পুস্তক রচনা করেন। তিনি ৮০ বৎসর বয়সের পর চার খানা খুব বড় বড় পুস্তক প্রকাশ করেন। টেনিসন বৃদ্ধ বয়সে উৎকৃষ্ট ও অধিকসংখ্যক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 'ক্রসিং দি বার' (Crossing the Bar) নামক সুবিখ্যাত গীতি-কবিতা তিনি ৮৩ বৎসর বয়সে লিখিয়াছিলেন। লক্স্লিহল ২২ বৎসর বয়সে রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরিশিষ্ট ৮২ বৎসর বয়সে লিখিয়াছিলেন। নিউটন ৮৩ বৎসর বয়সে উদ্যমশীল যুবকের মত পরিশ্রম করিতে পারিতেন। হার্ব্বার্ট স্পেনসারের ঐ বয়সে মৃত্যু হয়, কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ল্যাণ্ডর ৮৫ বৎসর বয়সে একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমাপন করিয়া ৮৭ বৎসর বয়সে আবার Heroic Idylls নামক গ্রন্থের শেষাংশটুকু প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

জর্ম্মাণ কবি গেটে আশী বৎসর বয়ঃক্রমকালে "ফষ্ট" নামক বিখ্যাত কাব্যের রচনা-কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। র‍্যাঙ্কে ঐ বয়সেই 'জগতের ইতিহাস' লিখিতে আরম্ভ করিয়া ৯১ বৎসর বয়সের মধ্যে ঐ গ্রন্থের দ্বাদশ খণ্ড লিখিয়া যান। গ্রীকদেশীয় কবি সাইমানিডিস ঐ বয়সেই কবিতা লিখিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বাফন (Buffon) ৮১ বৎসরে তাঁহার জীবনের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা তাহাই লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গ্লাডষ্টোনের কর্ম্মক্ষমতা ও শ্রমশীলতা অপরিমিত। ৮০ বৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডের চতুর্থবার মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে বাঙ্গালীর উপর,—বিশেষতঃ বাঙ্গালার কবি, মনীষী ও মনস্বীদিগের উপর বিধাতার অভিশাপ আছে। এখন "বাঙ্গালীর বল-বুদ্ধি-ভরসা ৪০ না হ'তে ফরসা।" অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গভূমি শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। যে বয়সে পাশ্চাত্যগণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, আমাদের দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তখন শ্মশানচিতায়। বিবেকানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী, ভাবুক, কবি, লেখক, ধর্ম্মপ্রচারক, নাটাকার, সমাজসংস্কারক সকলে ৪০ বৎসর বয়সে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। উদীয়মান কবি সতীশচন্দ্র রায় ও সুদক্ষ সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে ৩০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঈদৃশ লেখকগণের নিকট বঙ্গ সাহিত্যের অনেক আশা ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর কাল সে আশা সমূলে বিনষ্ট করিয়াছে।

আমাদের বৃদ্ধ সাহিত্যিকগণ লেখনী ত্যাগ করিয়াছেন। "ভূপ্রদক্ষিণ" প্রণেতা চন্দ্রশেখর সেন ও "উদ্ভ্রান্তপ্রেমের" কবি চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্র হইতে একরূপ বিদায় লইয়াছেন বলিলেই হয়, কেবল সেন মহাশয়ের আর্য্যসাহিত্য-সমাজের সহিত সংস্রবের কথা মাঝে মাঝে শুনা যায় বটে। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাঝে মাঝে একটু আধটু লিখিয়া এ পক্ষে কতকটা মান রক্ষা করিতেছেন। কিছুদিন হইতে কবিবর রবীন্দ্রনাথও হাত গুটাইয়াছেন।

মানবজীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ মানবকে বৃদ্ধ বা যুবা করিয়া রাখে। ১৮ বৎসরের বালক যে দেশে পিতার পদ প্রাপ্ত হয়, সে দেশে অকালবার্দ্ধক্য বা বার্দ্ধক্যে কর্ম্মশক্তির একান্ত অভাব হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে।

কোন দেশের লোক ৮০ বৎসর বয়সে আপনাকে যুবক মনে করেন। আবার কোন দেশের লোক ৪০ বৎসরেই মনে করেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, বয়সে মানুষ বৃদ্ধ হয় না, মনের ভাব বৃদ্ধ হইলেই মানুষ বৃদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীরাধাচরণ দাস।

বিধবার প্রাণ।

(১)

পূজার অনতিপূর্ব্বে বগুড়া হইতে পাবনা যাইবার কালে মুকুন্দ আমাদের বাড়ী উপস্থিত হইলে, তার মুখে সৌদার অনেক প্রশংসা শুনিতে পাওয়া গেল। সে এবার পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে এবং প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। বিদ্যালয়-সভায় তার আবৃত্তি খুব ভাল হইয়াছিল বলিয়াও অনেক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। মুকুন্দর মুখে সৌদার যেরূপ প্রশংসা ও গুণাদি শ্রবণ করিলাম, তাহাতে মনে হইল সে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতীর মত। তাকে দেখিবার বড় সাধ হল, মুকুন্দকে তাহা প্রকাশ করিলাম; সে উত্তর করিল "এখানে সে মুখুজীদের বাড়ী প্রায়ই আসিয়া থাকে। মুকুন্দ সৌদার শিক্ষক। তার মুখে সৌদার অজস্র প্রশংসা ও গুণ-কথা শ্রবণে এমত মুগ্ধ

হইয়াছিলাম যে, তাহার চেহারাখানির কথাও জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলাম।

(২)

মানুষের গুণাদি শ্রবণে লোকের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও অনুরাগ জন্মে, কেবল মানুষের স্থূলদেহ দর্শন করিলে তাহা হয় না অথবা তাহার গুণাদি প্রকাশ পায় না।

সৌদা আমাদের গ্রামের মিছিল উপলক্ষে এখানে মৃন্ময়ীদের বাড়ী আসিলে তাহাকে প্রথম একপলক দেখিলাম। সৌদার রূপ সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাসও আমার চক্ষে পড়ে নাই। একবার দুইবার তিনবার, আরও অনেকবার তাহাকে দেখিলাম তাহার গুণাদির সঙ্গে চেহারার অনেক পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। চেহারা যাহাই হউক তাহার প্রশংসা ও গুণাদি শ্রবণে তাহার প্রতি আমার ভক্তি ও অনুরাগ জন্মিল। সৌদা তখন নিতান্ত বালিকা, বড় অভিমানিনী। একবার কথা বলিতে চেষ্টা করিলাম, 'খুকী' বলিয়া ডাকিলাম। সে লজ্জিতভাবে দৌড়িয়া গৃহকোণে লুকাইল; আর বাহিরে এল না। আমি বাধ্য হইয়া তখন ফিরিয়া আসিলাম।

(৩)

আবার মিছিল আসিল, সৌদাও আবার আসিল; আমি মৃন্ময়ীর সঙ্গে পরামর্শ করিলাম, সৌদাকে গোপনে এক চিঠি দিব। সৌদার এই সময় বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে। স্ত্রীলোক সাধারণতঃ অপরিচিত লোকের সহিত কথা বলিতে বড় লজ্জিত। অতএব লিপি এখানে পরিচয় করাই প্রশস্ত পথ বলিয়া মনে করিলাম; তাই কয়েক ছত্র লিখিলাম।

"সৌদা, তোমার প্রশংসা ও গুণাদি শ্রবণে তোমায় ভালবাসতে ইচ্ছা হয়, তাই ভালবাসি। তোমার সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বড় অভিমান তোমার; কথা বলিতে লজ্জা বোধ কর, তাই তোমাকে এই চিঠি দিলাম। কথা বলিতে ইচ্ছা না হয়; চিঠি দিতে পার।

আশীর্ব্বাদক

ভবেশ।

চিঠি লইয়া মৃন্ময়ী ধীরে ধীরে সৌদার পশ্চাতে গেল।

বেলা তখন ১০টা হইয়াছে, সৌদা তার মামীর ঘরে বঁটির সাহায্যে বেগুন, পটল, কলমীশাক কুটিতেছে। মৃন্ময়ী ধীরে ধীরে তাহার পিছনে গিয়া চিঠি খানি তাহার আঁচলে বাঁধিয়া দিল; পরে সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সৌদাকে দেখে বল্লে "কেমন, তোমার কি রান্নাবান্না নেই, এমন সময়ে তুমি আমার কাছে এলে?"

"রাঁধুনী আজ মা—ই কচ্ছেন; আমি ঘুরতে ঘুরতে তোমায় দেখতে এসেছি।"

"হাঁ বেশ; আমার এগুলি প্রায় শেষ হলো, তোমায় নিয়ে চল ওঘরে একটু বসি।"

কাজ শেষ করিয়া সৌদা দাঁড়াইতেই বুঝিল কাপড়ে কি বাঁধা আছে। আঁচল টানিয়া দেখিল একখানি কাগজ; তখন মৃন্ময়ীকে বলিল "নিশ্চয় তোমার এ চালাকী।" "আমি ত ভাই তোমার সামনেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, আমার চালাকী ত হতে পারে না।"

"আমার কাছে ত আর কেউ আসে নি।"

"অথবা তাই আমার দোষী করিও না।"

"তুমিই নিশ্চয়ই চালাকী করিয়াছ. তোমায় আমি দোষী করি না, আমি তোমার মনোনিত ভাবে খুব সন্তুষ্ট হলেম, কারণ তুমি পূর্ব্বে আমার সহিত এমন কর নাই।"

"তা ভাই তোমার যদি বিশ্বাস হয়, তবে আমিই করিয়াছি।" এই বলিয়া মৃণ্ময়ীও বেশ আনন্দানুভব করিল।

এই সময়ে মৃণ্ময়ীয়ের ঘরের কোণে আমি লুকাইয়া ছিলাম। ঐরূপ শওয়াল জবাবের পর উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিতে সৌদার দৃষ্টি আমার দিকে পড়িলেই সে চমকিত হইল। তার পর উভয়ে অনেক কথা-বার্ত্তা হইল। মৃণ্ময়ী চলিয়া যাইবার সময়ে সৌদা বলিয়া দিল "কাল সকালে আমার সহিত একবার দেখা করিও।"

পূর্ণিমার পূর্ণ নিশাকরের মত সৌদার কমল-হৃদয় নবযৌবনে ভরপুর। সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় তাহার জীবন-কুসুমটী কোন নবপ্রভাযুক্ত যুগার অপেক্ষায় গাম্ভীর্য্য প্রযুক্ত সৌদামিনীর মত টলটলায়মান। আঁচলে বাঁধা মধুময় লিপিখানি উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিলে তাহার হৃদয় আরও আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

দোয়াত কলম, কালী ও কাগজ সমস্তই প্রস্তুত ছিল। মৃণ্ময়ী চলিয়া গেলে আঁচলে বাঁধা চিঠি খানি দেখিয়া একখানি নাতিদীর্ঘ পত্র লেখা হইল।

"যদি ভালবেসেছেন, তবে আমি আপনার ভালবাসার পাত্রী। আমায় চরণে রাখিবেন এই মিনতি।"

আপনার স্নেহের

সৌদা।

চিঠিখানি মৃণ্ময়ী কর্ত্তৃক আমার কাছে এল ; মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাইল ও মনে মনে বেশ খুসীও হলেম।

এই চিঠি লেখা-লেখির পর অনেক দিন আর আমাদের উভয়ের অর্থাৎ সৌদা ও আমার সহিত দেখা শুনা হল না কিংবা পত্রাদি ব্যবহার চলিল না।

ধীরে ধীরে অনেকদিন চলে গেল ; পিতৃ-হীন নীরদ সৌদামিনীর পাণিগ্রহণ করিল। সৌদার ভাই-ভগ্নী আর কেহ ছিল না, তাই তার পিতা নীরদকে ঘর-জামাই করিলেন। সুখসম্ভোগে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। সৌদা তখন একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল।

সৌদা যখন এতটুকু মেয়ে তখন গ্রামের আচার্য্য-গণৎকার তাহার ভাগ্য-গণনা করিয়া তাহার পিতাকে বলিয়াছিল "মেয়ে চিরসুখী হবে।" সৌদার লক্ষণ দেখিয়া গণৎকার একথা বলিয়াছিল কি. তাহার ভাগ্যলিপি পড়িয়া এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, না সে দক্ষিণায় পূর্ণহস্ত হইবার জন্য একথা বলিয়াছিল, তাহা তখন কেহ ভাবে নাই। স্বীয় কন্যা ও জামাতাকে নিজের বাড়ীতে রাখিতে পারিয়া, গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করিয়া তিনি মনে মনে বেশ সুখী হইয়াছিলেন এবং আচার্য্যকে হাজার বার প্রণাম করিলেন। পুনরায়

আচার্য্য সৌদার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলে নিশ্চয়ই অযাচিত পুরস্কার লাভ করিতেন সন্দেহ নাই। কয় মাস গেলে আমোদ প্রমোদে ছেলের অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। জামাতা প্রায়ই বাড়ী থাকে না, বাণিজ্যলাভের আশায় সময়ে সময়ে বহু দূরদেশে গমন করিতে হয়। নিয়মিত চিঠি পত্রাদি না পেলে সৌদার পিতা বড়ই অস্থির হইয়া পড়েন। আজ প্রায় এক মাসের উপর জামাতার চিঠিপত্রাদি পাওয়া যায় নাই। চিন্তিত হৃদয়ে অস্থির প্রাণে জামাতার নিকটে আরজেণ্ট টেলিগ্রাফ করিল "শারীরিক কেমন আছ, তারে জানাও।" দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর আসিল। টেলিগ্রাফ উন্মুক্ত করিতে বাম পার্শ্বে টিকটিকির শব্দ হইতেছিল, একটু থামিয়া আবার উন্মুক্ত করিল। টেলিগ্রাফের ভাবার্থ এইরূপ "নীরদের সন্ন্যাসরোগে মৃত্যু হইয়াছে।" টেলিগ্রাফ যে করিয়াছে সে কোন দিন পরিচিত নয়, তবে অনেক ব্যবসায়ী।

সৌদার পিতা মাতাদের ন্যায় টলিতে টলিতে অস্থির হইয়া স্ত্রীর কাছে ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন।

(৫)

বাঙ্গালা দেশে পতিহীনের যেরূপ হইয়া থাকে, সৌদার সেরূপ হইতে বাকী রহিল না। ললাটের সিন্দূর মুছিল, হাতের শাঁখা ভাঙ্গিল, রহিল কেবল একখানা ধুতি, তাহাও পেড়ে নয় সাদা।

[illegible] দিনের কাজকর্ম্মের পর সৌদা নিজের ঘরে গিয়া বসিল, ভাবনা-পূর্ণ হৃদয় কেমন ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। কুটীরের জানালা খোলা ছিল, বসন্তের মৃদু বায়ু ঘরে প্রবেশ করিয়া গায়ে লাগিতেছিল। সেই স্নিগ্ধ বায়ুতে সৌদার হৃদয় অলস হইয়া পড়িল। বিছানায় শয়ন করিলেই নিদ্রাদেবী তাহাকে আকর্ষণ করিল।

নিদ্রাবেশে সৌদা এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিল। সৌদা প্রশস্ত, সুদীর্ঘ রাজপথে চলিতে চলিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজপথ সন্নিহিত বহুযোজন বিস্তৃত জনমানব প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইল। নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে বাসযোগ্য গৃহ দেখিতে পাইল না। নিকটে ও দূরে দুই একটি আলো দেখা যাইতেছে। পথ ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইল। ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইয়া গেলে চক্ষে আর কিছু দেখা গেল না, তখন একটী গাছতলায় বসিয়া পড়িল। খানিক পরে বহুদূরে একটী আলো গেল। সেই আলোকরশ্মি রাজপথ ধরিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়া যেন পথহারা পথিকের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। সৌদা আলোর সাহায্যে পুনরায় পথ চলিতে লাগি বহুদূর গিয়া দেখিতে পাইল—দুই দিকে দুইটি সুপ্রশস্ত, সুদীর্ঘ রাজপথ। দুই পথ বাহিয়া স্ত্রী পুরুষ গমন করিতেছে। একটির পথ অন্ধকারময় আর একটি আলোয় ভরা; যেন সে স্বর্গের সুগম পথ দেখাইয়া দিতেছে। ভাবিতেছে "আমি কোন পথ দিয়া যা এমন সময়ে পিছন হইতে কে কদিবগম্ভীর

[illegible]লিয়া উঠিল, যাহারা কুপ্রেমে আত্মহারা, [illegible]হারা বামপার্শ্বস্থ অন্ধকারজনিত শঙ্কটময় [illegible] গমন করিবে। আর যাহারা [illegible]প্রেমের বশবর্ত্তী তাহাদের ঐ আলোক-[illegible] সুশোভিত স্বর্গীয় পথেই গমন করিবার [illegible]।"

সৌদা উত্তরে বলিল "যদি কোন কুচরিত্রা [illegible] ঐ স্বর্গীয় পথে অগ্রসর হয়?"

তখন পিছন হইতে আরও জলদগম্ভীর [illegible] প্রত্যুত্তর করিল "তাহাদের বাধা প্রদানের [illegible] অবিরত আমরা এখানে পাহারা [illegible]তেছি।"

রাত্রি তখন বোধ হয় অধিক হইয়া [illegible]য়াছে, সৌদার হঠাৎ চৈতন্যলাভ হইল। [illegible]খে আলমারীর উপরে কতকগুলি কাগজ [illegible], তাহার উপরে কয়েকটী ইন্দুর দৌড়া-[illegible]দৌড়ি করিতে করিতে এক খানা কাগজ [illegible] সৌদার বিছানার উপরে আসিয়া পড়িল। [illegible] একখানি বহু দিনের চিঠি। চিঠি [illegible]খিয়া সৌদার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল।

[illegible]ষ্ণের কথা মনে ছিল কিনা জানি না, [illegible] মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং মনে [illegible]ল—

[illegible] বাসিলে ভাল যাতনা কি যাবে তার
মিটিবে কি আশা?
[illegible] জলধর ধ্যান, তৃষ্ণার্ত চাতকের
মিটে কি পিপাসা?"

(৬)

[illegible] বৎসর চলিয়া গিয়াছে। জীবনের [illegible] সুখ, কত দুঃখ, কত হর্ষ-বিষাদ, কত আনন্দ-নিরানন্দ কত সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। তাহারও মধ্যে মাঝে মাঝে সেই সৌদার কমলহস্তের লিপিখানি মনে পড়িত।

বসন্তের সন্ধ্যা সমীরণে আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে আমার সাম্‌নে করযোড়ে একটী রমণী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান হইয়া কি যাচ্ঞা করিতেছে। অনেক দিন পূর্ব্বে সৌদাকে দেখিয়াছিলাম। এখন দেখিয়া চিনিয়া উঠা বড় দায় হইল। ললাটে সে রক্তিমাভা নাই, হাতে সে সাধের শঙ্খ নাই, পরিধানে সে পাশিপাড়ী নাই; কেবল একখানা সাদা ধুতি; হৃদয় শুষ্ক অথচ অধরে প্রেমের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধীর চিত্তে তাহাকে দর্শন করিলে মনে হয় যেন তাহার অন্তরে কত আকাঙ্ক্ষা প্রপূরিত। তাহার যেন মুখ ফুটিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে —"বিধবার কি আকাঙ্ক্ষা করিবার কিছু নাই? সে কি পাষাণ—সে কি পুতুল? জগতে কি তার কামনা করিবার কিছু নাই?" আমি তাহার দৃষ্টিতে ব্যাকুল হইয়া বলিলাম,—"তুমি কি সেই সৌদা? তোমার আকাঙ্ক্ষা কি?" কেমন করুণ কণ্ঠে সে বলিল,—

"দেব! আমি সেই সৌদা
তব হৃদয় যারে প্রেমার্থ অভাগিনী।"

"সৌদা তুমি ব্যাকুল হইও না, তোমায় আমি পূর্ব্ব হইতেই ভাল বাসি, আজও ভাল বাসিব, চিরদিনই তোমায় ভালবাসিব, স্নেহ করিব। তুমি বিধবা হইলেও আমার নিকট এখনও তুমি নিতান্ত বালিকা, সন্তান তোমার

লাভ হয় নাই; ভাল মন্দ বিচার করিতে জান না। তুমি আমার কাছে থাক, চিরদিন থাক, আমি তোমায় অনেক উপদেশ প্রদান করিব—গ্রহণ করিবে তো?"

"দেব! আজ হতে আমি আপনার দাসী, সহধর্ম্মিণী, প্রেমাঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী। আপনি যাহা উপদেশ দিবেন, সাদরে তাহা গ্রহণ করিব।"

"দেখ সৌদা; তুমি আমার দাসত্ব করতে আস নাই, আমিও তোমায় দাসীপনা করতে দিব না। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী নও, প্রেমাঙ্গিনী নও, অর্দ্ধাঙ্গিনী নও, তুমি আজ হতে আমার প্রাণের ভগিনী। ব্রত ও সংযমই তোমার জীবনের কাজ। তুমি বাঙ্গালীর মেয়ে, বঙ্গদেশের শাস্ত্রানুসরণ করিবে। উচ্ছৃঙ্খলতা কুলালয়া মনে আনিও না, জানিও বাঙ্গালী-কন্যার সতীত্ব ও ধর্ম্ম রক্ষাই জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন।"

সৌদা নির্ব্বাক নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, আমার কথা শেষ হইলে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশের পানে চাহিয়া স্বগত বলিল,—

"হে মঙ্গলময় বিধাতঃ! তোমার সুবিচারে আমায় রক্ষা কর।

আজ অনেক দিন হইতে একটী আশার অঙ্কুর হৃদয়ে রোপিত করিয়াছিলাম। তাহা ক্রমশঃ ফলে পরিণত হইতেছিল, কিন্তু হে বিধাতঃ! তুমি আমার আশার প্রেমদ্বারে কুঠারাঘাত করিলে।

"তবু বুঝিল না মন।

শুধু চিত্ত ভেঙ্গে গেল, শুধু প্রাণ দগ্ধ হল,
আশার একটি কণা হল না পূরণ।
তবে কেন তার আশা তবু কেন ভাল বাসা
জাগ্রত নয়নে তবু কেন সে স্বপন।
হায় বুঝিল না মন।
এইরূপে যাবে দিন—
যাবে মান যাবে বল, যাবে সুখ যাবে দুখ
গিয়াছে হৃদয়,— যাবে হতাশ জীবন,
এমনই অতৃপ্ত বক্ষে; এমনি সজল চক্ষে,
আগুন শয্যায় শেষ মুদিব নয়ন
তবু পাবনা সে ধন।"

সন্ধ্যা অতীত হইয়া অন্ধকার সমাগম হইল, মৃদুমন্দ সমীরণে সৌদার হৃদয় অশান্ত হইয়া আসিতেছিল।

এমন সময়ে অপর গৃহে কে গান করিতেছিল।

"নিদারুণ শাস্ত্রকার কোথা এসময়
দেখনা বারেক আসি রমণী হৃদয়।
বসি ঘরে নিরজনে, ঝরে অশ্রু দুনয়নে,
দেখরে সমাজ তার করুণ বদন,
কোমল অন্তর তার কত পোড়ে অনিবার
নিদারুণ পিতা মাতা কর দরশন,
হায়রে দুঃখীর দুঃখ বোঝে কোন জন?"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস।

হরিনাম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে নাস্তিক অনীশ্বরবাদী, সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না—পাপ-পুণ্য বা সুখদুঃখ মানে

১। দুর্জ্জয় অভিমানের দাবদাহে তাহার প্রাণ সদা জর্জ্জরীভূত ; অবিশ্বাসের অস্বাস্থ্যকর ... হৃদয়ে—সংশয়ের দারুণ আঁধারে তাহার অন্তঃকরণ চিরসমাবৃত! সে গভীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে চির-মঙ্গলময় অনন্ত করুণাসিন্ধু শ্রীভগবানের নির্ম্মল দয়া-জ্যোতিঃ প্রবেশ করে না,—তাহার অবিশ্বাস-বিষদগ্ধ অন্ধ-নয়নে সে সমুজ্জ্বল পবিত্র রশ্মি সহ্য হয় না!

চার্ব্বাক-দর্শন নাস্তিকতায় পূর্ণ। চার্ব্বাক বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বেশ্বরের সত্তাই স্বীকার করেন না; তাঁহার মতে ভগবান কল্পনার অদ্ভুত সৃষ্টি—ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই, কর্ম্মফল নাই, পাপ-পুণ্য নাই, ইহকালের পর পরকাল নাই, ইহকালেই মানুষের সব শেষ; সুতরাং খাও, দাও, মজা কর—কোন চিন্তা নাই।

পুত্র বিদ্যমান, অথচ তাহার জনক আকাশ-কুসুমবৎ কল্পনার সৃষ্ট অলীক পদার্থ, এ কিরূপ কথা; সৃষ্টি বিদ্যমান, অথচ তাহার স্রষ্টা কেহ নাই; ক্রিয়া আছে, তাহার কর্ত্তা নাই; ইহাকে উন্মাদ কল্পনা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? অন্ধের দর্শন শক্তি নাই বলিয়া বিশ্বসৌন্দর্য্যের বিদ্যমানতা অস্বীকার করিতে হইবে কি? কালার শ্রবণ শক্তির অভাব বলিয়া এ অনন্ত শব্দময় জগৎ শব্দহীন প্রতিপন্ন হইবে কি? বৃক্ষ হইতে ফল ভূতলে পতিত হয়, ইহা বলিয়াই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ স্থিরীকৃত হইয়াছে, জগতের ক্রিয়া দর্শনেই জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অতিকাল গভীর আঁধারেও মূষিকের দর্শন লাভে ... কিন্তু আমরাও ঘোর অন্ধকারে উহার দর্শন পাই না! কেন না, মানুষের দর্শন শক্তি বিড়ালের ন্যায় তত তীব্র নহে। সাধক কঠোর সাধনা প্রভাবে বহু পুণ্যফলে ভগবৎ দর্শনলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন; আমাদের তেমন পুণ্য—সেরূপ সাধনার বল না থাকিলে, জ্ঞান-চক্ষুর বিকাশ না হইলে, আমরা তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হইব কেমন করিয়া? এ পাপ চক্ষে সে ব্রহ্মজ্যোতিঃ—সে মহান্ তেজোময় বিরাটপুরুষের তেজোদীপ্তি সহ্য হইবে কেমন করিয়া? অন্ধকারপ্রিয় নিশাচর ক্ষুদ্র পেচক পাখীর ক্ষুদ্র নয়নে প্রখর জ্যোতিঃ সূর্য্যরশ্মি সহ্য হইতে পারে কি?

সাধক কঠোর সাধনা প্রভাবে একবার শ্রীভগবানের দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলে, তখন তিনি এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া যান—ভগবানের অনন্ত রূপ-মাধুর্য্যমোহে তিনি আর বিশ্বমানবকে সে সংবাদ দিবার জন্য এ পাপ-তাপময় সংসারে ফিরিয়া আসেন না। লবণের পুতুল মহা সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে, সমুদ্রে কত জল, সে সংবাদ প্রদানের নিমিত্ত আর তীরে ফিরিয়া আসে না; সে তখন অনন্ত সাগরাম্বুরাশির সহিত মিশাইয়া যায়। মানুষও বহু পুণ্যফলে, কঠোর সাধনাবলে একবার শ্রীভগবানের শ্রীচরণ দর্শন পাইলে—তাঁহার অনন্ত রূপসাগরে ডুবিয়া যাইলে সে আর বিশ্ব মানবকে সে সংবাদ দিবার জন্য এ জগতে ফিরিয়া আসে না। জীবের এরূপ ব্রহ্মদর্শন বা জগৎপতি জগদীশ্বরের সহিত অভেদ্ সম্মিলনের নামই নির্ব্বাণ মুক্তি।

এই অখিল বিশ্বের সৃষ্টিমূলে যে বিরাটপুরু-

বের মহতী শক্তি নিহিত আছে, তিনিই জগদীশ্বর—তিনিই হরি। তিনি অনন্ত, অব্যয় অচিন্ত্য, অচ্যুত—অমর। আমরা তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্ট—তাঁহারই স্নেহে প্রতিপালিত এবং তাঁহারই শুভ ইচ্ছায় নিয়ত পরিচালিত। তাঁহার প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত আমরা অসার, নিস্পন্দ—শক্তিহীন। আমরা তাঁহারই স্নেহে গঠিত—অনুগ্রহপালিত, আমরা তাঁহারই খাই তাঁহারই পরি, তাঁরই রাজ্যে বাস করি, সুতরাং তিনি পিতা, আমরা পুত্র; তিনি নিত্য, সুতরাং আমরাও অনিত্য নহি,—আমরাও অমর। মানবাত্মা চির অবিনশ্বর; দেহ ধ্বংসের সহিতই আমাদের সব ধ্বংস হইয়া যায় না।

মানব অমৃত-পুত্র—আমরা অমর,
জীর্ণ বাস সম দেহী ত্যজে কলেবর।

গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি
নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি
নবানি দেহী॥"

মানবাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই, ইনি বার বার উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন না। ইনি অজ, নিত্য, অক্ষয়, পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হইলেও ইঁহার নাশ হয় না। দেহী যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।

সংসার-ফল-হেতুভূত কর্ম্ম সমূহ ফলভোগ-সাধন দেহ উৎপাদন করিয়া থাকে। সাধু অসাধু সকলকেই এ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়; ফলভোগ ব্যতীত কাহারও কর্ম্ম বিনষ্ট হয় না।" খাও, দাও, মজা কর,—এখানেই সব শেষ, নাস্তিকের এ উক্তি নিতান্তই মূল্যহীন প্রলাপ বাক্য মাত্র! যথাঃ—

"যানি কর্ম্মাণি সংসার ফলহেতূনি সত্তম।
তানি তৎ সাধনত্বেন দেহস্যোৎপাদয়ন্তি বৈ॥
শরীরারম্ভকং কর্ম্ম যোগিনোঽযোগিনোঽপি বা।
বিনা ফলোপভোগেন নৈব নশ্যত্যসংশয়ম্॥"
(গীতা)।

এখানেই—ইহকালেই জীবের সব শেষ হয় না; জীবাত্মা স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া পুনরায় সংস্কারোচিত জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক স্থূল দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। শুধু দুই চারিবার দুই চারি জন্ম নহে, জীবাত্মা অনন্ত কাল বিদ্যমান থাকিয়া এইরূপ অসংখ্য জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"

হে পরন্তপ! তোমার—আমার বহু জন্ম গত হইয়াছে; কিন্তু আমি সে সকল জন্মের কথা জানি, আর তুমি অবিদ্যাবৃত বশতঃ সে সব জন্ম বিবরণ জান না।

আমাদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে যিনি ক্রিয়াযুক্ত করেন, তিনিই জীবাত্মা। কর্ম্ম নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মার জন্মগ্রহণের বিরাম হয় না; কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ—দেহধারণ করিতেই হইবে। মুক্তিতেও আত্মার ধ্বংস হয় না।

তখন তিনি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন।

বিশ্বমঙ্গলের জন্যই—আত্মার কল্যাণ বা আত্মোন্নতির নিমিত্তই, কর্ম্মফল ভোগের এ কঠোর বিধান। আলোককে ভালরূপ বুঝিবার নিমিত্তই, আঁধার সৃষ্টির প্রয়োজন; নব সৃষ্টির জন্যই নব দেহ গঠনের একান্ত আবশ্যক।

"সংসার স্রষ্টার নীতি সৃষ্টির কারণ,
জড়ে ও অজড়ে বৎস! সর্ব্বত্র সমান।
সৃষ্টি স্থিতি লয় যেন চক্রের মতন
ঘুরিতেছে বিশ্বে, নাহি তিলার্দ্ধ বিশ্রাম;
ধ্বংস বিনা সৃষ্টিস্থিতি, বৎস! অসম্ভব।
ক্ষুদ্র, তবু না মরিলে এই তৃণগণ,
নাহি সাধ্য তৃণ অন্য হইবে উদ্ভব;—
না পারিবে স্থিতি লাভ করিতে কখন।"

(কুরুক্ষেত্র)।

আত্মার ধ্বংস নাই; জীবের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ ও কর্ম্মফল ভোগ অনিবার্য্য। জীবকে কর্ম্ম করিতেই হইবে; কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কর্ম্মফলের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই কবি বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মত্যাগ নির্লিপ্ততা ভাবিও না মনে।
ভগবান কর্ম্মরত। বিপুল সংসার
কর্ম্মক্ষেত্র; নাহি কারো তিলার্দ্ধ বিশ্রাম।
জগতের সুখ মাত্র সুখ আপনার,
আমি জগতের অংশ—এ নিঃস্বার্থ জ্ঞান
যার কর্ম্ম-মূলে; কর্ম্মফলে কদাচন
নাহি ক্ষুদ্র স্বার্থ যার, নির্লিপ্ত সে জন।

(কুরুক্ষেত্র)।

নিষ্কাম বা নির্লিপ্ত কর্ম্মীকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব বলিতেন,—

"না করিও চিন্তা না করিও ভয়;
যা করেন ভগবান তাই হয়।
ভাব পরিচয়?—এক ভাব আর হয়।"

এ নিষ্কাম কর্ম্মী প্রাণের কথা। বিশ্বপ্রেমিক নির্লিপ্ত কর্ম্মী ব্যতীত এমন কথা যার-তার মুখে শোভা পায় না। এ শুধু মুখের কথা নহে; এ শ্রীভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা। ভগবানই সর্ব্ব কর্ম্মের একমাত্র কর্ত্তা, চিত্তে এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস পূর্ব্বক তৎপদে কর্ম্মফল অর্পণ করিলে জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে কেন? নিষ্কাম কর্ম্মীর আত্ম-পর ভেদ নাই; বিশ্বপ্রাণী সবই তাহার আপন জন।

"মিত্রকে যে ভালবাসে, সকামে সে ভালবাসা,
সেত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার!
শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ,
সেই জন দেবতা আমার!
পিতা মাতা, স্ত্রী ভ্রাতা, পতি, পুত্র মহাবিশ্বে
এই প্রেমে তৃপ্ত নাহি পায়।
অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি কি যে গো অনন্ত আছে
প্রেমান্ধ সেই দিকে ধায়!

(কুরুক্ষেত্র)।

ভগবানের প্রতি কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া নিষ্কাম-নির্লিপ্ত কর্ম্ম করাই কর্ম্মফল এড়াইবার প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থ—আমার ও আমির দুর্ভেদ্য দুর্গ-পরিখা বিদ্যমান থাকিতে মনের সেরূপ নিষ্কাম ভাব হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, ক্ষুদ্র সংসারকে বড় করিয়া এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে আপন সংসার এবং

বিশ্বপ্রাণীকে আপন জন বলিয়া ভাবিতে না পারিলে এ সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না। কবি বলিয়াছেন,—

"আপন পুত্রের মাতা, আপন মাতার পুত্র,
যে হয়, কি মহত্ত্ব তাহার ?
পরের পুত্রের মাতা, পরের মাতার পুত্র,
যে হয়, সে পুণ্য-পারাবার।"

(কুরুক্ষেত্র)

বস্তুতঃ বিশ্বপ্রেমিক নিষ্কাম কর্ম্মীর কর্ম্ম-জীবনই সার্থক! তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় কর্ম্মফলের অতীত; কর্ম্ম-জনিত কোন রূপ পাপ-পুণ্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না।

"ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম্ম নিষ্কাম যে কর্ম্মে রত,
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্মপত্রে জল মত
সর্ব্বভূতস্থিত ব্রহ্ম ; সাধ সর্ব্বভূত-হিত,
হইবে তোমার কর্ম্ম ব্রহ্মে হবে সমর্পিত।"

(কুরুক্ষেত্র)

কিন্তু আমাদের মত নিয়ত বিষয়াসক্ত সংসারাসক্ত আত্মস্বার্থরত ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে নিষ্কাম-নির্লিপ্ত কর্ম্মানুষ্ঠান—এ বিশাল বিশ্বকে আপন সংসার এবং বিশ্বপ্রাণীকে আপন জন বলিয়া ভাবা বড় সুকঠিন কর্ম্ম। ক্ষুদ্র কূপমণ্ডুক আমরা—আমাদেরও আমির গণ্ডীবদ্ধ এ ক্ষুদ্র গর্ত্ত সদৃশ ক্ষুদ্র সংসারের বাহিরে আমার এ স্বার্থাগ্নিলিপ্ত পাপ-নয়নের ক্ষীণ দৃষ্টি প্রসারিত হইবে কেমন করিয়া ? সে যে কঠোর সাধনাসাপেক্ষ ; সে মহাসাধনা-শক্তি এ অধমের কোথায় ? তবে কি আর আমার এ কঠোর কর্ম্মফলের হাত হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই ?—হায় ! তবে আমার দশা [illegible] হইবে ?—আমি কি কলুর চোক্ ঢাকা বলদের মত জন্ম জন্ম কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইব ? না, উপায় অবশ্যই আছে ; শ্রীভগবানের নাম করা—নিয়ত হরিবোল ! হরিবোল ! বলিয়া ডাকা, কর্ম্মফলের হাত এড়াইবার একমাত্র উপায়। আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে কর্ম্মফল-মুক্তির এমন সহজ সরল—এমন সুন্দর সুপবিত্র উপায় আর নাই। নামের বল বড় বল—নামের শক্তি বড় শক্তি ; হরিনামে পাবকশিখা [illegible] হরির ন্যায় নিয়ত কর্ম্মফল ক্ষয় হয়—পাপ তাপ দূরে যায়।

পতিতে যে ডাকে ভাল কি মহত্ত্ব তার ?
নিগুণ পাপীরে তুলে,
স্নেহে যে না নেয় কোলে,
প্রাণের ঠাকুর তিনি দেবতা আমার।

ইহাই এ জগতের প্রাণ-কথা। জীবের [illegible] প্রতি—পাতকী-পাষণ্ডের প্রতি ভগবানের [illegible] দয়া বলিয়াই—তিনি পতিতকে হাতে ধরিয়া উদ্ধার করেন বলিয়াই তিনি বিশ্বপূজ্য ভগবান। রাবণ রামের পরম শত্রু—মহাপাতকী, তথাপি তিনি জীবনান্ত কালে দশদিকে—অন্তরে বাহিরে রামমূর্ত্তি দর্শনে মগ্ন হইয়াছিলেন। এমনি ঈশ্বরের মহা সাধনা—ভক্তের [illegible] ভগবানের এমনি অপার অনুগ্রহ! হায় [illegible] কবে আমরা ভিতরে-বাহিরে দশদিকে শ্রীভগ[illegible] বানের মধুর মূর্ত্তি দর্শনে মগ্ন হইব! [illegible] আমরা হরিবোল ! হরিবোল ! বলিয়া তাঁহার অনন্ত রূপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়া [illegible]

শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভে কৃতার্থ হইব?—কবে 'হরিবোল' বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডের মহাবন্ধন-মুক্ত হইব? এস, ভাই সাধক! আমরা হরি হরি বলিয়া দু'বাহু তুলিয়া নাচিয়া গাহিয়া পাগল হই,—এস, একবার হরি হরি বলিয়া প্রেমভরে তাঁহার বিশাল কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ি। এস, সকলে মিলিয়া একবার উচ্চৈঃস্বরে বলি, হরি হরিবোল! বন্ধুগণ! একবার গগনস্পর্শী স্বরে বল, হরি হরিবোল! বিষয়াসক্ত! আমার বন্ধন ছিঁড়িয়া বল, হরি হরিবোল! মহাকর্ম্মী সর্ব্ব কর্ম্মের ভিতর বল, হরি হরিবোল!—সুখে-দুঃখে সকলে বল, হরি হরিবোল! সম্পদে-বিপদে বল, হরি হরিবোল! পতিসোহাগিনী! পতি-পদে মস্তক রাখিয়া ললাটে সাবিত্রীর সিন্দুর পরিয়া বল, হরি হরিবোল! পতি-পুত্রহীনা! নয়নের উষ্ণ অশ্রুবিন্দু অঞ্চলে মুছিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাসে বল, হরি হরিবোল! ভোগি! ভোগ-কালিমা ভক্তি-গঙ্গাজলে ধুইয়া বল, হরি হরিবোল! রোগি! রোগ যাতনা ভুলিয়া বল, হরি হরিবোল! মুমূর্ষু! মৃত্যুচিন্তা ছাড়িয়া বল, হরি হরিবোল! ক্রীড়াশীল! খেলার ছলে বল, হরি হরিবোল! কোলের শিশু! মাতৃ-স্তন পান করিতে করিতে বল, হরি হরিবোল! বিশ্ববাসি! বিশ্ব ভুলিয়া বল, হরি হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

> হরি হরি বল ভাই হরি কর সার,
> শ্রীহরি-চরণ বিনা সকলি অসার।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ কবিরত্ন।

কুচবিহার-বিপ্লবে।

চতুর্থ বিপ্লব।

ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিণাম অত্যন্ত বিভীষিকাময়। বিভাগি আগ্নেয়-গিরি নিবাসী জনগণ যেমন অগ্ন্যুৎপাতে নিঃসন্দেহ হইয়া নির্ভীক-চিত্তে উহার সান্নিধ্যে বসতি স্থাপন করে এবং ঐ স্থান যেমন বিহারশীল জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ হয়, ও কোলাহলময় হইয়া উঠে—অপিচ নিরুপম প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদের মধ্যে সমুন্নত ধনিবর্গের উন্নত চূড়াযুক্ত বিশাল হর্ম্ম্যরাজিতে শোভমান হইয়া, রম্য ক্রীড়া-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া থাকে; কুচবিহার রাজ্যও তাদৃশ্যাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। কুচবিহার রাজপুরুষগণ বুঝিতে পারেন নাই যে,—তাঁহারা কিরূপ নিরুপদ্রব ভিত্তির উপর অবস্থিত হইয়া রাজকার্য্যালোচনা করিতেছিলেন।

বিভাগি আগ্নেয় শৈলের অগ্ন্যুৎপাতে শৈলবাসী অথবা সান্নিধ্যনিবাসী জনগণের ও প্রদেশের ধ্বংসের ন্যায়, মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজ্যত্যাগের পর কুচবিহারবাসী রাজপুরুষগণ অথবা কুচবিহার-প্রকৃতিপুঞ্জ আহমদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া হতশ্রী এবং বিনষ্টগৌরব হইয়াছিলেন। রাজ্যও বিধ্বস্ত এবং উৎসন্ন হইয়াছিল।

উত্তর পূর্ব্ব ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় আহমপতি সুহুং মুং ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আসামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুচবিহার রাজ্য

যে সময়ে আসামে রাজ আক্রমণ করেন, তাহা ১৪৪২ সালের অন্তর্গত সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং তৎকালে আহম রাজ সুহং মুং এর রাজত্ব শেষ হইয়া তদ্বংশীয় অন্য কোন রাজার রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল। ইতিহাসে ঐ রাজার নামের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অতএব আমরা আহমপতি অথবা আহমেরাজ নামে উহার উল্লেখ করিব।

মহারাজ বিশ্বসিংহ অত্যন্ত তেজস্বী ও উদ্যমশীল বীরপুরুষ ছিলেন। অধ্যাত্ম-জ্ঞানেও ইহার হৃদয়-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল। হইবারই কথা,—(১) যিনি দেব দেব মহাদেব হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তিনি কখনও ইষ্ট বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারেন না।

এই হেতুই মহারাজ জীবনের শেষভাগে যোগানুরক্ত হইয়া হিমালয় গুহাবাসী হইয়াছিলেন। মহারাজ বিশ্বসিংহ তৈজস্বিনী শক্তি-সম্পন্ন ও সুদক্ষ কর্ম্মকুশলী বীরপুরুষ ছিলেন। ইনি যখন যে ব্যাপারে উদ্যম সহকারে লিপ্ত হইতেন, তাহাতেই সুনিশ্চিত জয়লাভে সফল-কাম হইতেন। তাহার জীবনে অভাব-দৈন্য রাহু-গ্রস্ত হইয়া হতাশা উপনীত করে নাই। কৃতকর্ম্ম কুশলতায় ইনি বিজয়পুর, বিজনী ও বিদ্যাগ্রাম প্রভৃতি এবং হিমালয় প্রান্তসংলগ্ন সমতল ভূমিভাগ ও আসামের বহুস্থান অধিকার করেন।

মহারাজ বাহাদুর রাজাভাতখাওয়ার পশ্চিমস্থ স্থানের ভোটরাজকে পরাজিত করিয়া কর প্রদানে বাধ্য করেন। মহারাজ যেস্থানে বিজয় লাভ করেন, তাহা অদ্যাপিও জয়গ্রাম বা "জয় গাঁও" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

মহারাজ জীবনের শেষভাগে বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিলে, তৎসদৃশ গুণবান্ স্বীয় পুত্র শ্রীমান নরনারায়ণ রাজ্য লাভ করেন।

রাজ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কুচবিহারপতি মহারাজ নরনারায়ণ আহমপতি সুহং মুং এর উত্তরাধিকারী—আহমরাজ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। কুচবিহারপতি পরাজিত হইলেন। মহারাজ বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক পূর্ব্বপরাভব স্মরণ করিয়া কুচবিহার রাজ্যের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছিলেন। ঐরূপ অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করার উদ্দেশ্যে মহারাজ নরনারায়ণ মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কর প্রদানে স্বীকার করত সন্ধি করিলেন। অল্পকাল মধ্যে আহম অত্যাচার বন্ধ হইয়া গেল। অনুমান—১৫৫৬ খ্রীঃ।

মহারাজ নরনারায়ণ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বকীয় ভ্রাতা, মহাবল বিক্রমশালী শুক্লধ্বজকে প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, ইনি আহম-দিগের ভীষণ রক্তস্রোত নিবারণ জন্য, কুচবিহারবাসিনী রমণীগণের সতীত্বরত্ন রক্ষা করে, এবং আহম অবরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য উদ্দাম সহকারে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। মহারাজ বিশ্বসিংহ জীবনের শেষভাগ বিশেষতঃ সর্ব্বকাল নিরুপদ্রবে রাজ্য [illegible]

(১) যোগিনীতন্ত্রে বর্ণিত আছে, মহারাজা বিশ্বসিংহ মহাদেব হইতে হীরার গর্ভে জন্মলাভ করেন।

করিয়াছিলেন সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে আমোদ-প্রমোদরত সৈন্যদল বিলাসিতার জন্য, যুদ্ধ বিদ্যায় নৈপুণ্যবর্জিতা হইয়াছিল (১), কাজেই রণদক্ষতা প্রদর্শন করিতে না পারায় মহামতী শুক্লধ্বজ বড়ই ক্ষুণ্ণমনা হইয়াছিলেন।

মহারাজ কুমার শুক্লধ্বজ অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয় ও তেজোগর্ব্বিত বীরপুরুষ ছিলেন। আহম যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া ইনি ঘৃণা, লজ্জা ও ক্ষোভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বীরবর শুক্লধ্বজ একদা গুপ্তমন্ত্রণাগৃহে মহারাজ নরনারায়ণকে ও প্রধান প্রধান মন্ত্রী-বর্গকে তেজোগর্ব্বিতভাবে অথচ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, "যদি আপনারা আমার আদিম তেজ ও উৎসাহবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে হয় এখনই আমাকে আহম যুদ্ধে নিযুক্ত করুন, নয়তো কঠিন-নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া সুদৃঢ় প্রাচীর পরিবেষ্টিত, লৌহময় দ্বাররক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গে নিক্ষিপ্ত করুন।"

মহামতি রাজকুমার শুক্লধ্বজের মধ্যস্থলে বীরকেশরী বিক্রমসিংহ দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহার কটিদেশাস্থিত কোষবদ্ধ চন্দ্রহাস ঝন্ ঝন্ রবে কম্পিত হইল। তৎপার্শ্বস্থিত চঞ্চলমনা [illegible]সিংহের কৃপাণ অর্দ্ধনিষ্কোষিত হইল। অমনি বীরেন্দ্র বৃন্দেরা, পরস্পর হস্তদ্বয় আক্রমণ করিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্তের এবং বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধস্থান বলপূর্ব্বক আক্রমণ করত ভ্রূদৃষ্টি-নিক্ষেপপরায়ণ হইয়া, নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন, অপাঙ্গে বহ্নিকণা বিস্ফুরিত হইতে লাগিল।

যুবরাজ অধিক বাক্যব্যয় করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার বাক্য কম্পিত ও মন্দীভূত হইতে হইতে নিরুদ্ধ হইয়া গেল।

রাজকুমার যুবরাজের ঈদৃশ বাক্যাবলী শ্রবণে, মহারাজ রাজসিংহাসন হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইলেন এবং জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন;—"বীরবর! তুমুল সংগ্রাম হইতে কখনও বিরত হইব না। বিজয়লক্ষ্মীর কৃপা-দৃষ্টি লাভ করিতে যদি আত্মোৎসর্গ করিতে হয়, তাহাতেও বিমনা অথবা পরাঙ্মুখ হইব না। তবে জয়লাভে কালোচিত বন্দোবস্ত ও সুব্যবস্থাবলম্বন করাই সুবিবেচকের ও পরম বিবেচনার কথা। অতএব বিজয়-তৎপরতা প্রদর্শন করিতে হইলে স্বকীয় কর্ম্মদক্ষতায় নির্ভর করত সৈন্যদল সংগ্রহে ও সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রাথমিক কর্ম্ম। বীরশ্রেষ্ঠগণ! সাফল্যকে করতলগত করুন এবং কর্ম্মদক্ষতা-গুণে সতীর সতীত্ব-ধর্ম্ম ও দেবদ্বিজগণকে রক্ষা করুন, স্বাধীনতা নিশ্চয়ই করায়ত্ত হইবে।"

স্বাধীনচেতা বীরপুরুষেরাই বীরের যথার্থ মর্য্যাদা বুঝেন, তাঁহারাই বীর হৃদয়ের অক্ষত-তন্ত্রীর সহিত, স্বীয় হৃদয়তন্ত্রী মিলাইয়া, হৃদয়ের উপাস্য-দেবতা-সান্নিধ্যে প্রীত মানসে উপস্থিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি থাকিতে পারে?

(১) কুচবিহারের সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। নিয়মিত সৈন্য ও অনিয়মিত সৈন্য। নিয়মিত সৈন্য সহর রক্ষা করিত। অনিয়মিত সৈন্যেরা যুদ্ধ উপস্থিত না হইলে কৃষিকার্য্য করিত। যুদ্ধকাল ব্যতীত বিশালবাহিনী অলস

উদ্দেশ্য বিষয় আহম রাজদের গোচরীভূত হইতে পারে, এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজ কুমার শুক্লধ্বজ রাজধানী চিকনাবাস হইতে দূরতরস্থানে নবসংগৃহীত সৈন্যদলের সুশিক্ষার স্থান-নিরূপণ করত দুর্গ সন্নিবেশ করেন। ইহা একটী উৎকৃষ্ট দুর্গে পরিণত হইলেও বিজয়সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় ইহার স্থায়ীত্ব সুদীর্ঘকালব্যাপী হয় নাই। এ বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে।

পূর্ব্বে যে স্থানে চিলারায়ের দুর্গ সন্নিবিষ্ট ছিল, ঐ স্থানকে অদ্যাপিও চিলারায়ের প্রান্তর—(চিলার পাথার বা চেল্লার পাথার) নামে লোকে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে বিশাল বনরাজি পরিপূর্ণ শালবন মধ্যে চিলারায়ের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। (১)

এই স্থানে দুর্গ সংস্থাপিত হওয়ায় দুইটী মহত্তর কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল। প্রথমত: ভুটিয়াদিগের আক্রমণ প্রতিরোধে সুবিধা হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ কার্য্য সংসাধনের উপযুক্ত স্থান বা তৎকালে দুর্গম বন্যপ্রদেশ ছিল বলিয়া বল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার সুবিধালাভ হইয়াছিল অর্থাৎ এই স্থানে দুর্গ সংস্থাপিত হওয়ায় আহমগণ কুচবিহার রাজের বা তদ্ভ্রাতা শুক্লধ্বজের এই অভিসন্ধি আদৌ জ্ঞাত হইতে পারেন নাই।

আহমদিগের সহিত স্বাধীনতা-সমর আরম্ভ হইলে বিক্রমসিংহের পরিবারেরা এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। (১)

যুবরাজ শুক্লধ্বজ সুসিদ্ধিলাভের জন্য ভক্ত্যানুগত বিশ্বরক্ষয়িত্রী ঈশ্বরী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ও প্রাত্যহিক পূজার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে এই স্থান অতীব দুর্গম ও হিংস্র জন্তু সমাবেশে বিজন অরণ্যে সমাচ্ছাদিত এবং সুদীর্ঘ শালবনে পরিপূর্ণ হওয়ায় অসূর্য্যম্পশ্য হইয়া রহিয়াছে।

কঠোর তপস্যায় ব্রতী সাধক-পুরুষ যেমন উৎকট কায়ক্লেশ, একাগ্রভক্তি প্রভাবে একনিষ্ঠ হইয়া স্বকীয় অভিলষিত সাধনের ধনকে সৌভাগ্যগুণে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ স্বকীয় উপাস্য দেব বা দেবীর কৃপাগুণে সাক্ষাৎকার লাভ অথবা সিদ্ধ লাভ করেন, তদ্রূপ মহামতি

(১) সাধারণ লোকে অনেকে এই স্থানকে নলরাজার গড় বলে। যাই হউক, এই স্থানে যে পূর্ব্বে একজন পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকাস্তূপ ও পরিখা প্রভৃতি দৃষ্টে এরূপ অনুমান সহজেই হয়। বীরবর চিলারায় এই স্থানের সংস্কার সাধন করিয়া ইহাকে একটী সামরিক দুর্গে পরিণত করেন। চিলারায়ের নামানুসারে ইহা এখনও চিলার পাথার নামে অভিহিত হইতেছে।

(১) বীরকেশরী বিক্রমসিংহকে, মহারাজ নরনারায়ণ বা শুক্লধ্বজের জ্ঞাতি-ভ্রাতা বলা হইয়াছে। এরূপ উল্লেখ করার কারণ এই,—মহারাজ চন্দন স্বয়ং অপুত্রক ছিলেন। ইনি বিক্রমসিংহকে পুত্ররূপে পালন করেন। বিক্রমসিংহও রাজসংসারে এরূপ ভাবে চরিত্রগুণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন যে, কেহই ইহার প্রতিরোধী ছিলেন না। স্বভাবে-সম্মিলনে, বীরত্বে ইহার প্রাধান্য চিরদিনই অব্যাহত ছিল। এই বীরশ্রেষ্ঠের ধর্মপরায়ণা সহধর্মিণী শ্রীমতী ধর্মেশ্বরী—"কুচবিহার-বিজয়"এর আদর্শ নায়িকা। রাজসংসারের প্রতিপালিতা ধর্মেশ্বরীর অনুগামিনী এবং সঙ্গীতা সুপণ্ডিতা অতি সৌভাগ্যবতী এর নায়িকা।

"তমসা যাচ্ঞা।"

(১)

আজিকে আমার সহসা এসেছে
জীবনে আঁধার রাত্রি।
সবে দেখে এরে অন্ধকার,
আমি হেরি এতে ভাতি॥
আসিছে আমার অজানা
জীবন গভীর অন্ধকারে।
তমসা সে ভাল—যাচি তারে যে
আমার মরম দ্বারে॥

(২)

এ মোর জীবনে কিবা সুখ আছে,
আঁধারেতে পাব শান্তি।
সে আঁধার মোর হইবে আলোক,
এ নহে আমার ভ্রান্তি॥
এ সারা জনমে শোক দুঃখ ক্লেশ,
পরাণ সহিতে নারে।
তমসা সে ভাল যাচি তারে যে
আমার মরম দ্বারে॥

(৩)

এস এস মোর গোধূলি লগন,
আঁধারিয়া দিক দশ।
ঢেকেটা রাখিয়া মোরে লয়ে যাও,
করে হীন রূপ রস॥
চাহিনা রহিতে মোহের আলোকে,
শুয়া এ ভুবন 'পরে।
তমসা সে ভাল যাচি তারে যে,
আমার মরম দ্বারে॥

(৪)

সে তো নহে মোর অজানা জগৎ,
সে যে চির পরিচিত।
কতবার সেথা হতে আসিয়াছি;
সে তো নহে অজানিত॥
জানে গো আমার মরমের আমি
কোটী কোটী কোটী বারে—
"তমসা সে ভাল যাচি তারে যে
আমার মরম দ্বারে॥"

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ।

"পাখী।"

"বউ কথা কও" পাখী ডেকো না রে আর।
বউ কি কহিবে কথা
প্রাণে তার শত ব্যথা
দিবানিশি অশ্রু জল ঝরে চোখে তার॥
এ বউ লাজুক বড় মুখ নাহি তুলে।
বড় অভিমান হৃদে
শুধাইলে বেশী কাঁদে
কথাটী না কয় বউ কি হবে ডাকিলে?
"বউ কথা কও" পাখী কেন ডাক দিলে?
তুমি সে বনের পাখী সদা বনে রও।
বনে থাক বনে ডাক
কত আশা হৃদে রাখ
সেধে সেধে সদা ডাক "বউ কথা কও।"
কেন সদা ডাক পাখী "বউ কথা কও";
বউ তো কহে না কথা
কেন তারে ডাক বৃথা
ডেকোনা ডেকোনা ছিছি চুপ হ'য়ে রও।
কেন আর ডাক পাখী "বউ কথা কও।"

বড়ই নির্লজ্জ তুমি তবু ডাক দিলে;
যে শুনে তোমার রব
সে স্তব্ধ, সে নীরব
বউ কি কহিবে কথা সে ডাক শুনিলে?
বউ কি কহিবে কথা ওরে বোকা পাখী;
দিন নাই রাত নাই
আহার বিহার নাই
সদা সেই এক বুলি শুদ্ধ হ'য়ে থাকি।
এমন করিয়া ছিছি কেন ডাক পাখী?

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

ভগবদ্দর্শন।

তব দরশন তরে
যাইতে হইবে কি হে পর্ব্বত কন্দরে?
তোমার দেখার লাগি
মরিতে হ'বে কি গিয়া বিজন কান্তারে?
দৃষ্টি-শক্তি-হীন যেবা
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমা পায় না খুঁজিয়া;
অন্ধের নৈরাশ্য সহ
অবিরাম অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া!
অনন্ত শূন্যেতে ওই
মরীচিমালীর দিব্য প্রভা বিকাশিত
মরীচি মালার মাঝে
জ্যোতির্ম্ময় রূপে প্রভু, নিত্য বিরাজিত;
কুসুম-কলিকা চাহি'
হেরি তোমা অপরূপ চির শোভাময়;
প্রফুল্ল কুসুম বাসে
হে মহান্! হেরি তব পবিত্র-নিলয়;
গগনে চাহিয়া হেরি
অসীম অনন্ত তুমি অচ্যুত অক্ষয়;
মেদিনীর অঙ্কে তুমি
দয়ার আধার বিভু জীবের আশ্রয়;
সর্ব্বদাহক রূপে
জ্যোতিষ্মান্ তুমি দেব র'য়েছ অনলে;
জীবের জীবন রূপে
মিশায়ে র'য়েছ নাথ, অনিল হিল্লোলে;
সলিলে চাহিয়া হেরি
বিশ্বপ্রেমে দ্রবীভূত অনন্ত করুণা;
সুষুপ্ত রূপেতে তুমি
শান্তির নির্ঝর আহা জীবের সান্ত্বনা।
পিতৃ-সুত সম্বন্ধেতে
ত্রিলোক রক্ষক রূপে তুমি বিদ্যমান;
মাতৃ স্নেহে হেরি আহা
ত্রিলোক-পালক প্রভু মমতা নিধান।
সতী প্রেমে হেরি তোমা
ক্ষীরোদ সাগর মাঝে চির প্রেমময়;
শিশুর বিমল হাসি
দেখায় তোমার রূপ মাধুর্য্য-নিলয়;
ভক্তের সরল আত্মা
সদানন্দ রূপে দেব, নিত্য বিরাজিত;
[illegible] নয়ন-প্রান্তে
জ্ঞানময় রূপে তুমি চির উদ্ভাসিত।
সর্ব্বত্রে তোমা সাক্ষি',
দাও তব শ্রীপদের সুখ-পরশন;
জনম সার্থক হোক,—
অন্তরে বাহিরে তোমা করি দরশন।

শ্রীকান্তিকচন্দ্র ধর, বি, এস-সি।

না। ধর্মই হিন্দুর প্রধান অবলম্বন, ধর্মই হিন্দু জীবনের প্রধান সহায় সম্পদ; এই ধর্মকে প্রধান লক্ষ্য করিতে গেলে, খাওয়া পরার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ খাওয়া-পরার সহিত ধর্মের সাতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—খাওয়া পরার প্রতি যে হিন্দু দৃষ্টিহীন, ধর্ম তাহার নাই—ধর্ম হইতে অবশ্যই সে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; খাওয়া পরার সহিত মন—মনের সহিত ধর্ম, খাওয়া পরায় মন যদি বিকৃত ভাবাপন্ন হইল, তবে ধর্ম হইবে কেমন করিয়া? তাই ধর্মের চর্চায়ও আজ কাল এত বাড়াবাড়ি, ধর্মের নামে এত অধর্ম সঞ্চয়, হিন্দুর ধর্মভাবের এত অধঃপতন। যে সে লোক তাই আজ কাল ধর্মের প্রচার করে—যে সে লোক আজ-কাল বেদবেদান্তের বিচার করিয়া মতের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ জাতি ব্রাহ্মণেতর জাতির বাটীতে আহার করিত না—পূর্ব্বে সমাজে খাওয়ার সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি ছিল। শূদ্রের বাটীতেও তখন ব্রাহ্মণে আহার করিতে কত কুণ্ঠিত হইত! অশূদ্র প্রতিগ্রাহী বহু জাতির ত কথাই নাই—যাহারা শূদ্রের বাটীতে আহার করিতেন, তাহারাও সমাজে এরূপ যথেচ্ছাচার করিতেন না। তখন সমাজে শূদ্রের বাটী ব্রাহ্মণ ভোজনে লুচি-চিনির প্রচলিত ছিল; তার পর লবণবিহীন ব্যঞ্জন এবং লুচি; তার পর যত দিন যাইতে লাগিল লবণযুক্ত তরকারী আরম্ভ হইল, তারপর মৎস্য, এখন শূদ্রের বাটী অন্ন পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে; পলান্ন না হইলে ত খাওয়াই হয় না।

হিন্দু ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতি সহিত আহারাদির যখন এত বাঁধাবাঁধি, এত আঁটা আঁটি ছিল, তখন অন্য জাতির সহিত আহারে যে হিন্দুত্বের পতন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এখন অনেক হিন্দু আর আহার বিহারে জাতি বিচার করে না, ইংরাজের হোটেলে পর্য্যন্ত দ্বার অবারিত হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল বিষয়ে অন্যান্য জাতিরা বরং কতকটা লোক লজ্জা ও সমাজের ভয় করে—অনেকানেক উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে লাজ লজ্জার মাথা খাইয়াছেন, তাঁহারা জাতিভেদ মানিতে চাহেন না, উন্মাদের গৌরবে একেবারে দিশাহারা হইয়া হিন্দুর এত দিনের জাতিভেদ প্রথাটা তুলিয়া দিতে পারিলে মনে মনে আনন্দিত হন, জাতিবিচারটা একটা উন্নতির অন্তরায় মনে করেন। এ ভাব সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মধ্যে যত সংক্রামক হইয়াছে, এত আর কোন জাতি বিস্তর হয় নাই। যার তার সঙ্গে আহার বিহার করিলে সমাজে যে একটা বিষম দোষ বা পাপ স্বদেহে সংক্রামিত হয়, তাহা কেহ বিবেচনা করেন না।

এখন ব্রাহ্মণের ছেলের অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই কাচা খুলিয়া চা পান করা একটা নিত্য কর্ম—তাহাতে ঘৃণা লজ্জা বোধ নাই, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন, হস্ত পদ প্রক্ষালন, দন্তধাবন ক্রিয়া, এবং সন্ধ্যাবন্দনা না করিয়া [illegible] যে ক[illegible] সঙ্গত তা তাঁহারাই বলিতে পারেন। [illegible] সন্ধ্যাহ্নিক না করেন, তাঁহারা অপ[illegible]

না হইয়া কোনরূপ পদাধঃকরণ যে কেমন করিয়া করেন, তাহা ভগবানই জানেন। এরূপ পানাহারে প্রবৃত্তি যে কেমন করিয়া হয় তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহা উন্নত সাধকগণও যখন সমাজে অবস্থান কালে এ সকল সামাজিক প্রথা মানিয়া চলেন, তখন আমাদের মত নরাধমের এ সকল পরম হিতকর বিষয়ে এরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা অধঃপাতে যাইবার পূর্ব্বলক্ষণ নয় কি?

এইত গেল খাওয়ার সম্বন্ধে, পরার সম্বন্ধেও তদ্রূপ, সকল জাতির পরার সম্বন্ধে একটা জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ চিরদিনই আছে এবং তাহারা ইহা প্রাণের সহিত প্রতিপালন করিয়া চলে। হিন্দুরও খুব বিশিষ্টরূপ ছিল কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও এত শিথিল ভাবাপন্ন হইতেছে যে বোধ হয় আর কিছু দিন পরে পরিবার পোষাক সম্বন্ধেও একটা জাতীয়তা রক্ষা হইবে না। ইংরাজ জাতি অতি দরিদ্র হইলেও বাঙ্গালীর পোষাক পরিতে লজ্জা বোধ করে, কখন কোন ইংরাজকে আমরা ধুতি চাদর পরিয়া ভ্রমণ করিতে দেখি নাই। কিন্তু আজকালকার হিন্দু ইংরাজী সাজসজ্জায় সজ্জিত হইতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে—সাহেব সাজিয়াছি বলিয়া আপনাকে কত গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকে। অবশ্য ইংরাজ রাজত্বে রাজকীয় কার্য্যে যদি ইংরাজী পোষাক পরিতে বাধ্য হয়, তাহা না হয় পরিলাম, কার্য্যোপলক্ষে [illegible] অনুরোধে অগত্যা না হয় সাহেব সাজিলাম, [illegible] সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইয়া সাহেবী হাব ভাবে আপনাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিব কেন?

পূর্ব্বে বলিয়াছি খাওয়া পরার সহিত মনের নৈকট্য সম্বন্ধ, খাওয়া পরা যেমন হইবে মনের ভাব, আচার বিচারও তেমনি ভাবে ভিন্ন পথে চালিত হইতে থাকিবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এখন আর একটা সংক্রামক ব্যাধি সমাজ শরীরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। এখন অনেক হিন্দু আর কাছা দিয়া কাপড় পরিতে চাহেন না, কাছা খুলিয়া দিয়া থাকেন, কোথাও কোথাও লুঙ্গী পরণের ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি। আহারের বিচার ত নাই, তার উপর লুঙ্গী পরা আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম না করিয়াই একেবারে ব্রহ্মজ্ঞান, কিন্তু অন্য জাতির কি সহসা এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়? কোন বিশিষ্ট উচ্চ বংশীয় মুসলমান কি হিন্দুর বাটীতে আহার করেন—না তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন?

অনেকে বলেন, এইরূপ করিলে একতা বদ্ধমূল হইবে—জাতীয়তা ব্যবধান থাকিয়াই হিন্দু মুসলমান এক হইতে পারিতেছেন না। এ ধারণা ভুল বলিয়াই আমাদের মনে হয়, কারণ ভাল মুসলমান বা ভাল ইংরাজ আধা মুসলমান বা আধা ইংরাজকে আদৌ দেখিতে পারেন না। একজন গোঁড়া হিন্দুকে তাঁহারা যেরূপ মান্য করেন, একজন Half Caste কে তত করেন না, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁহার ন্যায় গোঁড়া

হিন্দু আচার্য্যের কত সম্মান ইংরাজ ব মুসলমান মহলে ছিল। আজকাল কোন আধাজাতি দাঁড়কাক হইয়া ময়ূরের দলে মিশিতে যাইয়া কি তত সম্মান লাভ করিতে পারিয়াছেন?

আমরা জানি, একজন মহৎ ভাবাপন্ন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট একজন খৃষ্টান ডাক্তারের সহিত মিশিতে ঘৃণা করিতেন। তাহার বাটীর রোগাদির চিকিৎসায় তিনি বিচক্ষণ বাঙ্গালী ডাক্তারকে ডাকিতেন, তাহার করমর্দ্দন করিয়া বসাইতেন অথবা কোন বড় ইংরাজ ডাক্তারকে ডাকিয়া গৃহের চিকিৎসা বিধান করিতেন, তথাপি একজন ঐ খৃষ্টান, খুব বিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তার হইলেও তাহার সহিত মেশামেশী বা তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া আপ্যায়িত করিতে ঘৃণাবোধ করিতেন। জাতীয়তা নাই কোথায়? স্ব স্ব জাতীয় গৌরবকে কে কোথায় নষ্ট করিয়াছে? যাহা জাতীয়তার নিশান স্বরূপ, কে কোথায় তাহা পদাঘাত দ্বারা নষ্ট করিয়াছে?

হিন্দুর খাওয়া-পরার দৃঢ়তা তাহাদের এক জাতীয়তার প্রধান নিদর্শন, এককালে ইহা খুব বদ্ধমূল ছিল, ইহা হইতে একপদ স্খলিত হইলে সমাজে তাহার জাতিপাত ঘটিত; হায়! এখন সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া আমরা আর এসব মানি না, অবাধে হিন্দুত্বের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অহিন্দুভাবে বিচরণ করিতেছি; তাহাতে জাতিনাশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর এতদিনের সম্ভ্রম যে নাশ হইতেছে, তাহা আমরা একবার ভুলেও ভাবি না।

সম্পাদক।

বিদ্যাপতি-রসমাধুরী।

মৈথিল ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি ঠাকুর কবি ও সাধক ছিলেন। পদাবলীই তাঁহার মহাকাব্য। ঐ কাব্যে তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমরস বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানি সাধন ও ভক্তিতত্ত্বের অমূল্য ভাণ্ডার। বিশ্লেষণ প্রণালী অবলম্বনে আমরা তাঁহার সুললিত পদাবলী হইতে কতিপয় পদের অর্থ পরিস্ফুট করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। যাঁহারা ভক্ত তাঁহাদের হৃদয় প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে ভরিয়া যাইবে।

১। কর্ম্মপাশ ও মোক্ষ।

কবির হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত, তাই তিনি কাঁদিতেছেন আর গাহিতেছেন—

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।"

কিসের জন্য তিনি মাধবকে এত মিনতি করিতেছেন? তাঁর তাঁহাকে মুক্তি দিবেন বলিয়া—তাঁহার সংসার-বন্ধন ঘুচাবে এইজন্য তিনি তাঁহাকে বার বার মিনতি করিতেছেন। কিসে মুক্তি হয়, এই ভাবনা তাঁহার হইয়াছে তাই তিনি কাঁদিতেছেন। বিনা ভক্তিতে মুক্তি মিলে না—"বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা" এটি মিরাবাইয়ের কথা। "বিনা প্রেমসে রীঝৎ নহি তুলসী নন্দকিশোর" এটি তুলসী দাসের কথা। মিরাবাই ও তুলসীদাস উভয়েই সাধক, উভয়েই প্রেমিক ছিলেন। ভক্তির অঙ্গ তিনটী—বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ ও সেবা। তুলসীদাস পঞ্চাঙ্গ ভক্তির কথা বলিয়াছেন, যথা—

"তুলসী হয়ে সংসারেতে পাঁচো রতন হৈর সার।
সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দান, উপকার॥"

কবিবর বিদ্যাপতি বলিতেছেন—

"দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিয়া,
দয়া জানি ছোড়বি মোয়।"

হরিসাধনে মোক্ষ মিলে জানি, তাই তোমাকে তিল তুলসী দিয়া পূজা করিয়াছি এবং তোমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি; অতএব হে হরি! দয়া করিয়া আমার ভববন্ধন ছুটাও।

শেষের দিনে পাপপুণ্যের বিচার হয়; পাপীর দণ্ড হয় এবং পুণ্যাত্মা মুক্তিলাভ করে। সাধক মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব সুকৃতি সঞ্চয় আবশ্যক। যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, মুক্তি লইবে ত সুকৃতি কৈ? সাধকের নেত্রে বারিধারা বহিল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—

"গণইতে দোষ, গুণ লেশ না পাওবি
যবহুঁ করবি বিচার।"

হে ঠাকুর! আমার কোনই গুণ নাই, কেবলই দোষ; আমাতে পুণ্যের লেশ মাত্রও নাই, আমি পাপের বোঝা বহিতেছি। পুণ্যাত্মা নিজ পুণ্য বলে তরিয়া যায়, পাপীর ত্রাণকর্ত্তা মধুসূদন।

গুণের লেশ নাই, একথা ভাবিয়া সাধক ভীত হইয়াছেন কেন? এই জন্য ভীত হইয়াছেন—পাছে হরি তাঁকে চরণে ঠেলেন। কিন্তু মনেতে দৃঢ়বিশ্বাস আছে—হরি আপন জনকে চরণে ঠেলিতে পারিবেন না, কেন না তিনি জগতের নাথ, জীব ত জগৎ ছাড়া নহে। তিনি পুণ্যের আলয় ও মহান, জীব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ও পাপী। পাপী সকলের ঘৃণার পাত্র হইলেও সেই মহাপুরুষ হইতেই ত জাত, তাই কবি বলিতেছেন—

"তুহুঁ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি
জগবাহির নহি মুই ছার।"

হে হরি! তোমাকে সকলে জগতের নাথ বলে; আমি ক্ষুদ্র ও পাপী বটে। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও আমি তোমার জগৎ ছাড়া ত নহি; তুমি যেমন অপর সৃষ্টি করিয়াছ, সেই সঙ্গে আমাকেও ত সৃষ্টি করিয়াছ। আমি যে তোমার জগতের মধ্যেই আছি, জগৎ ছাড়া নহি ত। অতএব আমাকে ত চরণে ঠেলিতে পারিবে না—আমায় ঐ চরণে স্থান দিতেই হইবে। নিজ নিজ কর্ম্ম-ফলে জীব মাত্রেরই সংসারে পুনঃ পুনঃ গতাগতি হইয়া থাকে। কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। ইহার নাম কর্ম্মপাশ। এই কর্ম্মপাশ কাটিলেই জীবের মোক্ষ হয়। কিন্তু কিসে সেই কর্ম্মপাশ কাটে? হরির চরণে মতি থাকিলে সেই কর্ম্মপাশ কাটে, তাহা হইলেই জীবের মোক্ষ লাভ হয়। কবি বলিতেছেন—

"কিয়ে মানুষ, পশু, পাখি যে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥"

ক্রমশঃ

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও উহার সাধনা।

সৃষ্টি প্রারম্ভে যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাত্র পঞ্চভূতময় ছিল, তখন পরম পুরুষ ভগবান সৃষ্টি বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে, বহ্নি-বিনির্গত স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, স্বকীয় বিরাট পরমাত্মার কতকগুলি পরমাণু জগৎ মধ্যে স্থাপন করিলেন। উক্ত পরমাণু সকল ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়া, পুষ্টতর ও স্ফুটতর হইয়া দেহ ধারণ করত ক্রমশঃ জীব মধ্যে পরিগণিত হইল। জীব সমূহ কর্ম্মফলানুযায়ী পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীনে আসিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ জন্ম অতীত হইল, ক্রমে পরমাণু হইতে উৎপন্ন ঐ জীব সমুদায়ের উন্নতির দিন আসিল, এই উন্নত অবস্থাই মানব-জীবন। এই মানব জীব পূর্ব্ববৎ স্বীয় কর্ম্ম-সূত্রে বদ্ধ থাকিয়া ও পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন থাকিয়া ক্রমশঃ উচ্চ প্রেরণা-বশে, পরকল্যাণরত দেবজীবন ও তৎপরে ঐরূপ ভাবে সারূপ্য, সাজুয্য, সালোক্য প্রভৃতি অবস্থান্তর অতীত হইয়া আবার তাঁহাতেই মিলিত হয়।

লীলাময়ের লীলা ব্যাপ্তির উদ্দেশ্য বশে প্রেরিত পরমাণুস্বরূপ এই মানবজীব, কর্ম্ম ও সাধনাবলে,—মায়া মোহাদিতে অভিভূত থাকিয়াও লীলার চরম পূর্ণতা সৃষ্টি-বিস্তৃতি সাধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ব্যষ্টিভূত জীবাত্মা নিজেকে, সমষ্টিভূত পরমাত্মা পরমেশ্বরের সহিত পুনর্মিলিত করিবে—ইহাই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য। মানবজীবনের উদ্দেশ্য সংসারে নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম সাধনা দ্বারা ভক্তিজ্ঞান অর্জ্জন পূর্ব্বক অবিদ্যা হইতে মুক্ত ও কামাদির অতীত হইয়া অহংব্রহ্ম চিন্তায় ক্রমে নিজেকে সেই সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার সহিত সংমিলিত করা, ইহাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং ইহারই নাম মুক্তি বা মোক্ষ। বৌদ্ধেরা ইহকেই নির্ব্বাণ কহিয়াছেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর, সৃষ্ট জীব সমূহ মধ্যে মানব জীবকে যত শ্রেষ্ঠত্ব, যত প্রজ্ঞা এবং যত বিবেকবুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, তত আর কোনও জীবকে নহে। তাই মানব সাধনা-বলে দেবত্ব লাভ করিয়া অমর হয় ও পরে মোক্ষপ্রার্থী হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়। আবার এই মানবকে যত মায়া-মোহ-লোভাদিতে মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ হইবার সুযোগ দিয়াছেন তত আর কাহাকেও দেন নাই, তাই মানব সাধনা-বলে অবিদ্যাদির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা না করিলে স্বতঃই পশুত্বে পরিণত হয়। সুতরাং মুক্তিকামী মানবকুলকে বিধিদত্ত অতুল শক্তি সঞ্চারিণী প্রজ্ঞা ও বিবেকবলে মায়া-মোহাদি হইতে মুক্ত হইতে হইবে,

ইহাই সাধনা। এই সাধনাই কর্ম্মসাধন, এবং ইহাই মুক্তির সোপান।

কর্ম্ম-সাধনা বলিতে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ সমূহের ঋষিদের মত, সংসার ত্যাগ করিয়া বনগমন পূর্ব্বক বল্কল মূলাদি ও বৃক্ষাদির গলিত পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া তপস্যাচরণ করিতে হইবে—এরূপ না বুঝাইয়া সহস্র প্রলোভন পরিপূর্ণ, শোক-দুঃখ-কামনা-ময় সংসারে অবস্থান পূর্ব্বক কাম ক্রোধ লোভ, মোহাদি রিপু কুলের আক্রমণ উপেক্ষা করত বীরের ন্যায় কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে, ইহাই সার্ব্বজনীন সত্য ধর্ম্ম।

বিশেষতঃ কলিযুগে যখন মানব পরমায়ু নিতান্ত অল্প, তখন ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা; যদিও ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির সহজ উপায় বটে, তথাপি তদপেক্ষা ইহার কার্য্যকারিতা শক্তি সহজসাধ্য। কেন না শাস্ত্র বলিয়াছেন—শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে ভক্তি লাভ অসম্ভব। সুতরাং মানবকে কর্ম্ম সাধনা দ্বারাই মোক্ষের অধিকারী হইতে হইবে। এই অনাবিল কর্ম্ম সাধনা বলে মানবের আত্মজ্ঞান জন্মিবে, তখন স্বচেষ্টায় পরমাত্ম-সংমিলন ঘটিবে।

কর্ম্ম কি,—এক্ষণে তাহারই বিচার আবশ্যক। যাহা করা যায়—তাহাই কর্ম্ম অর্থাৎ অবস্থাগত এবং উপস্থিত মত কর্ত্তব্যই কর্ম্ম এবং তাহার সম্পাদনই কর্ম্ম-সাধনা। মাতা-পিতা প্রভৃতি পূজনীয়গণের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার, আত্মীয় কুটুম্ব, জাতি, প্রতিবেশী এবং রাজ-পুরুষগণের প্রতি শাস্ত্রানুযায়ী যোগ্য ব্যবহার, অর্থোপার্জ্জন, বিবাহ, যথাশক্তি দান, ব্যথিতের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য এই কর্ত্তব্য, যথোচিত সম্পাদন করাই কর্ম্ম-সাধনা।

ভক্তি অপেক্ষা কর্ম্মের শক্তি তীব্রতর ও স্ফুটতর এবং সহজসাধ্য। ভক্তিলাভ শ্রীভগবানের কৃপা অথবা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল লব্ধ, আর কর্ম্ম, সাংসারিক সুখ দুঃখের মধ্যে জড়িত থাকিয়া স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধন। সুতরাং ভক্তি অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠতর, ইহা অভ্রান্ত সত্য? শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসাধক বা কর্ম্ম এই প্রকার বীরোচিত সাধনায় ক্রমশঃ ভক্তির অধিকারী হইবেন। তখন জ্ঞানামিশ্র ভক্তি সহ কর্ম্মের অপূর্ব্ব মিলন ফলে কর্ম্মত্যাগ হইয়া আসিবে।

কর্ম্মীকে কিরূপ হইতে হইবে? কর্ম্মীকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী, কর্ম্মঠ, ও জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে। তাঁহাকে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে অভিযান আবশ্যক হইলে সংগ্রামের জন্য সর্ব্বথা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে বীরের-ন্যায় সহাস্য মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হৃদয়কে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইবে। কর্ম্মসাধক আশ্রিতবৎসল, সদয় ও সরল অন্তঃকরণবিশিষ্ট এবং বিপন্নের বান্ধব, ব্যথিতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, আদর্শ গুরুভক্ত, বন্ধুবৎসল, আদর্শ গৃহী হইবেন। তাঁহাকে দয়ালু অথচ কঠোর হইতে হইবে, অর্থাৎ তিনি যেন শ্রমবিমুখ অলস ব্যক্তিবর্গকে দানের পাত্র স্থির না করেন, অথবা দস্যু তস্করাদিকে আশ্রয় প্রদান করিয়া আশ্রিত বাৎসল্য না

দেখান, কর্ম্মীকে অটল শাস্ত্রবিশ্বাসী হইতে হইবে, অথচ অন্ধ সংস্কারগুলিকে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। তিনি আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র হইবেন। তাঁহার অটল দেশ ভক্তি আর দশ জনকে দেশানুরাগী করিয়া তুলিবে। কথায়, কার্য্যে এবং ব্যবহারে সকল বিষয়েই তাঁহাকে আদর্শ হইতে হইবে। পার্থিব বিষয় গুলিকে ভোগ করিয়া যাইতে হইবে। অথচ তৎপ্রতি আসক্তির লেশমাত্রও থাকিবে না। সমুদায় কর্ম্ম বিচার পূর্ব্বক স্থির ভাবে মস্তিষ্ক যন্ত্রকে পরিচালিত করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

এইরূপে কর্ম্ম করিতে করিতে অনাসক্তি আসিবে, ঐ অনাসক্তির পূর্ণাবস্থায় জ্ঞান ও ভক্তি প্রকট হইবে। এই বিজ্ঞানকারী শুদ্ধ ভক্তিই ক্রমে মানবকে পরাভক্তির অধিকারী করিবে। তখন কর্ম্মী বিশ্বময়ের বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতে পাইবেন এবং আপনিই পরম পুরুষে লীন হইবার জন্য উৎসুক হইবেন; ফলে জীবনের সারভূত উদ্দেশ্য বা চরম পরিণতি পরমাত্ম-সংমিলন ঘটিবে। এই পরমাত্মা সংমিলনই মোক্ষ বা মুক্তি এবং ইহাই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

শ্রীতারাপদ রায়।

আবেগ।

কেন কাঁদি?' তাত বুঝিতে পারি না! কি যেন এক অব্যক্ত যাতনা, কি যেন এক অসহ্য বেদনা, কি যেন অস্পষ্ট ক্রন্দন ধ্বনি হৃদয় মাঝে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! তাই কাঁদি? কিসের নিমিত্ত এ বেদনা? কিসের অভাবে এ যাতনা? তাত ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না—বিরলে নির্জ্জনে কত দিন মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু মনের নিকট ইহার কোন সদুত্তর পাই নাই; নিজের মনে নিজে প্রশ্ন করিয়া নিজে তাহার মীমাংসার প্রয়াস পাইয়াছি—কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, মীমাংসার পর মীমাংসা করিয়া এই বুঝিয়াছি যে আমি কাঁদিতে বড় ভালবাসি তাই কাঁদি! সুনীল আকাশে চাঁদ হাসে, তারা হাসে, পূর্ব্বাকাশে বালার্কের রক্তরাগ-রঞ্জিত মেঘমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সরোবরে সরোজিনী হাসে! আমি কিন্তু অনবরত কাঁদি! কাঁদিয়াই সুখ পাই! যখন জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম এই হাসি-কান্নাময় নূতন জগৎ সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তখনই কাঁদিয়াছিলাম। তাহা বুঝিতে পারি নাই, আপনিই যেন চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, মুখ ফুটিয়া ক্রন্দনধ্বনি বাহির হইয়াছিল, সেই অবধি আমি কাঁদিতে ভালবাসি!

তার পর যখন পিতামাতার স্নেহে বাড়িতে লাগিলাম, এই হাসি-কান্নাময় সুন্দর জগৎ চিনিতে পারিলাম, তখন কোকিলের কুহুরব, পাপিয়ার মধুর ঝঙ্কার বড় মিষ্ট লাগিতে লাগিল! কিন্তু সেই সুমিষ্ট স্বরে আমার হৃদয়-বীণার সেই বিষাদ-মাখা করুণ সুর বাজিয়া উঠিল! জানি না কোন দিন আমি

হাসিতে পাইব। বাঞ্ছিতের আগমনে তোমরা হাস, প্রিয় বস্তুর আগমনে তোমরা হাস, আকাঙ্ক্ষার সামান্য তৃপ্তিতে তোমরা হাস; কিন্তু কেন কাঁদ বল দেখি? বাঞ্ছিতের বিয়োগে, প্রিয় বস্তুর বিহনে, আকাঙ্ক্ষার নৈরাশ্য-অন্ধকারে তোমরা কাঁদ কেন? তোমাদের হাসি মেঘাচ্ছন্ন তমসা রজনীতে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় ক্ষণিক। তোমাদের হাসি বাসন্তী প্রভাতে মল্লিকা রাণীর ন্যায়, তোমাদের হাসি প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্র-রেখার ন্যায় ফুটিয়া চকিতে কোথায় মিলায়ে যায়! তাই বলি তোমাদের হাসির কোন মূল্য নাই, তোমরা হাসিকান্না লইয়া থাক! হাসি কান্নাময় জগতের জীব তোমরা। তোমরা হাসিকান্না লইয়া খেলা করিতে ভাল বাস।

ছেলে মরে গেলে মা কাঁদে কেন? কেন না, তাহাকে আশা মিটায়ে দেখিতে পাই নাই বলিয়া! ছেলেকে দেখিয়া যদি পিতা মাতার আশা মিটিত, তবে আর তাহারা কাঁদিত না, সে আশা কখনও মিটে না, কভু মিটাতেও পারে না, তাই তোমরা কাঁদিতে বড় ভালবাস! আমার কান্না স্বতন্ত্র, আমি যাহা চাই, আমার যে জিনিসের অভাব, আমি যাহাকে ভালবাসি, সে জিনিসটী —তাহাকে আমি পাই না—তাই আমি কাঁদি! যেদিন তাহাকে পাইব সেদিন হাসিব; সে জিনিষ যদি একবার পাই তবে আমার কান্না চিরতরে ফুরাইবে হইবে, আর কাঁদিতে হইবে না, তোমাদের বাঞ্ছিত বস্তুর মত আমার সে বস্তুটী তত সুলভ নহে, তাই আমি কাঁদি! কাঁদি বলিয়াই কাঁদিতে ভাল বাসি। না কাঁদিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যে যত কাঁদিতে পারে, সে তত শীঘ্র তাঁহাকে পায়। আমি তাঁহাকে পাইবার জন্যই কাঁদি! আপনারা যাহা চান, আমি তাহা চাই না, আপনারা যাহা পাইলে হাসেন, আমি তাহা পাইলে কাঁদি! আপনারা বাঞ্ছিত দ্রব্য পাইলে কত সুখী! আমি তত দুঃখী, তাই আমি কাঁদি। আমি যাহা চাই, তাহা এ জগতে পাই না, তাই আমি কাঁদিতে ভালবাসি! একবার তাঁহাকে পাইলে, একবার তাঁহার মধুর অমৃতময় রস আস্বাদন করিতে পাইলে, একবার তাঁহার শক্তি সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া জাগরিত হইলে আর আমি কাঁদিব না! কিন্তু তাহা কি হইবে? তাহা কি পাইব? সে শক্তি কি আমার হৃদে জাগিবে?

মর্ম্মের মর্ম্মস্থল হ'তে একবার কাঁদিয়া দেখি, যদি পাই! যদি সে শক্তি হৃদে পাইতে পারি, যদি একবার তাঁহার মধুর অমৃতময় রস আস্বাদন করিতে পারি, তাই একবার কাঁদিয়া বলি,—

"এস! চির বাঞ্ছিত এস
"এস! চির সঞ্চিত এস,
এস! এস! মম পাশে।

সম্পাদক।

অন্তরঙ্গ।

এ সংসারে প্রকৃত অন্তরঙ্গ কয় জন আছে? লোকে বোধ হয় জানে না ঐ অন্তরঙ্গ কথাটাতে কত মহত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে! অন্তরঙ্গ, অন্তরঙ্গ কথাটাই যেন কত মধুমাখা! ভগবান

যেন কতই মধুর ভাব উহাতে পূরিয়া রাখিয়াছেন। কে সেই মহাপুরুষ যিনি আমার অন্তরের নিভৃত গুহার আবর্জ্জনারাশি একটী একটী করিয়া পরিমার্জ্জিত করিয়া দিবেন? কে সেই সাধু যিনি সেই পবিত্র প্রেমময় রাজ্যের প্রান্তভাগ আমাকে দেখাইবেন? কে সেই জীবন-ধন, যিনি মোহন হাসি হাসিয়া আমার ভাঙ্গা হৃদয়ে সঞ্জীবনী-সুধা সিঞ্চন করিবেন। আমি যেদিকে আঁখি ফিরাইতেছি, সেই দিকেই আমি অন্তরঙ্গের মুখ দেখিতেছি, যে দিকে তাকাই, সেদিকে কত ভালবাসা-বাসি, কত মাখামাখি, কত মিশামিশি, আমার নিকট যেন এ স্বপ্নবৎ! ইহা স্বপ্নেই লয় হইবে।

ঐ দেখ, ঐ যে ধনকুবের অর্থ-মদে মত্ত, উহার কত অন্তরঙ্গ, কত আত্মীয় স্বজন আসিয়া "আমি তোমারই" শব্দে কর্ণ বধির করিয়া তুলিতেছে, কিসের দ্বারা এ সকল সংঘটিত হইতেছে? অর্থ! অর্থ!! অর্থ!!! অর্থের মোহিনী শক্তি, অর্থের যাদুকরী বিদ্যা উহার মূল মন্ত্র—মূল সূত্র। এ স্বার্থপূর্ণ সংসারে অর্থ! তুমি স্বনামধন্য! কিন্তু কালের কুটিল আবর্ত্তনে কি না সম্ভবে? ঐ ত আজ কয়েক বৎসর পরে সেই ধনগর্ব্বিত ধন-কুবের এক মুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল! সে এখন গাছের তলায় তৃণ-সজ্জা নির্ম্মাণ করিতেছে! কোথায় সেই বৈভব, কোথায় সেই আত্মীয়, কোথায় তাহার প্রিয় অন্তরঙ্গ! সকলেই দারিদ্র্য নিপীড়িত, বন্ধুর যন্ত্রণা পরিদর্শনে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় অন্তর্হিত।

আজ আমি কত 'আমার আমার' করিতেছি! আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা ও বন্ধু বলিয়া আপনাকে সুখের সাগরে ভাসাইতেছি, হায়! এখনও বুঝিলাম না যে, উহারা আমার কেহই নহে, এ গৃহ আমার, এ প্রাঙ্গণ আমার, কতই না আমার, কিন্তু কই, এ গৃহ যদি আমার হইত, তবে কেন আমি ইহাতে চিরদিন বাস করিতে পারি না। এ প্রাঙ্গণ যদি আমার হইত, তবে কেন ইহাতে আমি চিরদিন ধূলাখেলা করিতে পারি না? আমার ত এ কিছুই নহে, আমার বাটীর একটী ধূলিকণাও আমার নহে, অথবা চারিদিকে যাহা দেখি, সবই যেন আমার বলিয়া বোধ হয়। আমার পিতা আমার নহেন, আমার মাতাও আমার নহেন, অথচ প্রাণের ভিতর কে বলিতেছে "(আমার! আমার!!)" তবে কে আমার হইবে? ঐ অন্তরঙ্গ শব্দটী মনে হইল, ঐ বা আমার কে হইবে? এই সমস্ত ভাবনা, এই সকল আমার! আমার! কেবল রোগের বিকার, মায়া-মোহের জল্পনা কল্পনা মাত্র! তবে বুঝি আমার অন্তরঙ্গ মিলিল না। তবে কি অন্তরঙ্গ মিলিবে না? এই পাপ-তাপ-রোগ-শোক-পরিপূর্ণ সংসার-মরুতে অন্তরঙ্গ মিলে কিনা সন্দেহ। প্রতপ্ত বালুকাময় মরুভূমে কি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়? হইলে বড়ই মধুর! বড়ই আনন্দজনক হয়; সংসারে দেখিতেছি—কত লোকের কত আত্মীয়-স্বজন থাকে, কিন্তু ঐ সকল ভ্রান্তিময়, সব স্বপ্নের মত স্বপ্নেই মিলিয়া যায়। ঐ যে সুন্দরী, তাহার মৃত-স্বামীর পদপ্রান্তে আলুলায়িত-কুন্তলা

শোকে বিহ্বলা হইয়া অজস্র অশ্রু-বিমোচন করিতেছে, ঐ মাতৃহীন বালক নয়নজলে বক্ষঃ-স্থল প্লাবিত করিতেছে, পত্নী-বিরহে স্বামীর গণ্ডস্থল শোকাশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছে, উহারা ক্রন্দন করিতেছে কেন? উহারা কি জানে না, এ সংসারে কোথায় কবে কে আসিয়াছিল, যাহার আর যাইতে হয় নাই? কোথায় কবে কে জন্মিয়াছিল যে একদিন শ্মশানের সম্মুখীন হয় নাই? ধনী, তাহারও শেষ-সজ্জা শ্মশান! দরিদ্র, তাহারও শেষ-সজ্জা শ্মশান! এবং যে মনুষ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদে সর্ব্বতোভাবে সত্ত্ববান হইয়াও ধনী-গৃহের কুকুরে মার্জ্জারের সমান বলিয়া পরি-গণিত হইল না, তাহারও শেষ-সজ্জা শ্মশান! আজি স্বর্ণ-পর্য্যঙ্কে সুকোমল আস্তরণে যাহার কোমলতর শরীর শায়িত হয়, তাঁহারও শেষ-সজ্জা শ্মশান! পদ্মিনীর মত রূপসী, এবং রূপ-লাবণ্য-বিবর্জ্জিতা কাঙ্গালিনী, ছোট, বড়, শিশু, বৃদ্ধ, যে সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহারও বাহির হইবার পথ শ্মশান! তবে এ ক্রন্দন কেন? ঐ ক্রন্দনের কোন অর্থ নাই, কোন স্বার্থ নাই! উহা মায়ার ক্রন্দন, উহারা যাহাদের জন্য অশ্রু-বিমোচন করিতেছে, তাহাদিগকে যথার্থ ভালবাসিতে পারে নাই, পবিত্র প্রেম প্রদান করিলে সেই প্রেমের বলে সেই নিঃস্বার্থ প্রেমের আকর্ষণে উহাদিগকে অপার্থিব করিয়া লইতে পারিব? কিন্তু তাহা পারে নাই; এখন আবার লূতাতন্তুর মত সংসারের মায়া-জালে আবদ্ধ হইয়া, সেই অনুতাপ, পরিতাপ, শোক, দুঃখ, এবং বিপদ, অনন্ত-বিস্মৃতির অতল-জলে ডুবাইতেছে। তবে অন্তরঙ্গ কি, বুঝিলাম না! আর কি অন্বেষণ করিব? না, আর অন্বেষণ করিব না; এখন বুঝিতেছি যে, এরূপ অন্বেষণ বৃথা! উহার সুখ-দুঃখ সব বৃথা, কোথাও কি তবে অন্তরঙ্গ মিলিবে না? যে অন্তরঙ্গ, যে আমার প্রাণের প্রাণ, তাহাকে অনন্ত প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া রাখিব, আমি কি স্বার্থপর! আমি কেবল আমার অন্তরঙ্গ অন্বেষণে ব্যস্ত কেন? আমার যে অন্তরঙ্গ, সে কি সকলের অন্তরঙ্গ হতে পারে না? আমি যাহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিতে পারি, অন্যে তাহা কি পারিবে না? শত বার পারিবে, সহস্র বার পারিবে! উহার মধুর আলাপনে, সকলেই মোহিত হইবে, উহার প্রেমের কণিকামাত্র পাইলে কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমাগ্নি সকলের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইবে। জাতি-কুলের অভিমান, চিরদিনের জন্য সাগর-জলের অতল-তলে নিক্ষিপ্ত করিবে, তখন সকলেই প্রেমানন্দে, উৎফুল্ল হইয়া সহস্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিবে আমার "অন্তরঙ্গ" সেই—— মধুর হরিনাম!

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

——o——

গঙ্গা।

(১)

শরণ্যে, বরণ্যে, ধন্যে, পুণ্যে! ভগবতি!
নগণ্য তৃণটী যদি পড়ে তব নীরে,
জননী, সমান তারে লহ বুক পাতি,
যত্ন করে নিয়ে যাও প্রেম-পারাবারে।

হেন অভিমানশূন্যা দয়ার মূরতি।
তোমা ভিন্ন অন্য নাই জহ্নুকন্যা সতি!

(২)

তোমাকে দেখিলে মাত্র নগেন্দ্র-নন্দিনি!
সুধা-ধারা সিক্ত যেন হয় দেহময়,
আনন্দে নাচিয়ে উঠে হৃদয় অমনি
পাপ-রাশি অন্তর্হিত হয় পেয়ে ভয়
তখনি ত্রিতাপ-জ্বালা হয় তিরোভাব,
অনন্ত আবেগে ভক্তি হয় আবির্ভাব॥

(৩)

যক্ষ-রক্ষ-নাগ-নর পাতকি-নিকর,
সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয় নীরে করি স্নান,
তব বারি স্পর্শ করি মৃত-কলেবর,
মুক্ত হয় কিংবা এক বিন্দু করি পান,
তব তীরে যদি লভিবারে পারে স্থান।
পশু-পক্ষী জীব-জন্তু করে ধনাজ্ঞান॥

(৪)

ত্রিতাপনাশিনি তুমি ত্রিপথ-গামিনি।
ত্রিভুবন পবিত্র করেছ পদার্পণে।
তোমার সমান নাই কলুষ-হারিণি!
দরশনে মাতৃ-ভাব জেগে উঠে প্রাণে,
তীরে বাস নীরে স্নান করি বারি পান।
অন্তে যেন তোমার জীবনে ত্যজি প্রাণ॥

(৫)

তোমার তরঙ্গ-রাশি যে করে দর্শন,
অনন্ত আবেগে বহে ভক্তি-উৎস তার
ভাব-সিন্ধু-চিত্তে করে ভীম-গরজন
ঈশ-প্রেম আপনি বিকাশে আসি তায়,
এ ত্রিধার উদ্দাম প্রবাহ হৃদে যার।
করে কি অপূর্ব্ব এক রসের সঞ্চার।

(৬)

তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে করিছ গর্জ্জন,*
অনন্ত-লহরী-রাজী হেরিলে তোমার
আনন্দ-সাগরে মন হয় নিমগন
কত ভাব জেগে উঠে অন্তরে আমার,
এ প্রেম প্রবাহে যেন চলিছে সংসার।
প্রেম ভিন্ন ত্রিজগতে নাই কিছু আর॥

(৭)

ও প্রেমের গুরু-গুণে জ্বলিছে তপন
কোমল মাধুরী লয়ে উঠে শশধর,
প্রেমের সুবাস নিয়ে বহিছে পবন
প্রেমের কণিকা-রাজী তারকা-নিকর।
প্রেমের সুষমা নিয়ে উঠে ঊষা সতী,
প্রেম নিয়ে এজগত চলে দিবা-রাতি।

(৮)

সিন্ধুর নিকটে যত করিছ গমন
ক্রমে তব দেহ গঙ্গে করিছ বিস্তার,
তত্তই প্রবলা তুমি তরঙ্গ তেমন
জীবগণে শিক্ষা দিতে এ ভঙ্গি তোমার,
অনন্ত সমীপে জীব আনন্দ অপার।
অন্তরে সঙ্কোচ দুঃখ ক্ষীণ দেহ সার!!

(৯)

দিতেছ কি শিক্ষা এই ছলে নারীগণে,
পতির নিকটে সুখ আনন্দ অপার
দূরে দুঃখ-ভয় আর সদা শঙ্কা মনে
পতির নিকটে বল বিক্রম তাঁহার,
মনোবৃত্তি পতি পাশে সদা পরকাশ।
বসন্ত পরশে যথা কুসুম বিকাশ॥

(১০)

দরশনে মাত্র তুমি পাপ-তাপ হর

পিপাসা মুমুর্ষুগণে কর প্রাণ দান
দৃষ্টিমাত্র ত্রি-শরীরে সুধা-বৃষ্টি কর
অপার আনন্দে যেন নেচে উঠে প্রাণ,
তোমার প্রেম-তরঙ্গ করি দরশন।
অন্তরে প্রেম-পয়োধি করে গরজন॥

(১১)

তব অঙ্কে মলমূত্র ত্যজে কত জন
কত মৃত জীব বক্ষে সন্তানের প্রায়
ভক্তি-ভরে কত ভক্ত করিছে পূজন
সমদৃষ্টি তবু হেন! কে আছে কোথায়?
দিবা-নিশি মল-রাশি বহিছ ধরায়;
তবু পূতা পূজ্যা তুমি পাবকের প্রায়।

(১২)

সাগর-সঙ্গম তরে নাহিক বিশ্রাম
দিবা-রাত্তি গতি তব ক্লান্তি নাহি তায়
বাধা-বিঘ্ন পদে পদে দলি অবিরত
উদ্দাম আবেগে গতি প্রাণেশ যথায়,
জীবের আবেগ হেন ঈশ প্রতি হয়
আপন পতির প্রতি নারীর যা হয়
কি শিক্ষা দিতেছ দয়া করি অতিশয়
বুঝিবে কি হায় মোহাবৃত নেত্র যার,
তোমার পাদ পরশে দেবি! মন্দাকিনি!
ধন্যা পুণ্যা পূজ্যা আজ ভারত-জননী॥

(১৩)

অনন্তের সনে মরি মিশেছ যেখানে
অনন্ত লালসা তব অনন্ত গরব
উভয়ে উভয় শোভা করেছ সেখানে
অনন্ত লহরী তব কি ভৈরব রব
অনন্তের পরশনে অনন্তরূপিণি!
নিরিরণ ত্যাগ তুমি করেছ তথায়,
দুই দেহ এক হ'লে দেবি! মন্দাকিনি!
মিশিল বাসনা-রাশি অনন্তের পায়,
বার বার নমি মাগো পরমা প্রকৃতি
এমন প্রেমেতে ডু'বে থাকি দিবা-রাতি।

(১৪)

নাস্তিকেরে দিলে হেথা আস্তিকতা দান
ওরূপ হেরিলে ঈশ-ভাব আসে মনে
না মিশিলে নামরূপ করে না প্রয়ান,
শিক্ষা দিলে অল্পজ্ঞানী অভিমানী জনে
সতীকে সতীত্ব-ধর্ম্ম শিক্ষা দিলে আর,
সতীপতি এক দেহ নহে ভিন্ন কায়,
ভক্ত প্রভু সঙ্গে সদা এই ব্যবহার
কদাচার করি জীব বৃথা দুঃখ পায়,
তরঙ্গে তরঙ্গে কত দিছ উপদেশ।
অজ্ঞগণ কি বুঝিবে সে সব সন্দেশ॥

(১৫)

তটবাসী কীট ধন্য পবিত্র যেমন
কীর্ত্তি মণ্ডল মণ্ডিত নৃপতি নিকর
মুকুট-মণি মরীচি-চর্চ্চিত চরণে
দূরস্থ তেমন নয় সম্রাট প্রবর,
ধ্যান-যোগ অন্তরের অন্ধকার হরে
মণিরত্ন হীরকাদি বাহিরের আর
দেহ সুশীতল করে সুধাকর করে
কাম ক্ষুধা দীনজন হরে দৈন্য ভার
হেরিলে তোমাকে জ্ঞান-নয়ন প্রকাশি।
এসবার কার্য্য তুমি কর দিবা-নিশি॥

(১৬)

শতেক যোজন থেকে যদি কোন জন,
মা গঙ্গে মা গঙ্গে বলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
সুখাতের অংহরাশি করি নিপীড়ন,

কে যেন ঢালিয়া দেয় তাহার শরীরে।
অন্তকালে রেখো কোলে ভুলোনা আমায়।
দীনহীন এ মিনতি করি রাঙা পায়॥

শ্রীঅক্ষয়কুমার তত্ত্বনিধি।

বিদ্যাপতির রসমাধুরী।

সাধনার সোজা পথ, মুক্তির সহজ উপায়, কবি সকলকে উপদেশ করিতেছেন। হরিনাম ভিন্ন কলিতে জীবোদ্ধারের অন্য উপায় নাই, সাধনার এত সোজা পথও নাই। এই ভব-সাগরের কর্ণধার শ্রীহরি, তাঁহার শ্রীচরণ, তাঁহার তরি। জীব সেই চরণ-তরি আশ্রয় করিয়া ভবসিন্ধু পার হইতে পারিবে। সকাতরে কবি বলিতেছেন—

"ভনয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু
তুয়াপদ পল্লব, করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥"

২। নিত্যানিত্য বস্তু-বিচার

যার যেরূপ জ্ঞান, সে সেইভাবেই সংসারকে দেখে। কাহারও চক্ষে এই সংসার অনিত্য ও অসার বলিয়া বোধ হয়, কেহ বা এই সংসারকে সার ও নিত্যবস্তু বিবেচনা করিয়া ইহার সেবা করিয়া থাকে। মিল্, বেন্থাম, স্পেন্সর ইহ-সংসারকে এক চক্ষে দেখেন; আবার এমার্সন্, বর্ক্, সোপেনহার এই সংসারকে আর এক ভাবে দেখেন। কাহারও মতে এই সংসার বিলাস-কানন ও লীলা চত্বর; কাহারও মতে ইহা শ্মশান-ক্ষেত্র বা মরুভূমি। সংসার বিলাসকাননই হউক আর শ্মশানক্ষেত্রই হউক, ইহা যে অনিত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যিনি একটু অনুধাবন করিয়া দেখিবেন তিনিই এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বিদ্যাপতি ঠাকুর একথা উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই জন্য তিনি বলিতেছেন—

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু-সম
সুত-মিত রমণী সমাজে।"

এই সংসার অনিত্য। কেমন? উত্তপ্ত বালিতে জলবিন্দু পড়িবা মাত্র যেমন চকিতের ন্যায় বিশুষ্ক হইয়া যায়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা দ্বারা সুশোভিত এই আপাততঃ মনোহর সংসারও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী। সংসারের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বিদ্যাপতি যে উপমাটী প্রয়োগ করিয়াছেন, সেটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। চিত্রকর হইয়া কবি এই অনিত্যতার ছবিটী অঙ্কিত করিয়াছেন। সংসার অনিত্য এই কথা ভাবিয়া কবির হৃদয় শান্তি হারাইয়াছে, তাই কবি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—

"তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন্ কাজে।"

অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইলাম আর নিত্য বস্তুটী একেবারে ভুলে গেলাম! হায়! আমার একূল ওকূল, দুকূলই গেল, কোন কাজই হইল না। নিত্যবস্তু কি? নিত্যবস্তু হরি নারায়ণ, ভগবান! তাৎপর্য্য এই, নারায়ণকে ভুলে গিয়ে মিছে মায়ায় বদ্ধ হইলাম; ভগবানই সৎ, বাকি সব অসৎ; তিনিই নিত্য, বাকি সবই অনিত্য! সংসারে আসক্ত হওয়াই

রোষাবহ; আমার চিত্ত অসার সংসারেই আসক্ত। সংসারে আসক্ত বলিয়াই হে হরি! আমি তোমাকে ভজিতে পারি নাই, অতএব আমার শেষ দশায় কি হ'বে? আমার পরিণাম অতিশয় শোচনীয়, আমার মুক্তির আশা বা ভরসা নাই। কবি নিরাশ হইলেন, বলিলেন, আমার মুক্তির আশা নাই।

"মাধব! হাম্ পরিণাম নিরাশা।"

নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার সঞ্চার হইল; আবার বুকে ভরসা বাঁধিল। বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তির অপূর্ব্ব ক্রীড়া। কবি গাহিলেন—

"তুঁহুঁ জগতারণ, দীনদয়াময়
অতএ তোহারি বিশোয়াসা।"

হে হরি! তুমি জগতের জীবের ত্রাণকর্ত্তা, তুমি দয়াময়। তোমার দয়ার উপর আমি নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস যে তুমি আমাকে উদ্ধার করিবে।

তাহার পর কবি খেদ করিয়া বলিতেছেন—

"আধ জনম হাম্, নিদে গোঙায়নু
জরা শিশু কত দিন গেল।
নিধুবনে রমণীরসরঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন্ বেলা॥

আমি অতিশয় পাপী, অনিত্য সংসার সুখে কাল কাটাইয়াছি, তোমাকে ভজনা করি নাই। "আমার দিন গেছে মিছে কাজে রাত্রি গেছে নিদ্রায়", বার্দ্ধক্য ও শৈশব কত কষ্টে কেটে গেছে আর যৌবনকাল রমণীর সঙ্গে রঙ্গরসে কেটে গেছে; সেই জন্ত রাধাকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ভজনা করা হয় নাই। যাহারা ঘোর সংসারপঙ্কে নিমগ্ন তাহাদের এইরূপই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। তাহারা দিনরাত্রি সংসারের কাজে ঘুরিয়া বেড়ায়; ছেলে মেয়ের আপনার ও স্ত্রীর সুখের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়; পয়সার চিন্তায় সারাদিন ব্যতিব্যস্ত থাকে, সুতরাং তাহাদের ভগবচ্চিন্তায় অবকাশ হয় না। হায়! হায়! রমণীর সঙ্গে রঙ্গরসে মত্ত হইবার সময় হয়, কিন্তু হরিভজন ও হরিসাধনের এক তিলের জন্তও সময় হয় না। ভজন সাধন ত দূরের কথা; এমন কি হরিনাম বা হরিস্মরণ করিবার সাবকাশ নাই। এ ত ষোল আনা পাপ। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; এরূপ পাপীর উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত।

সংসারের সকলই অনিত্য, কেবল একমাত্র শ্রীভগবানই নিত্য ও সার বস্তু। তিনিই কেবল অক্ষয়, পুরাণ, অনন্ত ও অনাদি; তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, আর সকলই জন্মমৃত্যুর অধীন। তাই কবি বলিতেছেন—

"কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।"

ভূত সকলের আদি অন্ত আছে, স্বর্গের দেবতাদেরও আদি অন্ত আছে, চতুরানন ব্রহ্মারও আদি অন্ত আছে (কতবারই তাঁহার জন্ম হইয়াছে এবং কতবারই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলা যায় না) কিন্তু হে ভগবান! তোমার আদিও নাই অন্তও নাই।

জলবুদ্বুদ্ জলেই উথিত হয় আবার জলেই মিশিয়া যায়। সেইরূপ এই বিশাল সংসারের উৎপত্তি তোমাতে এবং লয়ও তোমাতে

হইয়া থাকে। তুমিই কারণ-বারি। তুমি সৃষ্টিকালে ভূতসকলকে আপন দেহ হইতে প্রসব করিতেছ, আবার প্রলয় কালে তাহাদের সংহার করিয়া আপন দেহেই অন্তর্নিবিষ্ট করিতেছ। এই যে নয়নপ্রীতিকর বিশ্বসংসার সম্মুখে দেখিতেছি তুমি তাহাকে আবার গ্রাস করিবে। যে প্রকৃতি-প্রতিমাকে নানা সাজে সাজাইয়াছ, সেই প্রতিমাকে আপন কারণ-বারিতে বিসর্জন দিবে। ভগবান্! তোমার অনন্তলীলা!

"তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমায়ত
সাগর লহরী সমানা।"

হে নাথ! পাপীদের তুমিই একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, মুক্তিদাতা, তোমা ভিন্ন শমন ভয়ে ভীত জীবের অন্য গতি নাই। তুমি আদি, তুমি অনাদি, তুমি আদির আদি, তুমি অনাদির অনাদি, তুমি মহান্ পুরুষ। জীবোদ্ধার তুমি ভিন্ন আর কে করিতে পারে? তোমার শক্তি, তোমার জ্ঞান, তোমার মহিমা ভিন্ন জীবোদ্ধাররূপ কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন হইতে পারে না। দেখিয়া শুনিয়া জীবোদ্ধারের ভার তুমি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছ, তাই ভক্তচূড়ামণি বিদ্যাপতি কহিতেছেন—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমনভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি
অবতারণ ভার তোহারা।"

হে হরি! তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে মারিতে হয় মার, রাখিতে হয় রাখ; তোমা বই আর গতি নাই।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

প্রার্থনা।

ভুলে বা ত ডাকি না প্রভু ভুলে ভালবাসি না।
ভুলিতে ভুলিতে তব বিশ্ব-রূপ ভুলি না॥
বাসিব তোমারে ভাল
আজি হ'তে প্রাণ খুলে,
দাও প্রভু সে শকতি
(ওই) বাসি যেন ভুলে ভুলে
(আজি) বড় ভুল ভেঙ্গে দাও, ভুলে বড় ভুলে থাকি।
ভুলিনা জীবনে যেন রাঙ্গাপদে মতি রাখি॥

শ্রীবলাইলাল মুন্সী।

হরিনাম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্রের অলৌকীত্ব প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অবতারত্ব সপ্রমাণ করিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। ভক্ত সরল ভক্তি-বিশ্বাসেই তাঁহার ভগবানকে অর্চনা করিয়া থাকেন, প্রকৃত ভক্তের পূজায় ভগবানকে পুরস্কার নিমিত্ত যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয় না—শিশুর মাতৃ পরিচয়ে জননীর স্নেহ-মমতা বা সহজাত চিত্তাকর্ষণই যথেষ্ট। ভক্তের ভগবান জ্ঞান-কর্ম্মের—যুক্তি-তর্কের অতীত; তিনি প্রেমময়—দয়াময়। প্রেম-ভক্তিই তাঁহার পূজার প্রধান উপচার—আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসই ভগবদুপাসনার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। ভক্ত শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাসে তাঁহাকে ডাকিলেই—শিশু 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিলেই তিনি তাহাকে দর্শন দানে পবিত্র করিয়া

থাকেন। সংশয়ী ভক্তের সন্দেহ নিরসন জন্য নহে—ভক্তের ভক্তির আবদার রক্ষার নিমিত্ত জিজ্ঞাসু ভক্ত নিত্যানন্দের প্রশ্নের উত্তরদান ছলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং শ্রীমুখে এইরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

"কি পুছিস্ ভাই আমার
ব্রজের খেলা দৌড়াদড়ি,
এবার নদের খেলা (ধুলায়) গড়া গড়ি॥
ব্রজের খেলা বাঁশীর তান্,
নদের খেলা হরির গান;
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া,
নদের বেশ কৌপীন পরা॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, হরিনাম প্রচার পতিত অধমের প্রাণে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার এবং পতিতের উদ্ধার সাধনই শ্রীভগবানের শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইবার—ভগবান হইয়া মানবদেহ ধারণের এক মাত্র কারণ। ভগবান স্বয়ং মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনি ভক্ত সাজিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া গাইয়া আপনি পাগল হইয়া অবোধ পতিত মানব সম্প্রদায়কে ভক্তির পবিত্র আলোক প্রভাবে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান ব্যতীত ভক্তির এ উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন, অন্যের পক্ষে অসম্ভব; তাই স্বয়ং ভগবানকেই আদর্শ ভক্ত সাজিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইতে—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। 'হরি' বলিতেই তাঁহার পবিত্র অশ্রু-গঙ্গা প্রবাহিত হইত—'কৃষ্ণ' বলিতেই তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। কৃষ্ণই ভগবদ্ভক্তির ইহাই ত শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ভক্তের আতিশয্য-ভিন্ন—প্রাণের অসাধারণ আবেগ-আকুলতা ব্যতীত কেহ ভগবানের জন্য এরূপ ভাবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে পারেন না।

প্রভু নিয়ত এরূপভাবে হরিগুণগান ও কৃষ্ণ নাম প্রচারে—পতিতের উদ্ধার ব্রতে নিরত থাকিতেন। তাই আজও বঙ্গের পতিত জাতি—পাতকী-পাষণ্ড সকলে "প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ, নামে এমন উন্মত্ত! তাই আজিও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—গৌড় দেশের গৌরাঙ্গ ভক্ত-সম্প্রদায় প্রেমানন্দে গাইয়া থাকেন, "প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ"! তাই এ সুদীর্ঘ কাল পরে আজিও নিশীথ-নিদ্রাভঙ্গে শুনা যায় "প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ!" তাই আজিও চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে—মাঘের প্রচণ্ড শীতে মহোৎসবের মহাক্ষেত্রে মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় "প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ"! পথে, ঘাটে, মাঠে ভক্ত-মুখে সঙ্গীতে শুনা যায়, "প্রাণগৌর নিত্যানন্দ!" বায়ু-তরঙ্গে সুদূরে ভাসিয়া বেড়ায় সুরসঙ্গীতের ন্যায় সে পবিত্র মধুর সঙ্গীতধ্বনি, "প্রাণগৌর নিত্যানন্দ"! •

মানব-হৃদয়ের উপর যাঁহার এত প্রভাব—যাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তনের জন্য অসংখ্য ভক্ত নিয়ত ব্যাকুল, যাঁহার গুণে জ্ঞানে ও মধুর প্রেমে এ জগৎ মুগ্ধ, তিনি ভগবানের অবতার—মানুষের উপাস্য দেবতা বলিয়া পূজা-ভক্তির

• নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রাণ—প্রধান ভক্ত। রাম অবতারের লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ অবতারের বলদেব এবং শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের নিত্যানন্দ এক বলিয়াই গৌর-ভক্তগণের বিশ্বাস।

পুষ্পাঞ্জলি না পাইবেন কেন? বস্তুতঃ প্রেমের রাজত্ব এমনি চিরস্থায়ী; ভক্তের ভগবান এমনি চির মধুর! হায়! কবে আবার এ পাপ-তাপময় ধরিত্রী-বক্ষে এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে। কবে আবার কলির অবতার পতিতের প্রাণ-দেবতা প্রেম-ভক্তিতে মত্ত হইয়া পাপী-তাপীর দ্বারে দ্বারে গাইয়া বেড়াইবেন,—"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।"

(৪)

হরি-সভা শুধু জাতি বিশেষের সভা নহে; উহা সকল জাতির, সকল ধর্ম্মের সভা। হরি-সভা সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের সার্ব্বজনিক সভা, উহা সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের পবিত্র শান্তি নিকেতন; উহা জাতীয় হিংসা-বিদ্বেষের কলুষ সম্পর্ক-শূন্য বিশ্বমানবের মহা তীর্থ।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

হে দেবদেব ঈশ্বর! তুমিই আমার মাতা তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধন এবং তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।

"ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত, গগন,
ভূত পঞ্চময় তুমি নারায়ণ।
অণু পরমাণু তুমি, নির্ব্বিকার,
সর্ব্ব আত্মা-রূপি তুমি নিরাকার।
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্রষ্টা, দ্রষ্টা, দৃশ্য;
তুমি জ্ঞাতা, তুমি স্থিত, সত্যাগত;
তুমি যোগ, তুমি যাগ কর্ত্তা কর্ম্ম,
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম ত্রাণ তাতা।"

ইহা সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের প্রাণের কথা। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সম্মত মহা সত্য; বিশ্ববাসী সে মহা সত্যেরই এক মাত্র উপাসক। সুতরাং শৈব, শাক্ত বৈষ্ণব,গৌর,গাণপত্য সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের—সকল জাতিরই ভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত সভায়—হরি সভায় যোগদান করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। যেখানে ভগবানের কথা, ধর্ম্মের আলোচনা, ঈশ্বর-গুণ-কীর্ত্তন হয়, সে স্থানে সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ, জাতীয় ঈর্ষার দুর্গন্ধ তিষ্ঠিতেই পারে না। হরিসভা শান্তির পরম নিলয়—সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের পবিত্র ক্ষেত্র।

শ্রীভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত সভাই হরিসভা—তাঁহার পবিত্র মন্দিরই হরিমন্দির; সুতরাং ব্রাহ্মের উপাসনামন্দির, খ্রীষ্টানের গির্জ্জা এবং মুসলমানের মসজিদ সবই হরিসভা বা হরিমন্দির সদৃশ। তবে হিন্দুর হরিসভায় বা দেবমন্দিরে, ব্রাহ্মের উপাসনা গৃহে, খৃষ্টানের গির্জ্জায় এবং মুসলমানের মসজিদে সকলেই ভক্তের মস্তক ভগবানের চরণোদ্দেশে আনত না হইবে কেন? শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার অনুগ্রহে যবন হরিদাস, ঠাকুর হরিদাস হইয়াছিলেন। আজিও হিন্দু যবন বৈষ্ণব জ্ঞানে তাঁহার পূজা করে—প্রসাদ গ্রহণ করে। তবু কি হিন্দু-ধর্ম্মকে অনুদার ভ্রমমার্গের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিতে হইবে? হিন্দুধর্ম্মের মত এমন উদার, এমন উচ্চ—এমন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ আবার জগতে

কোন ধর্ম্মের কোন শাস্ত্রে আছে? একমাত্র হরিসভার ভিতর দিয়া—হরিনামের মধুর কলরবে মুগ্ধ ও হরিনামামৃতে স্নাত ও পূত করিয়া হিন্দু বিশ্বমানবকে—পৃথিবীর সকল জাতি ও সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে তাহার আপন ধর্ম্মের সমুদার সমুন্নত সুবিশাল ক্রোড়ে স্থান দান করিতে পারে। জাতীয় ঘৃণা-বিদ্বেষ ভুলিবার ইহা উজ্জ্বল নিদর্শন—জীবন্ত আদর্শ। হিন্দু হউন, বৌদ্ধ হউন, আর খ্রীষ্টানই হউন, সাধকমাত্রেই আমার মাথার মণি, ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্ত মাত্রেই আমার প্রীতি-ভক্তির প্রাণদেবতা।

নদীজলসকল হায়, ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়,
ঈশ্বরে পূজিতে যার যথা অভিপ্রায়;
ভিন্ন লক্ষ্য নাহি কভু, সকলেরি এক বিভু
একই উদ্দেশ্য সবে ভিন্ন পথে ধায়।
কেবা শুধু নাম ভেদ, বৃথা ঈর্ষা বৃথা ভেদ,
নাম ভেদে ভিন্ন জ্ঞানে বৃথা করি ভুল;
থাকিলেও পক্ষাপক্ষ, সকলেরি এক লক্ষ্য
সকলেরি এক বিভু সাধনার মূল।

জল পান করিলেই তৃষ্ণার্তের পিপাসা নিবারণ হয়; সে জলের নাম জল, পানি, একোয়া বা ওয়াটার যাহাই কেন না হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? ভক্ত তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে—আরাধ্য দেবতাকে হরি, কৃষ্ণ, কালী, খোদা বা গড্ যে নামে ইচ্ছা অভিহিত করুক, তাঁহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবেই! জগতের সমস্ত ধর্ম্মমতই একটা সনাতন সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; সুতরাং ধর্ম্ম-মাত্রই বিশ্বমানবের মাননীয়, তাহাতে সন্দেহ কি? একই স্থানে পঁহুছিবার বহু পথ থাকিতে পারে, কোনটি সরল, কোনটি বঙ্কিম, কোনটি কুশ-কণ্টকাকীর্ণ, আবার কোনটি বা কুসুমাবৃত; কোন পথে অতি সত্বর কোন পথে বা একটু বিলম্বে লক্ষ্য স্থলে পঁহুছা যাইবে মাত্র। এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত থাকিতে পারে; কোনও সাধনা কৃচ্ছ্রসাধ্য, কোনও সাধনা বা অতি সরল, কোনও সাধনায় অতি সত্বর, কোনও সাধনায় বা অতিবিলম্বে সাধকের সিদ্ধি বা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম মত ভেদের ইহাই নিদান। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সরল বিশ্বাস ভাল; কিন্তু গোঁড়ামী ভাল নহে। গোঁড়ামীর চেয়ে ভাড়ামী দোষের, আবার গোঁড়ামীর ভাড়ামী আরও দোষের। ধর্ম্ম-জগতে মতভেদ থাকে ও থাকুক, কিন্তু মত-ভেদের ঝগড়া থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

"ধর সাঁচ্চা মেরীর বাচ্চা, কিংবা ধ্রুব প্রহ্লাদে,
বাজাও ঢাক, টান নাক, আর বল আহ্লাদে—
নেইক' ক্ষতি; কিন্তু যদি ছাড় ভড়ং বুজরুকি
দেখবে মজা—সবাই বাজায় একই তালে ডগ
ডুগি।
(হেঁয়ালি)।

শব্দেরও একটা শক্তি আছে—প্রাণ আছে। 'হরি' শব্দের এমনি মহিয়সী শক্তি—এমনি অসাধারণ গুণ যে, 'হরি' এই শব্দটি উচ্চারণ মাত্রই বক্তা ও শ্রোতার দেহ, মন ও আত্মা পবিত্র হয়, মন কি যেন এক স্বর্গীয় পদার্থের—অপার্থিব অমূল্য রত্নের অন্বেষণে ছুটিয়া বেড়ায়! আমি অন্ন-আচার ভক্ষণ করিতেছি না, অন্ন-আচার আমার নিকটেও নাই, তথাপি 'আচার

এই শব্দটি শ্রবণ বা উচ্চারণ মাত্রই কি যেন কি একটা তীব্র জ্বালায় রসনা আপ্লুত হয়; সেই রূপ 'হরি' এই শব্দটি শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলেই হৃদয় প্রেম-রসে সিক্ত হয়, প্রাণ তাঁহার পদারবিন্দ লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে নিতান্ত পাপী-পাষণ্ডের প্রাণেও ভগবদ্ভক্তির বাণ ডাকে। তাই শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

"আয়রে মাধাই কাছে আয়,
হরিনামের বাতাস লাগুক গায়।

হরিনামের বাতাস গায় লাগিলে অনধিকারী অধিকারী হয়, সংসারাসক্ত পৃথিবীর জীব-ভক্তির পরশ-পাথর স্পর্শে মুক্তির শান্তি সোপানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয়। 'হরি' শব্দের এমনি অসীম গুণ যে, পাপী, তাপী, পাষণ্ড যেই হরি নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করুন না কেন, হরিনাম তাহাকেই মুক্তির পবিত্র পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। বস্তুতঃ—

"হরি নামের এমনি শক্তি, জন্মে ভক্তি,
মুক্তি দেয় সে জোর ক'রে।"

ফলতঃ শব্দের প্রকৃতিগত এমনি শক্তি নিহিত আছে যে, সে শক্তি মনের উপর অসাধারণ ক্রিয়া করিয়া শ্রোতাকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। রণ-বাদ্য শ্রবণে কার প্রাণ না যুদ্ধ-উল্লাসে নাচিয়া উঠে? সিংহের ভীম গর্জ্জনেই বা কোন্ বীরপুরুষের প্রাণ আতঙ্কে না শিহরে? মধুর বংশীরব শ্রবণে কাল ভুজঙ্গও মুগ্ধ হয়,—মুহূর্ত্তে হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া যায়।

"নাচে শিখী শুনি মেঘধ্বনি,
ডমরুর রবে নাচে কাল ফণী।"

এ সব নিত্য প্রত্যক্ষীভূত সত্য। সুতরাং হরিনামের গুণে—হরি নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে পাষণ্ডের দুষ্প্রবৃত্তি দূর হইবে, অভক্তের প্রাণে ভক্তির মধুর বন্যা প্রবাহিত হইবে, সংসারাসক্ত বিষয়ানুরক্ত জীব প্রেমের অনাবিল বাতাসে মুক্তির স্বর্গরাজ্যে ছুটিয়া যাইবে—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! বলিয়া পাগল হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? কবি বলিয়াছেন, "নাম-রসে যার মন মজেছে, সে মানুষ কি আর মানুষ আছে?" নাম-রসে মন মজিলে সে ত আর এ পৃথিবীর মানুষ থাকে না, সে যে স্বর্গের দেবতা হইয়া যায়।

নাম ব্রহ্মস্বরূপ। হরিনাম অপৌরুষেয় সিদ্ধ শব্দ। এ নামের শক্তি মহা তেজস্বিনী হরিনাম পতিত-পাবন। "হরি শব্দের এমনি প্রকৃতিনিহিত অসাধারণ গুণ যে,"হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" হরি নাম করিলেই পতিতের উদ্ধার হয়—পাপীর বহুজন্মসঞ্চিত পাপ বিদূরিত হয়।

"চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ॥"

হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আর হরিভক্তিবিহীন দ্বিজও চণ্ডালাধম।

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক ব্যবসিতোহিসঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

অতি দুরাচার পাষণ্ডও যদি এক মনে হরি ভজনা করে, তবে সেও অচিরে পাপমুক্ত ধর্ম্মাত্মা হইয়া থাকে। বিল্বমঙ্গল ও যবন হরিদাস প্রভৃতি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর্দ্র

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে হয়, সে যুগের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয় কোনও ব্রাহ্মণ বংশজ ব্রাহ্মণ নামধেয় ব্যক্তিকে উহা প্রদান না করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জ্ঞানে হরিদাসকেই উহা প্রদান করিয়া ছিলেন। হরিদাস নিজকে অস্পৃশ্য নীচ জাতীয় জ্ঞান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন, প্রভু! আমাকে ছুঁইও না, তদুত্তরে প্রভু বলিয়াছিলেন, "হরিদাস! আমি স্বয়ং পবিত্র হইবার নিমিত্তই তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, তোমার ন্যায় পবিত্রতা ধর্ম্ম আমার নাই, কারণ হরিনামের গুণে,—

"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপোদান॥
নিরন্তর কর চারিবেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥"

অনন্তর শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীভগবানের এই শ্লোকটি উচ্চারিত হইল। যথা:—

"অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা।
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

হে প্রভু! যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার মঙ্গলময় নামটি বর্ত্তমান, সে নীচ চণ্ডাল জাতীয় হইলেও অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যিনি তোমার নাম করিতেছেন, তিনি নিরন্তর তপস্যা, যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থের স্নান ও চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন। তোমার ভক্তের অনন্ত মাহাত্ম্য। ক্রমশঃ—

কবিরাজ শ্রী[illegible] ঘোষ কবিরত্ন।

"ডাক্তারের বাড়ী।"

(১)

সন্ধ্যা হইতে আর দেরী নাই। একটা গাঢ় অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল। গৃহসংলগ্ন উদ্যানে বিপিনচন্দ্র একমনে কি ভাবিতেছিল, সহসা তাহার তিন বৎসর বয়স্কা কন্যা ছুটিয়া আসিয়া বাবার গলা ধরিয়া দাঁড়াইল। বিপিনচন্দ্র তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন—কিরে খেঁদী! ভাত খেয়েছিস্? খেঁদী কোলের উপর দুলিতে দুলিতে বলিল—খেয়েছি, সহসা উদ্যানের ভিতর একটা বিড়াল ছানা দেখিতে পাইয়া খেঁদী চিৎকার করিয়া বলিল—বাবা! বেরাল, বিপীনচন্দ্র অন্যমনে বলিয়া উঠিলেন—বেরাল ওর মাকে খুঁজ্‌ছে। খেঁদী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বাবা আমার দুটো মা। বিপিনচন্দ্র সহসা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—কিরে খেঁদী কি বল্‌ছিস? খেঁদী পুনরায় বলিল—বাবা আমার দুটো মা নয়? একটাকে ডাক্তারের বাড়ী নিয়ে গেছে আর একটা ঘরে আছে; খেঁদী কোনও উত্তর না পাইয়া পুনরায় বলিল —আচ্ছা বাবা আমার একটা মাকে যে খাটে করে ডাক্তারের বাড়ী নিয়ে গেল সে আর আসবে না? বিপিনচন্দ্র কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন—সন্ধ্যা হয়েছে বাড়ী চল্, অদূরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় বিপিনচন্দ্র প্রাণে একটা উদাস ভাব লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

(২)

আজ প্রায় একবৎসর হইতে [illegible]

বিপিনচন্দ্রের পত্নী একটী এগার বৎসরের ও একটি তিন বৎসরের কন্যা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। গৃহে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবীন, বিধবা ভ্রাতৃজায়া ও তাহার ছেলে মেয়ে ব্যতীত আর কেহ ছিল না। কন্যা দুইটীর লালন-পালনের জন্য বিপিনচন্দ্র সংপ্রতি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুতে বিপিনচন্দ্র বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন কি সংসারে তাহার আর শ্রদ্ধা ছিল না বলিলেই হইত। পত্নীর মৃত্যুর পর কন্যা দুইটীর উপর স্নেহও তাহার দ্বিগুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায়ই সকলেই দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর একটু বশীভূত হইয়া পড়েন এবং সন্তানাদির উপর স্নেহ কমিয়া যায়। বিপিনচন্দ্রের মনে এই ধারণাটি প্রবল ছিল। এই জন্য তিনি নিজেকে একটু সামলাইয়া চলিতেন ও জগতে বিমাতার একটা ভাল দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যও সচেষ্ট ছিলেন।

বিপিনচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী যেদিন সংসারে নূতন আসিল, অনেকেই অনেক কথা বিপিন-চন্দ্রকে বলিল; বিপিনচন্দ্র সকলকার কথাই শুনিতেন ও মনে মনে ভাবিতেন—"স্ত্রী যে ভাল মন্দ হয় উহা স্বামীর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।" সকলেই বলিত, এইবার বিপিনচন্দ্রকে অনেক ভুগিতে হইবে, কিন্তু সপ্তাহ ঘুরিতে না ঘুরিতে যখন সকলেই দেখিলেন যে, বিপিন-চন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী মনোরমা আপনা হইতেই খেঁদীকে কোলে টানিয়া লইল ও সংসারে বিপিনচন্দ্রের প্রথমা পত্নীর এক একটী কাজ ক্রমশঃ খুঁজিয়া লইতে লাগিল, তখন সকল-কারই মুখ ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। বিপিনচন্দ্র ভাবিলেন বুঝি তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ করা সার্থক হইল।

বিপিনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুষমা তাহার স্ত্রীর অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের ছোট। বিপিনচন্দ্র এই কন্যাটীর জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, বাপ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে যে সন্তান পর হইয়া যায় এ ধারণা যাহাতে তার না আসে সে জন্য তিনি সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন ও সময়ে সময়ে নির্জ্জনে তাহাকে বুঝাইতেন। এদিকে মনোরমার প্রতিও বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল, যাহাতে মনোরমা শীঘ্র শীঘ্র মেয়েগুলিকে মিলাইয়া লইতে পারেন একজন বিপিনচন্দ্রও চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সেদিন রবিবার, বিপিনচন্দ্র আফিসে বাহির হন নাই। সকাল বেলা গৃহের দালানে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। নীচে রান্না-ঘরে বালিকা পত্নী কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় বিপিনচন্দ্রের ভ্রাতা নবীন কোথা হইতে দাদার কাছে আসিয়া বসিল, বিপিনচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"কিহে নবীন, পাড়ায় আমার বিবাহ সম্বন্ধে কেউ কিছু বলে নাকি?" নবীন বলিলেন—"না, তবে কেউ কেহ বলে যে ছেলে-মেয়েগুলো যেন পর হয়ে যায়।" বিপিনচন্দ্র বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"আচ্ছা, এসব কথা পাড়ার লোকে কেন বলে বলতো। দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে কি ছেলে-মেয়ে কখন পর হয়? ছেলে-মেয়ে

তোমাকে মানুষ কর্‌বার জন্যই তো আমি বিবাহ করিয়াছি।" নবীন নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বিপিনচন্দ্র আর কিছু বলিলেন না, রাত্রে বিপিনচন্দ্র নিজের শয়ন-কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সুষমা তাহার নূতন মায়ের সহিত গল্প করিতেছিল। বিপিনচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন, সুষমা মাকে ছাড়িয়া পিতার নিকট আসিল। পিতা ও কন্যায় বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, মনোরমা খেঁদিকে লইয়া একপাশে শুইয়া রহিলেন, সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

সকালে বিপিনচন্দ্র সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া নবীন নবীন করিয়া ডাকিতে ডাকিতে গৃহের দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, নবীন বাহিরের ঘরে ছিল। দাদার গলার স্বর শুনিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এমন সময় খেঁদি ঘুম হইতে উঠিয়া মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিপিনচন্দ্র উপর হইতে ভ্রাতৃজায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৌদিদি! খেঁদি কাদ্‌ছে মেয়েকে পাঠিয়ে দাও।" বিপিনচন্দ্রের ভ্রাতৃজায়া নির্ম্মলা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মেজ বৌ! খেঁদি উপরে কাঁদ্‌ছে একবার দেখগে।" মনোরমা বলিল—"এখন কুট্‌নো কুট্‌ছি, কি করে যাই, ওকে নীচে পাঠিয়ে দিতে বল। সে কথা বিপিনচন্দ্রের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিপিনচন্দ্র সহসা গলা সপ্তমে চড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"কই গো বৌদিদি! এখন এল না যে, শীগ্‌গির কুট্‌নো কোটা ফেলে রেখে দিয়ে আস্‌তে বলে দাও। মেয়েটা মা-মা করে কাঁদ্‌ছে শুনেও নীচে বসে রয়েছে ওঁর কুট্‌নো কোটাটা আগে হোল।" মনোরমা নিঃশব্দে আসিয়া খেঁদিকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

নবীন বিপিনচন্দ্রের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—"মেজ বৌদিদি আমাদের সংসারে নূতন আসিয়াছে, বেশী বকিলে হয়তো মন আবার খারাপ দিকে চলিয়া যাইতে পারে।" বিপিনচন্দ্র বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"মন খারাপ আবার কি? বুড়ো মাগী এখন থেকে এদের না দেখ্‌লে আর কি কখন এদের উপর স্নেহ পড়্‌বে?" নবীন নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বিপিনচন্দ্র বকিতে বকিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

প্রত্যহই রাত্রে বিপিনচন্দ্র কক্ষে আসিয়া দেখিতেন—সুষমা ও তাহার স্ত্রী দুইজনে গল্প করিতেছে কিন্তু আজ বিপিনচন্দ্র বাড়ী আসিয়া দেখিলেন—সুষমা মেজেয় শুইয়া একটা রামায়ণ লইয়া পড়িতেছে, মনোরমা নিঃশব্দে খাটে শুইয়া আছে। বিপিনচন্দ্র শয্যায় শুইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"কাযের মধ্যে তো কেবল ঘুমই দেখিতেছি মেয়েগুলো যে কোথায় থাকে কি করে ওগুলো দেখ্‌বার আর খেয়াল হয় না; এটা জেনে রেখ যে, মেয়েগুলোকে মানুষ কর্‌বার জন্যেই তোমাকে বে করা হয়েছে।" এই বলিয়া বিপিনচন্দ্র সুষমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুই নীচে কি পড়্‌ছিস্ উপরে শুবি আয়।" সুষমা উপরে আসিয়া শুইল। বিপিনচন্দ্র বলিলেন—"নলদময়ন্তীর গল্প জানিস্?" সুষমা বলিল—"না, [illegible]

বাবা!" বিপিনচন্দ্র গল্প আরম্ভ করিলেন, সে রাত্রি গল্পে কাটিয়া গেল।

অদ্য বিপিনচন্দ্র আফিসে বাহির হইয়াছেন। দুপুরবেলা মনোরমা গৃহের কাজ শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় সরলা আসিয়া উপস্থিত হইল। সরলা মনোরমার বাল্য-সখী, ইহার বিবাহ বিপিনচন্দ্রের পার্শ্বের বাটীতেই হইয়াছিল। মনোরমা সরলাকে দেখিয়া বলিল—"এতদিন আসিস্ নি কেন?" সরলা বলিল—"কি করি ভাই, আমাদের বাড়ীতে তো আর কেউ নেই আমাকেই সব কোর্তে, হয় সময় পাই না, তা তুই কেমন আছিস্?" মনোরমা বলিল—"এই এক রকম কেটে যাচ্ছে মাত্র।" সরলা কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকিয়া বলিল—"সত্যিই তো ভাই, তা আর কি কোর্বে?" মনোরমা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। সরলা কথা-প্রসঙ্গে নিজের ঘরের অনেক কথা মনোরমাকে শুনাইতে লাগিলেন। মনোরমা নিঃশব্দে সরলার কথা শুনিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় পার্শ্বের ঘর হইতে নির্ম্মলা ডাকিলেন—"মেজ বৌ!" মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। মনোরমাকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া সরলা বলিল—"আচ্ছা, তবে আজ আমি আসি। আর বোসবো না।" মনোরমা বলিল—"মাঝে মাঝে আস্তে ভুলিস্ নি।" সরলা "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মলা মনোরমাকে বলিলেন "কে কথা কইছিল গো?". মনোরমা বলিল "ওবাড়ীর সরলা।"

"চলে গেল বুঝি"?

"হুঁ"।

নির্ম্মলা আর কিছু না বলিয়া বলিলেন—"আমি একলা বসে আছি, তাই তোমায় ডাক্‌ছিলুম, আচ্ছা বৌ! আজকাল তোমার কি হয়েছে বলতো? সর্ব্বদা মন খারাপ করে থাক কেন?"

"না, মন খারাপ আর কি"?

নির্ম্মলা বলিলেন—"কি জানি, তোমায় দেখ্‌লেই যেন বোধ হয় তুমি মনে মনে কি একটা ভাব।" এমন সময় বাহিরে জুতার শব্দ হইল। নির্ম্মলা বলিলেন—"আজ শনিবার তাড়াতাড়ি আফিস বন্ধ হয়েছে, বোধ হয় মেজ ঠাকুরপো আস্‌ছে।"

বিপিনচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন, দালানেই মেয়েরা পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। বিপিনচন্দ্র ভ্রাতৃজায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মেয়েগুলোর বড় অযত্ন হচ্ছে, আমার যে কেন তোমরা কেন আবার দিলে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। মেয়েটাকে শুইয়ে দিতে বল।" বিপিনচন্দ্র আর কিছু না বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া বসিলেন। নবীন বাহিরেই ছিল; বিপিনচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—কি করি, ছেলে-মেয়েগুলোকে এখনও আপনার করে টেনে নিতে পার্‌ছে না। নবীন বলিল, "ওর জন্য তুমি ভাব্‌ছো কেন? দিন-কতক গেলে আপনা হতেই সব হয়ে পড়্‌বে আপনা হতে যেটা ক্রমশঃ হয়ে উঠ্‌বে সেটা জোর করে তাড়াতাড়ি না করাই ভাল।" বিপিনচন্দ্র বলিলেন—"আপনা হতে যে হবে তার কোন আশাই দেখ্‌ছি না।" দুইজনে

আর কোন কথা হইল না।

এইরূপভাবেই দিন কাটিতে লাগিল, বিপিনচন্দ্র সুষমার সহিতই বেশী কথা কহিতেন, মনোরমার সহিত যখনই কোন কথা কহিতেন তখনই মেয়েদের লালন-পালন সম্বন্ধেই কথা কহিতেন। বিপিনচন্দ্র মনোরমাকে যত মেয়েদের সহিত মিশিতে বলিতেন মনোরমা ততই যেন একটু একটু করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। বিপিনচন্দ্র এইজন্য মনোরমাকে প্রায়ই ভৎর্সনা করিতেন।

সে দিন রাত্রে বিপিনচন্দ্র আফিস হইতে আসিয়া শুনিলেন, মনোরমার জ্বর হইয়াছে। বিপিনচন্দ্র রাত্রে আহারাদি করিয়া ভ্রাতৃজায়াকে বলিলেন—"বৌদিদি! ওরা তোমার কাছেই গুণ্। আমি একলা মেয়েগুলোকে দেখ্‌বো না ওকে দেখ্‌বো।" ভ্রাতৃজায়া মনোরমাকে নিজের কক্ষে লইয়া গেলেন। রাত্রে মনোরমার জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বকিতে লাগিল। এ জ্বর আর ছাড়িল না, একভাবে ৩৷৪ দিন রহিল। বিপিনচন্দ্র আসিয়া একবার মাত্র খবর লইতেন। দূরে একবারও মনোরমাকে দেখিতে যাইতেন না। নির্ম্মলাই মনোরমার শুশ্রূষা করিতেন।

আজ সন্ধ্যায় সহসা আকাশে একটা মেঘ দেখা দিল, ক্রমশঃ সেটা আকাশ ছাইয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বিপিনচন্দ্র ভিজিতে ভিজিতে ঘরে আসিলেন। আজ মনোরমার অবস্থা বড়ই খারাপ, জ্বর বাড়িয়াছে, কেবলই প্রলাপ বকিতেছে, নির্ম্মলা পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। সহসা মনোরমা প্রলাপ বকিতে বকিতে উঠিয়া বসিল, এক দৃষ্টে নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া বলিল—"দিদি! তোমরা আমাকে কেন এনেছ?" নির্ম্মলা এই অদ্ভুত প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে মনোরমাকে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল। নির্ম্মলা বাড়াবাড়ি দেখিয়া বিপিনচন্দ্রকে খবর দিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিতেই মনোরমা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"কে তুমি? আমাকে মেয়েগুলোকে মানুষ করতে বল্‌ছো?" এই সময় বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই একটা বজ্রপাত হইল, মনোরমার ক্ষীণ প্রাণ দেহপিঞ্জরে ধড়ফড় করিয়া উঠিল। মনোরমা আবার চীৎকার করিয়া বলিল, "দিদি! তোমরা কি আমাকে শুধু মেয়ে মানুষ করবার জন্যই এনেছ?" বিপিনচন্দ্র চোরের মত আস্তে আস্তে মনোরমার মস্তকের নিকট বসিল। আবার বজ্রপাত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির বেগ বাড়িয়া উঠিল। এই সময় নবীন আসিয়া বলিল—"ডাক্তার মশাই এসেছেন।" বিপিনচন্দ্র অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—"নিয়ে এস" নবীন চলিয়া গেল।

ডাক্তার মহাশয় গৃহে আসিয়া রোগিণীকে বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"দেখুন, জ্বরের উপর কোন মানসিক উত্তেজনার দরুণ জ্বরটা একটু বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। তবে একটু সাবধানে রাখিবেন, কল্য প্রাতে রোগিণী কিরূপ থাকে আমায় খবর দিবেন।" ডাক্তার মহাশয় নবীনের

সহিত প্রস্থান করিলেন। সহসা মনোরমা চীৎকার করিয়া বলিল—"খেঁদি কাঁদ্‌ছে, মাই। বিপিনচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। খেঁদি বিপিনচন্দ্রের পাশে আসিয়া চুপি চুপি কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—"বাবা! মাকে ডাক্তারের বাড়ী নিয়ে যাবে?"

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়।

ত্রি-বেণী।

কথিত আছে এক সময়ে মহাদেব শিব বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইয়া, সুর, তাল ও লয় সংযোগে বিষ্ণুর স্তবে নিযুক্ত হয়েন। সেই সঙ্গীত মূর্চ্ছনায়, ষড় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর পূর্ণভাবে আবির্ভাব ঘটায় ত্রিলোক মুগ্ধ হয়,—এমন কি ভাবাবেশে বিষ্ণু আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাহাতে তাঁহার মন গলিয়া যায়। সেই দ্রব মন ঘর্ম্মরূপে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের আসব হইয়া বহির্গত হয়। কোন দেববস্তুর কণিকামাত্রও যখন কখন বৃথা হয় না, জীবমঙ্গলের নিদানরূপে সৃষ্ট ও গ্রাহ্য হয়, তখন বিষ্ণুর দ্রবমন বা পাদাম্বু নিঃসৃত ঘর্ম্ম কিরূপে বৃথা হইবে? তাহা তখন বিষ্ণুর ইচ্ছায় জীবের পাতকনাশিনী পবিত্রতোয়া নদীতে পরিণত হয়;—এই বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা নদীর নামই গঙ্গা। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা দ্রবময়ী গঙ্গাকে প্রবাহবতী দেখিয়া ব্রহ্মা তাহাকে ধরিয়া স্বীয় কমণ্ডলুর মধ্যে রাখিয়া দেন। ইহাই গঙ্গার আদি বা জন্মতত্ত্ব।

ইহার বহুকাল পরে সূর্য্যবংশীয় নৃপসত্তম মহামতি সগরের সহস্র পুত্র কপিল-কোপে ভস্ম হওয়ায়, 'গঙ্গাবারি-স্পর্শে তাঁহাদের মুক্তি' এই দৈববাণীর পূর্ণ বিশ্বাসে সগরের পৌত্র অংশুমান (১) গঙ্গাকে মহীতলে আনয়নের জন্য ঘোরতর তপস্যা করিয়া বিফলমনোরথ ও উপরত হন। তাঁহার পুত্র দিলীপও ঐ কার্য্যে তদবস্থাপ্রাপ্ত হয়েন। পরে দিলীপের পুত্র পুণ্যচেতা ভগীরথ পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধারের জন্য সুরনরত্রাস গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন।

ভগীরথের সাধনায় গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে বহির্গত হইল, তাঁহার পতন বা প্রবাহবেগ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া, শিব নিজ শিরে গঙ্গাকে ধারণ করেন। সেই জন্য শিব গঙ্গাধর। পরে তথা হইতে গঙ্গা দেবারাম হিমালয়ের বক্ষ দিয়া, তত্রস্থ গোমুখীকার উৎসযোগে হরিদ্বারে ও পরে ভারতে পতিত হয়েন; এবং ভগীরথাগ্রা হইয়া উত্তর ভারতকে পবিত্র করিতে করিতে, শতমুখে সিন্ধুকূলে আসিয়া ভস্মশেষ সাগরসন্তানগণকে স্পর্শ ও মুক্ত করেন। ইহাই গঙ্গার পৌরাণিক বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য এবং হিন্দুর চরম লক্ষ্য ও বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেই গঙ্গা হিন্দুর নিকট চির পবিত্র ও শ্রদ্ধেয়।

এইরূপে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের সংস্পর্শেই গঙ্গার পতিত-পাবনী নাম ত্রিলোকবিশ্রুত। বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক ও কৈলাস দিয়া মর্ত্ত্যের পুণ্যময় হিমালয়ের হরিদ্বার উপত্যকায় উপস্থিত, শেষে গোমুখী দিয়া ভারতে আগমন।

---

(১) ইনি সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জের পুত্র।

আবার 'গো দেহে সকল দেবতার বাস', ইহা হিন্দুশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য; কাজেই পবিত্রা গঙ্গা পবিত্র গোমুখ দিয়া মর্ত্ত্যকে পবিত্র, ও পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য,—পাপী তাপীকে শান্তি দিবার জন্য—উত্তর ভারতকে সুজলাতে শোভিত ও পূর্ণ করিবার জন্য পুণ্যময় ভারতে আসিয়া চির মঙ্গলের বিকাশ করেন। এই সকল কারণেই পুণ্যপ্রথিত ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ

'সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী সদ্য দুঃখ বিনাশিনী
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গে গঙ্গৈব পরমাং গতি।'

এই পবিত্র অথচ মঙ্গলপ্রসূ মন্ত্রে মানবের পক্ষে গঙ্গার প্রণাম ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আবার কেহ গঙ্গামাহাত্ম্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গাহিয়াছেন, 'দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি'! যাঁহাকে স্পর্শ এমন কি দর্শনমাত্রেই মুক্তি পাওয়া যায়, তিনি অল্প পুণ্যজীবন নহেন। গঙ্গার পক্ষে শুধু এই সকলই যথেষ্ট নয়,—গঙ্গা-মাহাত্ম্য শুধু আত্মজীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না। কাল বা যোগ বিশেষে গঙ্গাস্নানে বহুকোটি সূর্যগ্রহণ জন্য ফল, ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষের মুক্তি ইত্যাদি ফলশ্রুতি ও শাস্ত্রবন্ধ অলঙ্কৃত করিয়া আছে। কপিল শাপভস্ম যে সগরসন্তানগণের মুক্তির জন্য যে ভাগীরথীর ধরাগমন, হিন্দুর চক্ষে—প্রাচীনের চক্ষে তিনি সামান্য জলপ্রবাহ নয়, প্রকৃতই মুক্তিদাত্রী। সেই জন্যই সাধকেরা বলেন, গঙ্গাতীরে বাসের নিকট স্বর্গবাস তুচ্ছ; গঙ্গার গর্ভে মৃত্যু শাশ্বত মুক্তি দান করে। বিশেষতঃ গঙ্গার তটস্থ জলের সীমা হইতে চতুর্হস্ত পরিমিত স্থান তাই 'নারায়ণ ক্ষেত্র' নামে কীর্ত্তিত, (১) এ স্থান চির বিশুদ্ধ। এখানে জন্ম স্থিতি বা মৃত্যু সবই সুখজনক, শান্তিপ্রদ ও মুক্তির নিয়ামক। শ্বন বা শ্বপচ স্পৃষ্ট হইলেও গঙ্গাজল যে চির শুদ্ধ—দেবভোগ্য, ইহা গঙ্গামাহাত্ম্যের অল্প বিকাশ নয়। এই গঙ্গা শুধু মর্ত্ত্যবাসীর মুক্তিদাত্রী নয়, তিনি স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্তে ভাগীরথী, ও পাতালে ভোগবতী এই ত্রিপথগারূপে ত্রিলোকবাসী পাপী তাপীকে সদ্যঃ মুক্তি দান করেন।

এই পাপনাশিনী গঙ্গার সহিত ভগিনী স্বরূপা পবিত্রতোয়া যমুনা ও সরস্বতী প্রয়াগধামে সম্মিলিত হইয়া মহাতীর্থ ত্রি-বেণীর (যুক্তবেণী) সৃষ্টি করিয়াছে। এই ত্রি-বেণী মানবের জীবন্মুক্তির স্থান। এখানে মস্তক মুণ্ডন করিয়া সাধকের কার্য্যসকল সম্পাদন এবং তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিলে মানুষ নিজেকে ও পিতৃগণকে মুক্ত মনে করে।

আধ্যাত্মিক ভাবে এই মানব জীবনকে গঙ্গা স্বরূপ পবিত্র ও আপামর সাধারণের হিতকর মনে করিলে, এবং তাহার সঙ্গে কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ যমুনা ও সরস্বতীর সংযোগ ঘটাইলে, ইহাও ত্রি-বেণীর তুল্য মহাতীর্থে পরিগণিত হইতে পারে। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই নদীত্রয়ের সংযোগস্থান যে ত্রি-বেণী তাহা বাহ্য দৃশ্য,—এবং মানুষের জীবন কর্ম্ম ও

---

(১) শৃণু নারায়ণঃক্ষেত্রং জলান্তশ্চ চতুর্হস্তং।
অত্র নারায়ণ স্বামী নান্যঃ স্বামী কদাচন।
জলে চাত্র মৃতে লোকে সিদ্ধিভবতি তত্র বৈ।
ব্রহ্মাণে নাপি মন্ত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নর।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

জ্ঞানের সংযোগে দৃষ্ট যে ত্রি-বেণী তাহা অন্তর্দৃশ্য! বাহ্যদৃশ্য বাহ্যভাবে হৃদয়কে টানিয়া অনেকটা বাহ্য শোভায় বিমোহিত করে,—প্রকৃত তত্ত্ব ভুলাইয়া দেয়। শারীরিক শক্তি বা অর্থ শক্তিতে প্রয়াগ ধামে গমন করিলেই সে দৃশ্য দেখা যায়। তথাকার পাণ্ডাগণের দ্বারা কার্য্য সকল সম্পাদন করা হয়। মন সে দিকে তাহার গভীর তত্ত্বে প্রবিষ্ট না হইলেও বাহ্যদৃশ্যে 'কার্য্য সম্পন্ন হইল বলিয়াই' মনে হয়। যে মহাপুরুষ তথাকার কার্য্য সকল সম্পাদনের সহিত পুণ্যময় মাঘমাসে কল্পবাস করিয়া (১) প্রকৃত ত্রি-বেণী মাহাত্ম্যে জীবন ও বিশ্বাস ঢালিয়া দিতে পারেন, উল্লিখিত ঋষিগণের ব্যবস্থাকে মুক্তির সোপান বলিয়া মনে করিতে পারেন, গঙ্গা যমুনা সরস্বতীকে নদীরূপা মনে না করিয়া, গঙ্গাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা মহাপাতক-নাশিনী—যমুনাকে সূর্য্যকন্যা পবিত্রা ধর্ম্মরাজভগিনী এবং সরস্বতীকে বিষ্ণুপ্রিয়া মনে করিতে পারেন, তাঁহাদের সঙ্গমস্থল তীর্থস্বরূপ হইয়া মানবকে মুক্তি দান করে—"আমিও এখানকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া—এই ত্রি-বেণী সঙ্গমে স্নান তর্পণ করিয়া সদ্যঃ মুক্তি লাভ করিলাম", এইরূপ মনে করিতে পারেন, তিনিই গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিয়া ত্রি-বেণী বা প্রয়াগ-তত্ত্বে বিভোর হইয়া থাকেন। তাঁহার বাহ্যভাব অন্তর্ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া তাঁহাকে সদ্যঃ মুক্তি দান করে, নতুবা অপরের পক্ষে নদীত্রয়ের একত্র সমাবেশ মাত্র ত্রি-বেণী বা প্রয়াগ-ক্ষেত্র—সাধু-সন্ন্যাসীর সাধনার স্থল,—তীর্থ যাত্রীদিগের মহাসংযোগ-মাত্র, ইহাই তাহার পক্ষে ও মনে প্রতিভাত হয়। আর হয়, ত্রি-বেণী স্নানে ও কার্য্যকলাপ করণে অহং জ্ঞানের অর্থাৎ 'আমি করিলাম' ইহারই উৎপত্তি;—ইহাতে উত্থানের পরিবর্ত্তে পতনই ঘটিয়া থাকে—মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই আসিয়া পড়ে—জীবন্মুক্তির পরিবর্ত্তে জীবনের বন্ধনই দৃঢ় হয়। ইহাই ত্রি-বেণীর বাহ্য দৃশ্য। এই বাহ্যদৃশ্যই আত্মাভিমানী মানবকে বাহ্যভাবে মুগ্ধ ও আত্মঘাতী করিয়া থাকে—ত্রি-বেণী-তত্ত্ব বা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মহিমা হইতে দূরে লইয়া যায়। কাজেই সে মানব-জীবন পাইয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যেও থাকিয়াও, উহাদের প্রকৃত আস্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকে। যে কর্ম্ম মানুষকে বদ্ধ করে,—যে জ্ঞান মানুষকে উন্মত্ত করে,—সে সংসারচক্রে বা বিষয় ব্যাপারে তাহাদিগকেই নিজের হিতসাধনে নিযুক্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকে। তাহাদের রাঙা রূপে প্রকৃত রূপ ভুলিয়া যায়—এমন কি বিকৃত চক্ষে দেখিতেও পায় না। সেই জন্যই বন্ধনের উপর ক্রমিক বন্ধনে তাহার জন্ম, জরা ও মৃত্যুর ধ্বংস হয় না।

মানবের জীবন প্রকৃতই বড় পবিত্র শিশিরাপ্লুত প্রভাত-কমলের ঢলঢলে ভাব বা নিষ্পাপ সাধুজীবনের সারল্য যেমন মনোজ্ঞ যেমন নয়নের প্রীতিপ্রদ, নিষ্কলঙ্ক শিশুর জীবন সেইরূপ হৃদয়ানন্দদায়ক ও প্রীতিবর্দ্ধক। আবার শিশুর জীবনই ক্রমে পূর্ণত্বে পরিণত হইয়া মানবের পূর্ণবিকাশ করিয়া থাকে। যদি শিশুর জীবন পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয় অতু

(১) মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী.....

তাহার পরিণতি বা পরিপক্কাবস্থা যে মানবের পূর্ণ জীবন, তাহা কেন পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক থাকিবে না? কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানে কালিমা পড়াতেই সেই পবিত্রতায় কলঙ্ক পড়িয়া মানুষকে পশু করিয়া ফেলে।

বিষয় বা কার্য্যবিশেষে কর্ম্ম ও জ্ঞান মানব-জীবনের দুই পার্শ্বে থাকিয়া তাহাকে সংসার-চক্রে ঘুরাইয়া বেড়ায়। অগ্রে কর্ম্ম মানুষকে নিজের দিকে টানে, তাহারা যদি পবিত্র জ্ঞানে তাহাকে ধরিয়া রাখে, তাহা হইলে মানব-জীবনের পতন ঘটে না, পরন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের পবিত্রতার সহিত উৎকর্ষক্রমে মানুষকে দেবত্ব দান করে। এই ভাবেই গঙ্গার পার্শ্বে যমুনা ও সরস্বতীর শুভ সংমিলনে প্রয়াগ-তীর্থরূপ মানব-জীবনের দুই পার্শ্বে কর্ম্ম ও জ্ঞান। এইরূপ জীবনে কর্ম্ম ও জ্ঞানকে ধরিয়া থাকিলে, নিজের সেই যে মহাতীর্থে প্রয়াগের সৃষ্টি হয়, তাহা ফেলিয়া আর কখন মানুষকে অন্য তীর্থে গমন করিতে হয় না পরন্তু অপর সাধারণের মহামুক্তির স্থল হইয়া সে সংসারের সকল পবিত্রতা—জীবনের সমস্ত মঙ্গল, একত্রিত করিয়া রক্ষা করিতে পারে। সাধক রাম-প্রসাদের "তীর্থবাসী হওয়া মিছে"—এই সঙ্গীত এই ভাবেরই উদ্বোধক।

এই কর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ মানবের পক্ষে বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই দুইটির প্রকৃত স্বাদ না পাইলে মানব-জীবনে এ তীর্থের আবির্ভাব ঘটে না। অগ্রে কর্ম্ম পরে জ্ঞান! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তত্ত্বোপদেশে বলিয়াছেন,—"পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।" "জ্ঞানভূমিতে অনারূঢ় কর্ম্মীদিগের (জ্ঞানভূমিতে আরোহণের উপায়-ভূত চিত্ত শুদ্ধি লাভ জন্য) কর্ম্মযোগ, মানবের প্রথম নিষ্ঠা।" অরণিদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদনের ন্যায় "পবিত্র কর্ম্মের পর কর্ম্মের অবলম্বনে যে জ্ঞানের উৎপত্তি—সেই জ্ঞানযোগ দ্বিতীয় নিষ্ঠা (১)" অতএব কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি বিনা মানুষ জ্ঞানযোগের অধিকারী হয় না। এই কর্ম্ম ও জ্ঞান মানুষকে আশ্রয় করিলেই মানুষের শৈশবের চাঞ্চল্য ক্রমশঃ ঘনীভূত বা বর্দ্ধিত হইয়া চির নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কার্য্য বা বিষয় ব্যাপারে সংলিপ্ত হইলেও তাহা কলুষিত হয় না। রাম, যুধিষ্ঠির, চৈতন্য, যীশু মহম্মদ, নানক প্রভৃতি ধর্ম্মামোদী মহাপুরুষ-দিগের জীবন কালের পবিত্রতা ও সারল্যের সহিত ক্রমে পবিত্র ও সরল থাকিয়া সংসারের মোহে আপনাকে,—আপনার কর্ম্ম ও জ্ঞানকে ডুবিয়া না দিয়া আপামর সকলের আদর্শ স্বরূপ হইয়া আছে। তাঁহাদের প্রত্যেকের মস্তকে কত ঝঞ্ঝা, কত বজ্র পড়িয়াছে—কিন্তু সে জীবন অটল অচল—সুখে বা দুঃখে ভ্রূক্ষেপ নাই—কেবল কর্ত্তব্য,—কেবল সত্য,—কেবল ধর্ম্ম,—কেবল কর্ম্ম,—কেবল জ্ঞান! এই জন্যই সে জীবন কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ বলিয়া যমুনা ও সরস্বতীর সংমিলন স্থল প্রয়াগরূপ মহাতীর্থ। নিজেকে স্থির পবিত্র রাখে—পাপী তাপীকে মাতৃমমতায় কোলে লইয়া কীর্ত্তিমন্দিরে তুলিয়া জগৎকে দেখায়! তাই ত্রি-বেণী-তত্ত্ব মানবত্বের বিষয়ী-ভূত মানব-জীবনের প্রত্যক্ষ মুক্তিমণ্ডপ।

ক্রমশঃ

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।

(১) গীতা ৩য় অধ্যায়, ২য় ও ৩য় শ্লোক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতা এবং নানারূপ বিপদ নিবন্ধন এবার "আলোচনা" প্রকাশে বিলম্ব হইল, গ্রাহকগণ তজ্জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

সত্যধর্ম্ম বা কর্ত্তাভজা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তাভজা কি ?

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

কর্ত্তাভজা কি জানিবার আগে কর্ত্তা কি তাহাই বুঝা একান্ত আবশ্যক। কর্ত্তা শব্দের অর্থ যিনি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ যিনি এই চরাচর বিশ্বসৃষ্টিরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন এবং বিশ্বজগতের পরিচালনা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তিনিই কর্ত্তা। যাঁহার ইচ্ছায় এই পরিদৃশ্যমান জগতের ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু হইতে সুবৃহৎ গ্রহ-নক্ষত্রাদি সৃষ্ট হইয়াছে,—যাঁহার ইচ্ছায় চক্ষুর অগোচর কীটাণু হইতে বৃহৎকায় তিমি, হস্তী প্রভৃতি জীবকুল সৃষ্ট হইয়াছে,—যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জীব-জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জীবের আহার প্রদান করিতেছেন এবং তাহাদের যথোপযুক্ত বাসস্থান বিধান করিয়া সর্ব্বদা পালন করিতেছেন,—যিনি এই পৃথিবীকে জীবজন্তুর বাসের উপযোগী করিয়াছেন এবং যাঁহার আদেশে শূন্যোপরি ভ্রাম্যমান রবি-শশী ও গ্রহাদি সুনিয়ম ভাবে পরিচালিত হইয়া ও জীব জীবনের মূলীভূত বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীব-জগতের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে, তিনিই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা, কর্ত্তা, বা প্রভু; পরম পিতা পরমেশ্বরই এই জগতের একমাত্র কর্ত্তা, সুতরাং কর্ত্তা বলিতে একমাত্র জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বরকেই বুঝাইবে।

কর্ত্তাকে ভজা অর্থাৎ ভজনা করা বা উপাসনা করাকেই কর্ত্তাভজা বলে। এই কর্ত্তাভজাকেই সত্যধর্ম্ম বলা হয়। এই কর্ত্তাভজা বা সত্য-ধর্ম্মই মানব জাতির আদি সনাতন ধর্ম্ম। জগতে মনুষ্য জাতির মধ্যে সৃষ্টির আরম্ভ হইতে অদ্যাবধি যতগুলি ধর্ম্মমত প্রচলিত হইয়াছে, এবং যতগুলি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত প্রচারিত থাকিবে—সকলগুলিই এই সনাতন সত্য-ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত, আবিষ্কৃত বা পৃথকীকৃত হইয়া পরিমার্জ্জিত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। ইতিহাস, পুরাণ, বেদ এমন কি এই সভ্যতালোকিত যুগের বিজ্ঞানও ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্ট জীব সমূহের অন্তর্গত সৃষ্টির রত্ন সদৃশ এই মানবজীব সৃষ্ট হইবার পর হইতেই সনাতন ধর্ম্মাশ্রয়ী হয়। তখন মানব মধ্যে জাতিভেদ ছিল না, সকলেই এক জাতি, এক ধর্ম্মী ও এক কর্ম্মী ছিল। পরে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় এক স্থান হইতে স্থানান্তর বাসের আবশ্যক হওয়ায় আর্য্যগণ পৃথিবীর নানা স্থানে নানা দলে বিভক্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং দেশ কালানুযায়ী সত্য-ধর্ম্মের কিছু কিছু পরিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ঐ প্রকারে সংস্কৃত মত সংস্কারকারীর নামানুযায়ীও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। নবসংস্কৃত মতানুযায়ীদিগের বিভিন্ন দেশে বাস-হেতু ভাষা, পরিচ্ছদ আকার, আহার, ব্যবহার সমস্তই বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পরিশেষে ঐ সমস্ত পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায় এক একটী জাতি হইয়া উঠিয়াছে। ইহার এক-

বিশেষ প্রমাণ এই যে, জাতিসমূহের সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য একই মোক্ষের অধিকারী হওয়া। জগৎপূজ্য আর্য্য মহাজাতির হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই শাখাত্রয় সকলেই নিজেকে সত্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ ব্যগ্র। আবার এই সমস্ত সংস্কৃত মত সমূহ যখন বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন দেশবাসীর ধর্ম্মপুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখনও উহাদের সারাংশ একরূপ। যদি এই প্রচলিত ধর্ম্মগুলি একই সত্য ধর্ম্মের অপভ্রংশ অথবা পরিবর্ত্তিত অবস্থা না হইত তাহা হইলে উহার সারাংশ কখনই এক প্রকার হইত না। সুতরাং আধুনিক কাল প্রচলিত সর্ব্ববিধ ধর্ম্মমতই যে আদি সত্যধর্ম্ম বা কর্ত্তাভজারূপ মহাধর্ম্ম বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন—ইহা অভ্রান্ত সত্য। সত্য অর্থাৎ ন্যায় পক্ষে থাকিয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করার নামই কর্ত্তাভজা। বর্ত্তমান সময়ে একটী কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় বাঙ্গালাদেশে দেখা যাইতেছে। এই সম্প্রদায় কিছুতেই স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ করিতে চাহে না। ৩টী শ্রেণীতে এই সম্প্রদায় বিভক্ত। এক শ্রেণী সনাতন কর্ত্তাভজা বা শ্রীগুরু উপাসক, ইঁহারা ন্যায়-পথে চলিতে সতত সচেষ্ট, এবং পৌরাণিক যুগের কর্ত্তাভজা পদ্ধতির সহিত সম্পূর্ণ একতাযুক্ত। কিন্তু ঐ সম্প্রদায়-মধ্যস্থ কতকগুলি অর্ব্বাচীন, সাধারণের সমক্ষে গুপ্তবিদ্যা (যোগাদি) প্রকাশ করিয়া ফেলায় ও তাহার যথারীতি সদুত্তর প্রদান করিতে না পারায় সাধারণের মনে এতদ্বিষয়ক এক বিশেষ কুসংস্কার জন্মিয়াছে। সাধারণে প্রায়ই কর্ত্তাভজা নাম শুনিলে বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সনাতন আদি ধর্ম্মমত যে আদৌ ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইতে পারে না একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। পর পর পরিচ্ছেদে আমরা তাহাই বুঝাইতে ও প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব।

শ্রীতারাপদ রায়।

ভালবাসা।

ভালবাসা ভুলি কেমনে,
ভাল বলে বাসি ভাল—
অতি যতনে;
বাসিতে শিখেছি ভাল
ভালবাসি বলে ভাল
ভাল বেসে থাক ভাল
বিভোর মনে।

কেন ভালবাসি? কাহাকে ভালবাসি? ভালবাসা কাহাকে বলে? তোমরা কি তাহা জান? দুই দিনের জন্য একটী পাখী পুষিলে, পাখী পড়িতে শিখিল, তোমার মনের মত বুলি বলিল, তারপর একদিন পাখী পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিল; তুমি সেই পাখীর নিমিত্ত কাতর হইলে—বলিতে লাগিলে "পাখী আমার প্রাণ লইয়া পলাইল"; দুদিনের নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিলে, তারপর কালের প্রভাবে সবই ভুলিয়া গেলে; এই যে দুঃখ, এই যে কাতরতা, ইহারই নাম ভালবাসা।

পবিত্র ভালবাসায় মোহ আসিতে পারে না। ভালবাসা কি মধুর শব্দ! ইহাতে

তাহার ইহা অপেক্ষা মিষ্টতর শব্দ আর নাই; মধুরের কল্পনা কি? ভোগের জন্ত ইহা অপেক্ষা ভাল সামগ্রী আর নাই। তুমি আমি স্বার্থের দাস, মানের ভিখারী, আমরা কেমন করিয়া উহা চিনিব? এই পৃথিবীতে যতপ্রকার ভালবাসাবাসি দেখিতেছি, উহা ভালবাসা নহে—বাসনা বা মোহের বিকার মাত্র, সুতরাং উহা স্বার্থ-জড়িত; ভালবাসা একটী মহাযজ্ঞ; এ যজ্ঞের আহুতি স্বার্থ এবং দক্ষিণা মান। পবিত্র প্রেমে স্বার্থ নাই। অভিমান আছে; অপমান নাই, রাগ আছে; নির্দ্দয়তা নাই, আকর্ষণ আছে, কিন্তু মোহ নাই।

আবার যেখানে ধর্ম্ম নাই, বিবেক নাই, ইন্দ্রিয় দমনের বাসনা নাই সেখানে প্রেম নাই। যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসা যায়, যাহার প্রাণটুকু কাড়িয়া লইয়া আপন প্রাণে মিশান যায়, সেই কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমের বলে তাহার অভ্যন্তরে ভগবানের সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকশিত হয়; উহার বিকাশে আমরা মুগ্ধ হই; যাহার চরিত্র আমার চরিত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিষ্পাপ মনে না করি, কিংবা যাহার চরিত্র কোন বিশেষ মধুর ভাবপূর্ণ না দেখি, তাহার প্রতি কখনও আমার শ্রদ্ধা হইতে পারে না। কেন না, মুগ্ধ হইলেই অনুকরণ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়, অনুকরণ করিতে গেলেই পুণ্য ও পবিত্রতায় দিন দিন উন্নত হওয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। যতই বন্ধুর গুণ মধুরতর বোধ হইবে, ততই নিজের দোষ স্ফুটতর কাদিত হইবে, সুতরাং উহা পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার গুণরাশি আয়ত্ত করিতে ইচ্ছাও প্রবল হইবে। কারণ, ভালবাসার এক গৌরব এই যে, উহা মনুষ্যকে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ বিকশিত করে; এবং উহা হইতে ভগবচ্চন্দ্রের বিমল কিরণ বিস্ফুরিত হইতে থাকে; এবং ভগবদ্‌গুণরাশির সমাবেশের আবির্ভাব অনুভূত হয়। যদি এক জনকে যথার্থ ভালবাসিতে পারি, তবে আমি কালে সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে সমর্থ হইব। সমুদ্রের জল যখন পূর্ণ প্রবাহে উথলিয়া উঠে, তখন নদ, নদী এবং হ্রদ, সরোবর সর্ব্বত্রই তাহা প্রবাহিত হইয়া পড়ে। যদি হৃদয় খুলিয়া দিয়া ভালবাসিতে পারি, তবে সংসারের কত হৃদয়ই না আমি আমার করিয়া লইতে পারি! কত হৃদয়ের উপরই না আমার হৃদয় ছড়াইয়া পড়ে! আমি যাহাকে ভালবাসিলাম, সেই আমার হইল; যাহাকে যে ক্ষণ হইতে যে পরিমাণে ভালবাসিলাম সে সেই ক্ষণ হইতে সেই পরিমাণে আমার হইল; সে জানুক বা না জানুক, সে ইচ্ছা করুক বা না করুক, তাহাতে আমার অধিকার পৌঁছিল; সে আমায় ভালবাসুক আর নাই বাসুক, আমার ভালবাসা শীতরশ্মি চন্দ্রমার লক্ষ যোজন দূরস্থ স্নিগ্ধ কৌমুদীর ন্যায় দূরে থাকিয়া তাহাতেই গিয়া ছড়াইয়া পড়িল।

যদি তাহাকে এ জন্মেও দেখিতে না পাই, তথাপি আমার হৃদয় দেশ ও কালের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার হৃদয়ে গিয়া স্পৃষ্ট হইবে; এবং সেখানে সে যে অবস্থায় থাকুক আমাকে তাহাতে লইয়া যাইবেই কিন্তু আমি যেন সৎপথ হইতে বিচলিত না হই। আমি যেন তাহাকে

অশ্রদ্ধা না করি; আমার ভালবাসা যদি গভীর হয়, তবে তাহার মধ্যে আমি ভগবৎ সুষমার অমৃতময়ী পূত করুণা দেখিতে পাইব এবং তাহাতে অবগাহন করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব; কিন্তু ঘোর সন্দেহ, পাছে আমার প্রাণ তাহার প্রাণে অনন্তের জন্য মিশিয়া না থাকে, যদি প্রেমে স্বার্থের কণা বিষময় হয়, যদি প্রেমে নির্দ্দয়তার বাহ্ন জ্বলিয়া উঠে, যদি প্রেমে পাপানল প্রধূমিত হয়, তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার-তম হইতে অন্ধকারের অনন্ত অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে।

যাহারা ভালবাসার প্রতিদানের আশা করে, আমি তাহাদিগের ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিতে পারি না, যেখানে আত্মদান নাই, সেখানে ভালবাসা নাই, সর্ব্বস্ব ভুলিয়া আপনা হারাইয়া ভালবাসিতে হবে—তবেই সুখ। যিনি প্রেমিক, তিনি প্রতিদানের প্রয়াসী হইতে পারেন না। দেবাদিদেব মহাদেব তাই প্রেমী হইয়াও যোগী, গৃহস্থ হইয়াও শ্মশানচারী। তুমি সমস্ত প্রাণটা ঢালিয়া আর কাহাকে কি ভাল-বাসিয়াছ? যদি ভালবাসিয়া থাক তবে সর্ব্বান্তঃকরণে বল—

"তুমি যদি আর কারে ভালবাস,
আর তুমি ভালবেস না।"

তথাপি আমার দুঃখ হইবে না। কারণ আমি যে তোমাকে ভালবাসিয়াই সুখী; যেখানে প্রতিহিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে সেই খানেই স্বার্থপরতার কৃষ্ণ ছায়া নিপতিত। আমার প্রাণ পূর্ণ শশধরের কুন্দকৌমুদীবিধৌত, এখানে তমোভাবের লেশমাত্র নাই—সুতরাং তুমি অপরকে ভালবাসিলেও আমি ক্লিষ্ট হইব না।

শ্রীরাধার এই প্রেম উপাস্য ছিল, তাই ষোড়শ সহস্র গোপিনীর প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ আবদ্ধ হইলেও শ্রীমতীর প্রেম-প্রবাহের হ্রাস হয় নাই। নিঃস্বার্থ ভালবাসা জগতে সুদুর্লভ। ভগবান করুন, সেই বৃষভানুনন্দিনীর ন্যায় সকলে নিঃস্বার্থ প্রেমে মুগ্ধ হউক; আবেগ, আবেশ দূরীভূত হউক, দেখিবে সংসার স্বর্গ হইয়াছে, মরুভূমি নন্দন-কাননে পরিণত হইয়াছে।

আং সং।

হারামণি।

[সাধক কবি নীলকণ্ঠের নামের ও গানের সহিত পরিচয় নাই, এরূপ বাঙ্গালী আজকাল দুর্লভ। তাঁহার বহু সাধন-সঙ্গীত, দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান অদ্যাপি বাঙ্গালার হাটে, ঘাটে, বাটে, মাঠে প্রচলিত হইয়া থাকে। নীলকণ্ঠ প্রাচীন ঢঙের কবি ছিলেন—খাঁটি দেশী কবি। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিবার সুযোগ পায় নাই। Western idea বা প্রতীচ্য ভাব তিনি আধুনিক বহু তথা-কথিত কবির মত বেমালুম অপহরণ করেন নাই। নব্য শিক্ষিতগণ নীলকণ্ঠকে 'প্রাচীন' জ্ঞানে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালার অগণিত অর্দ্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নর-নারী কখনও নীলকণ্ঠের কলকণ্ঠের সুমিষ্ট স্বর-লহরী বিস্মৃত হইতে পারিবে না। যতদিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে, ততদিন নীলকণ্ঠের স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে না।

'পদাবলী'-সাহিত্যের একটা দিক্ নীলকণ্ঠ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা বহুকষ্টে তাঁহার নিজের বিলুপ্তপ্রায় মধুর সঙ্গীতটী নব-দ্বীপনিবাসী জনৈক নিরক্ষর গায়কের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আলোচনার পাঠক-পাঠিকাগণকে 'উপহার' দিলাম। কোন মুদ্রিত পুস্তকে ইহা প্রকাশিত হয় নাই।]

বংশ-বন্দনা।

বাঁশের বাঁশরী শ্যামের করে
বিনা বংশ-দণ্ড হয় না কোন কাণ্ড
দণ্ড করে" বাঁশে সকল কার্য্য সারে।
পুত্র কিংবা কন্যা বংশেতে জন্মিলে
আগে কাটে নাড়ি দিয়ে বাঁশের ছিলে
ও বাঁশ দেখো ভূমণ্ডলে প্রশংসিত মণ্ডলে,
বাঁশের পাতায় পূজে শীতলা ষষ্ঠীরে ॥
বাঁশ ছাড়া কভু ঘর বাড়ী না হয়,
খুঁটি বাটা যত বাঁশের সমুদায়,
শাবক, শলা, কুলংনী, তীর, আড়া চাড়,
কিনা হয় সে বাঁশ দিয়ে।
বাঁক, বাখারি, ফড়, জোঁয়াল, সিমলে ঝুড়ি,
চুবড়ী, কুলো, ডালা রাখালের নড়ি।
হেঁটো, খাঁচা, মাচা, আগড় বাঁধা চোঙ্
দেবতাদি ঠাট হয়, কাঠামোটি করে।
গুণবান বাঁশ কি দিব তুলনা,
বিবেচনা কার বেদে নাহি সীমা।
অভাবে খামার ভাঁজি হও মুচিবাড়ী
তোকলি হইয়ে খীবকেরি কাগে
উকুণ ঠেঙ্গা হও, কৃষকেরি করে,
ও বাঁশ জোয়ানে ধরিয়ে চৌচির করিয়ে
বোনে খাজুই, পলুই খিন্তি খুনী ছয়ারি,
ও বাঁশ কুমারের চাকে হও চাকের নড়ি
দাঁড় মাঝির হাতে হও দাঁড়ি আড়ি
হাতুড়ির বাঁট হও কর্ম্মকারের বাড়ী
রথের নিশানের ছড়ি।
তাঁতি বাড়ী গুজরে শানা চরকী নাটা
জাহ্নবীর জলে হয়ে থাক খোঁটা
বাঁকা হ'য়ে থাক চৌপলেতে আঁটা
মোটামুটি বিকায় দশখানা বাজারে।
শুনতে পাই বাঁশ, বৈদ্যের নিকটে
জীবে ব্যাধ হ'য়ে পাড়লে সঙ্কটে
বংশলোচন বেটে খাওয়ালে উৎকটে
আরোগ্য হয় সে ব্যাধি।
বেদ বিধানে বংশ প্রয়োজন
ঘোড়া ঝোড়া ওড়া চাক ডালা চালুন
বাঁশের যত গুণ না যায় বর্ণন
বাঁশের ছাদ্না করে বিবাহ আসরে।
বাঁশ ত' নয় সামান্য জগৎ মণ্ডলে
যদি কোন কালে কারুর ভিটা মূলে
বাঁশের ফুল ধরে, নির্ম্মূল করে তার সমূলে;
সে বংশে পুত্র কন্যা থাকে যা'টি
ছাদে পাতে মারে ছারপোকা টিকটিকি
ও বাঁশ জয়দের নিশান উড়ায় পরিপাটী
বাঁশগাড় ক'রে মাটি মাড়ে নরে।
ও বাঁশ ফুলের সাজি হয়ে থাক দেবালয়ে,
শ্মশানেতে থাক মড়ার বাঁশ হ'য়ে
ঘাড়ে থেকে যাও বুকে বাঁশ দিয়ে
খুঁচিয়ে মার বক্ষ হিয়ে।
নীলকণ্ঠ বলে আমায় কবে হবে সে সুদিন
কবে দেখাইবে আমায় জাহ্নবী পুলিন

এই শ্মশানস্থলে দেহ হবে লীন
তথা ভস্ম হবে দেহ কলেবরে।

সংগ্রহকর্ত্তা—শ্রীরাধাচরণ দাস।

কুচবিহার বিপ্লব।

৫ম বিপ্লব।

যুদ্ধ কি ভয়াবহ ঘটনা? নরান্তককারী দানবী শক্তির স্ফুরণে নরহত্যার চরম পরিণতিই কি যুদ্ধ?

দেবী রত্নমঞ্জরীর প্রশ্নে শত্রুপরাভবকারী মহামতি শুক্রধ্বজ প্রত্যুত্তর করিলেন, "না দেবি! তোমার বিচার্য্য প্রচুর নহে। তুমি নিতান্ত কোমলপ্রাণা অবলা, তাই রণরঙ্গের অবতারণা বুঝিতে অসমর্থ।"

এই সময়ে রণবেশধারিণী সৌভাগ্যবতী বিলম্বিতকোষবদ্ধ চন্দ্রহাস মুষ্টিদেশে কর প্রদান করিয়া প্রবিষ্ট হইলেন।

রত্নমঞ্জরী বলিলেন, "স্বাগতম্!" শুক্রধ্বজ পশ্চাৎ ফিরিলেন, দেখিলেন—সৌভাগ্যবতী।

সৌভাগ্যবতী সসম্মানে উঁহাদের অভিবাদন করিলেন। রত্নমঞ্জরী ও শুক্রধ্বজ তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

মহামতি শুক্রধ্বজ ঈষদ্ধাস্যে বলিলেন,—"ভগিনি! তুমি তোমার বউদিদিকে বুঝাইয়া দাও, যুদ্ধ কাহাকে বলে।"

সৌভাগ্যবতী বলিলেন,—"বউদিদি! আমরা আজ যুদ্ধে যাইতেছি। যুদ্ধ কাহাকে বলে, সেইখানেই বুঝিতে পারিবে। আপনি কি রণক্ষেত্রে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করেন?"

রত্নমঞ্জরী বলিলেন,—"নিশ্চয়ই যাইব; কিন্তু তুমি বল যুদ্ধ কাহাকে বলে?"

সৌভাগ্যবতী বলিলেন,—দিদি! বুঝিয়া দেখুন, আহমেরা স্বাধীন। ভূতপূর্ব্ব সময়ে আমরাও স্বাধীন ছিলাম। তবে আহমেরা আমাদিগকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছে কিরূপে? যুদ্ধে। আমাদের যুদ্ধার্থী সৈন্যদল লক্ষ্য করিয়াছেন; আহমাদিগেরও এইরূপ অনেক সৈন্য আছে। আমাদের দেশ আছে, তাহাদেরও দেশ আছে। তবে তাহারা বলীয় দেশে প্রবেশপূর্ব্বক যথেচ্ছ অত্যাচারাদির ও দৌরাত্ম্য করিতেছে কেন? আমরা কাটাকাটি মারামারিতে অর্থাৎ যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারি নাই। সেই জন্যই আমাদের এই দুর্দ্দশা। যখন কোন একটী একতাবদ্ধ জাতীয় শক্তি উদ্দিক্ত, উদ্বুদ্ধ অথবা আসুরিক-আনন্দ প্রলুব্ধ হইয়া উঠে, তখন তাহারা নৈতিক জ্ঞানের অভাব-বশতঃ বলদৃপ্ততায় যথেষ্ট গৌরব করিয়া থাকেন। আত্মম্ভরিতার ফলে নিরঙ্কুশ-প্রমোদ-রত এবং দৌরাত্ম্যপ্রিয় হন। শান্তি-সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, পররাজ্য গ্রহণাকাঙ্ক্ষী হইয়া, অন্য রাজ্য আক্রমণ করিলে, তখন ঐ আক্রমিত রাজা নিজসর্ব্বস্ব, জাতীয় গৌরব, জাতীয় সম্মান ও সতীর সতীত্ব রক্ষার্থ বদ্ধপর হইয়া, অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া শত্রু-সমক্ষে দণ্ডায়মান হন। যথার্থী হইয়া পরস্পর অস্ত্র শস্ত্র পরিচালন করিতে থাকেন। ইহাতে নরহত্যার চরম-দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহাই যুদ্ধ নামে বিখ্যাত।"

উচ্ছ্বসিতা শুক্রধ্বজ বলিলেন,—রত্নে! যুদ্ধের

কারণ কি ও যুদ্ধ কাহাকে বলে, ইহা অবশ্যই বুঝিয়াছ। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপরায়ণ দুইটী শক্তির ভীষণ নরহত্যাকারী যে সংঘর্ষ, তাহাই যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধ সুফল-প্রদ বটে, আবার অন্যপক্ষে কুফলেরও প্রসূতি। সৌভাগ্যবতী-বর্ণিত কারণযুক্ত যুদ্ধে যদি অত্যাচারপ্রিয় পররাষ্ট্রগ্রাহী শক্তির নির্মূল সাধন হয়,তাহা হইলে তাহাতে সংসারে শান্তি-সুখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অপর পক্ষে অন্যায় পক্ষ দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহাতে দেশ ক্রমেই বীরশূন্য এবং অন্তঃসার-বিহীন হইয়া যায়। তখন তৃতীয় পক্ষের আক্রমণে বাধা-প্রদানে তাহার সামর্থ্য থাকে না। যুধ্যমান শক্তিগুলি এইরূপে স্বকীয় ও পরকীয় ধ্বংসের পথ মুক্ত করিয়া বিধ্বংস হইয়া থাকে। বল-দৃপ্ত অত্যাচারপ্রিয় পক্ষ যুদ্ধে দুর্বল অথবা অন্তঃসার-শূন্য না হইলে পরাজিত পক্ষের প্রতি অত্যাচারের একশেষ হইয়া থাকে। তাহার জাতীয় মান, জাতীয় গৌরব একবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। পরাধীনতার চাবুকে তাহাদের শরীর জর্জরিত হইতে থাকে। এই জন্যই বিজ্ঞ নৃপতিগণ রণজ্ঞ হইলেও আকস্মিক আক্রমণ বা অত্যাচারপ্রিয়ের বলপ্রদর্শন হইতে নিরাপদ হইয়া নিরস্ত হইতে বা বৈরীপক্ষকে বিব্রত করিতে ইচ্ছুক হন না, সদ্ভাব ও শান্তি প্রত্যাশা করেন।

আমরা সুভোগ্য শান্তি উপভোগ করিতে-ছিলাম, যুদ্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত হই নাই। এতাদৃশাবস্থায় পররাষ্ট্রগ্রাহী, বলদৃপ্ত বিজিগীষু অরিবর্গের প্রচণ্ড আক্রমণে দেশ বিপর্যস্ত ও শঙ্কাকুল করিয়া তুলিল, আমরা অনিচ্ছাসত্বেও যুদ্ধ-রত হইয়া পরে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলাম। সুন্দরি! এখন আমরা সুসজ্জিত, সুগঠিত সেনাদলে পরিবৃত হইয়া, আনুগত্য উচ্ছেদ-সাধনে ধাবমান্ হইব। তাই এই যুদ্ধযাত্রা।

সৌভাগ্যবতী উত্তর করিলেন ;—মহামনা উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজা মহাশয়ের প্রবল অনীকিনীর প্রান্তদেশ রক্ষণী রমণী-বাহিনী প্রস্তুত। আজ্ঞাপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

শুক্লধ্বজ বলিলেন ;—যেরূপ বহু বিস্তৃত ও ভয়াবহ সংগ্রাম সম্ভাবনা, তাহাতে তোমার স্ত্রীবাহিনী প্রচুর বলিয়া মনে করা যায় না। তুমি তোমার সুশিক্ষিত রমণী-বাহিনী সাহায্যে আমার প্রিয় দুর্গ "চিলারায়ের প্রান্তর" রক্ষার্থ অবস্থান কর। আহব-যুদ্ধে যাইবার প্রয়োজন নাই।

সৌভাগ্যবতী কহিলেন ;—না, আমি নিশ্চ-য়ই যাইব।

শুক্লধ্বজ প্রত্যুত্তরে বলিলেন ;—বিশেষ নিষেধ করিব না,—কিন্তু রমণী সৈন্যদলকে আমি যুদ্ধে নিযুক্ত করিব না। স্ত্রী-শিবির রক্ষার্থ নিয়োজিত করিব।

সৌভাগ্যবতী বলিলেন ;—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য। কিন্তু এরূপ বাহিনী গঠনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন কেন? যাহাই বলুন, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চয়ই যাইব।

রত্নমঞ্জরী বলিলেন ;—তোমার দুঃসাহসিক কর্ম্ম কখনও অনুমোদনীয় নহে।

তুমি অবলা, স্বভাবতঃ দুর্বলা। তোমার আবার যুদ্ধ কি? তুমি রণ-রঙ্গিণী-বেশ

ধারণ করিয়াছ বলিয়াই, তোমাকে কি একজন বীর-রমণী বলিয়া পরিজ্ঞাত করিতে হইবে? শান্ত হও, অন্য সুযোগের অপেক্ষা কর।

সৌভাগ্যবতী বলিলেন;—বউদিদি! তুমি আমার শক্তিমত্তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত আছ। তাই পরুষবাক্যে আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ। কিন্তু যিনি রণ-দুর্ম্মদ, যিনি বীরোচিত যশো-মাল্যভাগী হইয়া আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান, তিনিই আমাকে ধনুর্ব্বেদ, ত্রিশূল, কৃপাণ প্রভৃতির পরিচালন-পদ্ধতি ও সামরিক বিদ্যায় সুশিক্ষা দান করিয়াছেন। তাঁহারই অনুজ্ঞায় স্ত্রী-বাহিনী গঠন করিয়াছি। রমণীকুল কি বীরধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ?

রত্নমঞ্জরী বলিলেন;—তোমার শৌর্য্যপ্রদ বাক্যাবলী শ্রবণে অন্তঃকরণে ত্রাসের সঞ্চার হয়। তুমি যুদ্ধ করিতে জান। আত্ম-রক্ষাক্ষম ও অন্যের ত্রাণকারিণী শক্তি ধারণ কর কি? যদি তাহাই হয়, তবে সহচরীরূপে আমিও নিশ্চয়ই আহব যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব।

তোমার দাদা মহাশয়কে বল, তিনি যেন নিবারণ না করেন।

শুক্লধ্বজ বলিলেন;—অয়ি কুলশীলসম্পন্নে! আমি তোমাকে নিবারণ করি। যুদ্ধের নামেও তোমার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়, তুমি কিরূপে শত-সহস্র বীরের হুঙ্কার ধ্বনি, নৃশংস হত্যাকাণ্ড আহত জনের মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি শ্রবণ করিবে। তুমি নিবৃত্ত হও? সুখে গৃহে বাস কর! আমি রণরঙ্গের জন্য বিদায়প্রার্থী, তুমি সহাস্যাননে বিদায় দান কর।

রত্নমঞ্জরী কহিলেন;—স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য, বীরবীর্য্যবলে দেশের উদ্ধারের জন্য, দেশ নিষ্কণ্টক করিবার হেতু, পরাধীনতা মোচনের কারণে, আমি তোমাকে বিদায় দান করিতেছি সত্য; কিন্তু মনে রাখিবেন— আমি বীরপত্নী, বীর-বাণী-গীতি শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণে উৎসাহের দুন্দুভি বাদিত হইলে, হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেম জাগরিত হইলে, কোন্ বীর রমণী কবে নীরবে অবস্থান করিতে পারে? অদিনীর অবারণীয় অনুরোধ যথার্থ ই রণক্ষেত্রে গমন করিবে।

অদ্য হইতে আমিও স্ত্রী-বাহিনীর একজন সামান্যা শিক্ষানবিশী পদ গ্রহণ করিব। কেমন দিদি, সৌভাগ্যবতি! (১) শুক্লধ্বজ বলিলেন,—যে সমর-ব্যাপারে খ্যাতিমান্ মহাত্মা মহাত্মাগণও আতঙ্কিত হন, এবং উহা হইতে বিদূরে অবস্থান করেন, এমন শঙ্কাজনক সমর-ক্ষেত্র হইতে অতি দূরে বাস করাই শ্রেয়। প্রাবৃট্ কালে বারি-বহ যেমন অবিরল ধারায় বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ আকর্ণা-কৃষ্ট কার্ম্মুক সমূহ হইতে, অবিরত বিশিখসমূহ বর্ষিত হইতে থাকিবে। চমকপ্রদ-লীলাজনা বিকোষিত চন্দ্রহাসফলকে প্রতিফলিত হইয়া অবিরত ক্রীড়া করিতে থাকিবে। রণ-দুন্দুভি-আরাবে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। মৃত ও মুমূর্ষুর প্রতিচ্ছবি নিয়ত অন্তঃকরণে

(১) সৌভাগ্যবতী অত্যন্ত গুণবতী রমণী ছিলেন। এই জন্য ভাই ও বোন সম্পর্কিত সকলেই তাহাকে আদর করিয়া দিদি বলিতেন। বয়সে ছোট হইলেও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন না। প্রিয় ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে সুখী করিতেন।

জ্ঞানের আবির্ভাব করিবে। আরও কত কি ভীষণ বিকট দৃশ্য প্রদর্শিত হইবে, তাহা অবর্ণনীয়। সুতরাং তোমার পক্ষে প্রতি-নিবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়স্কর।

রত্নমঞ্জরী বলিলেন,—দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও কার্য্যপ্রবৃত্ত হওনই শঙ্কাবিনাশনের এক মাত্র উপায়। এহেন উপায় হইতে সুদূরে অবস্থান করা উচিত নহে। আমি বীরবালা ও বীরভার্য্যা। তবে দোষের মধ্যে স্ত্রীসুলভ ভীতির আশ্রিতা। এ ভীতি অল্প কালের মধ্যেই অপনীত হইবে। অনুগতাকে ছায়ার ন্যায় আনুগত্য দান করুন।

শুক্লধ্বজ কহিলেন;—আশ্রয়ীর রক্ষা-বিধানই বীরের অভিপ্রেত ধর্ম্ম। তুমি সৌভাগ্যবতীর তত্ত্বাবধানে রক্ষিতা হইবে। দিদি সৌভাগ্যবতি! তোমার বউ দিদির রক্ষাবিধানকল্পে ব্রতী হও, তাহার সুখ সুবিধা সাধনে সতর্ক হও, আমি কার্য্যান্তরে যাইতেছি। বিপুল বাহিনী শীঘ্রই যুদ্ধযাত্রা করিবে। তোমরা তৎপর হও। শুক্লধ্বজ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সৌভাগ্যবতী বলিলেন;—বউদিদি রত্ন-মঞ্জরী, তুমি যথার্থই রত্নমঞ্জরী। দাদা মহাশয় তোমাকে কত ভালবাসেন। কত শিরোপচার প্রদান করেন। সুতরাং তোমার বাক্য কখনই অবজ্ঞাত হইতে পারে না। বৌদি! তুমি যদিও সম্বন্ধ-জ্যেষ্ঠা তাহা হইলেও তোমাকে প্রিয়ভাবে কয়েকটী প্রিয় কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু দাসীর পক্ষে আপনাকে প্রবোধিত করা আমার বিধেয় ধর্ম্ম নহে।

যৌবন অস্থায়ী। পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরপীড়াকর কার্য্য পরিহার করাই জ্ঞানিগণের অবশ্য করণীয়, এবং অবিরোধভাবে ধর্ম্ম সেবা করাই বিধেয়। দয়া বৃত্তি হইতেই পরোপকারাভিলাষ জন্মে এবং তাহা হইতেই ধর্ম্ম-সৃষ্টি হইয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সত্যের সমাদর করেন এবং উহার রক্ষা বিধানেই প্রচেষ্ট হইয়া থাকেন। সংসারে যদিও সুখই এক-মাত্র গ্রাহ্য, তাহা হইলেও উহা অসৎ সুখের অঙ্গীভূত করা বা ঐরূপ উপাদানে পরিণত করা কখনও সমীচীন নহে। সুখের হেতুকে সৎসুখে অরূপান্তরিত ভাবে রক্ষা করাই এক মাত্র জীবনের গরিষ্ঠ অবলম্বন হওয়া কর্ত্তব্য। সৎএর-ভাবই সত্য। সত্য হইতেই নিকাম ধর্ম্মের পরিণতি সাধিত হয়। অতএব সত্য ধর্ম্মের প্রসূতি দয়া বৃত্তিকে আশ্রয় করা বুধ-গণের প্রধান লক্ষ্য।

যুদ্ধ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড বিশেষ। এই হত্যা-কাণ্ডের সংশ্রবে দয়া আদৌ প্রযুক্ত হয় না। সুতরাং ভবদীয়া দয়াবতী জনের রণক্ষেত্রে অনুপস্থিতিই শ্রেয়স্কর।

বউদিদি! তাই বলিতেছি, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডময় রণক্ষেত্রে গমন না করিলেই উত্তম কার্য্য হইত।

রত্নমঞ্জরী বলিলেন,—সৌভাগ্যবতি! দয়া, সত্য ধর্ম্ম এ সমুদয় হইতে আমি সুদূর-বাসিনী। উহাতে আমি আদৌ লক্ষ্য রাখি না। পতির নিকট যাহা পরিত্যাজ্য অর্থাৎ

পতি দেবতা যাহা শুনিলে বা যে বাক্যের যাথার্থ্যে সন্দিহান হইয়া উহা অসত্য বা অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান করিতে পারেন আমি এরূপ বাক্য ও ব্যবহার উভয়ই ত্যাগ করিয়া থাকিব। স্বামীর প্রতি যেরূপ ব্যবহারাদর্শ প্রদর্শন করি, ছোট বড় সকলের নিকটই তাহা প্রতিভাত করিতে চেষ্টা করি। ইহাই আমার পক্ষে ধর্ম্ম! এই ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ও সদুপায় মনে করি।

পতি-সংসর্গই সতী-রমণীর পক্ষে সৎ সংসর্গ। আসঙ্গলিপ্সু পুরুষ বা রমণীগণের আসঙ্গলিপ্সার উপাদান স্বভাবানুযায়ী বিভিন্ন হইলেও, সতীরমণীরা একমাত্র স্বামীরই অনুগামিনী হইয়া থাকেন। কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করাই সতী-রমণীর বিহিত কর্ম্ম। সৎ বিষয়ে আমাকে যাহা উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহাও আমার পক্ষে বিচার্য্য নহে। পাপ পরিহর্ত্তব্য, কিন্তু তাহার তো আদৌ অনুষ্ঠান করি না। নরকের দুঃখে ভয় করিব কেন? রত্নমঞ্জরী নীরব হইলেন। সৌভাগ্যবতীও তাহার বাক্যাবলী শ্রবণে ভাবান্তরগামিনী হইয়া পড়িলেন।

সৌভাগ্যবতী মনে মনে চিন্তা করিলেন;— দাম্পত্যে কি সুখ বর্ত্তমান আছে? বুধগণ বলেন,—যৌবন-কাল দুরতিক্রমণীয়। তাহা হউক, তবে এক সময়ে বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইলেই তো চলিতে পারে? পরে ভাবিলেন, যাক্, এ সকল পরে সময়ান্তরে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব; এখন প্রস্তুত হওয়া উচিত। প্রকাশ্যে বলিলেন,—বউদিদি! তোমার সাধ পূর্ণ হউক। এখন প্রস্তুত হউন। শীঘ্রই আবার আসিব। আমি নিজের সমুদয় বস্ত্রজাত সুসজ্জিত করি। সৌভাগ্যবতী নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রত্নমঞ্জরীও তথা হইতে প্রস্থিত হইলেন।

(৪র্থ বিপ্লব সমাপ্ত)।

মধুর মিলন।

(গল্প)

শীতকাল এখনও যায় নাই। বসন্তের সঞ্চার হইবারও তেমন বিলম্ব নাই। প্রভাতের তরুণ-অরুণ-কিরণের শোভা দর্শন করিতে আমি প্রতিদিনই নদীর কূলে যাই। প্রভাতের প্রাকৃতিক শোভা আমাকে স্বাভাবিকই এক বিমল আনন্দ আনিয়া দেয়। নদীর কূলে প্রভাতের শোভা বড়ই মনোরম। নিত্য যাই, নিত্যই বেশ আনন্দ অনুভব করি।

সে দিন, ঠিক সেই প্রভাতে তেমনি ভাবে নদীর তীরে গিয়া দাঁড়াইয়াছি; এমনই সময়ে একটি বালিকা কলসী কাঁকে করিয়া ধীর মন্থর গতিতে নদীতে অবতরণ করিতেছে। তাহার ফুট্ ফুটে চেহারাখানা, রাঙ্গা ঠোঁট দুটুকু ও সাদাসিধে ভাব চলনটী আমার কাছে যেন ঠিক প্রতিমার মত বোধ হইল। কলসীটি জলে পূর্ণ করিয়া বালিকাটি বাড়ীর দিকে যাচ্ছে, ঠিক আমার সামনে দিয়েই যাচ্ছে। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলেম—"মণি, এত সকালে জল নিতে আসছ। তোমার শীত করে না?"

তার বোধ হয় কথা বল্বার তেমন আগ্রহ ছিল না, তবে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "না"। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। সে বালিকা বাড়ী চলিয়া গেল। আর একদিন ঠিক সেইখানে সেই বালিকাটিকেই জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার নামটি কি, মণি?" সেদিন স্নেহের সহিতই বলিল "নাম কমলা।" ঠিক কমলার মতই বটে—

"তোমরা ক' ভাই বোন?"

"আমার ভাই বোন আর কেউ নাই।"

"তোমাদের বাড়ী এ পাটি ছেড়ে কত দূরে?"

"ঠিক আমাদের বাড়ী নয়, তবে আমি যে বাড়ীতে থাকি সেটি এই রাস্তা দিয়া একটু এগুলেই পাওয়া যায়।"

"তবে তোমাদের বাড়ী কোথা?"

"আমার বাড়ী নাই, বাপ মাও নাই। ছোট কাল হতে আমি ওদের বাড়ীতে আছি। লোকে শুনতে পাচ্ছি আমাকে ওঁরা পথে পেয়ে নিয়ে এসেছেন।"

বালিকাটির কথা শুনে আমার একটু দুঃখের সঞ্চার হল। এমন সুন্দরী মেয়েটি মাতৃ-পিতৃ-হীনা। তাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করলেম "তুমি কি পড়ছ?"

"আজ্ঞা পড়ছি; ঐ যে সামনে একটি বাগান দেখছেন, ঐ বাগানের সামনেই যে একটি ঘর ঐটিই আমাদের (মেয়েদের) স্কুল।

"কমলা, তুমি কার কাছে পড়?"

"পড়াবার কেহ নাই, আমি নিজেই বাড়ীতে পড়ি আর স্কুলে গিয়া যা পড়ি। আমি আর দেরী করতে পারব না, তা হলে খোকার মা গালি দেবেন।"

"তবে যাও।"

কমলা চলিয়া গেল। খোকার মাকে কমলা মা বলিয়া ডাকিত, তবে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে 'খোকার মা' বলিয়াই সম্বোধন করিত।

(২)

সেদিন রবিবার। অবসরের দিন। অরুণদেব সবে মাত্র ও প্রান্ত হইতে এ প্রান্তে আসিয়া তাহার কণক-রশ্মি বিতরণ করিয়া ঠিক আমাদের এই দিকেই অগ্রসর হইতেছেন। দুটি বালিকা; নাম শ্যামলা ও কমলা। বকুলতল হইতে পতিত শুভ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলি চয়ন করিতে করিতে শ্যামলা কমলাকে ডাকিল "কমলা"

"কেন লা।"

"আজ দুটি কথা মনে পড়ল।"

"কি কথা।"

"এই যে আমরা আছি দুজনে বেশ; আর কি এমন থাকতে পারব?"

"কেন পারব না?"

"সে দিন যে আমার বিয়ের কথোপকথন হয়ে গেল; দুদিন পরে কোথায় যেতে হবে।"

"কেন লা বিয়ে করবি কেন? এই ত আমরা বেশ আছি। দুটি প্রাণ বেশ মিশে থাকব, পড়ব আর এমনি করে সুখে খেলব।"

"তুই বুঝিস না কমলা। আমার বিমলা দিদি, তার সঙ্গে আমরা কেমন খেলতাম; সেও ত একদিন বলেছিল আর বিয়ে করব

না।" সে ত তুই চক্ষের উপরেই দেখ্‌লি। আজ বছরেক সে কোথায় চলে গেছে।"

"তবে শ্যামলা দিদি, তুমি চলে যাও আমি একাই থাক্‌ব। আমায় ত আর কেহ বিয়ে করবে না।"

"না রে কমলা, মায়ের মুখে শুনেছি সংসারে জন্মগ্রহণ করলে সকলেরই বিয়ে হয়। এমন ত কাউকে দেখি না যে বিয়ে না হয়েই বুড়ো হয়েছে।"

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে তরলা এসে উভয়ের কথায় বাধা প্রদান করিয়া বলিল "তোদের ফুল তোলা হয় নি?"

শ্যামলা বলিল "এই হয়েছে লো, চল, এখন বাড়ী যাওয়া যাক।"

কমলা জানিত যে, তাহার বাপ মা ভাই বোন কেহ নাই। শ্যামলার সহিত কথা কহিতে গিয়া প্রাণে বুঝি অনেকটা আঘাত লেগেছে—তাই সে আর তরলার কথার উত্তর না দিয়ে তাদের পিছে পিছে চলে গেল।

পিতৃ-মাতৃহীনা হলেও কমলার প্রাণে এতদিন বিষাদের ছায়া প্রতিফলিত হয় নাই। সে মনে মনে বলিতে লাগিল "মনে করিয়া-ছিলাম এমন সুখেই দিন চলে যাবে। কিন্তু কই যাদের সঙ্গে এই সুখ উপভোগ করছি তারা সব চলে যাবে। তারপর পরে তারা স্বামীর প্রাণে মিশে বিমল আনন্দ লাভ করবে আর আমি এই অভাগিনী কার চরণতলে স্থান পাব। একলাটি এমনি এই স্থানে অব-স্থান করে কোন্ অজানা সুখের অনুসন্ধান করব।"

(৩)

রাত্রি বোধ হয় তখন ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। গাঢ় অন্ধকার। বিনোদলাল সপরিবারে গো-গাড়ী করিয়া বাড়ী আসি-তেছে। গাড়ীর সাম্‌নে ছোট একটি লণ্ঠন ঝুলান আছে। গাড়ী চলিতে চলিতে পথের মাঝে এসে হঠাৎ থেমে গেল। গাড়ীতে সকলেই ঘুমাইতেছিল; গাড়োয়ান তন্দ্রাবেশে গাড়ি হস্তে করিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে, এক এক-বার উঠিয়া গরুদ্বয়কে বিষম আঘাত করিতেছে। এখানে আর কেহই চৈতন্য হইতে পারে নাই।

রাস্তার দুই ধারে বিটপিশ্রেণী, মাঝখানে উন্নত মেটে প্রশস্ত রাস্তা। তৃণাগ্রগুলি সর্ব্বদাই মধুর হিল্লোলে দোলে। তারা যেন সদাই পুলকিত। উন্মুক্ত-পথে বাস স্থাপন করিয়া বাস্তবিকই তারা স্বর্গ সুখ অনুভব করে, পথিকেরে বিপুল আনন্দ আনিয়া দেয়। মৃদু-মন্দ হিল্লোলে বিনোদলালের স্ত্রী সুখে তন্দ্রাভিভূতা হইয়া এক স্বপ্ন দেখিতেছে। যেন সে তাহার স্বামীকে বলছে; "দেখ গা, এই যে মেয়েটি পথে পেয়ে সেদিন এনেছিলুম দেখতে কেমন সুন্দর, কেমন মধুর মুখখানি আর তার মিষ্ট কথার স্বরগুলি আমায় কেমন মুগ্ধ করে ফেলেছে। আহা! এমন দুলালি মেয়েকে কে ফেলে দিয়েছে রে। একি মাতৃ-পিতৃহীনা। সর্ব্বহারা প্রাণটি আমার। ঠিক বিমলা ও শ্যামলার মতই, কি তাদের চেয়েও সুন্দর, আহা এসমা, কোলে এস। বিমলা শ্যামলার মেয়ের বোন্ তুমি, তোমার নাম

রাখিছ কমলা।"

এমন সময় বিনোদলালের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। গাড়োয়ান তখনও ঘুমাইয়া আছে। বিনোদলাল ডাকিল "গাড়োয়ান,গাড়োয়ান!" গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি উঠিয়াই দেখিল বিনোদ ডাকিতেছে; ডাক শুনিয়া বলিল, "আজ্ঞে।" "গাড়ী থেমে আছে যে।" অমনি গাড়োয়ান গরু দুটিকে বিষম আঘাত করিতে লাগিল কিন্তু গরু কিছুতেই পা অগ্রসর করিতেছে না। বড় বিপদ। গাড়োয়ান ধীরে ধীরে গাড়ীর নীচে নামিয়া গিয়া দেখিল একটি শিশু গাড়ীর সামনে পথি মধ্যে পড়িয়া আছে। তখন বিনোদলালকে ডাকা হইল। বিনোদলাল গাড়ী হইতে নামিয়া আসিতেই তাহার স্ত্রী হঠাৎ চৈতন্যলাভ করিয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কি হয়েছে?"

"এই যে গাড়ীর সামনে একটি শিশু পড়ে আছে; গাড়ী থেমে আছে।"

বিনোদলালের স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সুখ-স্বপ্ন হইতে সহসা জাগরিত হইয়া যেন সে আর একটা স্বপ্ন রাজ্যেই এসে পড়েছে। একটা সুখ-তন্দ্রা হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি লাভ করিয়া বিনোদলালের স্ত্রী বলিল, "শিশুটী বেঁচে আছেত?"

বিনোদ। "বেঁচে আছে কিন্তু শীতে বড়ই কাঁপছে।"

বি-স্ত্রী। "আহা কাঁপছে, নিয়ে এস না।"

বিনোদলাল শিশুটিকে তাহার স্ত্রীর নিকট দিল। তাহার স্ত্রী একখানি গরম কাপড়ে জড়াইয়া দিয়া স্নেহ-পূর্ণ-ক্রোড়ে উঠাইয়া লইল। বিনোদলাল শিশুটির দিকে পুনরায় লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে বলিল, "বুকের কাছে ধরে একটু দুধ খাইয়ে দাও না?"

"আহা এমন শিশুটি আমার, প্রাণের নিধি তোকে কে এমন করে ফেলে দিয়েছে রে" এই বলিয়া বিনোদের স্ত্রী একটু দুধ খাওয়াইয়া দিল।

গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল। বিনোদলাল ঘুমাইয়া পড়িল। বিনোদলালের স্ত্রী শিশুটিকে কোলের কাছে সংস্থাপন করিয়া স্নেহপূর্ণ হস্তদ্বয় দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তন্দ্রাভিভূত হইল। পূর্ব্বের মত তেমনই সুখ-স্বপ্ন সন্দর্শন করিল, যেন সে বিমলা ও শ্যামলার মত একটি যোগ্য বরে শুভলগ্নে পূর্ব্বোক্ত কমলাকে সম্প্রদান করিতেছে।

* * * * * * * * * * *

বিহগকুল প্রভাতের আগমন-বার্ত্তা জানাইবার কিছু পরে গাড়ীখানা একটী দ্বিতল বাটীর ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। সকলেরই নিদ্রা ভঙ্গ হল। বিনোদলাল সপরিবারে শিশুটিকে লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। বিমলা বয়স্কা মেয়ে। শ্যামলা বিনোদলালের এই এতটুকু মেয়ে, অস্পষ্ট ভাবে কথা বলতে শিখেছে। মায়ের কোলে ছোট শিশুটিকে দেখে বল্লে "মা-লে তোল কোলে ওতা কে মা?"

"তোমার বোন মা।"

"ওতা আমার বোন মা। আমার কোলে দিবি মা।"

"না মা, তাহলে বোন কাঁদবে।"

মাতা ও কন্যার কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময় বিনোদলাল এসে স্ত্রীকে বল্লে "ও গিন্নি, গিন্নি অমন সুন্দরী হুলাঙ্গী মেয়েটিকে পথে পেয়ে ত নিয়ে এসেছ, বলি, নামটি রাখলে কি ?"

"মেয়ের নাম রাখতে আর মাথা ঘামাতে হবে না, গত রজনীর সুখ-স্বপ্ন হতে মেয়েটি পাওয়া গেছে।" তারপর স্বামীকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সমস্ত বলা হইল। পাঠকগণের জানিতে বাকি রহিল না যে, মেয়েটির নাম হইল কমলা।

এই অবধি কমলা উক্ত গৃহেই লালিত পালিত হইয়া বড় হইতে আরম্ভ করিল। এই কমলার বিষয় পাঠকগণ পূর্ব্বেও অনেকটা জানিতে পারিয়াছেন।

(৪)

দেখতে দেখতে দুটি বৎসর কালের কবলে লীন হইয়া গেল। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ ও দুঃখের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শ্যামলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহার দ্বারা তাহার সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে কি না ঠিক বলা যায় না। কিন্তু তাহার বিবাহের পর হইতেও তাহার পিতার ভবন পরিত্যাগ করার পর কমলার কিন্তু দুঃখের পরিমাণ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। যতখানি শান্তি ও সুখের ছায়ায় এত খানি সে বড় হইয়াছিল আজ তেমনই ততখানি দুঃখের বোঝা লইয়া সে বিব্রত। বিনোদলাল ও তাহার স্ত্রী যে কমলাকে ভালবাসিত না, এমন নহে; তবে তার সঙ্গিনী শ্যামলাকে ছাড়িয়ে একটা শোকের উচ্ছ্বাস তার কোমল প্রাণকে ছুঁইয়া যাইতেছে। প্রতিকূল চিন্তাস্রোতে ভাসমান থাকিয়া, হৃদয়ে বেদনার বোঝা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

* * * * * * * * * * *

নীরবে ও অশান্তিতে কিছু দিন গত হয়ে গেল কিন্তু দুঃখের বোঝা বেশী হওয়া বই আর কম হল না। এই বার এক মাত্র মঙ্গলময়কে ভরসা করেই নিশ্চিন্ত হল।

(৫)

শরৎকুমার চেয়ারে বসিয়া একখানি বই দেখিতেছিল, এমন সময়ে তাহার স্ত্রী রমলা এসে বল্লে,—

"ওগো, এই যে দিবা রাত্তির বই নিয়েই পড়ে আছ, বলি এমন করে আর কয়দিন করবে ?"

"যে কয়দিন থাকে প্রাণ, সে কদিন করব।"

"তা বালাই যাক, আমার রেহাই দাও, এমন করে আর পারব না। চব্বিশ ঘণ্টা একটু অবসর নেই; ভোরের বেলা মেয়ে আনা, ৯টার সময় রাঁধতে যাওয়া আর সারাদিনটা এমান,—এ আর সহ্য করতে পাচ্ছি না।"

"বাপ শান্ত হও রমলা। আমার পাশে বস, যা বলি একটু কাণ পেতে শোন। অবুঝের মত অমন চেঁচালে কি হবে বল ত ?"

"আর বলবেই বা কি গো আর বোঝাবেই কি ? যে মেয়েটার জন্ত মাথবকে আনা হইয়াছিল, সে আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল মারা গেছে, মাধবকে রেখে কি হবে শা।"

"হায় রে বুদ্ধিমতী ;—বেশ

তোমায় ত এতদিন বুদ্ধিমতী বলেই আখ্যা দিয়াছিলাম। এখন সেটি ঘুরিয়ে কি সুখ্যাতি প্রচার করব সেইটাই ভাবছি। বলি যাকে একবার ঘর জামাতা করবে বলে এনেছিলে তার জন্য না হয় একটু কষ্ট করলেই বা। মেয়েটি বেঁচে থাকলেও ত বিয়ে দিতেই হত। এখন না হয় মাধবকে একটু জামাতা বলেই স্নেহ কর।"

"হায় রে কপাল; মেয়ের জন্যেই ত জামাতার আদর, তারপর বিয়ে হয়ে গেলে সেও ছিল এক কথা। এখন সে মাধবের প্রতি কেমন করে স্নেহটা আসবে? মেয়ের শোকেই অস্থির আর কুষ্মাণ্ডটাকে লয়ে ভারি ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হবে। বলি মাধবকে যদি তুমি নিজে বলে না দিতে পার তবে আমিই তাকে বলে দিচ্ছি যে সে আর এখানে থাকতে পাবে না, অন্য কোথাও চেষ্টা করুক।"

"রমলা! তুমি একবারে পাগল হয়ে গেলে নাকি? নাও নাও, এই জবাকুসুমটা নিয়ে মাথায় কিঞ্চিৎ ঢেলে ঠাণ্ডা হও, তারপর যে খেয়াল হয় তাই বল সেই মত কার্য্য করব।"

এইবার রমলা ভয়ানক রাগিয়া উঠিল এবং বলিল, "বলি এত ঢঙ রসটা আর ভাল লাগে না। তুমি কাগজ কলম আর বই নিয়েই পড়ে থাকবে, রান্না বান্নার কাছেও তুমি যাবে না কিংবা বাজারের তত্বটাও রাখবে না, সবগুলো চাকর বাকর ও গিন্নির উপর দিয়েই রাখছ। নিজের প্রাণে একটু কষ্ট লাগলেও অন্যের প্রাণের কথাটা বুঝবে।"

"তবে রমলা,—আজ হতে এই আমিই প্রস্তুত হচ্ছি। আমিই আজ থেকে রান্নার কাজটা করব। তুমি এই খানেই চুপ করে বসে নভেল নিয়ে পড়ে থেকো। মাধবের আর এই দুটি মাস, তা'হলে সে বি-এ পরীক্ষা দিতে পারবে।"

রমলা এইবার আরও রাগিয়া উঠিল। রাগে তার শরীরটা এমনই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে সে তৎক্ষণাৎ গৃহ হতে লাফাইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরের ঘরেই মাধব বসিয়া chemistry এর পাতা উল্টাইতেছিল। রমলা রাগত স্বরে মাধবকে ডাকিয়া বলিল "মাধব বহুদিন হয়ে গেছে এখানে আর আসতে পারি না। এখনই তোমার বইগুলি গুছিয়ে অন্য থানে যাবার বন্দোবস্ত কর।"

মাধব তাহাই করিতে মনস্থ করিল।

[৬]

ট্রাঙ্কে বইগুলি পূর্ণ করিয়া একজন কুলীর মস্তকে তাহা দিয়া আমি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম, কিন্তু কি উদ্দেশ্য করিয়া কি লক্ষ করিয়া বাহির হইতেছে সেটা তখন চিন্তা করবার সময় নয়। তবে আমার পরিচয় সেটাও সম্পূর্ণ ভাবে দিব না, কেবল আপনাদের নিকট নামটি বলিব। তাহাতেই আমি এখন উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে বাহির হইতেছি কেন তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আমার নাম মাধবচন্দ্র শর্ম্মা, আর কেন পরিচয় দিব না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাস্তায় বাহির হইয়া কতক দূর অগ্রসর হইয়া দাদা

রূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম। অবশেষে একটী দ্বিতল বাটীর সামনে রাস্তায় বসিয়া পড়িলাম। দুঃখে চক্ষের জলে কাপড় ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

* * * * * *

বিনোদলাল, তাহার স্ত্রী বিমলা ও শ্যামলার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। পিতৃ-মাতৃহীনা কমলাকে পেয়ে যেদিন বিনোদলালের স্ত্রী বুকের মাঝে স্থান দিয়ে ছিল, সেই দিন হইতেই এক চিন্তা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কমলা তখন বয়স্থা হইয়াছে, তাহার বিবাহের আয়োজন করিবার জন্য স্বামীকে ভয়ানক বিব্রত করিয়াছিল।

বিনোদলাল এক দিন ভগবানকে স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। নানা স্থান ঘুরিয়া কোন ফল হইল না। নিরুপায় হইয়া দেশে ফিরিলেন। ঠিক সেই—দিন যে দিন আমি রাস্তায় বসিয়া চক্ষের জল ফেলিতে-ছিলাম, পথের মাঝে আমি বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া আছি, দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাদন, এমন ভাবে এখানে কেন?"

দুঃখে আমার চক্ষে আরও জল আসিল। কথা কহিতে পারিলাম না। চক্ষু দুটি কাপড়ে আবৃত করিয়া অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। আমার নিকট যে কুলীটি ট্রাঙ্ক লইয়া হাজির ছিল, সে আমার সম্বন্ধে যাহা জানে, তাহার চেয়ে অধিক রঞ্জিত করিয়া আমি যে বাড়ীতে ছিলাম, তাহাদের নিন্দাবাদ করিয়া সমস্ত ঘটনাটা বিবৃত করিল। তার পর লোকটি আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া হাত ধরিয়া আমাকে উঠাইলেন এবং বলিলেন "আপনি এত অপমানিত হয়ে ওখান হতে চলে এসেছেন, দয়া করিয়া আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিলে আপনার পড়ার কোনরূপ ক্ষতি হইবে না, আশা করি।" এইরূপ বলিবার পর কুলীকে ট্রাঙ্ক উঠাইতে বলিলেন। কুলী ট্রাঙ্ক মস্তকে ধারণ করিয়া বিনোদ বাবুর পিছনে চলিতে আরম্ভ করিল। আমাকেও অগত্যা সেই খানেই আসিতে হইল।

[৭]

বিনোদ বাবুদের বাড়ী থাকা অবধি কমলা আমার নিকটেই পড়িত। তাহার পড়ায় বেশ অনুরাগ ছিল; নিত্য নূতন দুই চারিটি শ্লোক সে আমার নিকট শিখিয়া লইত। পড়িবার কালে তাহার কোমল-কণ্ঠের মধুর স্বর শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া যাইতাম! ইহা ব্যতীত সে নানা রূপ সুন্দর ফুলের মালা গাঁথিতে শিখিয়াছিল। শিল্প-কর্ম্মেও সে মজবুত হইয়াছিল। দিনের প্রায় সমস্ত সময়েই সে আমার নিকট থাকিত। সে যেন আমাকে পাইয়াই আনন্দে ভরপুর হইত। মনে হয়—আমাকে পাইবার জন্যই সে এত দিন কামনা করিয়া বসিয়াছিল। আজ আমাকে পাইয়াই বুঝি সে প্রাণে বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছে, যাহা হউক একজ সেও আমার নিকট স্নেহের পাত্রী, বাস্তবিকই সে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর কমলা বই নিয়ে আমার নিকট পড়িতে আসে কিন্তু সে দিন খালি হাতে আমার নিকট আসিয়া এক-পার্শ্বে

হাসিল। আমি বলিলাম "আজ পড়বে না ?"

"না"

"কেন ?"

"আজ আমাদের শুভ দিন।"

"কি শুভ দিন ?"

"এই একটু বসুন, তাহলেই বুঝবেন।"

এই বলিয়া কমলা চলিয়া গেল। একটু পরে কমলা এসে আমার হাতের বইগুলি একদিকে টেনে সরাইয়া রাখিয়া বলিল "আজ আপনাদের শুভ দিন, একটু শান্ত হয়ে বসুন না ?"

আমি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। আমার প্রাণে তখন ভয় ও সুখ দুটিরই আবির্ভাব হইল।

একটু পরে কমলা কতকগুলি ফুলের মালা এনে আমার গলায় জড়িয়ে দিল। হৃদয়ে তখন একটা স্বর্গীয় আনন্দের ঢেউ উঠিল। অন্তরতম প্রদেশে এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চারিত হইল, আর সমস্ত হাসিটুকু যেন শীতল হয়ে গেল।

একবার চাহিয়া দেখিলাম, একখানি শান্ত ও প্রফুল্লময়ী প্রতিমা আমার সামনে দণ্ডায়মানা আছে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস।

হরিনাম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

'নামে রুচি জীবে দয়া' সত্য আত্মাপন
নিজ-ধর্ম্ম-সার—সর্ব্ব ঘটে নারায়ণ।
সাধ বিশ্ব-জন-হিত—প্রেমে দাও কোল,
আত্মহারা হ'য়ে সদা বল "হরি বোল।"

ভাই! নিয়ত কেবলই আমিত্বের বৃথা অভিমানে নিমগ্ন থাকিও না।—আজীবন শুধুই আমি ও আমার আমার বলিয়া উন্মত্ত হইও না। ওরে, "রাখিস্ নে আর 'আমি' 'তুমি' ভাবিস নে আর বিশ্বভূমি" ভাই! জান না কি,—

"আমিত্ব তুমিত্ব ফেলে, নিত্যেতে উঠিয়া গেলে,
পাপ তাপ অবহেলে জীব মুক্তি পায়।"

(বিজয়গীতিকা)

কে আমি ? বল, এ ভবে কি আছে আমার ?" সবই তিনি, সবই তাঁহার। 'জলে জলবিম্ব সম, এ দেহ হেথায় মম। সমুদ্রের জল মুহূর্ত্তে মহাসাগরে মিশিয়া যাইবে। লবণের পুতুল, অনন্ত সাগরের অতল লবণাম্বুরাশির সহিত বিলীন হইবে; আমার আবার স্বাতন্ত্র্য কোথায়—পৃথক অস্তিত্ব কোথায় ? মায়ামুগ্ধ মন! যদি একান্তই আমিত্বের অলীক অভিমান ভুলিতে না পার—যদি একান্তই আমি ও তিনি পৃথক রাখিতে চাহ, তবে ভাব, আমি দাস, তিনি প্রভু; আমি সাগরজল, তিনি অনন্ত মহাসমুদ্র, আমি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, আর তিনি অত্যুচ্চ সুবিশাল চিনির পাহাড়! প্রভুভক্ত দাসের ন্যায়, পতিভক্তিপরায়ণা সতীর ন্যায়, কৃষ্ণ-প্রেম-উন্মাদিনী ব্রজ-গোপীর ন্যায় নিয়ত তাঁহার সেবা করিয়া—তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া সুখী হও; মকরন্দলোভী ভ্রমরের ন্যায় অবিরত তাঁহার পদারবিন্দ-মধু পানের চিন্তা কর, মিষ্টাস্বাদলুব্ধ ক্ষুদ্রাবয়ব ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় নিরন্ত সেই চিনির পাহাড়ের—সেই অনন্ত মাধুর্য্যময়

শ্রীহরির শ্রীচরণ ধ্যান কর।" চিনি হ'য়ে লাভ কি? আমি চিনি খেতেই ভালবাসি; তাই চিনির পাহাড়েরই চিন্তা করিব—আজীবন শুধু 'চিনি চিনি' করিয়াই কাঁদিব, চিনি লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া চিনির পাহাড়ের সন্ধানে ছুটিয়া যাইব না। বালক যেমন হস্তচ্যুত মোদক লাভের জন্য অশ্রুপ্রবাহে বুক ভাসাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভূতলে গড়াগড়ি যায়,—মোদক না পাইলে কিছুতেই শান্ত হয় না, মন! তুমিও তোমার সাধনার ধনকে—প্রাণের ঠাকুরকে হৃদয়ের দেবতাকে পাইবার জন্য, তাঁহার রাতুল পদে স্থান লাভ করিবার নিমিত্ত ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পূত অশ্রুগঙ্গা-জলে পরিত্রাণক শীতল করিয়া একবার সেইরূপ ভাবে কাঁদ। কাঁদ মন! একবার হরি হরি বলিয়া কাঁদ; একবার "হরিবোল বলিয়ে, দু'বাহু তুলিয়ে, নাচিয়ে গাইয়ে হওরে পাগল।" বল, ভাই! প্রাণ ভরিয়া সদা হরি হরি বল। বল, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

মন! কামনা ত্যাগ কর, বাসনাকে জলাঞ্জলি দাও। ভোগলালসার ক্ষণভঙ্গুর কাচের ঘর পদাঘাতে চূর্ণ কর, হরিনামের অনুরাগ-অনলে ভস্মীভূত কর, ভগবৎ-প্রেমের মলয়ানিল প্রবাহে সে শ্মশান ভস্ম উড়িয়া যাউক। ভাই! "কাম থাকিতে প্রেম হবে না, ব্রজগোপীর ভাব বিনে।" তাই পার্থিব কামনা-বাসনা ত্যাগ কর। ঐ দেখ, "ধাইছে গোপী ছাড়ি পুত্র কন্যা, ছাড়ি পতি, ছাড়ি পুর, ঐ দেখ, ব্রজবালাগণ শ্যামের ভক্তিতে পাগলিনী সবে, নাহি মান ভয় লাজ।"

মন! তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহার নামে ঐরূপ ভাবে পাগল হও; ব্রজবধূগণের ন্যায় সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাও। জীব! তাঁহার চরণে মন প্রাণ সঁপিয়া দাও। "কুরুক্ষেত্রের" নাগ-নন্দিনী দৈবজ্ঞার পার্থ-প্রেমের ন্যায় হরি-প্রেমে মত্ত হইয়া প্রাণ খুলিয়া বল,—

"কভু হরি পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা,
কভু হরি পুত্র আমি স্নেহে আত্মহারা,
কভু হরি সখা আমি সখী বিনোদিনী,
কভু হরি পতি আমি পত্নী-প্রেমাধিনী।"

ভাই! অনিত্য স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্য ব্যাকুল হইও না, অলীক ঐশ্বর্য্য-মোহে মুগ্ধ থাকিও না। 'দারা, সুত, পরিজন সব নিশার স্বপন, তবে কি কর মন অনিবার তার নারায়ণ।' তাঁহার ন্যায় আপন জন আবার কে? সে ধনের সদৃশ—সে রত্নের তুল্য অমূল্য সম্পদই বা কোথায়? 'হরি নাম বিনা আর কি ধন আছে সংসারে?' হরিবোল! বোল মধুর স্বরে। সব ভুলিয়া—এ নশ্বর বিশ্বের সব অতুল ঐশ্বর্য্যের লালসা বিসর্জ্জন দিয়া অন্তরে বাহিরে কেবলই তাঁহার চিন্তা কর নিশি দিন শুধু তাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তনে লিপ্ত থাক। তিনিই যে জীবের জীবন-সর্ব্বস্ব তিনি ভিন্ন আর কি আছে?—কাহার চিন্তা করিব? তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর, তাঁহার রূপ চিন্তা কর, তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হও—উন্মাদ হও। ভাই! সাধক রা প্রসাদের ন্যায় জোর করিয়া বল, "আ ভক্তি জোরে কিনতে পারি, নিরন্তর

জমিদারি।" দৃঢ়তার সহিত বল, 'হরি তুমি যে আমার প্রাণ! 'অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন।'

মনের এই প্রকার ব্যাকুলতা হইলে সাধক তাঁহার সাধনার ধনকে লাভ করিবার জন্য বিশ্বময় ছুটিয়া বেড়ায়! মন! "শোনরে হরি নামে হর, ব্রহ্মার ব্রহ্মজ্ঞান উদয়, নামে শিব সন্ন্যাসী শ্মশানবাসী হ'লেন মৃত্যুঞ্জয়। তাই বলি,মন! 'আমায় পাগল ক'রে দেরে,—আমায় পাগল করে দে, বিশ্বজোড়া হরিনামে আমায় পাগল ক'রে দে।" "আমার হরি বিনে প্রাণ বাঁচে না—পাই কোথা তারে?" বলিয়া বুলিয়া আমি যেন বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াই, আমি যেন দিবস-যামিনী কেবলই "হরি হরি বলি, নাচি বাহু তুলি, "তিনি আছেন বটে সর্ব্ব ঘটে" এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বভূতে তাঁহার দর্শন লাভে এবং তাঁহাতেই সর্ব্বভূত-দর্শনে কৃতার্থ হই; আমি যেন বিশ্বজোড়া বিশ্বেশ্বরের বিশাল বিশ্বরূপ দর্শনে আমার এ দুর্লভ মানব জন্ম সার্থক করিতে পারি। আমি যেন ভাবিতে পারি,—"সমস্ত জগতে এক মহাপ্রাণ, একই প্রাণী।" আমি যেন ভাবিতে পারি,—

"নারায়ণ! সেই মহাপ্রাণ
তোমার, আমার জগতময়।
পতঙ্গে, বিহঙ্গে, পাদপে, লতায়,
এক মহাপ্রাণ,—দ্বিতীয় নয়।"

(কুরুক্ষেত্র)

ভাই! ভক্তিভরেয়া ভরিপ্রাণ অবিরত বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" এই নাম চিন্তা, এই নাম ধ্যান এবং এই নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিনামের মহাভাবে বিভোর হও। নাম করিতে করিতে তোমার চিন্তা টুটিবে, পুত্রকলত্রাদির মোহ ছুটিবে, আমিত্বের বৃথা অভিমান দূর হইবে। তখন মনে হইবে—

"অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈশ্চ কৃষ্ণ চৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

শ্রীভগবানের নিমিত্ত চিত্তে এইরূপ ব্যাকুলতা জন্মিলে গৃহস্থ সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। তখন আর তিনি সংসারে আসক্ত ও পার্থিব ধন-রত্নাদির—স্ত্রী-পুত্রাদির চিন্তায়, আমিত্বের শূন্য-গর্ভ অভিমানে বিভোর থাকেন না। তখন তাঁহার মনে হয়, "আমরি; আজ দেখ গো চেয়ে, জগৎ জোড়া ছেলে-মেয়ে, বিশ্ব-নাথের বিশ্বে যে মোর সবাই আপন জন।" তখন তিনি হরিবোল বলিয়ে দু'বাহু তুলিয়া তাঁহার সাধনার ধনের অন্বেষণে বিশ্বময় ছুটিয়া বেড়ান; তখন এ বিশাল বিশ্ব তাঁহার আপন গৃহ এবং বিশ্ব-প্রাণী তাঁহার আপন জন বলিয়া বোধ হয়; তখন সংসারের ক্ষুদ্র কূপ-মণ্ডুক মুক্তির আরামে বিশ্ব-সাগরে ভাসিয়া বেড়ায়! তখন মনে হয়, 'আমি দাস, তিনি প্রভু, সাধনার ধন'—তখন মনে হয়, বিশ্বময় নারায়ণ! এস, সাধক! নারায়ণ পূজা করিবে ত হরিবোল বলিয়া ছুটিয়া এস, বিশ্বময় নারায়ণ!—বিশ্ব-প্রাণীর পূজা করিয়া তোমার নারায়ণ পূজা—হরিপূজা সার্থক কর। তুমি শ্রীভগবানের বিশ্ব-রূপ দর্শন করিতে চাহ কি?—একদিন

ভগবদ্ভক্ত মহাধীর মহাত্মা অর্জ্জুন এরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন; ঐ দেখ, সম্মুখে নারায়ণ, ঐ দেখ, বিশ্বময় বিশ্বেশ্বর কেমন বিচিত্র মূর্ত্তিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন! এস, আমরা এ মূর্ত্তির পূজা করিয়া—বিশ্বপ্রাণীর সেবা করিয়া আর হরিবোল বলিয়া 'জীবে দয়া নামে রুচি' প্রদর্শনে জন্ম সার্থক করি; এ সাধনায় সিদ্ধি হইলেই আমাদের হরিপূজা সম্পূর্ণ হইবে।

শ্রীভগবানের নামে নিত্য নব নব সুখের সঞ্চার, মনে নিত্য উৎসব জ্ঞান ও শোকের লাঘব হয়। তাঁহার পবিত্র নামের ন্যায় এমন চিরমধুময়—এমন অনন্ত শান্তিপূর্ণ স্বর্গীয় সুধা আর নাই। এই নামই জীবের সম্বল। এই নামে জীবের রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি যায়,—এই নামেই ভব-ব্যাধি দূরে পলায়। এই নামেই 'পালায় শমন রিপু-দমন নিবে পাপাগুন।' অতএব 'হরিনাম মহৌষধি পান কর মন নিরবধি, ভবব্যাধি রবে না।' এই হরিনাম মহামূল্য ভেষজ অপেক্ষাও মহৌষধি, ইহা সর্ব্বব্যাধিনাশক। স্বয়ং ধন্বন্তরি বৈদ্যনাথ বলিয়াছেন, "আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, অচ্যুতানন্দ গোবিন্দের নাম স্মরণরূপ মহৌষধে সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হয়।"

মাভৈঃ! জীব! আর ভয় নাই। প্রাণ ভরিয়া সদা হরিনাম কর—বাহু তুলিয়া প্রাণ খুলিয়া একবার বল, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! তবেই তোমার শমন-ভয় দূর হইবে।

মন! দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে 'জীবনের বেলাটুকু ফুরাইয়ে যায়।' সময় থাকিতে একবার শমনভয়হারী শ্রীমধুসূদন শ্রীহরির নাম জপ কর। প্রাণ ভরিয়া একবার হরিবোল! হরিবোল! বলিয়া দেহ মন পবিত্র কর; তোমার মানব জন্ম ধন্য হউক—সার্থক হউক।

মন! শৈবগণ শিবরূপে, বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মরূপে, বৌদ্ধগণ বুদ্ধরূপে, নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তা রূপে, জৈনগণ অর্হৎ পূজনীয়রূপে এবং মীমাংসকগণ কর্ম্মরূপে যাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন, যিনি ত্রিলোকের অধিপতি ও বাঞ্ছাকল্পতরুরূপে বিশ্বপূজ্য সেই শ্রীহরিকে একবার ডাক। একবার হরিবোল বলিয়া আকুল প্রাণে কাঁদ। ভাই! তুমি ত স্ত্রীর জন্য কত কাঁদিয়াছ, পুত্রের জন্য অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়াছ—ভূতলে অবলুণ্ঠিত হইয়াছ, ধনের জন্য, মানের জন্য, যশের জন্য ব্যাকুল প্রাণে নিয়ত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছ, হরিবোল বলিয়া এক দিন এক মুহূর্ত্ত কাঁদিয়াছ কি? তাঁহার ত্রৈলোক্যবাঞ্ছিত পদারবিন্দ লাভের নিমিত্ত একদিন দু'ফোঁটা পূত ভক্তি-অশ্রু তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়াছ কি? কর, মন! একবার হরি হরি বলিয়া ভক্তি-গঙ্গাজলে ধরা-বক্ষে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার নাম কর; একবার এ অনিত্য সংসারমায়া ছিন্ন করিয়া—হরি-প্রেমে আত্ম-হারা হইয়া তাঁহার জন্য ব্যাকুল প্রাণে কাঁদ,—সেই সর্ব্বসার শ্রীভগবানের রাতুলপদ ধ্যান কর।

ভাই! নিরাশ হইও না, পাপী-তাপী বলিয়া তাহার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে—

তাঁহার অভয় পদে আত্মসমর্পণ করিতে ভীত হইও না। ঐ দেখ, পতিতপাবন সোণার ঠাকুর—ঐ দেখ, গোরা "সর্ব্বত্যাগী প্রেমের মূর্ত্তি অমিল জগৎ জুড়ে।" তিনি পরম করুণাময়, তাঁহার দয়ার রাজ্যে কাহারও প্রবেশ নিষেধ নাই; পাপী, তাপী, ধনী, নির্ধন সকলেরই সে পদাশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি কাঙ্গালের ঠাকুর; তাঁহার দরবারে কাঙ্গালের জন্য অবারিত দ্বার। 'একবার নাচিয়ে গাহিয়ে দু'বাহু তুলিয়ে', হরিনাম করিয়া পাগল হও, একবার ভক্তি-অশ্রু প্রবাহে বক্ষ ভাসাইয়া—ধরা সিক্ত করিয়া তাঁহাকে ডাক, 'তৃণ হ'তে নীচ মোরা'—একবার আমিত্বের অহমিকা ত্যাগ করিয়া 'তৃণাদপি সুনীচেন' হইয়া মাতৃহারা শিশুর ন্যায় ধূলায় লুটাইয়া ব্যাকুল প্রাণে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া কাঁদ। ভাই! 'তরু সম হও, শুধু হরি কও', একবার তাঁহাকে প্রাণের ঠাকুর বলিয়া হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলে তিনি তোমার প্রাণের নিভৃত মন্দিরে উদিত না হইয়া—তোমাকে দর্শন দানে কৃতার্থ না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না। প্রাণের ব্যাকুলতাই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র সোপান। ভাই! একবার ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ডাক, নিশ্চয় তাঁহার পদারবিন্দ সেবনে ধন্য হইবে।

নাম কর, মন! নাম কর। 'হেলায় হেলায় হারাও না মন, হরি হরি বল বদনে, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! মন জোরে দিয়ে যা ছেড়ে নাম শমনে।' এ নাম করিয়া ধ্রুব ধ্রুবলোকে গিয়াছেন, এ নাম করিয়াই প্রহ্লাদ অনলে, জলে, হস্তীপদতলে প্রাণে বাঁচিয়া তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছিলেন, এ নাম করিয়াই 'যবন হরিদাস' 'ঠাকুর হরিদাস' হইয়াছিলেন, এ নামে ব্রজগোপীগণ মান-ভয়-লাজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, এ নামের মধুর বংশীধ্বনিতেই যমুনা উজান বহিয়াছিল, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে এ নাম জপ করেন, নারদ বীণা-যন্ত্রে এ নাম গান করিয়া নিয়ত ভ্রমণ করেন, এ নামের জন্য শিব সন্ন্যাসী—শ্মশানবাসী, এ নামের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পাগল! এ নামের মত নাম আর নাই, এ ধনের মত আর ধন নাই, এ ব্রতের মত আর ব্রত নাই, এ যজ্ঞের মত আর যজ্ঞ নাই, কলিতে নাম যজ্ঞই মহা যজ্ঞ; হরিনাম করার ন্যায় কলির জীবের মুক্তি লাভের এমন সহজ সরল পন্থা আর নাই। বল, ভাই! একবার হরি হরি বল; প্রাণ ভরিয়া একবার বল, 'হরে কৃষ্ণ—হরে রাম।'

হরিনামই জীবের ভবার্ণব পার হইবার একমাত্র উপায়। ঐ দেখ, ভাগবত-মুখে ভগবান বলিতেছেন,—

"কলেদোষ নিধেরাজন্ অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত বন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্রানং কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥"

ভাই! প্রাণ ভরিয়া সদা হরি হরি বল। হরিবোল! হরিবোল! বলিতে বলিতে

বিপুল পুলকে শরীরে রোমাঞ্চ হউক—হবে বিগলিত অশ্রুগঙ্গাজল ঝরিয়া পড়ুক।

ভক্তি-সাধনার নয়টি লক্ষণ। যথা :—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥"

যিনি ভক্তিমার্গের এই নব লক্ষণে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, এ বিশ্বে তিনিই ধন্য! তাঁহারই মনুষ্য জন্ম সার্থক।

হায়! প্রাণ ত কাঁদে না, মন ত গলে না, তাঁহার নামে ভাবাবেশে এ পাপ দেহে এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত রোমাঞ্চ হয় না! নববধূর প্রথম স্বামী-সম্ভাষণের মত এ প্রাণও পুলকানন্দে তেমন করিয়া শিহরিয়া উঠে না! প্রাণের ব্যাকুলতা ব্যতীত তাঁহাকে পাইবার আর উপায় নাই। তিনি পরম করুণানিলয়, এ নশ্বর সংসারের সবই নশ্বর—সবই অনিত্য; একমাত্র তিনিই পরম সত্য—তিনিই নিত্য, তিনিই অব্যয়, তিনিই অদ্ভুত। এ সকল কথার সবই বুঝি—সবই জানি। কিন্তু হায়! তবু ত আমার এ অবুঝ প্রাণ তাঁহার জন্য ব্যাকুল হয় না! তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত উন্মত্ত হয় না! তবে আর তাঁহাকে পাইবার উপায় কি? ব্যাকুল হও মন, ব্রজগোপীর ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হও। আত্মাভিমান—আত্মসুখ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার সংসার এ সব ভুলিয়া যাও, ভাব, তাঁহারই সব; আমি তাঁহার বিশাল সংসারের ক্ষুদ্র সেবক—তাঁহার চরণ সেবার দাস মাত্র। তিনি আমাকে যতটুকু সেবাব্রতের অধিকার দিয়াছেন,—এ ক্ষুদ্র সংসার পাতিয়া আমি ততটুকু করিতেছি মাত্র। ব্রজগোপীগণ বুঝিয়াছিলেন, মনে-প্রাণে ভাবিয়াছিলেন, 'পতি, পুত্র, পিতা নারায়ণ;' তাঁহারা আত্মসুখ ভুলিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সুখের চিন্তায় অস্থির থাকিতেন, তাই তাঁহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একবার এই গোপী ভাব প্রাণে জাগিলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। তাই বলি মন! একবার ব্রজগোপীর ন্যায় হরিবোল বলিয়ে পাগল হও; অবিরাম বল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল বলিতে বলিতে নাম-রসে ডুবিলে হৃদয় শান্ত হইবে,—আত্মা শীতল হইবে; তখন মনে হইবে,—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

দিন যায়। প্রতি মুহূর্ত্ত—প্রতি নিশ্বাসে তোমার দিন যাইতেছে, পরমায়ু-সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে; তাই বলি ভাই, সময় থাকিতে প্রাণ ভরিয়া একবার হরি হরি বল। আয়ু-সূর্য্য অস্তমিত হইলে, আর যে উদিত হইবে না—জীবনের গণা দিন কয়টি একবার ফুরাইয়া গেলে এ বিশাল বিশ্বের বিনিময়েও আর যে তাহা ফিরিয়া পাইবে না। এই অনিত্য জীবন এই ক্ষণস্থায়ী বিষয়-সম্পদ, এই নশ্বর স্ত্রী-পুত্র পরিজনও চিরস্থায়ী নহে,—অবিনশ্বর নহে যাহা মুহূর্ত্তে বিলয় প্রাপ্ত হইতে পারে, যাহার একটি অণু-পরমাণুও তোমার আমার ধরিয়া রাখিবার বা সঙ্গে লইয়া যাইবার শক্তি নাই তাহার জন্য এত আসক্তি কেন? মন একবার সেই শাশ্বত পদার্থের জন্য—একবার শ্রীভগবানের রাতুল পদ লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হও, একবার সেই নিত্য ধনে ধনী হইবার প্রয়াস পাও।

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ

সমালোচনা।

চারুদর্শন।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ কবিশেখর মহাশয়ের প্রণীত। মূল্য ১॥০, ভূক্তির আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের গ্রাহকের জন্য ৸০ আনা। বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসা-কার্য্যে সুনিপুণ, ইহাই আমরা জানিতাম, আজ তাঁহার "চারুদর্শন" উপন্যাস পাঠে তাঁহাকে একজন সুযোগ্য ঔপন্যাসিক না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার সরল লেখার ভঙ্গিতে চারুদর্শন বেশ সুন্দর হইয়াছে। উপন্যাস প্রিয় পাঠককে আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে উপন্যাসের আনন্দ ও জ্ঞানলাভ উভয়ই হইবে।

হরিদাস চরিতামৃতং।—উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত মূল্য ॥০ আনা। অতি সরল ও সহজ সংস্কৃত ভাষায় ভক্ত হরিদাসের জীবন চরিত্র, যিনি সংস্কৃত জানেন না তিনিও সহজে ইহা পাঠ করিয়া ভক্ত চরিত্র উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ব্রাহ্মণ্য প্রজানীতি।—শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর প্রণীত, মূল্য ৶০ আনা। যাহারা কাশী হইতে প্রকাশিত ত্রিশূল পত্রিকা গ্রহণ করেন। এ পুস্তক তাঁহারা আদর করিবেন কারণ রাজা বাহাদুরের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মমূলক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল একমাত্র ত্রিশূল পত্রেই প্রকাশ হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণ্য প্রজানীতিও ঐ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সহিত ঐক্য করিয়া ইহা লিখিত, এ লেখায় প্রাণ আছে, শক্তিশালী লেখকের এ পুস্তক হিন্দুমাত্রেরই পাঠ করা উচিত।

মহাভারত।—শ্রীযুক্ত গিরিধর বিদ্যারত্ন বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত আদিপর্ব্ব, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমরা পাইয়াছি। কাশীরাম দাস যে ভাবে মহাভারত পদ্যে লিখিয়া গিয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া ইহার অনুবাদ করিতেছেন। মূলের সহিত ঐক্য করিয়া বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে। হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেরই নিকট ইহার আদর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রতি খণ্ড ।০ আনা। ৫৩নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক মহাশয় সপরিবারে বেরি বেরি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এবং তাঁহার পুত্রবধূ মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় এবার পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল - ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

সুখী কে?
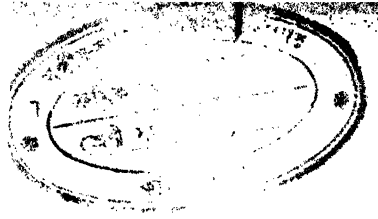
একদা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপর চারি ভ্রাতা ও পত্নী দ্রৌপদী সহ পথ ভ্রমণে অতিশয় ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কাম্য কাননে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেবকে জল আনিতে আদেশ করায় সহদেব কিয়দ্দূরে যাইয়া একটী সুরম্য জলাশয় দেখিতে পাইলেন। তথা হইতে বারি আনয়ন উদ্দেশ্যে যেই সেই জল সমীপে উপনীত হইলেন তখন সেই জলাশয়ের তীরে অবস্থিত নিকটবর্ত্তী কোনও বৃক্ষের শাখা হইতে খঞ্জন পাখীরূপী ধর্ম্ম তাহাকে কহিলেন, হে পাণ্ডু পুত্র, আমি কয়েকটী প্রশ্ন করিতেছি, তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া জল আহরণ কর; নচেৎ অমঙ্গল হইবে। সহদেব তাহার কথা অবহেলা করিয়া জলাহরণ উদ্দেশ্যে সেই উদক স্পর্শ করিলেন; বারিস্পর্শমাত্রে তিনি বিগতপ্রাণ হইয়া সেই বারিমধ্যে পতিত হইলেন। এদিকে যুধিষ্ঠির ক্রমেই তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন দেখিয়া জ্যেষ্ঠের আদেশ ক্রমে সহদেবের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা না করিয়াই “নকুল” জল আনিতে গমন করিলেন, সহদেবের ন্যায় নকুলও খঞ্জনরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তর না দিয়া বারি স্পর্শমাত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই-রূপে ক্রমে ক্রমে অর্জ্জুন, ভীম, ও দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেবের ন্যায় কালগ্রাসে পতিত হইলেন। চারি সহোদর ও পত্নীর এই প্রকার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জল অনুসন্ধানোদ্দেশ্যে গমন করিলে সেই “খঞ্জনরূপী ধর্ম্ম” সেই বৃক্ষশাখা হইতেই তাহাকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রশ্ন-বার্ত্তা পাইয়া তথায় উপবেশন করিলেন।

(প্রশ্ন) কিবা বার্ত্তা, কি কর্ত্তব্য, পথ বলি কারে,
সুখী হয় কোন জন এ বিশ্ব মাঝারে।

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ সমীপে ইহাও বলিয়া রাখি যে, এ সংসারে সুখী কে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং উল্লিখিত প্রশ্নটীর প্রথমোক্ত ১ম পংক্তির তিনটী বিষয় বর্জ্জন করিয়া আপাততঃ ৪র্থ প্রশ্নটী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু বর্ত্তমানে আবার অবস্থাও প্রায় তাদৃশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিহগরূপী ধর্ম্মের ৪র্থ প্রশ্নোত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই।

(উত্তর) অপ্রবাসে অঋণে যার দিন যায়,
দিবসান্তেও যদি সে শাক অন্ন খায়,

সংসার ভিতরে সুখী তখনি সেজন,
ইহা ভিন্ন সুখী কেহ নহে কোনজন।

এ জগতে যিনি অঋণী ও অপ্রবাসী, তিনিই প্রকৃত সুখী, তাহার ন্যায় সুখী এ সংসারে কেহ নাই সুতরাং আমি বহু ঋণী চির--প্রবাসী তাহা পূর্ব্বেই আভাসে জানাইয়াছি। কিন্তু যদিও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপ্রবাসী, ও অঋণীকেই সুখী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে পারি না। কারণ আমার মতে এ সংসারে মানবগণের অঋণী হওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য। মানবগণ জন্মগ্রহণ করা মাত্রেই অনেক বিষয়ে ঋণী হইতে বাধ্য, সেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ কয়জন? সুতরাং মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া যে ঋণ করা যায় ঐ সমস্ত ঋণের বিষয় চিন্তা করিলে এ জগতে কয়জন প্রকৃত সুখের অধিকারী।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যে সমস্ত ঋণের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা রেজেষ্ট্রারী কৃত রেহেণী বা খায়খদি কি বন্ধক বা হ্যাণ্ডনোটের ঋণ নহে, তিনি যে সমস্ত ঋণের কথা বলিয়া গিয়াছেন ঐ ঋণের জন্য আমাদের আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না, তমাদি দোষে বাধিত হয় না। অথবা আদায়ের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি বা সম্পত্তি নিলামের আশঙ্কা হয় না। এইরূপ আমাদের মনের ধারণা কিন্তু তাহা নহে, আশৈশব ঋণের দায় যিনি শোধ করিতে পারেন তিনিই এ জগতে প্রকৃত সুখী হইবেন। যাহারা ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহারাই সেই ঋণপাপে হয়তঃ রোগাক্রান্ত কিংবা সাংসারিক অশান্তিতে অথবা বহু ঋণগ্রস্ত হইয়া অথবা পরাধীনতার পরাকাষ্ঠা হইয়া এবং রাজদ্বারে উপনীত হইয়া প্রকাশ্য ভাবে সেই ঋণের অশেষ জ্বালা অনুভব করিতেছে।

অঋণ শব্দের অর্থ ঋণশূন্য, ঋ ধাতুর অর্থ গমন, কখন প্রাপ্ত অর্থাৎ গ্রহণ বুঝায়, বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়ার জন্য অর্থ গ্রহণ করিতে অথবা যে কোন একবার কেহ কাহারও নিকট উপকৃত হইলে, তাহাকেও ঋণ বলা যায় এবং অর্থদাতাকে অর্থ প্রত্যর্পণ ও উপকারীর প্রত্যুপকার করিলে তাহাকে অঋণ বলা যায়। অঋণ, শব্দ ইহা ব্যবহারিক শব্দার্থ, এই প্রকার ঋণ পরিশোধ করিলে তাহাকে অঋণ বলা যায় না। এবং এই প্রকার অঋণীকে প্রকৃত সুখী বলা যাইতে পারে না। পাঠক মহোদয়গণের অবগত হওয়ার জন্য কয়েকটী ঋণের পরিচয় প্রদান করিতেছি। যথা "শান্তি পর্ব্ব" হইতে উদ্ধৃত,—

"উৎসাদিতশ্চ বিষয়ঃ কাশীনাং রত্নসঞ্চয়ঃ,
এতস্য বীর্য্যদীপ্তস্য হতং পুত্রং শতং ময়া॥
অদ্যোদানীং বধ্যতস্য ভবিষ্যাম্যঋণো পিতুঃ॥

অর্থাৎ রাজা প্রতার্দ্দন একদিন ভৃগু-মুনিকে কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, রাজা বীতহব্যের পুত্রগণ কর্ত্তৃক আমাদিগের বংশ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, ও কাশী-রাজ্যের সঞ্চিত রত্ন সমূহ উৎসাদিত হইয়াছে, সেই বীর্য্যদীপ্ত ভূপতিপুত্রগণ আমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে তাহাকে নিহত করিতে পারিলেই আমি পিতার নিকট ঋণমুক্ত হইতে পারি। এস্থলে আরও

কয়েকটী ঋণের কথা বলিতেছি এই যে—

"ঋণং চতুষ্টয়ং পুংসাং পিত্রোর্ভার্য্যা সুতস্য চ।
পিতুর্গয়া পিণ্ড-দানাৎ মাতুশ্চৈব জলাশয়াৎ।
পুত্রোৎপত্ত্যাচ ভার্য্যায়া বিদ্যোৎপত্ত্যা সুতস্য চ॥"

অর্থাৎ পিতা, মাতা, ভার্য্যা ও পুত্র, এই চারি জনের নিকট মানবগণ ঋণী হইয়া থাকে। গয়াতে পিণ্ডদানে পিতার, জলাশয় প্রতিষ্ঠায় মাতার, পুত্রোৎপাদনে ভার্য্যার এবং বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা পুত্রের ঋণ পরিশোধ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইহাকেও অঋণী বলা যাইতে পারে। অপর বিদ্বান্ ধর্ম্মোত্তরে বলিয়া গিয়াছেন, যাহা এক সময়ে "নন্দিনী" নামক মাসিক পত্রিকায় "মানবের ঋণ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ হইয়াছিল যে,—

"ঋণৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা জায়ন্তে মানবা ভুবি।
পিতৃ দেবর্ষি মনুষ্যৈর্দেবতাভ্যশ্চ ধর্ম্মতঃ।
দেবা নাম ঋণো নিত্যং যজ্ঞৈর্ভবতি মানবঃ।
অন্নাবিত্তশ্চ পূজাভিরুপবাস ব্রতৈস্তথা॥
শ্রাদ্ধেন প্রজয়াচৈব পিতৃ নাম্নো ঋণো ভবেৎ।
ঋষিণাং ব্রহ্মচর্য্যেন শ্রুতেন তপসা তথা॥

অতঃপর "উদ্ভট" বলেন, মানবের ঋণ দ্বাদশ বিধ তাহা এই,—

দেবানাঞ্চ ঋষিনাঞ্চ পিতৃনাং মাতৃনাং তথা।
ভার্য্যা পুত্র গুরুণাঞ্চ অতিথিনাং তথৈব চ।
বৃক্ষানাঞ্চ গবাঞ্চৈব নৃপানাঞ্চ ভুব তথা।
ঋণঞ্চ দ্বাদশ-বিধং কথ্যতে বহুদর্শিনাং॥

অর্থাৎ, দেব, ঋষি, পিতৃ, মাতৃ, পুত্র, গুরু, অতিথি, বৃক্ষ, গরু, নৃপ, পৃথিবী ও ভার্য্যা এই বার জনের নিকট মানবগণ ঋণী; অতএব এই সমস্ত ঋণও মানবগণের পরিশোধ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত। উদ্ভট্ আরও বলিয়াছেন সর্ব্বদা শস্য উৎপাদন এবং শরীর পোষণ নিমিত্ত দেবগণের, যাগ, যজ্ঞ, হোম, দেবগণের সন্তোষ বিধান, ও ঊর্দ্ধ পূত বর্দ্ধন, ঋষিগণের শরীর পালন, ভরণপোষণ ও সুবিদ্যা প্রদানের জন্য পিতা, সর্ব্বদা বহুযত্নে ও বিবিধ কষ্টে ভরণপোষণ ও প্রতিপালনের নিমিত্ত মাতার, সর্ব্বদা সদুপদেশ দান এবং বহুযত্নে অধ্যাপনার দরুণ গুরুর, এবং সকলের উপকারের নিমিত্ত ধর্ম্মোপার্জ্জন ও তীর্থ পর্য্যটন হেতু অতিথির নিকট মানবগণ ঋণী হইয়া থাকে।

বৃক্ষ সকল নিজে স্বার্থশূন্য হইয়া পরের উপকারার্থ মানবগণকে ছায়া ও ফল প্রদান করিয়া জীবন ধারণ করে, এবং মরিলেও নিজের দেহ দগ্ধ করিয়া মানবগণের রন্ধনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। এই জন্য মানবগণ বৃক্ষের নিকট ঋণী হয়। রোপণ, জল-সেচন ও বেড়া দিয়া উত্তমরূপে বহু যত্নে বৃক্ষ পালন করিলে ঋণশোধ হইয়া থাকে।

গো-সকল বন্য দন্ত ভোজন করিয়া আপনার সন্তানগণকে দুগ্ধ না দিয়া মানবগণকে দুগ্ধ দান করত তাহাদের জীবন রক্ষা করে, উহারাও স্বার্থশূন্য হইয়া পরের উপকার করে বলিয়া গরুর নিকট মানবগণ ঋণী হইয়া থাকে। উহাদিগকে ভক্তি ও যত্নের সহিত উত্তমরূপে খাদ্য দ্রব্য দান করিয়া প্রতিপালন করিলে মানবগণ উহাদের নিকট ঋণমুক্ত হয়।

নৃপতিগণ চোর, দস্যু, এবং বিবিধ উৎপাত হইতে রক্ষা করেন বলিয়া রাজার নিকট মানব প্রজাগণ ঋণী হইয়া থাকে। উপযুক্ত কর দান করিলেই সে ঋণ শোধ হয়।

পৃথিবী খনন, দাহন, ইত্যাদি মানবগণের অশেষবিধ অত্যাচার সহ্য করেন বলিয়া পৃথিবীর নিকট মানবগণ ঋণী হয় সত্য, কিন্তু পুণ্য, ধর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই তাঁহার নিকট সকলে অঋণী হইয়া থাকে।

যজ্ঞ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেবগণের, তপস্যা ও গুরুভক্তি দ্বারা ঋষিগণের, গয়াতে পিণ্ডদান দ্বারায় পিতৃপুরুষগণের, জলাশয় প্রতিষ্ঠার দ্বারায় মাতৃগণের, পুত্রোৎপাদন দ্বারায় ভার্য্যা-গণের, বিদ্যা প্রদান দ্বারায় পুত্রগণের, পূজা ও পরিতুষ্টি দ্বারায় গুরুগণের, এবং ভক্তি সহকারে সেবার দ্বারায় অতিথিগণের নিকট মানব অঋণী হইয়া থাকে।

এতৎ ব্যতীত অনেক ধর্ম্মগ্রন্থেই মানবের ঋণ সম্বন্ধে অনেক প্রকার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, বিরাট পর্ব্বের ২২ অধ্যায়ে ভীম বলিয়াছেন,—

"অদ্যাহম্ ঋণো ভুত্বা ভ্রাতৃ-ভার্য্যাপহারিনম্।
শান্তিং লব্ধাহস্মি পরমা হত্বা সৌরিন্ধ্রী কণ্টকম্॥"

অর্থাৎ ভীম কহিয়াছিলেন আজ ভ্রাতৃ-ভার্য্যাপহারী সৌরিন্ধ্রী-কণ্টক কীচককে বিনষ্ট করিয়া সৌরিন্ধ্রীর নিকট অঋণী হইয়া আমি পরম শান্তি লাভ করিয়াছি।

সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণ! আমাদের এই সকল ঋণ শোধ করা অতিশয় কষ্টকর, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, তথাপি প্রত্যেককেই যথাসাধ্য উল্লিখিত ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। নচেৎ মানবগণ ইহ-কালের সুখ-শান্তি—অনুভব করিতে পারি-বেন না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী।

যশোদা।

মুখবন্ধ।

মানুষ "মা"তে যেমন মাতৃভাবের স্ফুর্ত্তি, তেমন আর অন্য কোন জীবে নাই। কচি কচি মুখে অর্দ্ধস্ফুট মা মা ডাক, তাহাতে যেমন মায়ের হৃদয়ে বাৎসল্য রসের সঞ্চার হয়, তেমন আর অন্য কোন জগতে অন্য কোন জীবে হয় কি না সন্দেহ। এই অপূর্ব্ব রসানুভূতি দেবতার ভাগ্যেও দুর্ল্লভ। নরদেহে ইহার সম্যক্ সম্ভাবনা। নরদেহ সমস্ত রসের আধার। জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ ও বিরহ মিলনের ক্ষেত্র এই নরদেহ, এই দেহেই শান্ত দাস্য সৌখ্য বাৎসল্য মধুর প্রভৃতি রসের অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি।

বসুপতি দ্রোণ ও তৎপত্নী ধরা নরদেহ আশ্রয় করিয়া হরিভজনের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। এই দ্রোণই ব্রজেশ্বর নন্দ, ধরা তৎপত্নী যশোদা। যশোদাই বাৎসল্য-রসের পূর্ণাভিব্যক্তি।

জগতে যত মা হইয়া গিয়াছে, আর যত মা হইয়া আছে সকল মায়ের সমস্ত বাৎসল্য রস একাধারে একত্র করিলেও যশোদা-ভাবের এক বিন্দুর সমান হয় না। যশোদার সহচরী বা ব্রজগোপী সকলেই কৃষ্ণগতপ্রাণা যশোদার অংশ, যশোদা-ভাবে ভাবিতা।

শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য দিয়ে গোপীর যে সুখ, যে আনন্দ, স্বীয় জঠর জাত সন্তানকে স্তন্য দিয়ে তাঁহারা সে সুখ, সে আনন্দ পাইতেন না। জগতের আদি হইতে কত যজ্ঞ, কত ঘৃতাহুতি—তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, আর ব্রজ-গোপীর এবং ব্রজের গাভীর পীযুষ ভরা বুক,—আর এক বাঁটি দুধ টেনেই গোপাল মাতাল,—সেই দুধে যে কত মাদকতা ছিল তাহা কে বলিবে! জগৎকে যিনি মাতাল করে রেখে-ছেন, আর জগৎ যাকে ধর্ত্তে ছুঁতে পায় না—মাতাল করবে ত দূরের কথা—সেই গোয়া-লিনীর বুকের দুধে, গোকুলের সেই গাভীর বাঁটে যে কত মধুরতা ব্রহ্মাও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিলেন না।

শ্রুতি যাহার আভাস মাত্রে অমৃতময়ী হইয়া উঠিয়াছেন, গোকুলে তাহারই পূর্ণাভিব্যক্তি; ব্রহ্মা তাহারই মহিমা কীর্ত্তনে বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন—

> তদ্ ভূরি ভাগ্যং ইহ জন্ম কিমপাটব্যাং
> যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি রজোঽভিষেকং।
> যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ
> স্তদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥

ব্রহ্মার মোহ ভঙ্গ হইল। যে গোকুল সামান্য আভীর পল্লী বলিয়া মনে হইতেছিল, সেই গোকুল আজ তাঁহার চিত্তে গোলোক বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। যাঁহার পদরজঃ অদ্যাপিও শ্রুতি অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন নাই সেই শ্রীকৃষ্ণে, যাহারা কোমল প্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রজবাসীর পদরজ স্পর্শ লোভে ব্রহ্মা গোকুলে জন্ম প্রার্থনা করিতেছেন।

হরিভক্তের পদরজের কি অপূর্ব্ব মহিমা! যাহার জন্য চতুর্মুখ লালায়িত, বৈষ্ণবের সেই পদধূলি সংসার তপ্ত এই জীবের তাপিত প্রাণ শীতল করুক। শ্রুতি যাঁহাকে সেই সেই সত্য তৎসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ক্লান্ত, আর ব্রজের গোপী যাঁহাকে "এই সেই" আমাদের নন্দদুলাল বলিয়া কোলে তুলিয়া স্তন্য পিয়া-ইয়া আনন্দে বিহ্বল, সেই গোপীর কৃপা কৃষ্ণবিমুখ এই হতভাগ্য জীবের প্রতি বর্ষিত হউক।

'শ্যাম অনুরাগে' যাহারা তিল তুলসী দিয়া তনু বিক্রয় করিয়াছিল, সেই গোপীর কৃপা ব্যতিরেকে, ব্রজলীলা বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। তাই আজ চতুর্মুখ আজ গোপীর—শুধু গোপীর কেন সমস্ত ব্রজবাসীর ভাগ্য বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের কৃপাভিক্ষা করিতেছেন।

> "অহোভাগ্যং অহোভাগ্যং
> নন্দ গোপ ব্রজৌকসাং।
> যন্মিত্রং পরমানন্দং
> পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং॥"

অহো, এই ব্রজবাসিগণের কি ভাগ্য! পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন যাহাদের মিত্র, অহো, তাহাদিগের কি ভাগ্য! দেবতারও এতাদৃশ ভাগ্যোদয় কখনও হয় নাই। অপরাধী ও বিচারকে যে সম্বন্ধ, নির্দ্দেশপ্রাপ্ত ভৃত্য স্বীয় প্রভুকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক যেন সেই ভাবে স্তুতি করিতেছেন।

ব্রহ্মা ঐ শ্রীমুখের একটী কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল, তাই এত স্তব-স্তুতি,—তথাপি সেই গোপ-বালক একটীও কথা কহিতেছেন না,

শুনিয়া শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন মাত্র; যে মুখ হইতে স্তুতি নিঃসৃত হইয়াছে, সেই মুখে কৃষ্ণ-স্তুতি—কত জ্ঞানগর্ভ কথা যুক্তি যোগ প্রভৃতি কত বিচার—শ্রীকৃষ্ণ যেন শুনিয়াও শুনিতেছেন না—ব্রহ্মা যেন কি একটী প্রকাণ্ড ভুল করিয়া যাইতেছেন—যাহাতে তাঁহার প্রীতি জন্মিবে, ব্রহ্মার বুদ্ধি সে দিকে আদৌ যাইতেছে না—ব্রহ্মা বলিতে বলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন, হঠাৎ যেন কাহার প্রেরণায় ব্রহ্মার বুদ্ধি সেই দিকেধাবিত হইল—

অথাপি তেদেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদলেশানু গৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মাহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

ব্রহ্মা নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন, যুক্তি তর্ক বিচার, যোগ প্রভৃতি কোন সাধনেই তাঁহাকে চিরকাল খুঁজিলেও পাওয়া যায় না। শুধু শ্রীপাদপদ্মের প্রসাদমাত্র ভরসা, তবে যদি, প্রভো, তোমাকে জানিতে পারা যায়। গোপীভাগ্য বর্ণন করিয়া ব্রহ্মা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। ভক্তের গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণে ভগবানের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ।

ভ্রাতৃ-মিলন।

(ছোট গল্প)

গোপাল চীৎকার করিয়া বলিল—"কি ছোট বৌয়ের এত বড় মুখ। সে বলে—'দাদা দিবে ভিক্ষা, তবে প্রাণ রক্ষা!' কেন—আমি কি কিছুই করি নাই?"

মনোরমা স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল—"নও থাম—বলুক"—

"বলবে? কেন—বল্‌বার তার কি অধিকার আছে? আমি ত তার বাপ-ভাইয়ের রোজগারের টাকা খাচ্ছি না—খেলে আমার ভাইয়ের রোজগারের টাকাই খাচ্ছি। সে কি জানে না প্রমথ আমার কেমন ভাই?"

"সে কি ক'রে জান্‌বে যে, তুমি ঠাকুর-পোকে কত কষ্ট ক'রে মানুষ ক'রে তুলেছ?"

"জানে না?—আমি তাকে ভাল ক'রে জানিয়ে দিব। সেদিন আমি তাকে বিয়ে দিয়ে ঘরে আন্‌লাম, সে কি-না আজ আমায় পৃথক হ'য়ে যেতে বলে। আমার ভাই আজ বাড়ীতে নাই কি-না, তাই কর্ত্তা হ'য়েছে।"

"তোমার পায়ে পড়ি চুপ কর—হয়ত এখনি ছোট বৌয়ের ভাইয়েরা আসিয়া হাঙ্গামা বাধাইবে।"

"আমি কি তাদের ভয় করি? আসুক না—আমার ভাইয়ের টাকায় পরের মেয়ে, পরের ছেলেরা নবাবী কর্‌ছে—আর আমি ভাই হ'য়ে বুঝি পৃথক থাব? আজ নবাবপুত্র দিগকে বাড়ী-ছাড়া ক'রে দিব।"

সহসা ছোট বধূর ভ্রাতারা আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া তুলিল। সে বিরাট কোলাহল শুনিয়া গ্রামবাসিগণ রায়-বাড়ীতে সমবেত হইল। শেষে বহু বাক-বিতণ্ডার পর, দুই একজন সহৃদয় বৃদ্ধ মাতব্বরের মধ্যস্থতায় স্থির হইল যে, প্রমথ না আসা পর্য্যন্ত গোপাল

একটী শয়নঘর ও একটী রন্ধনঘর লইয়া পৃথকভাবে নিজে উপার্জ্জন করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। গোপাল এই ব্যবস্থা শুনিয়া একবারে দমিয়া গেল;—অনেকক্ষণ পাষাণ মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। অনন্তর বস্ত্রপান্তে চক্ষু ঢাকিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হায়, স্বার্থপরায়ণা কুটীলা রমণী! তোমরাই সাজান সোণার সংসার ছারখার করিয়া ফেল,—সুখের শান্তি-নিকেতনে অশান্তি-অনল জ্বালাইয়া দাও। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

এ বিশ্বসংসার মাঝে কুটীলা রমণী
সুখের কণ্টক—শুধু দুঃখের তরণী।

(২)

গোপালচন্দ্রেরা দুই ভাই। গোপাল জ্যেষ্ঠ, প্রমথ কনিষ্ঠ। তাহাদের পিতা-মাতা যখন মানব-লীলা সম্বরণ করেন, তখন প্রমথ নিতান্ত বালক। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর, অসীম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া গোপালচন্দ্র নাবালক প্রমথকে লেখাপড়া শিখাইয়া "মানুষ" করিয়া তুলে। এবং সুপারিসের জোরে উচ্চ-বেতনে উচ্চ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেয়;—যৌবনোদ্গমে তাহার বিবাহ দেয়। এইজন্য প্রমথ পূজনীয় দাদাকে ও মাতৃসমা বউ দিদিকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত।

প্রমথের উপার্জ্জিত অর্থে গ্রামের জীর্ণপ্রায় বাড়ীটী উচ্চ সৌধে পরিণত হইল। রায়দের অপ্রতুল সংসার প্রতুল হইল। রায়-পরিবারের সুখ-সম্পদের কথা শুনিয়া প্রমথের কুটুম্ববর্গ রায়-বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোপাল-চন্দ্র তাহাদিগকে সাদরে গৃহে স্থানদান করিল।—হায়, তখন কে জানিত, এই আশ্রয়-প্রার্থী কুটুম্বদল কালে কর্ত্তা হইয়া বসিবে?

প্রমথের স্ত্রী—শরৎশশীকে তাহার ভ্রাতারা আসিয়া বলিতে লাগিল—"তুই ভারি বোকা—এমন ক'রে টাকা গুলো পরের পিছনে খরচ করলে, শেষে তোর উপায় হ'বে কি? জানিস্ তোর ভাসুরটী বড় সোজা লোক ন'ন;—তোদের বোকা পেয়ে বেশ দু পয়সা ক'রে নিচ্ছেন।"

শরৎশশী প্রথমে ভ্রাতাদের কুৎসিত পরামর্শে কান দিত না। কিন্তু যখন তাহার ভ্রাতারা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, এই অতুল ঐশ্বর্য্য—ঘরবাড়ী সমস্তই তাহার স্বামীর উপার্জ্জনেই হইয়াছে—গোপালের কিছুই নহে, তখন তাহার মনে স্বার্থ সাধনের কু-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সে স্বামীর স্বোপার্জ্জিত সমস্ত জানিয়া সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিতে ইচ্ছুক হইল।—তাই একদিন ভাসুরকে শুনাইয়া কোন প্রতিবেশিনীকে বলিল—"উনির ইচ্ছা নাই যে, একত্র থাকেন, কিন্তু আমার ভাসুরটী নাছোড়-বান্দা। ঘরে ব'সে ব'সে থাকবেন, আর দু'বেলা ছেলেপিলে নিয়ে মজা ক'রে খাবেন।—নিজের রোজগার করবার ক্ষমতা নাই কিনা—তাই ভাইয়ের গায়ে পা মিশা'য়ে থাকেন। শুন নাই দিদি! কথায় যে বলে,—

'দাদা দিবে ভিক্ষা, তবে প্রাণ রক্ষা'

আমার ভাসুরটী সেই রকম।"

এই কথা শুনিয়া গোপালচন্দ্র খানিকক্ষণ

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর চীৎকার করিয়া সমস্ত বাড়ী মাথায় তুলিল। তারপর যাহা ঘটিয়াছে পাঠকপাঠিকাগণ অবগত হইয়াছেন।

(৩)

দিন যায়—থাকে না। সময় কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। দীনেরও দিন যায়, ধনীরও দিন যায়! তবে কাহারও আনন্দে, কাহারও নিরানন্দে, কাহারও শান্তিতে, কাহারও অশান্তিতে, কাহারও সুখে, কাহার দুঃখে।

গোপালচন্দ্রের দুঃখ-কষ্টেই দিন যাইতে লাগিল—পৃথক হইবার পর, দুইবেলা কোন রকমে শাক-ভাত খাইয়া, কাপড় জামা সেলাই করিয়া পরিয়া, ছেলেপিলে লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। কিন্তু আর চলে না—ইউরোপের দারুণ মহাসমরের জন্য জিনিস-পত্র সমস্তই দুর্মূল্য হইয়া গিয়াছে। এ দুঃসময়ে সংসার পরিচালন করা মহা দায়। ধনীর গৃহেও নিত্য অভাব—দারিদ্রের গৃহে হাহাকার না উঠিবে কেন? গোপালচন্দ্রের গৃহে হাহাকার উঠিয়াছে। গৃহে সম্বল কিছুই নাই—তাহাতে সকলেরই কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে; অথচ কিনিবার উপায় নাই। গোপাল যাহা দৈনিক উপার্জ্জন করে, তাহাতে চারিটী প্রাণীর এক বেলার পেটের ভাত হয় না—কাপড়ের দাম কোথায় পাইবে আর?

সেদিন গোপালের চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা স্নেহলতা মাকে কাঁদিয়া বলিল—"মা! কাপড় যে আর পর্‌তে পার্‌ছি না;—কাপড় খানায় জাই-পুটে সেলাই ক'রেছি—দু' তিন খানে তালিও দিয়েছি—আর চলে না।"

মনোরমা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ক্ষুদের কোঁড়নগুলি বাছিতেছিল; কন্যার কথার কোন উত্তর দিল না।

গোপালের অষ্টম বর্ষীয় পুত্র চারুচন্দ্র আসিয়া জননীকে বলিল—"মা! বড় ক্ষিদে হ'য়েছে—চাট্টি খেতে দাও! উঃ! পেট যে জ্বলে যাচ্ছে!"

পুত্রের কথা শুনিয়া স্নেহময়ী জননীর চক্ষু-দ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল। সে অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

চারু বলিল—"আর যে সহ্য কর্‌তে পারি না, মা! বড় ক্ষিদে পেয়েছে মা!—বড় ক্ষিদে—"

জননী—"বাবা! তোরে কি খেতে দিব?—চাট্টি ক্ষুদের কোঁড়ন ব্যতীত, ঘরে ত আর কিছুই নাই যাদু! যে চাঁদমুখে ক্ষীর-সর-ননী তুলে দিয়েছি, সেই মুখে আজ কোন্ প্রাণে ক্ষুদের কোঁড়ন তুলে দিব? ভগবান! শুনেছি তুমি ক্ষুধায় সকল প্রাণীকে আহার, পিপাসায় জল দাও;—দাও প্রভু! আজ আমার বুকের মাণিক যাদুধনের মুখে অমৃত-ধারা ঢেলে দাও! আর যে যাদুর অনশন-যাতনা সহ্য কর্‌তে পারি না!—হে মহান্, হে দয়াল, হে বিপত্তারণ, হে ভূতভাবন ভগবান! আমার যাদুর দুর্দ্দশা দূর কর—ক্ষুধায় অন্ন মিলাইয়া দাও।" বলিতে বলিতে স্নেহময়ী জননীর দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইল। হায় রে মায়ের প্রাণ!

অদূরে গোপালচন্দ্র দাঁড়াইয়া এই শোচনীয়

দৃশ্য অবলোকন করিতেছিল।—সে আর স্থির থাকিতে পারিল না—এমন হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া কোন্ পিতা স্থির থাকিতে পারে? গোপাল দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর চক্ষুজল মুছিয়া ডাকিল—"রমা!"

মনোরমা আঁচলে চক্ষু মুছিয়া বলিল—"কি?"

গোপাল—"একবার ছোট-বৌয়ের কাছে গিয়ে একসের চা'ল ধার ক'রে আন।"

মনোরমা শরৎশশীর কাছে গিয়া একসের চাউলের জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করিল; কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। গর্ব্বিতা শরৎশশী এই সুযোগে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিল।...তার পর—তার পর? দরিদ্র গোপাল সেদিন পুত্র-কন্যাদি সহ অনশনে রহিল।

(৪)

আশ্বিন মাস। শরতের শ্যামল সৌন্দর্য্যে বসুন্ধরা এক অভিনব ভাবে উদ্ভাসিতা! তৃণ-লতায়, বৃক্ষের পাতায় সর্ব্বত্রই আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। শান্ত-প্রবাহিনী তটিনী আনন্দের লহর তুলিয়া, কুলকুল তানে আনন্দ-সঙ্গীত গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে! সগৌরবে প্রাণারাম সৌরভ ছড়াইয়া কাননে কাননে কুসুম-কলি ফুটিয়া উঠিতেছে;—সেই ফুটন্ত ফুলের মধুর সৌরভ বুকে করিয়া শরতের শীতল সমীর ঘরে ঘরে আনন্দ বিলাইতেছে!

সম্বৎসর পরে আনন্দময়ী মা আসিতেছেন, তাই নিরানন্দ বঙ্গ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ে অতুল আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রবাসীরা স্ত্রী-পুত্র পরিজনের বদন-কমল দর্শন লালসায় বাটী আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। সকলেই জলস্রোতের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া স্ত্রী-পুত্রের জন্য সাধের নূতন-নূতন জিনিষ খরিদ করিয়া মন-আশা পূর্ণ করিতেছে।

আজ শুভ-ষষ্ঠি। সন্ধ্যার পর মালতীপুর ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্মের বাহিরে মুটের দলের মধ্যে গোপালচন্দ্রকে দেখা গেল। ৭টার ট্রেণ আসিতে আর বেশী বিলম্ব নাই; প্লাটফর্ম্ম লোকে লোকারণ্য—গোপাল চীৎকার করিয়া যাত্রীদিগকে বলিতেছে—"বাবু, কুলী চাই, কুলী?"

যথাসময়ে ট্রেন আসিয়া ষ্টেসনে থামিল। গোপাল একটী গাড়ীর কাছে গিয়া বলিল—"বাবু! কুলী চাই?"

"চাই—এস।"—বলিয়া একটী সুবেশধারী বাবু কুলীর পানে চাহিল।—সহসা তাহার বোধ হইল, কে যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিঁধিয়া দিল।—সে লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া কুলীর পদযুগল ধরিয়া বলিল—"দাদা! তোমার এ-দশা কে করল?"

"কে প্রমথ? ভাই—ভাইরে—"বলিতে বলিতে গোপাল ডাউ ডাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রমথ পূজনীয় দাদাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। সে ভ্রাতৃ-স্নেহের বিমল অশ্রুধারা হিমালয়ের পাষাণ-স্তূপ হইতে প্রবাহিত

মন্দাকিনীর ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। আহা! ভ্রাতৃ-প্রেমের কি মধুর ভাব!

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

স্মৃতি ও বিস্মৃতি।

রোষ কষায়িত নেত্রে কহে স্মৃতি বিস্মৃতিরে
ডাকি।
"অসম্পূর্ণ কর্ম্ম মোর, তোর তরে ওরে
কালোমুখী।"
"বিস্মৃতি" কহিল ধীরে "বৃথা কেন এ রোষ
সুন্দরি!
সুখদের ভীতি হ'য়ে ফুটাতে তোমা আছো
প্রাণ ধরি॥

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ নিয়োগী।

স্মৃতি স্তম্ভ।

চা বাগানের পাশে আমাদের বাড়ী। প্রত্যহ দুপ্রহরে আহারান্তে যখন বিশ্রামের জন্য ঘরের সম্মুখের বারাণ্ডায় আমরা বসিতাম, তখন দেখিতাম সেখানে শত শত কুলি পিঠে ঝুড়ি বাঁধিয়া চায়ের পাতা তুলিতেছে. আমি সেখানে নূতন গিয়াছিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাদের সহিত আমার বেশ সদ্ভাব হইয়া গেল। এই সব সরলপ্রাণ, প্রফুল্লচিত্ত পাহাড়ীরা চায়ের পাতা তুলিতে তুলিতে তাদের সুখ দুঃখের কাহিনী আমাকে বলিত।

সে দিন তখনো বাহিরে যাই যাই, অদ্য বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত আছি, এমন সময় নিকটেই একটী সকরুণ মর্ম্মভেদী স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বাঁশীর সুরে করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে।

অন্তরের সব দুঃখ, ব্যর্থ আশার নিদারুণ বেদনা সে সুরে উথলিয়া উঠিতেছিল। সে কাতর ধ্বনি আমার হৃদয়ের অন্তস্তরে আঘাত করিল। অন্তর ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘ-শ্বাস বাহির হইল. কাহার প্রাণের অব্যক্ত যাতনা প্রকাশের এ আকুল প্রয়াস? কোন্ নিধি হারাইয়া কে এমন করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে? জীবনের কত খানি শূন্য হইয়াছে—তাই এই বেদনা? সে হতভাগাকে দেখিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় আসিলাম। ততক্ষণে বাঁশী থামিয়া গিয়াছে। দেখি এক নবাগতকে ঘিরিয়া কুলিরা সব কোলাহল করিতেছে। তাহার বিষণ্ণ মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষু, রুক্ষ কেশ হাতে একটী কাঠের বাঁশী। কুলিরা নিতান্ত উৎসুক চিত্তে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তাকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে দুই একটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া দ্রুতপদে দল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আবার বিষাদ মাখান স্বরলহরী তুলিয়া বাঁশী বাজাইয়া সে চলিয়া গেল। পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে সে আকুল স্বর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিল, ক্রমে তাহা দূরে মিলাইয়া গেল, সম্মুখে প্রসারিত গিরি উপত্যকায় ক্ষণেকের জন্য যে শোকপূর্ণ গীতি শুনিলাম, তাহা বহুক্ষণ ধরিয়া আমার কাণে বাজিতে লাগিল।

পর দিন কুলিরা কাজে আসিলে আমি

তাদের সর্দারকে এই নবাগতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ত প্রথমে কিছুতেই বলিবে না অবশেষে আমার আগ্রহ দেখিয়া বলিল, "বাবু! আমাদের মত সামান্য লোকের জীবনের কথা শুনে আপনারা কি করিবেন? এ লোক আগে এই চা বাগানেই কাজ করত, আমাদের সঙ্গে এক বস্তিতেই থাকত। মদন বয়সে আমার ঢের ছোট। আমি বাল্যকাল হইতেই তাকে ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসি। সে আমাদের বাড়ীর পাশে থাকত। সে তার মা বাপের বড় আদরের একমাত্র পুত্র ছিল। পিতা মাতা তারই উপর সব আশা ভরসা রেখেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সের সক্ষম পুত্রের উপর নির্ভর ক'রে তাঁরা সুখের দিনের আশায় জীবন ধারণ করতেন। মদনের মত বলিষ্ঠ সাহসী সচ্চরিত্র যুবক তখন আমাদের বস্তিতে আর কেহ ছিল না, সে চা বাগানের কাজ ক'রে অল্প টাকাই উপায় করত, তবে এমন যুবক ভাবষ্যতে যে নিশ্চয়ই আপনার উন্নতি করবে সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু একটী ঘটনায় এমন আশাপূর্ণ জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল।

মদনের বাড়ীর পাশেই মতিয়া তার পিতা-মাতা, ভাই বোনদের নিয়া থাকত। শৈশব কাল হইতেই মদনের সহিত মতিয়ার খুব ভাব ছিল। মতিয়াও চা বাগানে চায়ের পাতা তুলত। শৈশবে একত্র খেলা-ধুলা, একত্র আহার-বিহার, একত্র কাজ কর্ম্মের মধ্য দিয়া যখন তারা বড় হয়ে উঠল, তখন মদন একদিন মতিয়ার পিতাকে গিয়া জানাল যে সে মতিয়াকে বিবাহ করতে চায়। মতিয়ার পিতা প্রথমে এক রকম সম্মত হলেও শেষে একজন ধনীকে পেয়ে তার সঙ্গে মতিয়ার বিবাহ দিলেন। দরিদ্র মদন হতাশ নয়নে শুধু চেয়ে রহিল,— কোন কথা বলিল না। মতিয়া শ্বশুর বাড়ী চলে গেলে মদন নিয়মমত কাজ করে যেত; কিন্তু তার বিবর্ণ মুখ, ছল ছল চোখ দেখে আমি বুঝেছিলাম যে তার কোথায় লেগেছে। দুই বৎসর পর একদিন মতিয়া পীড়িত হয়ে স্বামীর ঘর হ'তে পিতার ঘরে ফিরে এল। তখন দেখলাম মদনের ব্যাকুলতা, তার ভাবনা, তার যাতনা। এক বৎসর ধরে সকল কাজ ভুলে সে মতিয়ার সেবা করিল। কোথা দিয়ে দিন রাত্রি কেটে যেত, আবার দিন আসত তা সে কিছুই জানত না। কিন্তু মতিয়া বাঁচল না, এই পাপ তাপপূর্ণ পৃথিবীর বোঝা পায়ে ঠেলে সে কোথায় চলে গেল। অল্প বয়সে তার সব লীলা শেষ হইয়া গেল।

সে চলে গেল কিন্তু জীবন্মৃত করে রেখে গেল আর এক জনকে। মতিয়ার স্বামী আবার বিবাহ করে সংসার করেছে। কিন্তু মতিয়ার মৃত্যুর পর হইতেই মদন গৃহত্যাগী উদাসীন। যতদিন তার পিতামাতা বেঁচেছিলেন ততদিন সে উপার্জ্জন করে তাঁদের খাইয়েছে। তার পর হ'তে সে এই বাঁশী বাজিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কেহ জানে না সে কোথা থাকে, কি করে খায়। ঐ যে স্মৃতি স্তম্ভ দেখ ছেন উহা মতিয়ার সমাধিস্তম্ভ। মাঝে মাঝে একবার করে মদন এই স্তম্ভ দেখিতে আসে, এই বলিয়া সর্দারটি চুপ করিল।

তার কয়েক দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় নির্জ্জন গিরি উপত্যকা দিয়া গৃহে ফিরিতে-ছিলাম। সম্মুখে বিশাল অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী তখন তাহাতে মেঘের উপর মেঘ জমিয়াছে। পর্ব্বতগাত্র হইতে ক্ষুদ্র ঝরণা রজত ধারার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, নিস্তব্ধ উপত্যকা মুখরিত করিয়া দু' একটী পাখী মধুর স্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। হঠাৎ চাহিয়া দেখি আমি মতিয়ার স্মৃতি সমাধির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। ভাল করিয়া বাহিরে দেখিলাম, একটী লোক কাঠের বাঁশী হাতে "স্মৃতিস্তম্ভ" বুকে রাখিয়া উহার উপর পড়িয়া আছে।

তখন নীল আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল, আর তার ঠিক নীচে সন্ধ্যাতারা ধপ্ ধপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

শ্রীউমেশচন্দ্র দে।

ত্রিবেণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গঙ্গাজল চির পবিত্র,—আমিও চির পবিত্র,—কূপোদক স্পর্শে গঙ্গাজল অপবিত্র হয়,—পাপস্পর্শে আমিও অপবিত্র হইব,—এই জ্ঞান থাকিলে, কর্ম্ম ও জ্ঞানে কখন কালিমা পড়িতে পারে না; কাজেই সেই জীবন চির-কালই, গঙ্গার সহিত যমুনা-বাণীর সংযোগের ন্যায়,—পবিত্র কর্ম্ম ও নির্ম্মল জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধে জড়িত থাকে—সাধারণের আদর্শ হইয়া রহিয়াও যায় না—মর্ত্ত্যে থাকিয়াও স্বর্গসুখ উপভোগ করে।

মানবজীবন, শুধু আপনাকে লইয়াই থাকিলে তাহার কর্ত্তব্য শেষ হয় না। পরন্তু এরূপ স্থলে ভয়ানক প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। একটী শস্যে বহু শস্যের সৃষ্টি,—একটি বীজে বহু বৃক্ষের উৎপত্তিই যেমন উদ্ভিদ্‌রাজ্যের প্রকৃতি-গত ধর্ম্ম দেখা যায়,—মানব-রাজ্যেও সেইরূপ ভগবৎ ইচ্ছার অনুকূল—একটি মানব হইতে সেইরূপ আর একটি,—আর একটি এইরূপে ক্রমে সৃষ্টি রক্ষার উপায় ঘটিয়া থাকে। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা ইহাই হয়, তবে মানব পবিত্রতাকে রক্ষা করিয়া যদি নিজেকে কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগে পবিত্র প্রয়াগতীর্থ করিয়া সংসারে রাখিতে পারে,—তবে তাহার সৃষ্টি বা জন্মের মুখ্য বা ঐশ তত্ত্ব যে পুত্রোৎপাদনরূপ মহাব্রত তাহা সম্যক্ প্রকারে পবিত্রভাবেই সংসাধিত বা উদ্যাপিত হয়। শাস্ত্রে বলে, আত্মা পুত্ররূপে—স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে। তবেই হইল বটবৃক্ষের বীজে ঠিক বটবৃক্ষ (পূর্ব্বের ঠিক মত) উৎপন্ন হয়। সে বীজ অন্য বৃক্ষ বা অন্য ভাবে বটত্ব প্রাপ্ত হয় না—মানবের জীবন যেরূপ হইবে তাহার সন্তানও ঠিক সেই রূপ হইবে। সে যদি নিজেকে মহা পবিত্র রাখিতে পারে কর্ম্ম ও জ্ঞানকে পবিত্র রাখিয়া তাহাদের যোগে হৃদয়কে চির পবিত্র রাখিতে পারে, তবে সে হৃদয়জাত যে বীজ তাহা তাহারই অনুরূপ হইয়া তাহাকেই সঞ্জীবিত রাখিবে। তাহার জীবনরূপ প্রয়াগতীর্থ তাহার পুত্রের জীবনে সংক্রামিত হইয়া তাহাকেও পবিত্র কর্ম্ম ও জ্ঞান যোগে মহাতীর্থ প্রয়াগ স্বরূপে সংসারে দেদীপ্যমান রাখিবে,বা রাখিতে সমর্থ হইবে অথবা তাহারও অপেক্ষা না করিয়া

সে নিজেই প্রাকৃতিক গুণে সেইরূপটি হইয়া দাঁড়াইবে। সে সেইরূপ হইলে, আবার তাহারা পুত্র, পরে তাহার পুত্র, এইরূপ বংশ-পরম্পরা এই পবিত্রতার ত্রিবেণীসঙ্গম অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর পবিত্রতায় মহাতীর্থ প্রয়াগের সৃষ্টি করিয়া আবহমান কাল আদর্শ থাকিবে। এই জন্যই মানবজীবনকে কর্ম্ম ও জ্ঞান যোগে ত্রিবেণীরূপে পূজা করিলে শুভ-ফলই দান করিয়া থাকে।

প্রয়াগ,—ত্রিবেণী অর্থাৎ যুক্তবেণী গঙ্গা, যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থল। এই স্থান হইতে ত্রি-ধারা একত্রিত হইয়া সম্মিলন অবস্থায় কিছু দূর যাইয়া আবার গঙ্গা বা ভাগীরথী হইতে যমুনা ও সরস্বতী বিচ্ছিন্ন বা মুক্ত হইয়া মুক্তবেণী ত্রিবেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাও প্রয়াগ-ধামের ন্যায় হিন্দুর চক্ষে মহাতীর্থ। শুধু হিন্দুর নয় বিশ্বাসের চক্ষে দেখিলে ইহা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সাধকমাত্রেরই মহাতীর্থ বা সাধনার স্থল। এইজন্য পুণ্যজীবন দরাফখাঁ গাজী—এই ত্রিবেণীতে (মুক্তবেণীতে) সিদ্ধ হইয়া মূর্ত্তিমতী মকরবাহিনী গঙ্গার দর্শন পাইয়াছিলেন ও তাঁহার স্তবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। আজিও তাঁহার স্তব সকল গঙ্গাভক্তের হৃদয়ে পবিত্রতা আনিয়া মুগ্ধ করিয়া থাকে। সুবিখ্যাত হুগলী নগরীর প্রায় ৩ মাইল উত্তরে এই ত্রি-বেণী-ক্ষেত্র। এইখানে গঙ্গা হইতে পূর্ব্বে যমুনা ও পশ্চিমে সরস্বতী প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। গঙ্গা একাকিনী দক্ষিণবাহিনী হইয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছে।

হরিদ্বার হইতে গঙ্গা বাহির্গত হইয়া একাকিনী প্রয়াগে যমুনা-বাণীর সহিত সম্মিলিত হয়। পরে ত্রি-ধারায় বরাবর আসিয়া এই মুক্তবেণী তীর্থে যমুনা বাণী গঙ্গা হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাহার পর গঙ্গা একাকিনী গমন করিয়া শত মুখে সগর সন্তানগণকে মুক্ত করিয়া মহাসাগরে সংযুক্ত হইয়াছে। সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলে গঙ্গার প্রথম এই একাকিনী থাকা পরে যুক্ত ও মুক্ত অবস্থা এবং শেষে পুনরায় একাকিনী ভাবে সিন্ধুমিলন মানব জীবনের সুন্দর ভাবে প্রকটিত হইয়া আছে।

মানব জীবনকে আমরা যে ভাবে পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে প্রথমে কর্ম্ম ও জ্ঞানের আভাস থাকিলেও তাহা কর্ত্তব্য নহে। শৈশব জীবনের ক্রিয়া কর্ম্মও জ্ঞানের বাহিরে থাকে, ইহা শাস্ত্রসম্মত; এই জন্য এই জীবনের পাপ পুণ্যও ঈশ্বর সান্নিধ্যে অর্পণ কর্ত্তব্য নহে।—গঙ্গা যেমন প্রথম একাকিনী—মানবজীবনও সেইরূপ একাকী থাকিয়া শৈশব জীবন অতিক্রম করে। পরে ক্রমে বুদ্ধির সহিত গুরুদত্ত শিক্ষা-সবুদ্ধিতে কর্ম্ম ও জ্ঞান তাহাকে আশ্রয় করে; ইহাই গঙ্গাতে যমুনা বাণীর মিলনস্বরূপ মানব জীবনে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্মিলন বা শিক্ষার সংযোগ বা ত্রি-বেণী সঙ্গম। তাহার পর কর্ম্ম যমুনার বাণী ত্রিধারায় কিছু দূর একত্রে গমন, ইহাও মানব জীবন কর্ম্ম ও জ্ঞানের একত্রীকরণে শিক্ষা প্রবাহে তাহাদের কার্যোন্নতি ও পবিত্রতা রক্ষা। কর্ম্ম ও জ্ঞান-যোগে জীবন পবিত্র ও আদর্শস্থানীয় [illegible]

বিদ্যা বা তপস্যায় সিদ্ধ হইলে তখন মানুষ সেই কর্ম্ম ও জ্ঞানকে পরার্থে ত্যাগ করিয়া কৃতার্থ হয়। ইহাই মানবের অধ্যাপনা বা উপদেশ দানের সময়। এই সময় আচার্য্য-গণ কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রকৃত স্বাদ ও পবিত্রতা দান করা হয়। অপরকে কর্ম্ম ও জ্ঞানে বদ্ধ করিয়া পবিত্রতা দান করিবার শাস্ত্রীয় বিধি হিন্দু জীবনের মহত্তম সম্পত্তি ও পুণ্যবানের পবিত্র শান্তি! এই কর্ম্ম ও জ্ঞানকে পরার্থে দানই গঙ্গা হইতে যমুনা বাণীর মুক্ত অবস্থা অর্থাৎ মানব জীবনে ত্রি-বেণী বা যুক্ত বেণীর মুক্ত। ইহা ঋষি জীবনের অমূল্য সম্পত্তি। বিদ্যা বা তপস্যায় সিদ্ধ ঋষি পর জীবনের জন্যই অর্থাৎ পরকে বিদ্যা বা তপস্যায় সিদ্ধ করিবার জন্য দানেই আত্মজীবন ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই ত্যাগই মুক্ত বেণী। ইহাতে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকেনা অথচ কেবল অর্থ তাহারই বৃদ্ধি করে।

এই ত্যাগের পর যখন তাহার পরকে বড় করা কাজ শেষ হয়, অর্থাৎ তাহার দ্বারা অপর একটা কি দশটি বা শত সহস্রটি মানুষ কর্ম্ম ও জ্ঞানে দেবভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ সেই মানুষ নিজের মতটা শিষ্য করিতে ও রাখিতে পারে, তখন সে তাহার মুক্ত বেণীর কার্য্য শেষ করে। এদিকেও তাহার জন্য কাল অপেক্ষা করে। তখন সে যমুনা সরস্বতীর সহিত বিচ্ছিন্ন একাকিনী প্রবাহমানা গঙ্গার মত আত্মতত্ত্বের যোগে ঈশ তত্ত্বে মন দিয়া লৌকিক কার্য্যাবলী পবিত্র কর্ম্ম ও জ্ঞানের যোগে সুসম্পন্ন দেখিয়া, সেই আত্মাপনের আমুষ্মিক কার্য্যের জন্য একাকী গমন করিয়া থাকে;- ইহা হিন্দুর চিরন্তন প্রথা। ইহাকেই পূর্ণ সিদ্ধ বলা যায়। এই সিদ্ধিজনিত অমৃত ক্ষরণের কিছুদিন পরে কালের ভেরী বাজিয়া উঠে, সে জীবনও তখন সেই ভেরীর উচ্চ শব্দে এই নশ্বর পৃথিবী তলে অবিনশ্বর কীর্ত্তিকে শত দিকে বিস্তৃত করিয়া পাপী তাপী ও অজ্ঞানকে উদ্ধার করিতে করিতে মহাসিন্ধুতে গঙ্গার পতনরূপ মহাকালে সম্মিলিত হয় বা জীবনের মহাব্রত উদ্যাপন করে। থাকে কেবল যুক্ত বেণী ও মুক্ত বেণী এই ত্রি-বেণী-দ্বয়ের ক্রোড়ে মহাতীর্থ আর বেণীমাধব নামক মহাদেব শিবের প্রতিষ্ঠা, তাঁহার অতুল্য কীর্ত্তি।

বেণী অর্থাৎ জলপ্রবাহ। ত্রি-ধারার একত্র সম্মিলন ও বিচ্ছেদ, এই জন্য যুক্ত বেণী ও মুক্ত বেণী আখ্যায় এই তীর্থদ্বয় প্রখ্যাত। এবং 'বেণী' শব্দের সার্থকতা রক্ষার জন্য তীর্থগর্ভে শ্মশানবক্ষে মাধবরূপী শিবের চির বর্ত্তমানতা। এই জন্য ত্রি-বেণী হিন্দুর পুণ্যস্থান ও তীর্থাগ্রগণ্য; এই জন্যই কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগে মানব জীবন ত্রি-বেণী তীর্থে সম্পূজিত হইবার যোগ্য।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সেন।

বিশ্বনাথ।

তুমিই আমার জীবনের স্বামী
হৃদয়ের পরম পূজ্য।
তুমিই আমার হৃদ্-বিমানে
উজ্জলতম সূর্য্য।
তুমি আদি দেব তুমি মহাদেব,
পতিতের তুমি বন্ধু;

আশুতোষ তুমি আশু তুষ্ট হ'য়ে
　　বিতর করুণাবিন্দু।
সৃজন-পালন সকলি তোমার
　　বিনাশ কারণে রুদ্র;
কি বুঝিব তব মহিমা অপার
　　জ্ঞানহীন আমি ক্ষুদ্র!
তুমি বিশ্বনাথ অনাথের নাথ
　　তুমি হে জ্ঞানবন্ত;
তুমি বিশ্বরূপ কখনো অরূপ
　　তব রূপে কোথা' অন্ত?
অনিলে সলিলে বিকাশ তোমার
　　তুমিত ধরণী ব্যাপ্ত,
তোমার উজ্জ্বল শাশ্বত তেজে
　　রবি-শশী তারা দীপ্ত.
জীবের ভাগ্য বিধাতা পুরুষ
　　তুমিই বিশ্বের যন্ত্র
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে মূলাধার তুমি
　　তুমিই ওঁকার মন্ত্র।
বিশ্বরাজ হ'য়ে ভিখারী গো তুমি
　　পত্নী পাশে চাও ভিক্ষা
ভোগে তুচ্ছ করি সে'জেছ যোগী
　　মানবে দানিতে শিক্ষা;
ওগো যোগিরাজ যোগীর জীবন
　　আমার জীবন অন্তে—
লইও তোমার বক্ষে টানিয়া
　　এ মিনতি পদ প্রান্তে।

শ্রীবঙ্গচন্দ্র নাথ কাব্যবিনোদ।

তোমার দান।

(১)

নীরবে একা বসেছিনু কবে,
　অজানা পথের পানে
তুমি আসিলে ক্ষণে ধীর পদক্ষেপে
　জাগাইলে সংগোপনে।

(২)

তোমার মুরতি ভাবি নাই কভু
　জাগে নাই কভু হৃদে
আজি পরাণ শীতল স্নিগ্ধ আভা
　তব দরশন মাগে।

(৩)

সুপ্ত হৃদয়ে শুভ জাগেছে
গোপনে পশিলে আসি;
কেড়ে নিলে মোর শুভ্র রতন
　অগাধ স্নেহের রাশি!

(৪)

(আজি) তাই বাজে মোর হৃদয় তন্ত্রে
　তোমার বাঁশীর গান,
এ যে চির বিনিময়ে, চির আদরের
　তোমার প্রেমের দান!

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস।

আবাহন।

(সাহানা—একতালা।)

আমি　সারাটি জীবন　ভাব-নিকেতন
　　রেখেছি নাথ, সাজিয়া;
তুমি　নিমেষেরই তরে　পুরাও বাসনা
　　থাকেক তাহে বসিয়া।

অতুল রাতুল চরণ-কমল
ধোয়াব ঢালিয়া নয়নেরি জল,
মুছাব যতনে খুলিয়া কুন্তল,
তব পদে শির নমিয়া।
ভকতি-প্রীতি কুসুম-অঞ্জলি
মন-সাধে নাথ, দিব পদে ঢালি—
প্রেম-মালা গলে দিয়ে কুতূহলে
হেরিব প্রাণ ভরিয়া।
আদর সোহাগে নব অনুরাগে
সাজাইয়া ডালা দিব আগে ভাগে—
কায়-মন-প্রাণ করি নিবেদন,
আপনা ভুলিব আপনা সঁপিয়া।
আমার আমিত্ব তোমাতে মিশাব
তোমার তুমিত্বে ডুবিয়া রহিব,—
তোমাময় হয়ে তোমার হইব
তব প্রেমে বঁধু মজিয়া।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, বি-এস্-সি।

ব্যর্থ কবি।

ক

দৃষ্টি আমি চাইনে প্রভু,
দৃষ্টি আমার রুদ্ধ হোক;
স্পর্শ মম থাকগে থেমে,
কর্ণ আমার রুদ্ধ হোক;
ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের রুদ্ধ পথ
আর না যেন কোন মতে
পায় বায়ুর গন্ধ বহি
জিহ্বা আমার স্তব্ধ করে;
কণ্ঠ আমার স্তব্ধ হয়ে
থাকগে থেমে শেষ হয়ে।

খ

দম্ভ কবির ব্যর্থ করি
সৃষ্টির পরে বিশ্ব আছে;
দার্শনিকে ব্যঙ্গ করি
দৃষ্টির পরে দৃশ্য নাচে;
বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞতাকে
স্তব্ধ করি বিশ্ব ডাকে—
সসীমেরই কণ্ঠ রোধি,
অসীমেরই শঙ্খ বাজে;
জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের মাঝে
বিশ্ব-সৃষ্টি কতই রাজে।

গ

মত্ত হিয়ার সৃষ্টি-কাণ্ড
লুপ্ত কোথায় বিশ্ব গড়ি?
ডঙ্কা কালের গর্ব্বে নাদে
সৃষ্টি কবির ব্যর্থ করি;
বিশ্বের পরে বিশ্ব লয়ে
কালের স্রোতে যাচ্ছে বয়ে
দম্ভ তবে কিসের তার
মত্ততার এ বিশ্ব গড়ি?
অনন্ত;—তার সৃষ্টি পাছে
ফিরছে বিশ্ব নৃত্য করি!

ঘ

মহাকালের রঙ্গ মাঝে
কল্পনার এ বিশ্ব গড়া
ব্যর্থতা যে মত্ততারই—
স্রষ্টা না তার দিচ্ছে ধরা;
সৃষ্টি যতই যাচ্ছে বেড়ে
স্রষ্টা ততই যাচ্ছে হেরে
সৃষ্টির পরে সৃষ্টি এসে

জাগিয়ে দিচ্ছে মত্ততাকে ;
মত্ত কবি নিজের জালে
ঘুরছে সদা সৃষ্টি পাকে।

৩

আজকে ওরে ব্যর্থ কবি,
মত্ততার এ সৃষ্টি রাখি,
দাঁড়া এবে পেছন ফিরে,
থাক্ পড়ে এ সৃষ্টি বাকি ;
মহাকালের বেলা ভূমে
সৃষ্টি নিবিড় মৃত্যু-ধূমে
ডুবিয়ে দেরে—বিশ্ব রেখা
যাকগে মুছে চিরতরে ;
এ পারেরই স্রষ্টা সৃষ্টি
এপারেই থাকগে পড়ে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষাল, বি-এ।

হরিনাম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতং।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলং ॥"

হায়! 'হরিনামের মতন আর কি আছে রতন?'—এ নামের মত যে আর কিছুই নহে; এমন মোক্ষ-ফলপ্রদ—এমন অবিনশ্বর সম্পদ যে আর নাই! সংসার-সুখ-মুগ্ধ বিষয়াসক্ত মূঢ় মন! এ অনিত্য সংসার-চিন্তা ছাড়িয়া একবার হরি হরি বলিয়া ডাক। 'যখন পাঁচ ভূতে মিলে, সকলি তোমায় ফেলে, কে কোথায় যাবে চলে, [illegible] কি খবর রাখ?' মন! অবিরাম বল, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! প্রতিনিয়ত নাম করিতে করিতে সংসার-জ্বালা দূরে যাবে—হৃদয় জুড়াইবে। হরিনামরূপ অমৃতনির্ঝরিণীর মধুর প্রবাহে মনের মলিনতা দূর হইবে—মন প্রেমানন্দে ভাসিবে।

মন! তুমি ত হরিবোল বলিয়া ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে পারিলে না, তুমি ত হরিনামে আত্মহারা হইয়া উন্মাদের ন্যায় তাণ্ডব নৃত্য করিতে পারিলে না, তবে তোমার উপায় কি?—উপায় আছে, নাম কর, 'হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা' যেমন করিয়া পার অবিরত কেবলই নাম কর। অবিরাম বল, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! এইরূপে বার বার করি বলিলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে—প্রাণে ভক্তির বান ডাকিবে। নাম করিতে করিতেই তাঁহার কৃপা লাভ হইবে। ডাক, মন! বার বার হরি হরি বলিয়া ডাক; কলিতে নাম-কীর্ত্তনই যে মুক্তির একমাত্র উপায়।

ভাই! প্রাণ ভরিয়া অবিরাম হরিনাম কর। শ্রীহরিতে ও তাঁহার নামে কোনও পার্থক্য নাই। ঐ দেখ, হরিভক্ত কবি প্রাণ খুলিয়া গাইতেছেন :—

"সেই নাম, সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন, আপনি শ্রীহরি॥"

নাম কর ভাই! নাম কর; মধুর হরিনামের প্রেম-বন্যায় বিশ্ব ভাসাইয়া দাও—হরিগুণ-গানে এ নিখিল বিশ্ব পূর্ণ হউক। 'উঠুক এ হরিধ্বনি গগনে-পবনে, বাজুক মঙ্গল-শঙ্খ ভবনে ভবনে।' এ জগতের প্রতি গৃহ হরিনামের পবিত্র মধুর রবে মুখরিত হউক, বিশ্বকণ্ঠে সমস্বরে ধ্বনিত হউক, হরিবোল।

হরিবোল। হরিবোল।

কলিতে হরিনামই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। এ যুগে জ্ঞান বা কর্ম্মযোগের আর তেমন প্রয়োজন হয় না, একমাত্র ভক্তিযোগই মুক্তির সর্বোপায়। এ যুগে শুধু ভক্তিতেই শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়। ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে প্রাণ ভরিয়া নিয়ত তাঁহার নাম কর, মুক্তি আসিয়া আপনি তোমার দ্বারে উপস্থিত হইবে—ভক্তের ভগবান আপনি আসিয়া তাঁহার ভক্তকে কোলে তুলিয়া লইবেন।

ভাই! তোমার শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব বলিয়া নাম করিতে বিরত হইও না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন,—"জ্ঞানে অজ্ঞানে বা ভ্রান্তে যে কোন ভাবেই হোক না কেন, তাঁর নাম করলেই ফল হবে। অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারে হোক, একবার পড়তে পারলেই অমর হওয়া যায়।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ)

নাম কর, ভাই! নাম কর। হরিনাম করিতে করিতে তোমার প্রাণের গুপ্ত কক্ষে—হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে যখন তোমার প্রাণের ঠাকুর আসিয়া উপনীত হইবেন—যখন আপনি শ্রীভগবান শ্রীহরি তোমার হৃদাসন আলো করিয়া বসিবেন, যখন তাঁহার অমিয়মধুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে তোমার অঙ্গ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে, নাসিকা শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের সুরভিত্র পদ্মগন্ধে বিভোর হইবে, কর্ণে কৃষ্ণকথা—তাঁহার মধুর মুরলী-গান ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাইবে না, জিহ্বা সুধায় সিক্ত হোয়াক বিগলিত হইবে, তখন তোমার মানবজন্ম সার্থক হইবে, ধন্য হইবে—জীবন মধুময় হইয়া যাইবে। তখন তুমি বিশ্বময় বিশ্বনাথের মোহন মূর্ত্তি—শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে মুগ্ধ হইবে—বিভোর হইবে—সশরীরে স্বর্গবাসী হইবে। তখন তুমি তোমার সাধনার ধনের দর্শনে আত্মহারা হইয়া বিপুল হর্ষভরে গাইয়া উঠিবে,—

"অধরং মধুরং বদনং মধুরং
বচনং মধুরং বলিতং মধুরং।
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং
কাণং মধুরং বলিতং মধুরং॥
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং।
মধুরাধিপতের্খিলং মধুরং
মধুরাধিপতের্খিলং মধুরং॥"

তখন,—অন্তর ছিঁড়িয়ে শোণিত-ধারায়
বহিবে সদা প্রেম-অশ্রু-ধার!
তখন,—নবীন আলোকে মধুর পুলকে
বাজিবে মরমে প্রেমের বাঁশরী॥

তখন তুমি এ মনুষ্যদেহেই দেবতা হইয়া যাইবে! তাই বলি, ভাই! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! প্রাণ ভরিয়া সকলে সকল কর্ম্মের মধ্যে নিয়ত হরি হরি বল। 'সবে পায় ধরি, শুধাইব হরি' এ অযোগ্য অধমের তেমন দৈন্য—তেমন সাধন-ভজন, তেমন ক্ষমতা ত নাই; এ দীন নিজেই যে নামের কাঙ্গাল!—দুর্জ্জয় অভিমানের দাস! তোমরা প্রেমিক-ভক্ত—হরিনামে পাগল, সবে একবার হরি হরি বল; শুনি তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া—হরিভক্তের পদরেণু মস্তকে

ধারণ করিয়া হরিবোল বলিয়ে দু'বাহু তুলিয়ে নাচিয়ে গাহিয়ে' যেন পাগল হইতে পারি। বল, ভাই সকল!—সমবেত ভক্ত-সাধকগণ! প্রাণ ভরিয়া সকলে সমকণ্ঠে একবার হরিবোল বল। আহো! কি মধুর নাম! যে যেখানে থাক, প্রেমানন্দে উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া এস; বল, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

"ওরে ভক্ত, ওরে পাগল, তোল্ রে হুঙ্কার-রোল,
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক, বল্‌রে 'হরিবোল'।
মোহের ধাঁধায় আর যাবি না,
এমন নাম তুই আর পাবি না,
জাগে ভোলা পরাণ খোলা নামের তুফান
রোল,
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক, বল্‌রে 'হরিবোল'।

ক্রমশঃ

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কাব্যতীর্থ।

প্রেম।

ভাব হইতে প্রেমের উদয় হয়, ভাবের চালনা হইলে প্রেম উপস্থিত হয়; যখন হৃদয় অন্তঃকরণ সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হয়, যাহা অতিশয় মমতাযুক্ত এবং যাহা অতিশয় ঘনীভূত এইরূপ যে ভাব তাহাকে কবিগণ প্রেম কহিয়া থাকেন।

আমি চাই সেই প্রেম, যে প্রেম বর্ষার কূলপ্লাবী ভরা গঙ্গার ন্যায় পূর্ণ, যে প্রেম স্থির, যাহাতে তরঙ্গের লীলা থাকে না, যাহাতে আবর্ত্তের ভীষণতা দৃষ্ট হয় না, যে প্রেম পবিত্র —পূর্ণ, এরূপ প্রেম কে দান দিতে পারে?

প্রেম কি? তোমরা যাকে প্রেম বল আমি তাহাকে "মোহ" বলি। অবশ্য প্রেমে ও মোহে বিস্তর প্রভেদ; এ সংসার মায়াময়; মায়ামোহে জীব বদ্ধ।

স্ত্রী বল, পুত্র বল, ভ্রাতা বল, ভগ্নী বল, পতি বল, পত্নী বল, জননী বল সকলেই মায়া-মোহে অচেতন; সকলেই মোহের বন্ধনে বদ্ধ। এই মোহ হৃদয়কে যতদিন পূর্ণ করিয়া রাখে ততদিন ইহা প্রেম বলিয়া প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা প্রেম নহে।

যেখানে মোহ বে, তোমার ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী, কালসাপেক্ষ সেখানে তাহা প্রেম নহে। প্রেম, পবিত্র পদার্থ! প্রেম স্বর্গীয়, দুর্লভ বস্তু। যাহা রূপজ বা গুণজ তাহা মোহ-সম্ভূত। তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, কমনীয় কান্তি আছে, তোমাকে দেখিলে মনে আনন্দের সঞ্চার হয়, বিলাসতৃষ্ণার তরঙ্গ উঠে, সুতরাং তোমাকে ভালবাসি; ইহাই রূপজ মোহ! এই মোহের সম্বন্ধ—রূপের সহিত, যতদিন তোমার রূপ থাকিবে ততদিন তোমার রূপে মুগ্ধ থাকিবে, ইহাকে ভালবাসা বলে না। এরূপ ভালবাসা, এরূপ প্রেম সংসারে বিরল নহে; রূপ-ক্ষয়ে অথবা বয়োবৃদ্ধিতে এই মোহের হ্রাস হইতে পারে। গুণজ মোহ এইরূপ। তোমার রূপ নাই—ঐশ্বর্য্য আছে অথবা অন্য কোন গুণ আছে, আমি তাহাতে মুগ্ধ হইলাম। যতদিন তোমার সেই গুণ আমার প্রাণে বীণার ঝঙ্কার দিতে থাকিবে ততদিন আমি তোমার অধীন। কিন্তু একবার কোন সূত্রে মোহ অন্তর্হিত হইলে তোমাতে আমাতে আর সম্বন্ধ থাকিবে না—রূপজ বা গুণজ মোহ সার্থক—

প্রেম অপার্থিব, স্বর্গীয়।

কবি-কল্পনায় আমরা এই রূপজ ও গুণজ মোহের চিত্রই অধিকতর প্রতিফলিত পাই। তোমার সাবিত্রী, দ্রৌপদী, তোমার দময়ন্তী, চিন্তা, তোমার শকুন্তলা, তিলোত্তমা সর্ব্বত্রই এই রূপজ বা গুণজ মোহের পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হইবে। প্রথমে কেহ হয় ত নয়নাভিরাম বপু—কেহ বা অনুপম গুণ সন্দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছেন। তাহার পর মায়াপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। সত্য বটে, অনেকে তাহাতে অবশেষে আত্মহারা পর্য্যন্ত হইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে স্বার্থের সংশ্রব থাকায় উহা কলুষিত হইয়াছে।

যাহা রূপ দেখে না, গুণ দেখে না—যাহা স্বাভাবিক—তাহাই পবিত্র প্রেম। এই প্রেমসলিলে অবগাহন করিলে জন্ম হয় না—কলুষকলঙ্ক দূরীভূত হয়—মানুষ দেবতা হয়। প্রেমের এই পূর্ণ বিকাশ শুদ্ধ হরগৌরীতে বিদ্যমান। শ্মশানচারী চিরযোগী ভিখারী ভোলাকে না দেখিয়া, তাঁহার গুণের কথা না শুনিয়া গৌরী এক মনে এক ধ্যানে তাহারই উপাসনা করিয়াছিলেন। রূপ-তৃষ্ণায় গৌরী ব্যাকুলা হন নাই। তিনি মহেশের মাথেই মুগ্ধ। আত্মা হইতে তাঁহার প্রেম-প্রবাহ ছুটিয়াছিল। মর্ম্মে মর্ম্মে, প্রাণে প্রাণে, তিনি শিবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

আমি জানি ইহাই প্রেম। তোমরা এরূপ প্রেমের মর্য্যাদা করিও না। আমি স্বার্থবাধা প্রেমের প্রত্যাশী নহি। আমার মস্তকে বজ্র নিপাত হউক, ধরা সহস্রধা বিদীর্ণ হউক, তথাপি আমি এরূপ প্রেম হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না।

মাসিক সংবাদ।

আদ্যশ্রাদ্ধ।—প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পবিত্র বংশ, পোস্তা রাজবাটীর নাম লোকের হৃদয় হইতে লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল, এক্ষণে তদীয় বংশধর পরদুঃখকাতর দানবীর কুমার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায় বাহাদুর পূর্ব্ব পুরুষগণের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; পিতৃকীর্ত্তি যাহাতে বজায় থাকে—সে বিষয়ে কুমারের দৃষ্টি যথেষ্টরূপে বর্ত্তমান। সংপ্রতি মাননীয় কুমার হরিপ্রসাদ তদীয় জননীর স্বর্গারোহণে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার আদ্যকৃত্য সমাধা করিয়াছেন। দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রাদ্ধকার্য্যে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। ৩রা চৈত্র মঙ্গলবার প্রাতে আদ্যশ্রাদ্ধ ও সভাধিবেশন, রাত্রিতে প্রায় আট দশ হাজার কাঙ্গালী বিদায় হইয়াছিল। বালক ও বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে যথাক্রমে ৵০ আনা ও চারি আনা নগদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৪ঠা চৈত্র বুধবার "ব্রাহ্মণ ভোজন" বিশেষ পরিতৃপ্তির সহিত সমাধা হইয়াছিল। বিনয়ী কুমার হরিপ্রসাদ সকলের নিকট যোড়হস্তে আপনার নম্রতা তথা অমায়িকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার নিয়মভঙ্গ, মধ্যাহ্ন ভোজন, ও রাত্রে জলপানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমাদের অকৃত্রিম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল,

মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। এই শোকসভায় কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য :—কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, মাননীয় উপেন্দ্রনাথ বসু ও বাবু যতীন্দ্রনাথ বসু (এটর্ণী), মাননীয় বিচারপতি এ. চৌধুরী, মাননীয় জে. চৌধুরী (ব্যারিষ্টার), রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় (জমীদার উত্তরপাড়া) বাবু শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বেঙ্গলী সম্পাদক) বাবু পীযূষকান্তি ঘোষ (সম্পাদক অমৃতবাজার পত্রিকা) ডাক্তার ডি. এন, মৈত্র, দেওয়ান বাহাদুর, হীরালাল বসু, মাননীয় রাধাচরণ পাল বাহাদুর, পণ্ডিত কালিদেব শাস্ত্রী, রায় সাহেব তারাচন্দ্র রক্ষিত, প্রভৃতি। আদ্যকৃত্য বেশ সুশৃঙ্খলায় সমাহিত হইয়াছিল।

উপাধিলাভ।—পোস্তা রাজবাটীর কুমার হরিপ্রসাদ রায় দুঃস্থ সাহিত্যসেবিগণের অকপট বন্ধু এবং "আলোচনা" পত্রিকার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক, সংপ্রতি তাঁহার উদারতা গুণে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতার সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "সাহিত্যনিধি" উপাধি দান করিয়া যথার্থ গুণের আদর ও যোগ্যপাত্রে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। কুমার হরিপ্রসাদ এরূপ উপাধি লাভের উপযুক্ত পাত্র, আশীর্ব্বাদ করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া মাননীয় পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত এই উপাধি-সম্মান উপভোগ করুন এবং দরিদ্র সাহিত্যসেবিগণের অভাব অভি-যোগে যুক্তহস্ত হইয়া আপনার পিতৃ পবিত্র বংশের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন।

পরলোকে।—কলিকাতার সুবিখ্যাত বণিক মেসার্স মণিলাল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। রামপদ বাবু আমাদের সোদর-প্রতিম বন্ধু ছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা যারপরনাই শোক-সন্তপ্ত। কিন্তু বিধাতার কার্য্যে ত কাহারও হাত নাই। রামপদ বাবু পরদুঃখ-কাতর ও ধার্ম্মিক ছিলেন। —ভগবান তাঁহার আত্মার সদ্গতি করুন। রামপদ বাবু সামান্য অবস্থা হইতে পাঁচ ছয়টি কারবারের মালিক হইয়া অনেক ধন-সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। আশা করি তাঁহার অনুজ শ্রীমান হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজের পন্থা অনুসরণ করিয়া সমস্ত কারবার সগৌরবে বজায় রাখিতে সক্ষম হইবেন।

বাটরা অনাথবন্ধু সমিতি।—প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত রামচরণ কুণ্ডু মহাশয়ের যত্নে বাটরা অনাথবন্ধু সমিতির উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই সমিতি হইতে অনেক দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করা হইয়া থাকে। অনবিচ্ছিন্নভাবে সেবা করিয়া সমিতির সভ্যগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে, যাত্রাভিনয়, থিয়েটার প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া সমিতির ফণ্ড সংগ্রহের সহায়তা করিয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে মুষ্টিভিক্ষাই সমিতির প্রধান অবলম্বন। আমরা এই সমিতির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিতেছি।